পদ্ধতি পরিচালনা ও স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে

গায়ত্রী যতি

সুবোধকুমার সেনগুপ্ত

পদ্ধতি, পরিচালনা ও স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে

(বি. এড.-এর তৃতীয় পত্রের পাঠ্যসূচী অনুসরণে লিখিত)

গায়ত্রী যতি

স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রাপ্ত (বাণীপুর) প্রথম শ্রেণী, বি-এড. (উৎকল) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, এম-এ. ডাবল (দর্শন-দ্বিতীয় শ্রেণী, এডুকেশন-প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয়) ;

শিক্ষাপদ্ধতি ও শারীর-বিজ্ঞান পুস্তক প্রণেতা ;

অধ্যক্ষা, রামকৃষ্ণ মিশন সারদামন্দির বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থা, ইউনিট—২, সরিষা, ২৪ পরগণা।

ও

সুবোধ কুমার সেনগুপ্ত, এম.এ., বি.টি.,

লেকচারার, রামকৃষ্ণ মিশন সারদামন্দির বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থা, ইউনিট—২, সরিষা। প্রাক্তন অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, বাণীপুর ;

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষাতত্ত্ব পরিক্রমা, শিক্ষাপদ্ধতি ও শারীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তক রচয়িতা।

প্রাপ্তিস্থান :

স্যাঙ্গুইন পাবলিশার্স কনসার্ন

৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৯

প্রকাশক :
বিশ্বনাথ ঘোষ,
৩৯৷ বিবিতলা লেন,
হাওড়া-৩।

মূল্য— টাঃ ১২·০০

মুদ্রাকর :
শ্রীসুকুমার নাগ
ইম্প্রেশন
৩৩বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

আমাদের দু' চার কথা

"শিক্ষাপদ্ধতি, পরিচালনা ও স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে" বইখানি লিখতে আমরা কেন উদ্বুদ্ধ হলাম সে সম্বন্ধে পাঠক সমাজকে দু' চার কথা অবহিত করা প্রয়োজন।

বিশ্ববিজ্ঞানের জয়যাত্রা প্রত্যেকটি পার্থিব জিনিসকে নবতর মূল্যায়নের নিরিখে দেখতে সাহায্য করেছে—প্রত্যেক তাত্ত্বিক জিনিসের মধ্যেও এনে দিয়েছে ব্যবহারিক যাদুর স্পর্শ। আমরা যদি নিতান্তই কুম্ভকর্ণের মত দীর্ঘ সুখনিদ্রায় নিমজ্জিত না থাকি তবে নিশ্চয়ই যুগের ডাকে আমাদের সাড়া জাগবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নিরন্তর ভাঙাগড়ার কাজ চলেছে; এই ভাঙাগড়ার কাজে শিক্ষাপদ্ধতি পরিচালনাকেও সব সময় ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। পদ্ধতি ও পরিচালনা সম্বন্ধে সর্বাধুনিক মতবাদগুলি সংগ্রহ করতে অনেক সময় দেশী, বিদেশী বহু পুস্তক ও পত্রিকার সাহায্য নিতে হয়েছে; যাঁদের লেখা থেকে আমরা উপকৃত হয়েছি তাঁদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইখানি লেখার সময় বি. এড.-এর পাঠ্যসূচীকে গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। বইখানি পড়ে শিক্ষক-শিক্ষণের সাথে যুক্ত ও বর্তমানের শিক্ষা-পদ্ধতি পরিচালনা সম্বন্ধে জানতে উৎসুক এমন কেউ যদি উপকৃত হন তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

গায়ত্রী যতি
সুবোধ সেনগুপ্ত

স্বীকৃতি

আমরা উভয়েই পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী নির্মোহানন্দ মহারাজজীর কাছ থেকে এই পুস্তকটি লিখবার প্রেরণা লাভ করেছি। এজন্য আমরা উভয়েই তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর কাছে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই।

তাছাড়া অনেকের (লেখিকার বন্ধুবর্গ ও লেখকের ছাত্রছাত্রীবৃন্দের) কাছ থেকে এই পুস্তক রচনায় নানা উপদেশ ও ইঙ্গিত লাভ করেছি। তার জন্য আমরা তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ ছাড়া লেখিকা লেখার তাগিদ পেয়েছেন তাঁর ছোট্ট বোন-পো পাপ্‌পুর কাছ থেকে। সে এখানে এলেই সকলকে সাবধান করে বলে দেয়, 'মাম্‌মাম এখন লিখছে, কাছে যেও না, রাগ করবে। আমিই শুধু কাছে কাছে থাকব।'

লেখককে তাগিদ দিয়েছে তাঁর ভাগ্নে অরূপ। অরূপ এখন বুঝতে শিখেছে এটা গল্পের বই নয়। সে পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ নিয়ে নাড়াগাড়া ও বানান ভুল বের করতে চেষ্টা করেছে। আমরা উভয়কে আশীর্বাদ জানাই।

লেখকের সোদরপ্রতিম সুবিখ্যাত আর্টিষ্ট শ্রী ও. সি. গাঙ্গুলী বইখানির প্রচ্ছদপট অঙ্কণ করে দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই।

বইখানির অন্যান্য চিত্র এঁকেছেন আমাদের সহকর্মী শ্রীবীরেন গৌতম। তাঁকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জন্মাষ্টমী ১৯৭২ গায়ত্রী যতি
সরিষা সুবোধ সেনগুপ্ত

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী নির্মোহানন্দ মহারাজজীর পায়ে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে এই পুস্তকটি উৎসর্গীকৃত হল।

গায়ত্রী যতি

স্নেহের মা ফুলালী। তুমি অকালে চলে গিয়েছ। তুমি লেখাপড়া খুব ভালবাসতে। তোমার স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুস্তকটি উৎসর্গীকৃত হল।

সুবোধ সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

তৃতীয় ভাগ

পদ্ধতি, পরিচালনা ও স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে

প্রথম ভাগ

পদ্ধতি

পদ্ধতি, পরিচালনা ও স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষায় পদ্ধতিতত্ত্বের গুরুত্ব

(Importance of Methodology in Education)

ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি। প্রথমটি হচ্ছে শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়টি হচ্ছে শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পরবর্তী কথা হচ্ছে শিক্ষাদান পদ্ধতি। শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্যদ্বারা স্থির করতে হয় কোন পথে শিক্ষাদানে অগ্রসর হতে হবে। শিক্ষার বিষয়বস্তুদ্বারা স্থিরীকৃত হবে শিক্ষার্থীদের কি বিষয়ে অভিজ্ঞতা দান করা হবে এবং তৃতীয় পর্যায়ে বা শিক্ষাদান পদ্ধতিদ্বারা নির্ণীত হবে কোন ধারা অবলম্বন করে শিক্ষাদান কার্য চলবে। এই ত্রিধারার সঙ্গমই হচ্ছে সার্থক শিক্ষণ প্রক্রিয়া। এদের মধ্যে একটি উপেক্ষিত বা অবহেলিত হলে, কিংবা এদের মধ্যে যদি ভারসাম্য বজায় না রাখা যায়, তাহলে শিক্ষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব প্রত্যেকটি অংশের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই সার্থক শিক্ষাদান কার্য এবং শিক্ষা প্রক্রিয়ার গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হতে পারে।

প্রাচীন শিক্ষা ও পদ্ধতি।

প্রাচীন শিক্ষাধারায় জীবন ও শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত ছিল। তখন না ছিল বিদ্যালয়, না ছিল কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জীবনের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতাসমূহ, অনভিজ্ঞগণ দেখে ও শুনে অভিজ্ঞদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করত। পরে পুরোহিত সম্প্রদায় যখন শিক্ষা দিতে অগ্রণী হলেন, তখন সে শিক্ষা হল কঠিন। তখন শিক্ষার লক্ষ্যের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতে লাগল, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হল লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় পুরোহিত সম্প্রদায় বা ব্রাহ্মণগণ নানা বিষয়ক কলা ও বৃত্তিমূলক জ্ঞানকে আখ্যা দিলেন অপরাবিদ্যা এবং যে সমস্ত শাস্ত্র ও দর্শন সম্পর্কিত বিদ্যা ঐহিক আশা-আকাঙ্ক্ষা হতে

মনকে মুক্ত করে সে বিদ্যাকে বলা হল পরাবিদ্যা (সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে), এই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলে পরিগণিত হল।

শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর প্রাচীনকালে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলেও বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি যে একেবারে অবহেলিত হয় নি, তা সে-যুগের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতি দেখলেই বুঝতে পারা যায়। অপরা ও পরাবিদ্যার জন্য বিভিন্ন পাঠ্যক্রম ছিল ও ঐগুলির মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষাপদ্ধতিও অকিঞ্চিৎকর ছিল না। যদিও তা বর্তমান মনোবিজ্ঞানসম্মত রূপ পরিগ্রহ করে নি। ঐ যুগের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে গুরু প্রথমে আবৃত্তি করতেন, শিক্ষার্থী তার পুনরাবৃত্তি করত, তারপর গুরু তার ব্যাখ্যা করতেন। পরে শিক্ষার্থী তার উপর প্রশ্ন করতেন। তারপর গুরু ও শিষ্য সমগ্র বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতেন।

তৈত্তরীয় উপনিষদে গুরু শিষ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ের সম্বন্ধ সুন্দরভাবে দেখান হয়েছে। "জ্ঞানদানের ক্ষেত্রে গুরু হচ্ছেন সম্মুখভাগ, শিক্ষার্থী হচ্ছেন পশ্চাৎভাগ, জ্ঞানদান হইতেছে দুইয়ের সংযোজক এবং ব্যাখ্যা হইতেছে সংযোজনী শক্তি।"

কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতির স্বরূপ মনোবিজ্ঞানসম্মত ছিল না। প্রাচীনপন্থীরা বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে কতকগুলি মূল শিক্ষিতব্য বিষয় বর্তমান, যেগুলির আয়ত্তীকরণ হলে বুদ্ধি মার্জিত হয়, স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হয়, বোধশক্তি উন্নততর হয় ইত্যাদি। পশ্চিমী দেশসমূহে গ্রীক ও লাতিন শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। এতে যে মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তা অন্যত্র শিক্ষণে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে গণিতশাস্ত্র, যুক্তিশাস্ত্র ইত্যাদি পাঠেও বুদ্ধি, মনোযোগ ও ধৈর্যের উন্নতি ঘটে থাকে। দার্শনিক লক, মনস্তত্ত্ববিদ হার্বার্ট প্রভৃতি এই মতের সমর্থক। এঁদের বলা হয় বিবৃতিবাদী।

বর্তমান সময়ে এই বিবৃতিবাদী মনস্তত্ত্ব অনেকেই নিরর্থক বলে মনে করেন এবং একে সমর্থন করেন না। আমরা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হতে দেখতে পাই, যে অধ্যাপক গণিতশাস্ত্র পাঠে যথেষ্ট চিন্তন শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তিনি সাংসারিক কোন সমস্যা সমাধান করতে পারছেন না; আবার দেখা যায় কোনও কবিতা অনুরাগী ব্যক্তি যখন তখন কবিতা আউড়ে যাচ্ছেন কিংবা ঐতিহাসিক সন তারিখ স্মরণ রাখার যথেষ্ট দক্ষতা প্রদান করেছেন, কিন্তু সেই ব্যক্তিই হয়ত কোন নির্দিষ্ট টেলিফোন নম্বর বা মোটর গাড়ীর নম্বর

বা বাড়ির নম্বর বা রাস্তার নাম মনে রাখতে পারছেন না। বিবৃতিবাদের দ্বারা এগুলির ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

অথচ প্রাচীন যুগে এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছিল এবং সেইভাবেই শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলত। অতএব পদ্ধতিতে কিছু অসঙ্গতি থেকে গিয়েছিল।

বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদেরা ভুল তত্ত্বের অনুসরণ করেছিলেন তেমনি ভুল তত্ত্বের অনুসরণ করেছিলেন দৈহিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও। প্রাচীন রোমীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য কঠোরভাবে বেত মারা হত। কিন্তু বর্তমান প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে ঐ জাতীয় কঠোর শাসনের অবলুপ্তি ঘটেছে। কাজেই প্রাচীন যুগের শৃঙ্খলা সম্পর্কিত মতবাদ সেই যুগের শিক্ষাপদ্ধতিকেও প্রভাবান্বিত করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অতএব শিক্ষাপদ্ধতিতে ত্রুটি থাকলে শিক্ষা প্রক্রিয়া যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তা বলাই বাহুল্য। এই অসম্পূর্ণতার ফলে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করার মধ্যে ফাঁক থেকে গিয়েছিল। প্রাচীন যুগে মুখস্থ করার উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। শিক্ষার্থীকে শাস্ত্রসমূহ মুখস্থ করে ফেলতে হত, অথচ শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই জ্ঞানকে রূপায়িত করতে পারত না। পরা ও অপরাবিদ্যার অনুসরণের মধ্যে ত্রুটি ও বিফলতা দেখা গিয়েছিল। কিছুদিন পূর্বেও দেখা গেছে বাংলাদেশের মক্তবগুলিতে শিশু শিক্ষার্থীরা কোরাণের কিছু কিছু অংশ মুখস্থ করছে। কিন্তু তারা ঐ স্তবকের অর্থ বলতে পারত না। এ শিক্ষায় লাভ কতটুকু? অতএব উপযুক্ত পদ্ধতির অভাবে যে প্রাচীন যুগ হতে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর পঞ্চ দশক পর্যন্ত ভারতে প্রকৃত শিক্ষা লাভে ত্রুটি ঘটেছে তা সহজেই অনুমেয়। যে শিক্ষা জীবনে গ্রহণ করা সম্ভব হল না, যা জীবনের ধ্যান-ধারণার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারল না, সেই শিক্ষাই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। অথচ বিষয়বস্তু যদি শিক্ষার্থীদের হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপিত করা হত, উপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু উপলব্ধিতে সাহায্য করা হত তাহলে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু জীবনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে নূতন চিন্তাধারায় শিক্ষার্থীদিগকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারত। কিন্তু তা করা সম্ভব হয় নি। তাইত দেখা যাচ্ছে শিক্ষাদান পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

শিক্ষাব্যবস্থায় উত্তম পদ্ধতির ভূমিকা।

১। পূর্বে শিক্ষা বলতে শিক্ষার ফল অর্থাৎ অর্জিত জ্ঞানের কথা বা অর্জিত কৌশলের কথাই বুঝাত। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা হল স্থিতিশীল (Static) কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আত্মবিকাশ অর্থাৎ উহা একটি চলমান শক্তি (Dynamic) এবং এই গতিশীলতার মাধ্যমেই শিশুর আত্মবিকাশ বা সামগ্রিক বিকাশ হয়ে থাকে। এই অর্থে শিক্ষার লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও, কিভাবে অর্থাৎ কি প্রক্রিয়ায় বা পদ্ধতিকে সেই লক্ষ্যে পৌছান যায়, তাই হচ্ছে আরও বড়। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেছেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে শুধু জ্ঞান দানই যথেষ্ট নয়। গতিশীল শিক্ষাপদ্ধতির (Dynamic methods of teachings) মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর উপযুক্ত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা ও তাদের সক্রিয় করে তোলাও শিক্ষার কাজ। অতএব বুঝতে পারা যাচ্ছে উত্তম পদ্ধতির ভূমিকা শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় কতকখানি গুরুত্বপূর্ণ।

২। শিখন কাজটি বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে হয়। শিক্ষা সার্থক হয় তখনই, যখন উভয় প্রকারের প্রক্রিয়াসমূহের উপযুক্ত সম্পাদন হয়। কিন্তু কোনও কারণে যদি কোনও একটি প্রক্রিয়া যথাযথরূপে সম্পাদিত না হয়, তাহলে শিক্ষা হয়ে উঠবে ত্রুটিপূর্ণ। প্রাচীন কালের শিক্ষক সম্প্রদায় এই গুরুত্বপূর্ণ সমন্বিত মানসিক ও শারীরিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না, ফলে তাঁদের শিক্ষাপদ্ধতির ধারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে চলেছিল। বর্তমান যুগে মনোবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে, ফলে পদ্ধতির ধারাও তারই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। কর্মমাধ্যম হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি, যা অনুসৃত হবার ফলে শিক্ষালাভে শিশুর সময় ও শ্রম উভয়ের অপচয়ই হ্রাস পেয়েছে।

একটি উদাহরণ নিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। উপযুক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করলে শিশু তার পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষক যদি শিশুর শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলির উপযুক্ত ব্যবহার করে শিক্ষাদান করতে পারেন, তাহলে শিশু তার পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। শিশু জীবনে চলার পথে নানা ধরণের প্রাকৃতিক ও জৈবিক সংঘাতের সম্মুখীন হয়। বস্তুতঃপক্ষে তার সমগ্র জীবনই সংঘাতের

ক্ষেত্র। উপযুক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করলে শিশু বিভিন্ন বিরোধী শক্তি-সমূহকে অতিক্রম করে নিজেকে সাধারণ ও স্বাভাবিক করে তুলতে পারবে।

আর একটি উদাহরণের সাহায্য নিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। মুখস্থকরণ, শিখনের ক্ষেত্রে একটি উপযোগী প্রক্রিয়া, কিন্তু তা যদি ভুল পদ্ধতিতে অনুসরণ করা যায় তাহলে মুখস্থকরণ হবে শ্রমবহুল ও বিলম্বিত। শিক্ষাশ্রয়ী মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন পরীক্ষাকার্য হতে দেখা গিয়েছে যে যদি শিশু অ-বিরাম পদ্ধতিতে মুখস্থ করে তাহলে তা বিলম্বিত হবে এবং সংরক্ষণও যথাযথ হবে না। পক্ষান্তরে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে শিশু যদি স-বিরাম পদ্ধতিতে বিষয়টি মুখস্থ করে, তাহলে সংরক্ষণ যেমন সুদৃঢ় হবে, তেমনি মুখস্থও হবে তাড়াতাড়ি।

(৩) শিক্ষার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন শিক্ষকদের কোনওরূপ স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ফলে তাঁরা বিষয়বস্তু কতটা শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করতে পারছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদান করতেন। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা ও বিষয়বস্তু মুখস্থ করা একার্থবোধক নয়। জীবনের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করা বা অন্তরে অন্তরে বিষয়বস্তু উপলব্ধি করা যাতে বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীর সাঙ্গীকরণ হয়, তাই হচ্ছে শিখনের উদ্দেশ্য। এর উপর নির্ভর করেই শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা পদ্ধতি রচনা করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে শিখনের জন্য প্রস্তুতির কথা (Readiness to learning)। কোনও কিছু শিক্ষাদানের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীর তা গ্রহণ করবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি আছে কিনা। শিক্ষার্থীর মানসিক প্রগতি, বুদ্ধির উৎকর্ষ, আগ্রহ ও ঔৎসুক্য আছে কিনা কিংবা কতটা আছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাদান কার্যে শিক্ষকের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। এরই ভিত্তিতে সু-পদ্ধতির উদ্ভব হবে, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

পরিণমন বা স্বাভাবিক পরিণতি, যাকে মনস্তত্ত্বে maturation বলা যায় সে প্রশ্নও শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে জড়িত হয়ে আছে। প্রাচীন যুগের শিক্ষকেরা পুনঃপুনঃ অনুশীলন বা অভ্যাসের উপর গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা হয়ত মনে করতেন পরিপক্কতার গতির হার বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে যদি কোন বিষয়বস্তু শেখা, দেহমানস পরিণতির (maturation) পক্ষে পর্যাপ্ত না হয়, তাহলেও তা ক্রমাগত অভ্যাস বা অনুশীলনদ্বারা আয়ত্ত করা যেতে পারে বটে, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে ; তাই

সাধারণভাবে বলা যায় যে অভ্যাসদ্বারা দেহমানসের পরিপক্কতা ত্বরান্বিত করা যায় না। শিখনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও অনুশীলন (nature and nurture) উভয়ের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

(৪) বর্তমান যুগে শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণা (motivation) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। প্রাচীন যুগের শিক্ষকগণ এ দিকে দৃষ্টি দেন নি। Shakspear বলেছেন, "A whining school boy with his satchel....creeping like a snail unwillingly to school"।

বিদ্যালয়ে শুধু পড়ার ব্যবস্থা থাকলে শিশুরা নিরানন্দময় পরিবেশে আসতে দ্বিধা বোধ করে, তাদের মধ্যে মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অতীত যুগের শিক্ষকগণ এদিকে লক্ষ্য করেন নি। শিশুদের বিষয়বস্তু উপলব্ধিকরণের ক্ষেত্রে যে প্রেষণার প্রয়োজন আছে তা তাঁদের মনে হয় নি। বর্তমান যুগে প্রগতিশীল শিক্ষাবিদগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে বিদ্যালয়ে যদি পাঠক্রমিক বা সহপাঠক্রমিক কর্মের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে দেখা যায় শিশুরা যেরূপ নিবিষ্টচিত্তে সেসব কাজ করে থাকে বা করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তারা তত বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে না। এর কারণ কি? এর কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানবিদ বিভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যা করেছেন, সে সব কচকচির মধ্যে আমরা প্রবেশ করব না। কিন্তু শিশুরা যে নানাবিধ কাজে ও খেলায় আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সংক্ষেপে বলতে পারা যায় শিশুর (১) দৈহিক প্রয়োজনে প্রেষণা (Physiological needs and motivation), (২) মানসিক প্রয়োজনে প্রেষণা (Psychological needs and motivation), (৩) সমাজকেন্দ্রিক প্রেষণা (Social motivation and needs), (৪) প্রতিন্যাস (attitudes), (৫) পরিবেশগত প্রেষণা (environmental motivation) আছে—এই প্রেষণাগুলি শিশুদের কর্মে বা খেলায় দেখা যায়। এগুলিকে শিক্ষক যদি পাঠদানক্ষেত্রে কাজে লাগান বা তা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, তাহলে শিশুদের পাঠে আগ্রহ দেখা যাবে। প্রেষণাকে মূলধন করে পাঠদান করলে পাঠ উপলব্ধিকরণে শিশুদের সাহায্য করাই হবে। বস্তুতঃপক্ষে বিভিন্ন কর্ম বা খেলাকে শিশুরা Springboard বা জলে লাফিয়ে পড়বার জন্য তক্তাস্বরূপ ব্যবহার করবে এবং সময় অনুযায়ী ঐসব কাজ থেকে উপযুক্ত পাঠে 'লাফিয়ে' পড়বে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণা (উদ্দীপনা বা

motivation) সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষাদান-পদ্ধতি রচনায় বিশেষ কার্যকরী এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

(৫) যে সকল পদ্ধতি শিশুদের আগ্রহ (interests) ও প্রতিন্যাস (attitudes) অনুকূল, সে সকল পদ্ধতি সহজেই শিশুদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং মনকে সেই অনুসারে পরিচালিত করবে। তাছাড়া যে সমস্ত লক্ষ্য পুনঃপুনঃ চরিতার্থ হয়, সেগুলি স্থায়ী মনোভাব বা প্রতিন্যাস গঠনে সাহায্য করে। শিক্ষার ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিশুদের আচার, আচরণ ও ব্যবহারিক জীবনের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। অতএব শিক্ষার্থীদের ঔৎসুক্য ও প্রতিন্যাসকে অবলম্বন করে শিক্ষাপদ্ধতি স্থিরীকরণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে মঙ্গলজনক। বলা বাহুল্য যে, আন্তর প্রেষণা (intrinsic motivation) দ্বারা পরিচালিত হলে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পদ্ধতি রচিত হলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণে ভালভাবে প্রবৃত্ত হবে। প্রাচীন যুগের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রতিন্যাসের উপর কখনও গুরুত্ব দিতেন না। তাঁরা সরাসরি এসে উপস্থিত হতেন এবং শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু আয়ত্তীকরণে প্রবৃত্ত করতেন।

(৬) শিক্ষাব্যাপারে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ ও স্বীকৃতি এবং তার উপর নির্ভর করে শিক্ষাদান পদ্ধতির উদ্ভাবন, একথা আমরা আলোচনা করেছি। বিষয়বস্তু নির্বাচন যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনি উপস্থাপনের বিধি, শিশুদের সক্রিয়তা, আলোচনা বিধি, শিশুদের অনুরাগ, অবসাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য নিরূপণ, দলীয় ব্যবহার ইত্যাদির সমস্যা শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সমূলে নাড়া দিয়েছে। শিশুদের মানসিক অবস্থার ভিত্তিতেই পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। অতএব শিক্ষাদান ক্ষেত্রে সুপদ্ধতির গুরুত্ব কতখানি তা সহজেই অনুমেয়।

(৭) জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত বা অনুভূতিমূলক বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মনের সচেতনতাই বা সক্রিয়তাই হচ্ছে চিন্তা। সাধারণ উদ্দীপনা হতে চিন্তা জাগরিত হয়। চিন্তা ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক যেমন হতে পারে তেমনি চিন্তা সু ও কু এই দুই প্রকারও হতে পারে। এক চিন্তা যখন অন্য চিন্তাকে জাগরিত করে তখন চিন্তালহরী বা ভাবানুষঙ্গের সৃষ্টি হয়। তাই শিশুদের কার্যকরী ও সার্থক চিন্তনপদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া দরকার। যদি শিশু উপযুক্তভাবে চিন্তা করতে না পারে তাহলে তার চিন্তাধারার অপচয় হবে এবং তার শিক্ষাও

ব্যাহত হবে। শুধু চিন্তনের উপযুক্ত পদ্ধতিই নয়, শিশুর ভাব ও ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করবার উপযুক্ত প্রণালীও শিশুদের শিখতে হবে, না হলে শিক্ষক যে পদ্ধতিই অবলম্বন করুন না কেন, শিশুদের শেখা সুফলপ্রসূ হবে না। অতএব সু-পদ্ধতির গুরুত্ব শিক্ষাদান ক্ষেত্রে খুবই বেশি।

(৮) শিশুর স্বয়ং কর্মের উপর শিক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে এবং এই স্বয়ং-কর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর প্রভূত বিকাশ হয়। এই কারণেই ফ্রয়েবেল, মণ্টেসরি, ডিউই, কিলপ্যাট্রিক, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ শিক্ষাবিদগণ শিক্ষায় কর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষায় কর্মের নীতির অর্থ হচ্ছে শিশুরা স্বাভাবিকভাবে কতকগুলি কর্ম সম্পাদন করবে এবং সেই সব কর্মের মাধ্যমে অভিপ্রেত আচার,. আচরণ, জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ইত্যাদি লাভ করবে। প্রগতিশীল শিক্ষাবিদগণ প্রায় সকলেই শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে কর্মকেন্দ্রিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অতএব এই সু-পদ্ধতিটির অনুসরণ একান্তই কাম্য। কিন্তু তাই বলে প্রাচীন শিক্ষাবিদগণ এ তথ্যের খবর জানতেন না একথা ভাবলে ভুল হবে। খেলা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষারও গুরুত্ব বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে একান্ত কম নয়। সেদিক থেকেও শিক্ষাপদ্ধতির নূতনভাবে সংস্কার করা প্রয়োজন।

পক্ষান্তরে নানা মনোবিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা জানা গিয়েছে। শিক্ষাবিদগণ ঐ তত্ত্বের উপর নির্ভর করে ডালটন প্ল্যান, মরিসন প্ল্যান, উইনেটকা পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তিমুখী পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ঐসবের প্রয়োগে অনেক সুফলও পাওয়া গিয়েছে।

জ্ঞানমূলক, নৈপুণ্যমূলক বা রসানুভূতিমূলক যে ধরণের পাঠই হোক না কেন শিক্ষার্থীদের দ্বারা বিষয়বস্তু উপলব্ধি করানোই হচ্ছে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে পারলে তারা যেমন এটা জীবনে হজম করে নিতে পারে, তেমনি তার ফলে তাদের আচরণমূলক পরিবর্তনও আশা করা যেতে পারে। উপলব্ধিমূলক প্রক্রিয়াতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা দান ও গ্রহণ চলবে, তবেই শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারবে। শিশুকেন্দ্রিক বা জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার তাই হচ্ছে কার্যক্রম। শিক্ষাদান-পদ্ধতির মধ্যে এরূপ কার্যক্রমের বিশিষ্টতা থাকবে, না হলে কার্যক্রম বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

এসব কারণ ও ফলাফল হতে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর খুবই গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বহুদিন থেকেই শিক্ষাপদ্ধতির রদবদল ও সংস্কার সাধন করে এসেছেন। বলা বাহুল্য তাঁরা শিক্ষাদান ক্ষেত্রে সু-পদ্ধতির গুরুত্ব দিয়াছেন খুব বেশি।

শিক্ষাদানের সাধারণ নীতি ও পদ্ধতিগত সূত্র* (General Principles of Teaching and Maxims of Method)।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে উত্তম পদ্ধতি শিক্ষাদান ক্ষেত্রে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। শিক্ষক যখন কোন বিষয়বস্তুর উপর পাঠদান করতে অগ্রসর হন, তখন তাঁর পক্ষে কি পদ্ধতিতে অগ্রসর হলে শিক্ষাদান সার্থক হবে তা ভাবতে হবে।

উত্তম শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের শিশুদের স্তরে নেমে আসা প্রয়োজন। তিনি শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করবেন, কিভাবে ও কি পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষাদানে অগ্রসর হলে শিশুরা সত্যি করে বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতি নিরূপিত হবে, যে শিশুদের শিক্ষাদান করা হবে সেই শিশুদের বয়স-সীমার উপর নির্ভর করেই।

বিদ্যালয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষাদানের জন্য কতকগুলি সাধারণ নীতি আছে, যদিও সেগুলি একটির সঙ্গে অপরটি সম্বন্ধযুক্ত, তাহলেও সেগুলিকে পৃথক করে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে।

১। **প্রেষণা নীতি** (The Principle of Motivation)।

বর্তমান প্রগতিশীল শিক্ষাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল শিক্ষকগণ যে কোন বিষয় শিক্ষাদানে অগ্রসর হওয়ার কালে প্রেষণার নীতির (Principle of motivation-এর) সদ্ব্যবহার করে থাকেন। বলা বাহুল্য অতীত কালে শিক্ষাদানে এই নীতি সাধারণতঃ পালিত হোত না। হঠাৎ যদি কোন বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষণীয় হিসাবে উপস্থাপিত করা যায়, তাহলে কি হয়? শিশুরা হয়ত শিক্ষকের চাপে পড়ে তা যান্ত্রিকভাবে শিখবে। কিন্তু যে বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষার্থীর কোন যোগাযোগ নেই, তার সঞ্চিত ভাবগুচ্ছের সঙ্গে পরিচিতি নেই, সেই বিষয়বস্তু শিখতে বা উপলব্ধি করতে শিশুরা আগ্রহ বোধ করবে

* What are the General Principles and maxims of methodical procedure in teaching ? Explain them.

কেন ? মনোবিজ্ঞান আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছে ? আমরা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান হতে শিখেছি যে আমরা শিশুদের কাছে যা কিছু শিক্ষাদানের জন্য উপস্থাপন করব, তার সাথেই শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহকে সংযুক্ত করতে চেষ্টা করব তাহলেই শিক্ষা সার্থক পথে চলবে।

শিক্ষক প্রতিটি পাঠকে হৃদয়গ্রাহী করবার জন্য শিক্ষার্থীদিগকে প্রেষণা জোগাবেন বা উদ্বুদ্ধ করবেন। এটি করা সম্ভব ; যদি শিক্ষক বিষয়বস্তুকে তোলপাড় করে শিশুদের আগ্রহসঞ্চারী তথ্যাদি আবিষ্কার করে তাদের নূতন পাঠে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। একটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক। গুণের নামতা শিক্ষা করা শিশুদের কাছে নীরস, নিরানন্দমূলক ও কষ্টকর, কিন্তু শিশুরা এ বিষয় শিক্ষা করতে সাগ্রহে এগিয়ে আসবে যদি শিশুদের কিছু কাঠি, মার্বেল বা পুঁতি দেওয়া যায়, যাদের সাহায্যে তারা আনন্দের সঙ্গে 'দুই দুই', 'তিন তিন', 'চার চার' ইত্যাদি করে সাজাতে পারে। তখন শিশুদের কাছে নামতা শিক্ষা খেলার আকার ধারণ করবে, নিরানন্দময় বলে মনে হবে না।

ঔৎসুক্য আর একটি পন্থা যা অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা জাগ্রত করা যায়। শিক্ষক আরবীয়, নিগ্রো, এস্কিমো ইত্যাদি কয়েকটি লোকের ছবি শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন, "এসব লোকদের পোষাক আমাদের পোষাকের চাইতে পৃথক কেন ?" পরিবেশের প্রভাবে মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ বিভিন্ন রূপ হয়—এই পাঠটি শিক্ষক শিশুদের কাছে এই সূত্রে উপস্থাপিত করতে পারেন। ছবির মানুষদের বিভিন্ন ধরণের পোষাক শিশুদের ঔৎসুক্য সঞ্চারিত করেছিল, সেই ঔৎসুক্যের বশেই শিক্ষার্থীরা আরও জানতে চাইবে।

প্রেষণা শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে এবং একবার আগ্রহ সঞ্চারিত হলে শিশুরা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তা শিখতে অগ্রসর হবে।

২। **কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি** (Activity Principle in Education)।

শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মের স্থান অতি উচ্চে। শিশুরা স্বভাবতঃই সক্রিয়, তাদের মধ্যে কাজ করবার ক্ষমতা দুর্বার।

শিশুরা জ্ঞানলাভ করে শুধু দুটি কান দিয়ে শুনে নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে।

কর্ণবিবরে যত জ্ঞানগর্ভ বাণীই প্রবেশ করান যাক না কেন, শিশুর মনে তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, অন্ত বিবর পথে তার নির্গমণ হয়ে যায়। অথচ শিশু যদি কোন কাজ করে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহলে সেই অভিজ্ঞতার ফল তার মনে বহুকাল স্থায়ী হয়। কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি হতে শিশুরা কতটা লাভবান হয় তা আমরা দেখতে পারি।

(১) প্রথম অভিজ্ঞতা হচ্ছে শিশুরা হাতে-কলমে কাজ করে বস্তু ও তার গঠণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা লাভ করে।

(২) দ্বিতীয়তঃ দলের সাথে মিশে কর্ম সম্পাদন করে শিশু লৌকিক বা এবং সামাজিক অভিজ্ঞতা লাভ করে।

(৩) শিশুর নানা কর্মে যোগদানের ফলে তার অভিজ্ঞতা হয় বিচিত্র এবং প্রত্যেক অভিজ্ঞতা বহু সমস্যা সৃষ্টি ও তা সমাধানের প্রেরণা জোগায় এবং শিশু বহুমুখী কর্মের প্রতি আগ্রহ বোধ করে।

(৪) দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও কাজের মধ্যে থেকে শিশুরা কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও উপযোগী বৌদ্ধিক শিক্ষাও লাভ করে থাকে।

হাতে-কলমে কাজের নীতি বা কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি বিদ্যালয়ের সকল স্তরেই প্রয়োগ করা চলে। প্রাথমিক স্তরে শিশুদের শরীর সঞ্চালন কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত, অর্থাৎ শিশুরা নাচে, খেলে, বাগানের কাজ করে, সুতো কাটে, মাটির কাজ করে, কাগজ কাটে ইত্যাদি। মন্টেসরি ও কিণ্ডারগার্টেনে শিশুরা নানা 'এ্যাপারাটাস' নিয়ে কাজ করে ও খেলা করে। প্রাথমিক স্তরে কার্যসমস্যা পদ্ধতিও (Project method) অনুসৃত হয় এবং তার ফলে শিশুরা উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা লাভ করে।

মাধ্যমিক এবং উচ্চস্তরেও কার্যসমস্যা পদ্ধতি (Project method) অনুসৃত হতে পারে। তাছাড়া সমস্যামূলক পদ্ধতি (Problem method) কিংবা ডালটন প্ল্যান ইত্যাদির মধ্যে শিক্ষার্থীরা বুদ্ধিমূলক কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে সমস্যার সমাধান করে এবং হাতে-কলমে সমস্যার সমাধান করার সুযোগ পায়। সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে ও সহপাঠীদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং কখনও কখনও তাদের আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতিতে (Heuristic method)-এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। বলা বাহুল্য সমস্ত ধরণের কর্মের ফলেই শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশ হয় এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়।

৩। **জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা নীতি** (The Principle of Connecting with Life)।

প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে।

শিক্ষা তখনই জীবনকেন্দ্রিক হয়, যখন শিক্ষা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে যুক্ত হয়, যখন বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মধারা শিশুদের জীবন, পরিবেশ ও সমাজ থেকে নেওয়া হয়। মামুলী শিক্ষার সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে এই যে শিক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নিতান্ত গৌণ। কতকগুলি বিষয় অতি সহজেই শিশুর জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, দিন-রাত্রি, দিনের তাপমাত্রা, বায়ুর গতি, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিশুদের অভিজ্ঞতা দান করতে হলে শিশুদের আবেষ্টনী ও পরিবেশ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে বলা যেতে পারে। সুদকষা অঙ্ক শেখাতে হলে শিশুদের নিকটস্থ পোষ্ট অফিস, যেখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক রয়েছে এবং স্থানীয় ব্যাঙ্কের আনুকুল্যে শিক্ষার্থীদের পোষ্ট অফিসে ও ব্যাঙ্কে কি ভাবে সুদ দেওয়া হয় তা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। পোষ্ট অফিস ও ব্যাঙ্কগুলি কিভাবে সুদ কষে থাকে তা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সাহায্যে জানা যেতে পারে। অনুরূপভাবে পৌর সংস্থা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের জানাতে হলে শিক্ষক স্থানীয় পৌর সংস্থার কর্মীদের সাহায্য নিতে পারেন। বিদ্যালয়ে কখনও অবাস্তব সমস্যার উল্লেখ করা উচিত নয়। আমাদের অঙ্ক বইগুলি যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে পুস্তকে সমস্যামূলক অঙ্কের প্রশ্নমালায় অনেক অবাস্তব জিনিস রয়েছে, যথা সরিষার তৈলের দাম ২ টাকা কেজি হলে ৫½ কেজি তেলের দাম কত? বর্তমান যুগে তেলের দাম প্রায় ৫·০০ টাকায় কেন্দ্রিভূত হয়েছে। শিশুরা এরূপ বাস্তব বহির্ভূত বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা পেলে শিক্ষা ব্যাপারে তাদের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসবে। অতএব সেদিক থেকে শিক্ষকের সাবধানতা অবলম্বন করা যথেষ্ট প্রয়োজন।

পদ্ধতির সাধারণ সূত্র (General Maxims of Method)।

শিক্ষার সাধারণ নীতি ছাড়াও শিক্ষাদান প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি সম্পর্কিত কয়েকটি সর্বজনবিদিত সূত্র আছে। এই সূত্রগুলি শিক্ষকদের জানা অত্যাবশ্যক।

(ক) **সাধারণ উদ্দেশ্য বর্ণন** (To Specify the General Aim)।

শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রধান নীতি হচ্ছে, যে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের

শিক্ষা দিতে হবে তার উদ্দেশ্য বর্ণন। উদ্দেশ্য যদি প্রথমে স্থিরীকৃত না থাকে, তাহলে শিক্ষাদান কার্য সাফল্যমণ্ডিত হবে না। কারণ উদ্দেশ্যহীন শিক্ষক শিক্ষাদান করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলবেন এবং সমগ্র বিষয়বস্তু শিশুরা উপলব্ধি করতে পারবে না।

(খ) **পরিকল্পনা গ্রহণ** (Planning)।

শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কিত অপর একটি প্রধান নীতি হচ্ছে শিক্ষক শ্রেণী-পাঠনা করতে গিয়ে সর্বদা পাঠ পরিকল্পনা করে যাবেন। পরিকল্পনায় সাধারণ নীতি বর্ণনা করা সহজ নয়, তবে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করলে এ-কাজ খানিকটা সহজ হতে পারে।

(১) কি শেখাবেন তা আগে ভাল করে জানুন।

(২) শিক্ষাদানে কি কি প্রয়োজন হবে তা সব সংগ্রহ করুন।

(৩) সমগ্র শ্রেণী যাতে আপনার শিক্ষাদান দ্বারা উপকৃত হয় সেদিকে লক্ষ্য করুন।

(৪) শান্ত ও স্বাভাবিক ভাবে পাঠ দান করুন।

(৫) শিক্ষার্থীদের জানা বিষয়বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করুন।

(গ) **জানা হতে অজানাতে যাওয়া** (To proceed from the Known to the Unknown)।

শিক্ষাদানের অত্যন্ত স্বাভাবিক রীতি হচ্ছে শিশু যা জানে তার উপর ভিত্তি করে অজানাকে আয়ত্ত করার দিকে অগ্রসর হওয়া। এখানে জানা বিষয়ের উল্লেখ কেন? জানা জিনিস থেকে শিক্ষার্থীরা অজানা জিনিসের পার্থক্য বুঝতে পারবে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে শিশুরা নূতন বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের অপরিচিত জগতের সন্ধান দিতে হলে তাদের জানিত জগতের সাহায্য নেওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। খুব কঠিন পাঠেও শিক্ষক আশা করতে পারেন যে নূতন কঠিন পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের জ্ঞাত তথ্যের আংশিক মিল কোথাও না কোথাও আছে এবং তার উপর নির্ভর করেই কঠিন বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে সাবলীলভাবে পরিবেশন করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে শিক্ষক যদি গণিতের লাভ-ক্ষতির অঙ্ক শিক্ষা দিতে চান তাহলে তিনি শিক্ষার্থীদিগকে বাজারে কেনা-বেচা সম্বন্ধে বাস্তবাশ্রয়ী আলোচনা করতে উৎসাহিত করবেন। ঐ আলোচনার মধ্য দিয়ে শিশুদের যে অভিজ্ঞতা হবে, তাকে ভিত্তি করেই শিক্ষক শিশুদের লাভ-ক্ষতির অঙ্ক

শিক্ষা দিতে পারবেন। নূতন কঠিন শব্দ শেখাতে গিয়েও শিক্ষক শিশুদের জানা সহজ শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা দেবেন। শিশুদের যতটুকু বিষয়বস্তু জানা থাকুক না কেন তারই উপর ভিত্তি করে শিক্ষক নূতন ও কঠিনতর বিষয় শিক্ষা দিতে অগ্রসর হবেন। কিন্তু তাঁর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার, শিশুরা যা জানে তার মধ্যে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে এবং শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে শিশুর ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানকে যথার্থতা দ্বারা সম্পূর্ণ করা।

(ঘ) **সরল থেকে জটিলের দিকে অগ্রসর হতে হবে** (To proceed from the Simple to the Complex)।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সহজ বিষয় শিক্ষা করে ধীরে ধীরে জটিলতার দিকে অগ্রসর হতে পারে। মনে রাখতে হবে 'সহজ' কথাটি শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। আমাদের বড়দের কাছে যুক্তিসহ সাজান বিষয়বস্তুগুলিকে সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু সেগুলি শিশুদের কাছে হয়ত দুর্বোধ্য ও জটিল মনে হবে। শিশুরা সমগ্র দৃষ্টি নিয়ে জিনিসকে পর্যবেক্ষণ করে,—বিশ্লেষণ করে নয়। ছোট শিশুরা ফুলকে সমগ্র বস্তু হিসাবে দেখতে ভালবাসে, অংশগুলির বিশ্লেষণ করে দেখতে যায় না। সমগ্র ফুলকে পর্যবেক্ষণ করে তারা পরে অংশে আসতে পারে। অনুরূপভাবে শিশু প্রথম শিক্ষার্থী হিসাবে বাক্যই বলে এবং এটিকে অবলম্বন করে তাকে বাক্যের বিভিন্ন অংশ শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। মনে রাখতে হবে শিশুদের কাছে 'পূর্ণ' বা whole বেশি অর্থবোধক।

(ঙ) **বাস্তব হতে বিমূর্তের দিকে যেতে হবে** (To proceed from the Concrete to the Abstract)।

শিশুদের প্রথমে বিমূর্ত সম্বন্ধে ধারণা থাকে না। শুধু পরিষ্কার, স্পষ্ট, নিরেট পদার্থ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাই শিশুদের কাছে একান্তবোধ্য। শিশুদের কাছে ৩+২=৫ এই বিষয়ের কোন অর্থবোধ হয় না। কিন্তু তাদের যদি ৩টি বল ও ২টি বল দেওয়া যায় এবং একত্র করে গুনতে বলা যায় তাহলে তারা তা করতে পারবে এবং তখন ৩+২=৫ এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। বাস্তব জিনিস নেড়েচেড়ে দেখার মাধ্যমেই শিক্ষকের বিমূর্ত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে শিশুদের প্রথম অবস্থায় ভূগোল শিক্ষা দিতে হলে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী

পর্যবেক্ষণ করতে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন। বাস্তবের ধারণা মনের মধ্যে থিতিয়ে গেলে পরে তাদের বিমূর্তের ধারণা দেওয়া যায়। এজন্যই নিম্ন শ্রেণীতে যত বেশি প্রদীপণ দেওয়া যায়, ততই শিশুদের বিষয়বস্তু উপলব্ধির ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক।

(চ) অনির্দিষ্ট থেকে নির্দিষ্টের দিকে যাওয়া (To proceed from the Indefinite to the Definite)।

শিশু অবস্থায় সকলেরই বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা থাকে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই অস্পষ্ট ধারণাসমূহকে স্পষ্ট ও যথাযথভাবে প্রতিভাত করা। কিভাবে এর ব্যবস্থা হতে পারে? শিশুদের যদি পর্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি করা যায় এবং শিশুরা যদি সক্রিয়ভাবে পাঠে অংশ গ্রহণ করে, তাহলে শিশুদের ধারণাগুলো উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে আসবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায়ও দেখা যায় যান্ত্রিকভাবে সূত্র, সংজ্ঞা, অর্থ ইত্যাদি মুখস্থ করানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফলে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ধারণা অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে। উত্তম শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুর মনে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত একটি গোটা ছবির উন্মেষে সাহায্য করবেন তাহলেই শিশুদের ধারণা স্পষ্ট ও উপলব্ধিমূলক হবে।

(ছ) বিশেষ থেকে সাধারণে যেতে হবে (To proceed from the Particular to the General)।

কোন একটি বিশেষ বিষয় পর্যবেক্ষণ করে শিশুরা তা স্পষ্ট বুঝতে পারে, সমস্ত বিষয়টি তাদের কাছে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু তা থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা শিশুদের কাছে বিমূর্ত ও বিভ্রান্তিকর। এই সূত্রটি 'বাস্তব হতে বিমূর্ত' সূত্রের সহিত এক শ্রেণীর অন্তর্গত।

বস্তুতঃপক্ষে উত্তম শিক্ষার লক্ষণ হচ্ছে নির্দিষ্ট বাস্তবাশ্রয়ী বিষয়বস্তু দৃষ্টে শিশুরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শিক্ষালাভ করবে। সঠিক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও চিন্তনের সাহায্যে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। শিক্ষক সেদিক থেকে শিশুদের শিক্ষালাভে উৎসাহিত করবেন। গণিতের নিয়মাদি, ব্যাকরণের সূত্র, প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্নিহিত তথ্যাদি এবং প্রকৃতপক্ষে সকল স্তরের সাধারণ বিজ্ঞানই এই নীতি অবলম্বন করে শিক্ষা দেওয়া চলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে শিশুদের কাছে সত্য ও সাহসিকতা এই দুটি শব্দের যথাযথঃ তাৎপর্য শিশুদের হয়তো উপলব্ধি হয় নি। শব্দার্থ বলে এই দুটি

শব্দ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা শিশুরা লাভ করতে পারবে না। এই অবস্থায় কি করা যেতে পারে? শিশুদের কাছে রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, হরিশচন্দ্র প্রভৃতি সত্যের প্রতীক মহামানবের গল্প বলা যেতে পারে। শিশুরা এর ফলে 'সত্য' কথাটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে। 'সাহসিকতা' কথাটি শিশুদের উপলব্ধি করানোর জন্য শিক্ষক রাণা প্রতাপ, শিবাজী এবং আধুনিক বীরদের সাহসিকতার গল্প বলতে পারেন। শিশুদের এবার সাহসিকতা সম্বন্ধেও ধারণা স্পষ্ট হয়ে আসবে।

(জ) **আরোহী পদ্ধতি অবলম্বনে অগ্রসর হওয়া** (To proceed Inductively)

এই সূত্রটি 'গ' হতে 'ছ' পর্যন্ত সব সূত্রগুলিরই পুনরুক্তি বলা যেতে পারে। এই সূত্রের প্রধান কথা হচ্ছে শিক্ষক কোনও সাধারণ সিদ্ধান্ত বা নিরূপিত সংজ্ঞা হতে বিষয়বস্তু শিক্ষাদানে অগ্রসর হবেন না, তিনি কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনা পর্যবেক্ষণ করবার পর সাধারণ সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করবেন। নিজেদের প্রচেষ্টার সিদ্ধান্তে আসার ফলে শিশুদের ধারণা মনে আরও স্থায়ীরূপ ধারণ করবে।

পক্ষান্তরে প্রথম অবস্থায় আরোহী পদ্ধতি অবলম্বন করে চললেও পরে অবরোহী পদ্ধতি (Deductive method) অবলম্বন করে চলতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শিশুরা হয়ত আরোহী প্রণালী অবলম্বন করে করে 'সর্বনাম' কাকে বলে তা জানল। শিশুরা কতটা শিখেছে তা জানবার জন্য শিক্ষক সর্বনামের সংজ্ঞা বলার পর একটি রচনার মধ্যে বিক্ষিপ্ত সর্বনাম শব্দ মিশিয়ে ছাত্রদের কাছে সর্বনাম শব্দ বের করবার জন্য উপস্থিত করতে পারেন।

অতএব শিক্ষা পদ্ধতিতে এই দুই সূত্রেরই যথাযথ স্থান বর্তমান।

(ঝ) মনস্তত্ত্বসম্মত উপায়ে অগ্রসর হতে হবে (To proceed Psychologically)

শিক্ষকের কাজ শিক্ষাদান ক্ষেত্রে দ্বিবিধ। প্রথমে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর কাছে উত্তমরূপে উপস্থাপনের জন্য বিষয়বস্তুকে সন্নিবেশিত করা, আর দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি জানা। শিক্ষক তাঁর কর্তব্য দুটি এমনভাবে সম্পাদন করবেন যাতে তাঁর শিক্ষাদান কার্য সুফলপ্রসূ হয়, অর্থাৎ শিক্ষার্থী ভালভাবে শিক্ষালাভ করতে পারে।

পুস্তকে যেভাবে বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত আছে, তা হচ্ছে যুক্তিসম্মত উপায়ে সন্নিবিষ্ট। আমরা ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু যুক্তিভিত্তিক ভাবে সাজান রয়েছে দেখতে পাই। যুক্তিভিত্তিক পরিবেশনায় বিষয়বস্তুর প্রাথমিক নীতি থেকে সিদ্ধান্ত পর্যন্ত সুপরিকল্পিত স্তরে সজ্জিত রয়েছে।

সাধারণতঃ যুক্তিভিত্তিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিমূর্ত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বাস্তব জিনিষে আসতে হয়, জটিল থেকে আসতে হয় সরলে, অজানা থেকে আসতে হয় জানাতে। যুক্তিভিত্তিক শিক্ষাদানে অগ্রসর-শিক্ষার্থী হয়ত লাভবান হতে পারে, বা শিক্ষকের কাছে তা সহজ ও যুক্তিসম্মত হতে পারে, কিন্তু ছোট ছোট শিশুদের পক্ষে এটি কোন প্রকারেই উপযুক্ত নয়।

মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিশুদের মন ও মনের গতি, তাদের শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা, তাদের ইচ্ছা, আগ্রহ, ঔৎসুক্য ইত্যাদির উপর নির্ভর করে পাঠদান ব্যবস্থা হয়। শিশু-প্রকৃতির উপর এতটা গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই শিশুরাও বিষয়বস্তু সহজেই বুঝতে পারে। শিশু-প্রকৃতি জানার ফলে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে শিশুদের প্রতিক্রিয়া, শিক্ষক অনায়াসে বুঝতে পারেন এবং শিশুদের বিষয়বস্তু গ্রহণ করবার গতি অনুযায়ীই শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষক সন্নিবেশিত করে থাকেন।

যখন আমরা কোন যুক্তিভিত্তিক বিষয়বস্তু শিক্ষাদানের জন্য প্রস্তুত হই, তখন আমরা বয়স্ক দৃষ্টিকোণ হতেই বিষয়বস্তুকে দেখি, শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা চিন্তাও করি না। কিন্তু শিশুর প্রকৃত শিক্ষাই যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তাহলে মনস্তাত্ত্বিকভিত্তিতেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে, যুক্তির ভিত্তিতে নয়।

পদ্ধতি সম্পর্কিত সূত্রগুলি সম্বন্ধে একটু সাবধান বাণী আমাদের শুনে রাখতে হবে। পাঠদান ক্ষেত্রে কেবল মাত্র সূত্রগুলিই শিক্ষকদের মূলমন্ত্র হবে না, সূত্রগুলিকে তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবেন মাত্র। এই সূত্রগুলি শিক্ষকদের পক্ষে সাধারণ দিকদর্শী হবে। তথ্যবহুল পাঠে এই সূত্রগুলি বেশি কার্যকরী। শিশুদের মধ্যে আগ্রহ, গ্রহণ-ক্ষমতা, প্রক্ষোভ জনিত আবেদনের মধ্যে পার্থক্য যেমন দেখা যায় পদ্ধতির মধ্যেও তেমনি পার্থক্য দেখা যাবে। শিক্ষকই দেখবেন কখন এবং কোথায় উপরোক্ত সূত্রগুলি ব্যবহৃত হবে।

শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞান

আমরা শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দিয়েছি। কিন্তু শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে শুধু পদ্ধতি-জ্ঞান কার্যকরী হবে না। পাঠের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও গভীর জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। একটি অপরটির পরিপূরক। সুষ্ঠু পদ্ধতি-জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে যেমন শিক্ষাদান ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি বিষয়জ্ঞান যদি শিক্ষকের না থাকে, তাহলে শিক্ষাদান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এতে আর আশ্চর্য কি? যে বিষয়টি শিক্ষক শিক্ষাদান করবেন, তার উপর যদি শিক্ষকের পূর্ণ আধিপত্য থাকে, তাহলে তিনি বিষয়বস্তুর প্রতি স্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন এবং নিজের পূর্ণ উপলব্ধি হলে তিনি শিক্ষার্থীদের সেই বিষয়ে জ্ঞান দিতে অগ্রসর হতে পারবেন। কিন্তু শিক্ষকের বিষয়জ্ঞান যদি অগভীর হয়, কিংবা বিষয় সম্বন্ধে যদি তিনি নিজে সন্দিহান থাকেন, তাহলে শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর প্রভূত জ্ঞান কোনরূপেই কার্যকরী হবে না। শিক্ষার্থীরা তাঁর কথায় বিভ্রান্ত হবে, বিষয় উপলব্ধি তাদের হবে না। শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষকের যদি অসাধারণ অধিকার থাকে, অথচ তাঁর বিষয়জ্ঞান সীমিত হয়, তাহলে শিক্ষক হয়ত তাঁর শিক্ষাদান আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন, কিন্তু যে শিক্ষাদান তিনি শিক্ষার্থীদের করবেন, তা হবে অগভীর এবং শিক্ষার্থীরা শুধু তাঁর চাকচিক্য দেখেই ভুলবে, উপলব্ধি তাদের গভীরভাবে হবে না।

অনুরূপভাবে বিষয়জ্ঞানের পাণ্ডিত্য থাকলে এবং পদ্ধতি-জ্ঞান স্বল্প থাকলে শিক্ষাদান খুব বেশি সুফলপ্রসূ হতে পারবে না। যদি উপযুক্ত পদ্ধতি শিক্ষকের জানা না থাকে, তাহলে তিনি বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করবেন কি করে? বিষয়বস্তুর সারবত্তা পরিবেশন তিনি কি করে করবেন? শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি কেমন করে হবে? যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি বিষয়জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত ও সঞ্চালিত করবেন, সেই পদ্ধতি সম্বন্ধেই যদি শিক্ষকের অস্পষ্ট ধারণা থাকে, কিংবা কোন ধারণাই না থাকে, তাহলে শিক্ষক বিষয়জ্ঞান বিকিরণে শিক্ষার্থীদের মনের আশেপাশেই ঘুরে বেড়াতে পারবেন, মর্মদেশে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন না। অনেক গভীর বিষয়জ্ঞান-সম্পন্ন পণ্ডিতকে দেখা যায়, শিক্ষক হিসাবে তাঁদের অসাফল্য। তার কারণ তাঁদের পাণ্ডিত্যের ত্রুটি নয়, ত্রুটি হচ্ছে তাঁদের পদ্ধতিজ্ঞানের অভাব।

অতএব শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে সুফলপ্রসূ হতে হয়, তাহলে পদ্ধতিজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়েরই আবশ্যক। উভয়ে উভয়ের পরিপূরক একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অতএব এই দুটির সমন্বয় সাধন করে আমাদের শিক্ষাদানে অগ্রসর হতে হবে।

অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে পরিপূর্ণ বিষয়জ্ঞান যদি থাকে তাহলে পদ্ধতিতত্ত্ব না জানা থাকলেও ঐ শিক্ষক সুশিক্ষক হতে পারেন এবং উদাহরণ স্বরূপ বহু স্বনামধন্য শিক্ষকের নামোল্লেখ করেন। কিন্তু প্রথমতঃ আমাদের স্বীকার করতে হবে যে নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রম দেখিয়ে নিয়মকে বাতিল করে দেওয়া চলে না। তাছাড়া ঐ সুশিক্ষকগণ শিক্ষাদান করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি কিভাবে গভীরভাবে হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য করে দেখেছেন এবং সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করেই পরে শিক্ষাদান করে গিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ঐ স্বনিরূপিত প্রক্রিয়াই পদ্ধতি হয়ে দেখা দিয়েছে। অতএব পদ্ধতিতত্ত্বকে কোন মতেই এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

আর একদল শিক্ষাবিদ পদ্ধতিতত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ করে বলেন যে অনেক ক্ষেত্রে পদ্ধতি সু-শিক্ষাদানের বা পূর্ণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা বুনিয়াদী শিক্ষার শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি ও কার্য-সমস্যাপদ্ধতির (প্রজেক্ট মেথড) সমালোচনা করে বলেন যে ঐ সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিক্ষাদান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু শিল্পকেন্দ্রিক এবং কার্য-সমস্যা পদ্ধতি উভয়ই মনস্তত্ত্বসম্মত। তবে যুক্তিমূলক সমগ্র বিষয়বস্তু যে সেক্ষেত্রে শেখানো হয় না, সে বিষয় অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু যুক্তিমূলক ও পাঠ্যসূচী অন্তর্গত বিষয়বস্তুর শিক্ষার প্রয়োজন সেখানে যতটুকু তা অন্যান্য পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিপূরক হিসাবে কার্য সমস্যা পদ্ধতিকে গ্রহণ করলে অসুবিধা কোথায়? একটি উদাহরণের সাহায্য না দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে না। ধরা গেল, চতুর্থ শ্রেণীর শিশুরা ডায়মণ্ডহারবার রেল স্টেশনের একটি প্রজেক্ট করছে। শিশুরা ইউনিট স্থির করে, পরিকল্পনা করে কর্ম সম্পাদন করল এবং তার সাথে ধরা যাক ভূগোলের সম্বন্ধিত পাঠ এল 'ডায়মণ্ড হারবার স্টেশনের পরিবেশ'। এই সম্বন্ধিত পাঠটি শিক্ষাদানের অসুবিধা কোথায়? চতুর্থ শ্রেণীতে ভূগোলের বইতে ডায়মণ্ড হারবারের নামোল্লেখ রয়েছে বইয়ের মাঝামাঝি জায়গায়। প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের বিভিন্ন জেলা, ২৪ পরগণা জেলার আয়তন, ভূপ্রকৃতি, ইত্যাদি

অতিক্রম করে এসে ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় পৌছাতে হয়। তারজন্যই কি কার্য-সমস্যাপদ্ধতিতে যুক্তিমূলকভাবে অগ্রসর না হয়ে হঠাৎ ডায়মণ্ড হারবারে আসায় আপত্তি? বলা বাহুল্য আপত্তি অবশ্য মোটেই গ্রাহ্য নয়। কারণ শিশুরা ডায়মণ্ডহারবার রেল স্টেশন সম্পর্কিত কাজ করতে গিয়ে তারা পর্যবেক্ষণ করে, নানা তথ্য সংগ্রহ করে ডায়মণ্ডহারবারের পরিবেশ সম্বন্ধে জানবে। এতে কোন ফাঁক বা ফাঁকির কিছুই সৃষ্টি হচ্ছে না।

অনুশীলনী

প্রঃ 1. What is methodology? Why is methodical procedure required in teaching? উঃ—পৃঃ ১—৩

প্রঃ 2. What are the general Principles of Teaching and Maxims of method? উঃ—পৃঃ ৯—১৬

প্রঃ 3. What is the relation between the matter and the method? উঃ—পৃঃ ১৮—২০

দ্বিতীয় অধ্যায়
শিক্ষণ পদ্ধতির ক্রম বিবর্তন
(Evolution of Teaching method)

প্রত্যেক শিক্ষকই শিক্ষাদানকালে কোন না কোনও পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। অর্থাৎ শিক্ষাদান কার্যের মধ্যে ছাত্রদের উপযুক্ত বিষয়বস্তু যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি শিক্ষাদান প্রক্রিয়াও গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বর্তমানে যে ব্যাপ্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা একদিনের প্রচেষ্টায় হয় নি। নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে, বিবর্তনের বেষ্টনীতে পুষ্ট হয়ে বর্তমানে এসে পদ্ধতি নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বলা বাহুল্য, বর্তমান রূপও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাবে।

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষাদান কার্য অ-পরোক্ষভাবে শুরু করে পরোক্ষধর্মী হয়ে চলে এসেছে। বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ পদ্ধতি সমকালীন। যেদিন থেকে শিক্ষাদান অ-পরোক্ষভাবে শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই জয়যাত্রা সুরু হয়েছে পদ্ধতির। মিশর, ভারত, চীন, গ্রীস প্রভৃতি দেশগুলিতে প্রথমে সভ্যতার আলো দেখা গিয়েছিল। তখন থেকেই শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভব এবং তখন থেকেই পদ্ধতি বিবর্তনের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে আসছে।

অনুকরণ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শিক্ষণ পদ্ধতি ও জ্ঞান বিকীরণ সমসাময়িক এবং সমগোত্রিক। প্রাচীন যুগে মানুষ যখন কৃষিকার্য, পশুচারণ প্রভৃতি কিছুই জানত না, তখন তারা হাতের কাছে যে জানোয়ার পেতো, পাথর ছুড়ে বা গাছের ডাল ভেঙ্গে তার আঘাতে তাকে মেরে তার কাঁচা মাংস খেত। একাজ তাদের পাঠশালায় বসে শিখতে হয় নি। তারা বড়দের অনুকরণ করেই শিক্ষালাভ করেছে। পূর্বগামীদের অনুকরণ করে শিক্ষাই ছিল তখন শিক্ষাদান পদ্ধতি। বেঁচে থাকবার জন্য অন্য কোন উপায় আবিষ্কারে তারা যে সচেষ্ট ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। কারণ মানুষ ক্রমে কৃষিকার্য, পশুপালন ইত্যাদি শিখতে লাগল। এই পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ক্রিয়ার মধ্যেও যে পদ্ধতি বর্তমান, তাও তাঁরা অনুকরণ করেই শিখেছে।

মানুষের সভ্যতা যেদিন অনেকটা পথ এগিয়ে যায় সেদিন হয় লেখার সৃষ্টি। যাঁরা এই লেখা রূপ আশ্চর্য সংকেতের সৃষ্টি করেছিলেন তাদের অবদান, নিউটন, এডিসন প্রভৃতির অবদানের অনেক উপরে। লিখনও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে। প্রথমে লিখনরূপ চিত্রসংকেত, তারপর তা থেকেই এসেছে বর্ণসংকেত। প্রতিটি স্তরেই শিক্ষাক্ষেত্রে ছোটরা বড়দের অনুকরণ করে এসেছে। অনুকরণ করতে শিখানই ছিল সেই যুগে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদান পদ্ধতি।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি—মৌখিক আবৃত্তিকরণ।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার্থী-পুরোহিতের প্রধান কর্তব্য ছিল বেদ সম্পূর্ণভাবে কণ্ঠস্থ করা। তিনি শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে বেদের স্তোত্র উচ্চারণ করে নির্ভুল ভাবে বেদ পুনরাবৃত্তি করতে শিখতেন। মৌখিক শিক্ষাপদ্ধতি ও আবৃত্তিকরণ ছিল ঐ সময়কার শিক্ষণপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

পরবর্তীকালে শিক্ষার্থী অর্থাৎ শিষ্যদের গুরুগৃহে থেকে যখন শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় তখন শিক্ষণ পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আবৃত্তিকরণের দিক থেকে শিক্ষণ পদ্ধতি মোটামুটি স্থির ছিল। সেই যুগের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে গৌতম আলোকপাত করে বললেন যে শিক্ষার্থী নিজের দক্ষিণ হস্তের দ্বারা গুরুর বাম হস্ত ধারণ করে বলতেন 'গুরুদেব আপনি আবৃত্তি করুন'।

মৌখিক শিক্ষার একটি চিত্র ঋগ্বেদের 'প্রতিসাক্ষ্য' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। 'প্রতিসাক্ষ্য' অধ্যায়ের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দেখতে পাই শিক্ষার্থীরা গুরুর পদ-বন্দনা করে বলছে "পাঠ আরম্ভ করুন"। গুরু পাঠ আরম্ভ করলে এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে, শিক্ষার্থীরা সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করত, তখন গুরু পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে দিতেন।

শেষ পর্যন্ত শিক্ষাদান পদ্ধতির আরও পরিবর্তন সাধন হয়—পদ্ধতি হয় তিনটি স্তর সম্বলিত। প্রথম হচ্ছে শ্রবণ, তারপর মনন এবং শেষকালে নিদিধ্যাসন, অর্থাৎ প্রথমে গুরু কর্তৃক পাঠদান ও শিক্ষার্থীদের শ্রবণ, পরে শিক্ষার্থীদের দ্বারা সেই সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের দ্বারা তার পুনরাবৃত্তি। এই ভাবে সমগ্র পাঠটির উপলব্ধিকরণও শিক্ষা পদ্ধতির একটি অঙ্গ হয়ে উঠল।

প্রাচীন চীনের শিক্ষাপদ্ধতি।

প্রাচীন চীনেও শিক্ষাদান ক্ষেত্রে অনুকরণ এবং মুখস্থকরণ পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। এদিকে তখন লিখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। শিক্ষকগণ ভাবতেন লিখিত জিনিষ হয়ত হারিয়ে যেতে পারে, এজন্য প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কিত বিষয়বস্তু মুখস্থ করে রাখাই সঙ্গত। সেই কারণেই ছাত্রদের মুখস্থ করে রাখার রীতিকে শিক্ষকগণ সমর্থন জানাতেন। ভারতে যেমন মুখস্থ করার উপর গুরুত্ব দিয়েও উপলব্ধিকরণের প্রক্রিয়া অর্থাৎ চিন্তন ও পুনরাবৃত্তি স্তরের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত, চীনদেশে তা কখনো হয় নি। তবে প্রাচীন চীনের অন্যতম ধর্মপ্রবর্তক কনফুশিয়াস (Confucious 551-478 BC) মুখস্থকরণের ত্রুটি দেখিয়ে বলেছিলেন মুখস্থকরণের সঙ্গে উপলব্ধির কথা। ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে তিনি যে শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা হচ্ছে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি।

প্রাচীন ইহুদীদের শিক্ষাদান পদ্ধতি।

প্রাচীন ইহুদীদেরও শিক্ষণব্যবস্থা অনেকটা প্রাচীন ভারতীয় ও চীনাদের মতই। প্রাচীন ইহুদীদের যুগেও হিব্রু স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় অনুশাসন সমূহ মুখস্থ করত এবং ঐ সমস্ত বিষয়ে অধিকার প্রতিপন্ন করবার জন্য প্রতিটি অক্ষর পুনরাবৃত্তি করত।[১] ইহুদী শিক্ষার Encyclopaedia-র মূল অংশ হচ্ছে Mishnah এবং তার অর্থ হচ্ছে পুনরাবৃত্তিকরণ দ্বারা শিক্ষা।[২] কিন্তু ট্যালমুড (Talmud) নামক নীতিগ্রন্থে এই মুখস্থকরণ ও পুনরাবৃত্তিকরণের পদ্ধতির বিরোধিতা করা হয়। ফলে নিম্নস্তরে মুখস্থকরণের রীতি অব্যাহত থাকলেও উচ্চস্তরে উপলব্ধির দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ট্যালমুডীয় অনুশাসনে অবশ্য বলা হয়েছিল যে কোন জিনিষে সুষ্ঠু উপলব্ধি হলেই মুখস্থকরণ সহজ ও সরল হয়।

ইহুদীদের শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এটি কঠোর শৃঙ্খলাজনিত অনুশাসন সম্বলিত ছিল। বেত্রাঘাত ছিল পদ্ধতির একটি অঙ্গ।

১। ......Hebrew Schools, where the boys learn the text of the sacred writings off by heart and then prove the mastery of it by repeating every syllable—Gilbert Highet.

২। ......the main part of the encyclopaedia of Jewish learning is called the Mishnah, which means "teaching by repetition."—Ibid

কিন্তু ট্যালমুড গ্রন্থ থেকেই জানা যায় যে এই কঠোরতা পরবর্তী সময়ে কিছুটা শিথিল করা হয়। কারণ ঐ গ্রন্থেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে যদি অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স্ক শিক্ষার্থীদের বেত্রাঘাতদ্বারা শারীরিক শাস্তিবিধান করা যায়, তাহলে তারা বিদ্রোহ করতে পারে।

প্রাচীন গ্রীক শিক্ষাদান পদ্ধতি।

গ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থাতেও যে শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসৃত হত, তাতেও অনুকরণ ও মুখস্থকরণ প্রাধান্যলাভ করেছিল। শিশুরা মহৎ ব্যক্তিদের আদর্শ অনুসরণ করত। যে কোন শিক্ষাসংক্রান্ত কাজেই বড়রা যে সমস্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেন, তা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের চলতে হত। হোমারের এবং তার পূর্বযুগ থেকেই এই শিক্ষাপদ্ধতি চলে আসছিল। হোমরের Illiad গ্রন্থে নবম খণ্ডে আমরা Phoenix-কে পাচ্ছি। তিনি ছিলেন Achilles-এর শিক্ষক। তিনি Achilles-কে উদ্দেশ্য করে যে কথা বলেছিলেন তার অর্থ হচ্ছে Achilles যুদ্ধবিদ্যা এবং বাগ্মীতায় পারদর্শিতা লাভ করবেন। শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথা ছিল ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ব্যক্তিগত গভীর যোগাযোগ ও সম্পর্ক। তার অর্থই হচ্ছে শিক্ষার্থী শিক্ষককে যথার্থভাবে অনুকরণ করে শিক্ষালাভ করত।

তাছাড়া শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল কঠোর শাসন এবং দৈহিক শাস্তিবিধান। বিশেষ করে স্পার্টার শিক্ষাব্যবস্থায় এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে দেখা যায়। স্পার্টার জীবনাদর্শ ছিল রাষ্ট্রের প্রয়োজনে রচিত এবং আদর্শে পৌছানর জন্য শিক্ষার্থীর দেহমনে কতকগুলি বিশেষ শক্তি বিকাশ করবার জন্য চেষ্টা করতে হত। এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিকাশের ব্যবস্থা করা হত।

সক্রেটিসের শিক্ষাদান পদ্ধতি।

গ্রীকদেশের যে অনুকরণ ও মুখস্থকরণ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হল তা গ্রীসদেশে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস (Socrates 469-399 B.C.) পূর্ব পদ্ধতির পরিবর্তে এক নূতন শিক্ষণ পদ্ধতির অবতারণা করেন। সক্রেটিস শুধু যথার্থ চিন্তা ও যথার্থ কর্মের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হন নি, কি করে বা কি

পদ্ধতিতে যথার্থ চিন্তন সম্ভব হতে পারে তার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার কথা সুষ্ঠুভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। সক্রেটিস পদ্ধতিকে সাধারণতঃ আরোহী-প্রণালী-সম্মত বলা হয়। সক্রেটিস এবং শিক্ষার্থী-যুবক আলোচনার মাধ্যমে কোনও কিছুর সংজ্ঞা বের করতেন। ধরা যাক আলোচনার মাধ্যমে piety (ঈশ্বরভক্তি) বা temperence (মিতাচার) এই দুটি কথার অর্থ কি সক্রেটিস শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করলেন। শিক্ষার্থী-যুবক ঐ কথাগুলি সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বর্ণনা দিলেন। সক্রেটিস তখন এমন কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনার আমদানী করলেন যে তাদের সাথে ছাত্রবর্ণিত সংজ্ঞার পার্থক্য দেখা দিল এবং এই আলোচনার প্রেক্ষাপটেই হয়ত তাঁরা পূর্বের সংজ্ঞার আংশিক বিষয়বস্তু গ্রহণ করলেন বা পুরোপুরি ঐ সংজ্ঞাকে বর্জন করলেন। তাহলে সক্রেটিসের শিক্ষাদানপদ্ধতি কি দাঁড়াচ্ছে? শিক্ষণপদ্ধতি হচ্ছে শিক্ষকের প্রশ্ন ও ইঙ্গিতদান, যার সাহায্যে এমন একটি অবস্থা বা সংজ্ঞায় উপনীত হওয়া যায় যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়পক্ষই সন্তুষ্ট হয়। এই পদ্ধতিতে আরোহী পদ্ধতির উপাদান বর্তমান থাকলেও একে বিশুদ্ধ আরোহী পদ্ধতি আখ্যা দেওয়া চলে না। এটি আলোচনামূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংজ্ঞার নির্ধারণ এইটুকু বলা চলে মাত্র। আলোচনার মধ্য দিয়েই সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এই হল সক্রেটিস পদ্ধতির মূল কথা।[১] এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে গিয়ে সক্রেটিস এমনিভাব দেখাতেন যে তিনি প্রশ্নের উত্তর কি হবে জানেন না এবং তিনি আলোচনার পরিবেশ তৈরি করেই সত্যানুসন্ধান করতেন। ফলে তাঁকে অনেক সময়েই শিক্ষার্থীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হত।

কিন্তু সক্রেটিসের আলোচনার মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর এবং শিক্ষার্থীদের ভুল ত্রুটি নির্ধারণই শিক্ষণের শেষ কথা নয়। তিনি নেতিবাচক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে আলোচনার সুরু করতেন। সক্রেটিসের একটি ইতিবাচক লক্ষ্যও এতে অন্তর্নিহিত ছিল, অবশ্য সেই লক্ষ্যটি শিক্ষার্থী মনের অগোচরেই প্রথমে থাকত। তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এই সত্য উপলব্ধি করতে শেখাতেন যে শিক্ষার্থীর অন্তর রাজ্যেই যে শক্তি বর্তমান তারই সাহায্যে সে সেই সত্যে

১। ......Socrates was the first who thought that teaching might mean, not pouring new ideas into an entirely empty brain but drawing out Universal truths from the mind in which they already lay concealed.—Gilbert Highet.

পৌঁছাতে পারে। যদি সে সত্যিই সত্যান্বেষী হয়, তবে সে অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে যুক্তির সাহায্যে সত্যে পৌঁছাতে পারে। সক্রেটিসের প্রশ্নাবলী সর্বদাই শিক্ষার্থীকে পথনির্দেশ করত, অবশ্য অতি ধীরে ও অজানিত ভাবে। অনেক সময়ই, ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে অলিগলি পথে সক্রেটিস শিক্ষার্থীকে সত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে পৌঁছে দিতেন। বিশ্লেষণমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আগমনের জন্য প্রচেষ্টা এই দুইয়ের সংমিশ্রণকেই পরবর্তী সময়ে সক্রেটিসের পদ্ধতি dialectic বা বিতর্কমূলক পদ্ধতি বলে অভিহিত করা হয়।

প্লেটোর শিক্ষাদান পদ্ধতি।

প্লেটো (Plato 420-348 BC) ছিলেন দার্শনিক সক্রেটিসের শিষ্য এবং তিনি সক্রেটিসের বিতর্কমূলক পদ্ধতিকেই শিক্ষাদান পদ্ধতি বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্লেটো তাঁর গুরু হতে অপেক্ষাকৃত প্রণালীবদ্ধ ভাবে এবং নিয়মানুগভাবে শিক্ষাদান কার্য সম্পন্ন করেছেন। প্রণালীবদ্ধ ভাবে বলা হয়েছে এজন্য যে, প্লেটো একটি শিক্ষণ Academy অর্থাৎ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি সক্রেটিসের মত হাটে-বাজারে শিক্ষাদানের জন্য ঘুরে বেড়ান নি। মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ পরীক্ষা ছিল এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া তিনি সক্রেটিসের মত সর্বসাধারণের সাথে আলাপ আলোচনা না করে, নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলতেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করতেন বটে, কিন্তু তিনি অনেক সময় বক্তৃতা পদ্ধতি অবলম্বন করেও শিক্ষা দিতেন।

অ্যারিষ্টটলের শিক্ষাদান পদ্ধতি

সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল—এই তিন মহান শিক্ষাগুরুর মধ্যে অ্যারিষ্টটল হচ্ছেন কালক্রম অনুযায়ী তৃতীয়। তিনি শিক্ষাদান পদ্ধতির দিক থেকে নূতন কিছু কথা বলেন নি। শুধু তার শিক্ষণপদ্ধতিতে তিনি সক্রেটিস ও প্লেটোর শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ একটু সুসম্বদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিন্তনের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। চিন্তনকে সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করণই হচ্ছে তাঁর সুসম্বদ্ধিত শিক্ষাদান পদ্ধতির মূল কথা। অ্যারিষ্টটল মাত্র সতের বৎসর বয়সে প্লেটোর Academyতে যান

সেখানে চল্লিশ বৎসর বয়ক্রম কাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। প্লেটোর মৃত্যু হলে তিনি অবশ্য সেখান থেকে চলে আসেন এবং Lyceum নামে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই Lyceum-এ অ্যারিষ্টটল গবেষণা এবং শিক্ষার উপর খুব গুরুত্ব দেন। বস্তুতঃ পক্ষে তাঁর মতে গবেষণা ও শিক্ষা একটি মুদ্রারই দুটি দিক মাত্র। অ্যারিষ্টটল তাঁর শিক্ষাধারাকে বিশেষভাবে সুবিন্যস্ত করেছিলেন। তাঁর আলোচনা ধারা ছিল অত্যন্ত উচ্চস্তরের। তিনি আলোচনামূলক শিক্ষাদানের সাথে বক্তৃতাপদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ করতেন; বক্তৃতাপদ্ধতির উপরই গুরুত্ব ছিল বেশি। তিনি কতকগুলি ধারাবাহিক সংযোজিত প্রসঙ্গ স্থির করে তার উপর আলোচনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করতেন এবং এভাবে সমগ্র বিষয়টির শিক্ষাদান সম্পন্ন করতেন।[১] বলা বাহুল্য-অ্যারিষ্টটল উপলব্ধির উপর বেশি গুরুত্ব দিতেন বলেই বিষয় শিক্ষা অভিজ্ঞতাভিত্তিক হয়েছিল। তাঁর মতে সোফিষ্টদের (Sophist) শিক্ষণধারা অত্যন্ত ক্রুটিপূর্ণ কারণ সোফিষ্টরা শিক্ষকের চিন্তাধারাই শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন।

প্রাচীন রোমান শিক্ষাদান পদ্ধতি

কোনও নূতন শিক্ষণপদ্ধতির অবতারণা প্রাচীন রোমানরা আবিষ্কার করতে পারেন নি। তাঁরা শিক্ষণ পদ্ধতিতে গ্রীকদেরই অনুকরণ করেন। প্রাচীনকালীন অনুকরণ ও মুখস্থকরণ পদ্ধতিই রোমানরা শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রীকরা যেমন বাহিরের প্রতিভাবান শিক্ষককে অনুকরণ করেছিলেন, রোমানরা তা করেন নি। রোমানরা অনুকরণ করত তাঁদের পিতৃপুরুষদের। পিতাই ছিল তাদের বিশেষভাবে অনুকরণীয় ব্যক্তি। এজন্যই দেখা যায় রোমানরা সর্বক্ষেত্রে পিতাকে অনুসরণ করছে। রোমানরা অবশ্য সেই সূত্রেই নিজ দেশীয় গল্পগাথা ও ঐতিহাসিক নায়কদের অনুকরণ করে দেশীয় ধর্ম ও কৃষ্টির সম্প্রসারণ করেন।

১। We see from them that he (Aristotle) combined lecturing with class room discussion, but put the emphasis on lecture. That is, he set out a series of topics, which linked together to form a complete survey of a subject. —Gilbert Highet.

রোমান শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে পরিবারভিত্তিক ছিল এবং শিক্ষা পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করত। ফলে শিক্ষার্থীরা পরিবারের আশা আকাঙ্ক্ষাকেই অনুকরণ করে বর্ধিত হত।[১]

কুইন্টিলিয়ানের শিক্ষণ পদ্ধতি

কুইন্টিলিয়ানই হচ্ছেন প্রথম ও প্রধান রোমান শিক্ষাবিদ যিনি শিক্ষা-পদ্ধতির দিক থেকে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ করেন। কুইন্টিলিয়ানই প্লেটোর 'দার্শনিক তৈরি'র বিরোধী ছিলেন। তিনি ছিলেন বাগ্মী সৃষ্টির জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাঁর মতে প্লেটোর পরিকল্পনা ছিল অবাস্তব ও কল্পনাধর্মী, এবং কুইন্টিলিয়ানের মতে উহা বাস্তবজগত হতে বিচ্ছিন্ন। কুইন্টিলিয়ান মনে করতেন যে বাগ্মী হয়ে রোমানরা আদর্শ রাজনীতিবাদী হতে পারবেন এবং বাস্তবকর্মে তাঁরা শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবেন। বাগ্মীতা শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে কুইন্টিলিয়ান অনুকরণ ও মুখস্থকরণের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি মনে করেন যে বাগ্মীর অনুকরণ ও মুখস্থকরণের ক্ষমতা যত বেশি তার ভবিষ্যৎ তত বেশি উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাপূর্ণ।

অতীত যুগের বেত্রাঘাত ছিল শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই পন্থার সাহায্যেই শিক্ষাকার্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হত। কিন্তু কুইন্টিলিয়ান এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। এ বিষয়ে তাঁর মতামত বিংশ শতাব্দীর শিক্ষার গণতান্ত্রিকতাকেও ছাড়িয়ে যায়। তিনি বেত্রাঘাত প্রসঙ্গে বলেছেন, "This mode of chastisement seems to mean servile and a gross affront on more advanced years. If a child is of so abject a disposition as not to correct himself when reprimanded, he will be as hardened against stripes as the vilest slave".

শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কুইন্টিলিয়ান কয়েকটি

১। Sarkar :—Education was then a responsibility of the family and its scope and content were often and to a large extent determined by the social status and the economic condition of the family concerned. The practical aspects of education were in most cases kept in the forefront ; a boy generally goes up to follow the occupation of the father and the girl, of the mother.

উপদেশমূলক কথা শিক্ষকদের সম্বন্ধে উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে শিক্ষক কখনও শিক্ষার্থীকে প্রশংসা করতে কার্পন্যবোধ করবেন না কিন্তু অযথাও প্রশংসা করবেন না। দুইই শিক্ষার অগ্রগতির পক্ষে হানিকর। তিনি আর একটি কথার উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করেছেন। তিনি বলেছেন শিক্ষার্থীর শিক্ষা যেহেতু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুকরণধর্মী সেই হেতু শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে অনুকরণের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা করে রাখবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে অনুকরণ করতে আগ্রহী হতে পারে।

কুইন্টিলিয়ান শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্য সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন। তিনি বলেছেন যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য বিবেচনা করে তাদের বৈষম্য অনুধাবন করে, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা দেবেন। এই চিন্তাধারাও কুইন্টিলিয়ানের শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পদক্ষেপ।[১]

যীশুখৃষ্টের শিক্ষাদান পদ্ধতি।

যীশুখৃষ্ট খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করেছেন এবং সেই সূত্রে তিনি শিক্ষক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি সাধারণভাবে শিক্ষাদান বলতে যা বোঝা যায়, সেরূপ শিক্ষা তিনি দেননি। তিনি দিয়েছেন ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে শিক্ষা। বস্তুতঃপক্ষে তিনি ধর্ম প্রচারকালে নিজেকে শিক্ষকের স্থানে উপস্থাপিত করে শিক্ষাদান কার্য করতেন, তিনি ছিলেন সুশিক্ষক।

যীশুখৃষ্টের শিক্ষাদানের দুটি দিক ছিল, দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং দুটিই একটি অন্যটির সাথে অন্বিত। তিনি তাঁর প্রখ্যাত শিষ্যদের যাঁদের নাম আমরা জানি, তাঁদের শিক্ষাদান করতেন, আর শিক্ষাদান করতেন অনেক ইহুদী ব্যক্তিদের, যারা তাঁর কাছে উপদেশ শুনতে আসত। যাঁরা শিষ্য তাঁরা ত সর্বদাই যীশুর সাথে থাকতেন এবং যীশুর কর্ম ও বাণী অনুসরণ ও অনুকরণ করে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। আর সাধারণ ইহুদীরাও বহুলোক একত্র হয়ে যীশুর বাণী শুনতো। তারা খাওয়া পরা ভুলে যীশুর পেছনে পেছনে যা কিছু হোক, শুনবার বা দেখবার আশায় যেত। ধর্মপ্রচারের জন্য যীশুখৃষ্টের সোফিষ্টদের মতে কোন নির্দিষ্ট সময় তালিকা ছিল না,

১। Sarkar :—A discerning teacher would assess the abilities of his pupils and help them according to their needs.

তিনি হয়ত কখনও নৌকায় বসে বা কখনো একটি পাহাড়ের মাথায় বসে উপদেশ দান করতেন।

যীশুখৃষ্টের ধর্ম শিক্ষাদানের চারটি বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। প্রথম হচ্ছে বক্তৃতা। দ্বিতীয় হচ্ছে যীশুখৃষ্ট কোন একটি জ্ঞানমূলক কথা উচ্চারণ করতেন। তারপর তিনি চুপ করে থাকতেন। শ্রোতাদের তিনি ঐ কথাটি থেকে যা প্রকৃষ্ট শিক্ষা তা গ্রহণ করবার সুযোগ দিতেন। তৃতীয় হচ্ছে যীশুখৃষ্ট কোন কোন সময়ে গল্পকে অবলম্বন করে ধর্মোপদেশ দিতেন। এবিষয়ে প্লেটো শিক্ষাদানে যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সেই কৌশল তিনিও অবলম্বন করেন। প্লেটোও গল্পচ্ছলে ও কবিতাশ্রয়ী গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। যীশুখৃষ্টের চতুর্থ পদ্ধতি হচ্ছে প্রচার। যীশুর শিষ্যগণ যীশুর কাছ থেকে যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, এবার তাঁদেরও কাজ হল ধর্মপ্রচার। যীশুর বলার পদ্ধতি খুব মধুর এবং সর্বশ্রেণীর লোক তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে থাকত।

মধ্যযুগের শিক্ষণ পদ্ধতি।

যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য ও অনুগামীরা যীশুখৃষ্টের উপদেশাদি প্রচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে লাগলেন। কোনও সময়ে বক্তৃতা পদ্ধতি, কিংবা কোন সময়ে আলোচনা পদ্ধতি—এরূপ ভাবেই চলতে লাগল মহাপুরুষের বাণীপ্রচার।

মধ্যযুগের পূর্বেই খৃষ্টধর্ম যখন প্রায় দৃঢ়ভিত্তিক হয়, অর্থাৎ মানুষের সকল স্তরে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন, নির্বিশেষে যখন খৃষ্টধর্ম সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তখন শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে গতানুগতিকতা দৃষ্ট হয়। ফলে রোমান রাজত্বের শেষের দিকে শিক্ষণধারা প্রাণহীনতায় পর্যবসিত হয়। শিক্ষাধারার এই অবনতি সেণ্ট অগাষ্টাইন নামে একজন ধর্মযাজক (St Augustine 354-430 AD) বিশেষভাবে বিরুদ্ধতা করেন। অগাষ্টাইন, ভারতীয় ঋষিদের অনুরূপ, তাঁর প্রার্থনায় যে নীতির কথা বলেছিলেন, তা হচ্ছে তাতে প্রাণ থাকবে, বাগাড়ম্বর থাকবে না। অগাষ্টাইনের শিক্ষাদর্শন পড়লে জানা যায় তিনি প্রকৃতিবাদেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ভারতীয়দের মত পরাজ্ঞান লাভের জন্য সক্রিয় ছিলেন। শিক্ষাদান পদ্ধতির কথা বিশদ করতে গিয়ে সেণ্ট অগাষ্টাইন বলেন যে শিক্ষার্থীরা শুধু শিক্ষকের কথা শুনে শিক্ষালাভ

করতে পারে না। তিনি বলেন শিক্ষাদানে সক্রিয়তা আছে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও আত্মিক যোগ থাকা অনিবার্য, না হলে শিক্ষা সুফলপ্রসূ হতে পারে না।

মধ্যযুগের আরম্ভ ও ধর্ম-যাজক শিক্ষক সম্প্রদায়।

মধ্যযুগের প্রারম্ভে গ্রীক ও রোমান সভ্যতা শিক্ষাক্ষেত্রে অবনতির সূচনা করেছিল। কিন্তু অগাষ্টাইনের পদ্ধতির মূল কথা, যার সাথে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর শিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে পর্যন্ত মিল রয়েছে—এমন জিনিসও লোকে গ্রহণ করতে পারে নি। মধ্যযুগের শিক্ষার ক্রম অবনতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতি গোঁড়া ধর্মযাজকগণ সে যুগে শিক্ষার হাল ধরে বসেছিলেন। ধর্মযাজকগণ শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্যকে উর্ধে স্থান দেবার জন্তই শিক্ষার ধারক ও বাহক হবার জন্ত অগ্রণী হননি। ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ত বা ধর্ম প্রচার করবার জন্তই তাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন। ফলে জাগতিক শিক্ষার দিকটা তারা ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেন নি। কি করে ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করেও আয়ত্বের মধ্যে আনা যায় সেদিকেই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ফলে শিক্ষণপদ্ধতি হিসাবে মুখস্থকরণ ও অনুকরণ পদ্ধতির উপরই তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ সেটাই হচ্ছে গতানুগতিক সহজ পন্থা। ফলে শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ।

ধর্মপ্রচার বনাম শিক্ষাপ্রসার সম্বন্ধে ধর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সেগুলো গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হবার পর আর একটি সূত্র থেকে শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। সেটা রাজরাজড়াদের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা। এবিষয়ে সব চাইতে আগে নাম করতে হয় চার্লস্ দি গ্রেট-এর, (৭৬৮-৮১০ খৃঃ)। তিনি নিজে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েও, শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী। এলসিয়াম (Alcium 735-804 A D) ছিলেন সম্রাটের শিক্ষা-সম্পর্কিত পরামর্শদাতা, তিনি শিক্ষণপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। ছোটদের জন্য যে শিক্ষণ পদ্ধতির কথা এ্যালসিয়াম সুপারিশ করেন সেটা হচ্ছে এ্যালসিয়াম কর্তৃক রচিত কয়েকটি প্রশ্নোত্তর শিক্ষার্থী কর্তৃক মুখস্থ করণ। প্রশ্নগুলি

অবশ্য অতিশয় অতিপ্রাকৃত। বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য এ্যালসিয়ামের প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করণ পদ্ধতি যথেষ্ট ক্লান্তিজনক। তাই তাদের জন্য এ্যালসিয়াম আলোচনা পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী খ্রীষ্টধর্মীয় নীতি ও গ্রীক দর্শনের সমন্বয় রূপ সম্বন্ধে আকৃষ্ট হন এবং এই সমন্বয় রূপ শিক্ষার বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ দেখা যায়। এ বিষয়ে সন্ন্যাসী পিটার এ্যাবেলার্ডের (Peter Abelard) অবদান বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। দার্শনিক এ্যাবেলার্ডের মতবাদ ছিল সংজ্ঞাবাদ বা নামবাদ (সাধারণ বা অমূর্ত বস্তু শুধু নাম ছাড়া আর কিছুই নয় এই মত) বা Nominalism এবং বাস্তববাদের (Realism) মধ্যবর্তী স্থানে। কিন্তু দার্শনিক হিসাবে খ্যাতির চাইতেও শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি বেশি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কাউকে অন্ধভাবে কোনও ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন নি। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যম। তাঁর রচিত পুস্তক Sic et Non (Yea and Nay) থেকে তাঁর প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতির বিশেষ রূপ বুঝতে পারা যায়। পুস্তকের ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে জ্ঞান লাভের দুয়ারে পৌছবার প্রথম সোপান হচ্ছে অবিরত প্রশ্নজাল।[১] এ্যাবেলার্ডের পর মধ্যযুগীয় শিক্ষাবিদদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষণপদ্ধতির ক্ষেত্রে কিছু অবদান রেখে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস (ST. Thomas Aquinus) এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ নির্ভর করে তাঁর সক্রিয়তার উপর। শিক্ষার্থী-শিক্ষাগ্রহণকালে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে এবং তা হলেই তার শিক্ষাগ্রহণ সাফল্য মণ্ডিত হবে। এইভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভ সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শিক্ষা দিকে শিক্ষার্থীরা সত্যান্বেষী হতে পারবে এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হতে পারবে।

মধ্যযুগীয় বিশ্ববিত্তালয় সমূহে শিক্ষাদান পদ্ধতি

মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল দু ধরণের। প্রথমটি হচ্ছে বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Methord-Lectio) এবং অপরটি হচ্ছে আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method—Disputatio) বিশ্ববিদ্যালয়ে

১। Peter Abelard Constant Questioning is the first key to wisdom for through it we are led to enquiry, and by inquiry we discern the truth.

ব্যবহৃত পুস্তকগুলি ছিল অত্যন্ত মূল্যবান এবং বেশির ভাগ শিক্ষার্থী ঐসব দামী পুস্তক ক্রয় করতে পারত না। অতএব শিক্ষাদান ছিল বিশেষ করে মৌখিক। শিক্ষার্থীরা শিক্ষককের বক্তৃতা বা আলোচনার সারাংশ নিজ নিজ খাতায় লিখে রাখত। শিক্ষকের কথা যদি স্পষ্ট ও উচ্চগ্রামী না হত, তাহলে শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষকদের মাঝে মাঝে লাঞ্ছনাও সইতে হত। বক্তৃতা পদ্ধতি হতেই আলোচনা পদ্ধতির সৃষ্টি। বিষয়বস্তু ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে কিনা তা জানবার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আবার পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীরা তাদের সন্দেহ নিরসনের জন্য শিক্ষককে প্রশ্ন করত[১]।

এ যুগে বইয়ের ব্যবহার খুব কম ছিল, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বইয়ের অভাব ছিল ত বটেই, কিন্তু শিক্ষাবিদরা পুস্তকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করে বক্তৃতার উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা মনে করতেন, পুস্তক শিক্ষার্থীর বাগ্মিতা বিকাশে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া পুস্তক অবলম্বন করে বক্তৃতা দিলে বা পুস্তকের ভাষায় বক্তৃতা দিলে বাগ্মীর স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা, তাছাড়া স্বকীয়তাও নষ্ট হবেই। শিক্ষাবিদদের এ ধারণা অবশ্য অতি পুরাতন, কারণ প্রাচীন দার্শনিক ও বাগ্মী ইসোক্রেটিস (Isocrates) ও প্লেটো ইত্যাদি অনেকেই পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করার বিরোধিতা করেন। প্লেটো ত বলেন যে বইয়ের সাহায্য নিলে শিক্ষার্থীর স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

পুঁথি ব্যবহারের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হচ্ছে বক্তৃতাদানকারী শিক্ষক যেমন অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষার্থীদের উপলব্ধিতে অসুবিধা হতে পারে মনে করে ভালভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন, কঠিনকে সহজ ও সরল করে রূপান্তরিত করেন, কিন্তু পুস্তকে সে সুযোগ নেই। এইজন্যই বক্তৃতা পদ্ধতি ও আলোচনা পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হয়। এতদ্ব্যতীত বক্তৃতা-দানকারী শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করে বিষয়টি বোধগম্য করবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে পারেন, কিন্তু পুঁথিতে

১। "Mediaeval methods of education are so often abused that it is a pleasure now and then to point out their virtues. In particular it is worth noting here that some mediaeval universities know the value of this questioning process. At the University of Paris in the thirteenth and the fourteenth centuries the chief teachers made themselves available on special occasions to answar quodlibets. The word means is 'whatever you like' and in theory their students could question them on any subject—Gilbert Highet.

সে সুযোগ নেই। অতীত যুগের শিক্ষাবিদদের মধ্যে এ ধারণা দৃঢ়ভিত্তিক হলেও, পরবর্তী যুগে পুঁথির গুরুত্ব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথমতঃ পুস্তকে লিখিত বিষয়বস্তু একটি নির্দিষ্ট মান মেনে চলে। বক্তৃতা পদ্ধতিতে বক্তৃতাদানকারী শিক্ষক নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিষয়বস্তু হতে সরে যেতে পারেন। ফলে বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয়বস্তু প্রতিভাত হয়। কিন্তু পুস্তক বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। এই কারণেই কয়েকটি গ্রন্থ, যথা, অ্যারিষ্টটলের দর্শনশাস্ত্রের পুস্তক (Aristotle's Organon) বা জাষ্টিনিয়ানের নিয়মাবলী (Justinian Code) ইত্যাদি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত হয়।

শিক্ষণ পদ্ধতিতে পুস্তকের আগমন, শিক্ষণ পদ্ধতিতে নূতন আলোকের আভাষ দিয়ে থাকে। প্রামাণ্য গ্রন্থকে ভিত্তি করে আলোচনা চলতে লাগল বিষয়বস্তুর স্থিরতা ও শিক্ষার উদ্দেশ্যের স্থিরতা শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করে তুলল। কিন্তু এই পদ্ধতিরও কিছুটা পরিবর্তন হল। প্রামাণ্য গ্রন্থের আলোচনার মাধ্যমেই যুক্তিভিত্তিক বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশনের ব্যবস্থা হল। ফলে বক্তৃতা পদ্ধতির স্থান গুরুত্বপূর্ণ স্তর হতে নীচে নেমে গেল, আর তার স্থান নিল তথ্যমূলক আলোচনা পদ্ধতি।

কিন্তু মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্যমূলক আলোচনা পদ্ধতি ও বক্তৃতা পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকর নয় বলেই শিক্ষাবিদরা মনে করতে থাকেন। ফলে গ্রীসীয় ও রোমানদের যে সাহিত্যধর্মী শিক্ষার মধ্যযুগে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্তি ঘটেছিল, তারই আবার পুনরাবির্ভাব ঘটল, অর্থাৎ শিক্ষণ পদ্ধতি গিয়ে দাঁড়াল মুখস্থকরণ ও অনুকরণে। ব্যাকরণ পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হল খুব বেশি।

নবজাগরণের যুগে অবশ্য কয়েকজন শিক্ষাবিদ শিক্ষণ পদ্ধতিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হন এবং মধ্যযুগীয় শিক্ষণ পদ্ধতির অসারতা প্রতিপন্ন করেন।

নবজাগরণের যুগ

ইরাসমাসের শিক্ষাপদ্ধতি

যে কয়েকজন শিক্ষাবিদ শিক্ষণ পদ্ধতিকে ঢেলে সেজে নূতন রূপ দিতে চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে মানবতাবাদী ইরাসমাসের নাম বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। ইরাসমাস (Erasmus 1466-1536) পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাতত্ত্ববিদ। শুধু শিক্ষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর বিদ্যাবত্তার অপরিসীম পরিচয় প্রদান করেন। তাঁর শিক্ষাসম্বন্ধীয় অবদান তাঁর সমগ্র দর্শন ও সাহিত্যের অবদানের একাংশ মাত্র। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ হচ্ছে 'Praise of Folly'; এই গ্রন্থে তিনি মধ্যযুগীয় দার্শনিক ও বৈয়াকরণিকদের কঠোর সমালোচনা করেন। তাছাড়া তিনি তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষণ পদ্ধতি ও বিদ্যালয়ে প্রচলিত পুস্তকাদিরও বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেন। তিনি ছোট শিশুদের কখনও শিক্ষাদান করেন নি, এমন কি, সাধারণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও শিক্ষাদানে অধৈর্যভাব প্রকাশ করতেন। কিন্তু শিশুদের পাঠদান ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে এমন মূল্যবান সুপারিশ করেছিলেন, যাতে অনেকে মনে করতেন তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি বোধহয় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই ফল। তিনি তাঁর 'On the Right Method of Instruction' গ্রন্থে বলেন, ব্যাকরণের ধাতুরূপ, শব্দরূপ, বাক্যগঠন প্রণালী ইত্যাদি প্রতিটি শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় হলেও, এগুলির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ অসঙ্গত এবং এগুলির প্রয়োগও যথোচিত সহজ ও সরল হবে। তিনি সাধারণ শিক্ষক যাঁরা শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণের নিয়মাবলী পড়াতে গিয়ে বেশি সময় ব্যয় করেন, তাঁদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, আমরা ব্যাকরণের নিয়মাবলী শিক্ষা করে ভাষা বলতে শিক্ষা করি না। আমরা যাঁরা ভালভাবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম, তাঁদের সাথে কথা বলে ও পুস্তক পড়েই ভাষা শিক্ষা করি [১]। এই নীতির উপর নির্ভর করেই ইরাসমাস ব্যাকরণের স্থান বিষয়বস্তুর পরে দিয়েছেন।

শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে ইরাসমাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রগতির দিক থেকে ইরাসমাস তিনটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মত পোষণ করেন। প্রথম হচ্ছে শিশু প্রভৃতি, অর্থাৎ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা; দ্বিতীয় হচ্ছে, শিক্ষার্থীকে তার

১। "...it is not by learning rules, that we acquire a power of speaking a language but by daily intercourse with those accustomed to express themselves with exactness and refinement, but by copious reading of the best authors."—Woodward : Erasmus Concerning Education.

উপর ভিত্তি করে শিক্ষণ এবং তৃতীয় হচ্ছে শিক্ষার্থীর বারবার অনুশীলন। এই তিনটি স্তরের উপর নির্ভর করেই ইরাসমাস শিক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্বের কথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে যদি শিক্ষণ পদ্ধতি সঠিক হয় এবং শিক্ষাদান ও অনুশীলন একই সাথে চলে, তাহলে শিক্ষার্থী সাধারণতঃ যে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করতে সক্ষম [১]। ইরাসমাস বলেন যে গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতি অর্থাৎ অনুকরণ ও মুখস্থকরণ শিক্ষাগ্রহণে কখনই সাহায্য করতে পারে না। তিনি দৈহিক শাস্তিদানের সাহায্যে শিক্ষা পদ্ধতিরও যথেষ্ট নিন্দা করেছেন।

মাইকেল দ্য মণ্টেন (Michael de Montaigne 1533-1592)[১]

শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে নূতন চিন্তাধারার কথা ইরাসমাস ব্যক্ত করেছেন, তার ধারক ও বাহক হিসাবে মাইকেল দ্য মণ্টেনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। মণ্টেন তাঁর 'Pedantry' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন যে আমাদের কোন কিছু বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে গিয়ে দেখা উচিত যে সে বিষয়ে জ্ঞান-বৃদ্ধ হয়েছে কি-না? কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা মুখস্থকরণের উপরই বেশী গুরুত্ব দেই এবং উপলব্ধিকরণের উপর মোটেই দৃষ্টি দেই না। যান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতি অর্থাৎ মুখস্থকরণের উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষণলাভ করতে পারে না। মণ্টেন শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন।

(১) একই পদ্ধতি অবলম্বন করে সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা চলে না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য বর্তমান, অতএব একই পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষাদান করলে সকল শিক্ষার্থী একইরূপভাবে সমৃদ্ধ হতে পারবে না।

(২) ইরাসমাসের মত মণ্টেনও দৈহিক শাস্তিদানের বিরোধী। দৈহিক শাস্তিদান শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে, তারও বিকাশ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা।

(৩) প্রকৃষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতি হচ্ছে শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে বিচার-বুদ্ধি, যুক্তি ও কল্পনা শক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্তে আসতে হবে, জ্ঞান লাভ

১। "......that where the method is sound, where teaching and practice go hand in hand, any discipline may ordinarily be acquired by the flexible intellect of man"—Woodward : Erasmus Concerning Education.

করতে হবে। মণ্টেন বলেছেন, "Knowing by heart is not Knowledge"। অতএব শিক্ষকও যেন জোর করে শিক্ষার্থীকে কোনও কিছু গ্রহণ করতে উৎসাহিত না করেন। শিক্ষার্থীর নিজের বিচার ও যুক্তিশক্তি শিক্ষার্থীকে জ্ঞানলাভে সাহায্য করুক, সে নিজেই বিষয়বস্তুর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হোক। শিক্ষক বরং এ-বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে পারেন।

রজার্স অ্যাসক্যাম[১]

রজার্স অ্যাসক্যাম (Roger Ascham 1515-1568) ছিলেন মণ্টেনের সমকালীন শিক্ষাবিদ। তিনি মণ্টেনের শিক্ষণ পদ্ধতির প্রশংসা করেন এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজ ও প্রীতিপূর্ণ যোগাযোগের উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন যে কোন পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হোক না কেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি প্রীতিপূর্ণ সংযোগ না থাকে তবে শিক্ষাদানও স্থায়ী ও ফলপ্রসূ হতে পারে না। অ্যাসক্যাম 'The Schoolmaster' নামে একটি শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর দুই বৎসর পরে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের মূল বিষয় হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থটি দু ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে অ্যাসক্যাম বলেন শারীরিক শাস্তি যদি বিদ্যালয়ে হতে দূরীকরণ হয় তাহলে শিক্ষার মান বর্ধিত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ইহা শিক্ষণ পদ্ধতির পরিপূরক।

অ্যাসক্যাম পুস্তকটির দ্বিতীয় ভাগে ভাষা শিক্ষার কথা বলেছেন। এখানে তিনি ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতির সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছেন যে কোনও আদর্শ গ্রন্থের মাতৃভাষায় অনুবাদ ও পরে মূলভাষার পুনরায় অনুবাদ করা—এই দ্বৈত অনুবাদ পন্থা অবলম্বন করলে ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত কার্যকরী হয়।

খ্রীষ্টযাজকদের শিক্ষাদান পদ্ধতি[২]

ইরাসমাস, মণ্টেন, অ্যাস্ক্যাম প্রভৃতি শিক্ষাবিদ শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে

১। Discuss the Contributions of Mantaigne in the development of Educational methods.

২। Discuss the Contributions of Christian monks in the development of Educational methods.

গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করলেও, তৎকালীন শিক্ষক সমাজ, তাঁদের চিন্তাধারাকে পূর্ণ সমর্থন করেন নি। তৎকালীন শিক্ষকদের মতবাদ ছিল যে দৈহিক শাস্তিদ্বারা শিক্ষার্থীকে পাঠগ্রহণে আগ্রহী করা সম্ভব। তাই এই যুগে শিক্ষণ পদ্ধতির দিক থেকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না।

খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণ বর্তমান যুগের প্রারম্ভে শিক্ষণ পদ্ধতির একটি নূতন ধারা অবলম্বন করেন। খ্রীষ্টীয় বিদ্যালয়গুলির সাহিত্যধর্মী শিক্ষা, ও তৎকালীন অন্যান্য শিক্ষার মূল পদ্ধতির সংমিশ্রণে এই বিশেষ পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতির রূপরেখা বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয় যে শিক্ষকেরা এক ধরণের বিশেষ বক্তৃতাকে অবলম্বন করে শিক্ষাপ্রদান করতেন। শিক্ষার্থীর শিক্ষার প্রধান ধারা ছিল খ্যাতনামা লেখকদের নির্ধারিত সাহিত্য পাঠ। শিক্ষার্থীকে নির্বাচিত বিষয়টি পড়তে দেবার পূর্বে শিক্ষক বিষয়-বস্তুর সাধারণ আলোচনা করে দিতেন এবং সেই নির্ধারিত অংশ পাঠ করে দিতেন। তারপরে শিক্ষার্থীরা বক্তৃতার অংশগুলি প্রয়োজনবোধে লিখে নিত।

খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণের শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষা পরিকল্পনায় জেজুইটসের (Jesuits) অবদান উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যক্তিমাত্রের শিক্ষাচিন্তা নয়। ইহা সমগ্র জেজুইট সম্প্রদায়ের অবদান। ছয়জন শিক্ষাবিদ প্রচলিত Catholic এবং Protestants-দের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষণ পদ্ধতি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে এবং শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। একে বলা হয় 'রেসিও স্টাডিয়োরাম' (Ratio Studiorum—1599 AD)। এখানে বলা হয় যে শিক্ষক শিক্ষার বিষয়বস্তু প্রথমে শ্রেণীতে পাঠ করবেন। পরে তিনি উহা এমনভাবে ব্যাখ্যা করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর রসগ্রহণে সমর্থ হয়। এরপরের স্তরে শিক্ষক প্রতিটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে অপর অনুচ্ছেদের মধ্যে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করে ব্যাখ্যা এবং আলোচনা করবেন। এর পরের স্তরে এই লেখকের বা অন্য কোন লেখকের রচনার সঙ্গে বর্তমান রচনার রচনা-শৈলী ও বিষয়বস্তুর তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হবেন। সকলের শেষে শিক্ষক তাঁর স্বীয় মন্তব্য পেশ করবেন।

খ্রীষ্টীয় যাজকদের শিক্ষণপদ্ধতির বিভিন্ন প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা লিপিবদ্ধ হল।

(১) যতক্ষণ পর্যন্ত না পাঠটি শিক্ষার্থীর পুরোপুরি আয়ত্ত না করা হত

ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠটির পুনরাবৃত্তি চলত। তাছাড়া ঐ বিষয়টির পুনরালোচনা হত সপ্তাহশেষে ও মাসের শেষে এবং পরীক্ষা গ্রহণ করা হত বৎসরান্তে।

(২) শিক্ষার্থী যদি শ্রেণীতে শিক্ষকের বক্তৃতার মধ্যে কোনওরূপ অযৌক্তিকতা বা ত্রুটিবিচ্যুতি দেখতে পেত, তাহলে ঐ বিষয়ে শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার অধিকার তার ছিল।

(৩) বিতর্কের অবতারণা করে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে অধ্যয়নে উৎসাহিত করতেন এবং বিতর্কে বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করতেন শিক্ষক।

(৪) বিষয়বস্তু পরিবেশনের পূর্বে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত মান বিবেচনা করে বিভিন্ন দলে ভাগ করা হত। এতে শিক্ষণ পদ্ধতি আকর্ষণীয় ও কার্যকরী হতে পারত, কারণ শিক্ষাগত মান একইরূপ থাকলে শিক্ষকের শিক্ষাদানে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে অবাধ স্বাধীনতা থাকে।

(৫) পাঠদান একেবারে যাতে নীরস না হয়ে দাঁড়ায় এজন্য নাটকাভিনয় ও খেলাধূলা শিক্ষণ পদ্ধতিতে অনুপ্রবেশ করেছিল।

(৬) প্রত্যেক শ্রেণীতে একজন করে মনিটর ছিল, উদ্দেশ্য অন্যান্য শিক্ষার্থীর ত্রুটি ও অগ্রগতি সম্বন্ধে শিক্ষককে সর্বদা ওয়াকিবহাল রাখা। যদি শিক্ষার্থী অমনোযোগী হত, তাহলে তাকে সংশোধক বা Corrector-এর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হত। সংশোধক ছিলেন বিদ্যালয়ের সম্পর্কবিহীন একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি। তিনি অমনোযোগী ছাত্রকে মনোযোগী করবার জন্য যথাবিহিত চেষ্টা করতেন। তিনি যদি অপারক হতেন, তাহলে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় হতে তাড়িয়ে দিতেন।

খ্রীষ্টযাজকদের শিক্ষণ পদ্ধতির সমালোচনা।

খ্রীষ্টীয় যাজকদের শিক্ষণ পদ্ধতি অর্থাৎ রেসিও স্টাডিয়োরামে যে শিক্ষণ পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছিল, তা বহুকাল ধরে চলেছিল বটে কিন্তু তাও পরবর্তীকালে সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে যে সম্প্রদায় বা শিক্ষাবিদ এই পদ্ধতির সমালোচনা করেন, তাঁদের মধ্যে জ্যানসেনীয় সম্প্রদায় (Janesenists) প্রধান। জ্যানসেনীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে প্রথমতঃ শিশুপ্রকৃতি নির্ধারণ, দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির আবিষ্কার। প্রথমটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে শিশু-প্রকৃতি নির্ধারণ বা শিশু-পর্যবেক্ষণের (Child study) প্রাথমিক প্রচেষ্টা

জ্যানসেনীয়দের হাতেই শুরু হয়। প্রকৃষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রথম নীতির পরিপূরক, কারণ শিশুকে ভাল করে জানলেই তাকে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেওয়া মোটেই কষ্টকর নয়। শিক্ষা পদ্ধতির সম্বন্ধে একটি মূল্যবান কথা এই সম্প্রদায় বলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে যা শিশুদের জানা, তাই থেকে শিশুদের শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ করতে হবে।[১]

গ্রীষ্টীয় যাজকদের শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিশুদের অপরাধ প্রবণতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যাজকগণ বলেন যে শৃঙ্খলার ভিত্তি হচ্ছে শিশুদের কঠোর শাসন এবং উহা হচ্ছে শিক্ষণ পদ্ধতির পরিপূরক ও সহায়ক। কিন্তু জ্যানসেনীয় সম্প্রদায়-এর কঠোর সমালোচনা করেন এবং শারীরিক শাস্তি দিয়ে কঠোর নিয়ম ও শৃঙ্খলা স্থাপনের বিরোধী ছিলেন।

মথে ফেনেলোঁ (Mothe Fenelon 1651-1715) হচ্ছেন আর একজন উদারমতাবলম্বী শিক্ষাবিদ যিনি গ্রীষ্টীয় যাজকদের শিক্ষণ পদ্ধতির বিশেষরূপ সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে যাজকদের কঠোর শৃঙ্খলার মতবাদ শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত। তিনি মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে 'On the Education of Girls' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। ঐ যুগে নারী-শিক্ষার কথা অচিন্তনীয় হলেও তিনি নারীশিক্ষা প্রসারের দিকে বিশেষভাবে চেষ্টিত হন।

ফেনেলোঁ শিশুশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে অল্প বয়স থেকেই শিশুরা কথা বলতে শেখে এবং ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করে। অতএব শিক্ষকদের পক্ষে শিশুদের অতি শৈশব অবস্থাও অবহেলা করা উচিত নয়। শিশুদের প্রশ্নের সহজ, সরল ও নির্দিষ্ট উত্তর শিক্ষকদের দিতে হবে। এই ছিল ফেনেলোঁর মতবাদ।

শৃঙ্খলা রক্ষার ও শাস্তিদানের নিয়মাবলী।

শিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা। ঐ যুগে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রচলিত ছিল না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করে যে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব, তা সেই যুগে অজ্ঞাতই ছিল। খ্রীশ্চিয়ান ব্রাদার্স নামে একটি সংস্থা ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে

১। Boyd জ্যানসেনীয় সম্প্রদায়ের উল্লেখ করে বলেছেন : The common principle of the school work was that the learning should begin with what is familiar.

কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং এর উদ্যোক্তা ছিলেন সেণ্ট জন ব্যাপটিষ্ট দ্য-লা সালে (St John Baptist De-la Salle)। শিশুদের শিক্ষাদান ও শিক্ষকদের শিক্ষণপদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত করান, এই সব বিদ্যালয়গুলিতে চললেও, এর গতি ছিল অধোগামী। জেজুইটস্‌দের মত এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্র খুবই কঠিন অনুশাসনে আবদ্ধ ছিল, এবং শৃঙ্খলাবোধ সঞ্জাত হত কঠোর সংযমদ্বারা। শিক্ষক গম্ভীর ও রাশভারী ব্যক্তি হবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করবেন না। বিদ্যালয়ে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা ও নীরবতা পালনই ছিল শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রথম সোপান।

খ্রীশ্চিয়ান ব্রাদার্সদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে প্রতি শ্রেণীতে 'সর্দার পড়ো' বা মনিটর থাকত। 'সর্দার পড়োর' কাজ ছিল শিক্ষকের অনুপস্থিতকালে শ্রেণীর শৃঙ্খলা ও শিক্ষার্থীদের পঠন লিখন ইত্যাদি লক্ষ্য করা। তারা মাঝে মাঝে পাঠদানের কাজও করত। শৃঙ্খলা রক্ষার দিকেই তাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকত এবং শিক্ষক এলে তাঁর কাছে তার অনুপস্থিতিতে যেসব শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা ঘটেছিল, তারই ফিরিস্তি দিত। দ্য-লা সালের কনডাক্ট অফ দি স্কুলস্‌ (Conduct of the Schools) নামক পুস্তকে শাস্তিদানের বিধি বর্ণিত আছে।

শিক্ষক শাস্তি বিধান করতেন। শাস্তিবিধানের পাঁচ রকম প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রথম অবস্থায়, খুব কম অপরাধের জন্ম শিক্ষার্থীকে কঠোর তিরস্কার করা হত।

দ্বিতীয় স্তরে, আরও একটু বেশি অপরাধের জন্য শিক্ষার্থীকে নতজানু হয়ে বা দাঁড়িয়ে থেকে বা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের থেকে বেশি কাজ করে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ আরও বেশি অপরাধের স্তরে শিক্ষার্থীকে চামড়ার চাবুক দিয়ে আঘাত করা হত। অনগ্রসর ও অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের জন্তই এই ধরণের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

চতুর্থ স্তরে অর্থাৎ আরও বেশি অপরাধের স্তরে শিক্ষার্থীকে বেত মারা হত।

যদি দেখা যেত এই চার রকম শাস্তি প্রদানের ফলেও শিক্ষার্থী কোনও

রকম শোধরাতে পারে নি, তাহলে তাকে পঞ্চম স্তরে বিদ্যালয় হতে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হত।

'কনডাক্ট অফ দি স্কুলস্'-এ বর্ণিত আছে যে শিক্ষক শাস্তিদানের সময় শান্তভাবে এবং শিক্ষার্থীর উপর কোনওরূপ রাগ পোষণ না করে শাস্তি বিধান করবেন। আর তা ছাড়া কি কারণে শিক্ষার্থীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তা শিক্ষার্থীকে প্রথমেই জানতে দেওয়া হত। শিক্ষার্থী স্বীয় কর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং শাস্তি গ্রহণের পর শিক্ষকের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে—এই ছিল শাস্তিদান ও শাস্তি গ্রহণের বিশেষ নীতি। কোনওরূপ লঘুপাপের জন্য গুরুদণ্ড দেওয়া হবে না, সেদিকে শিক্ষকের দৃষ্টি রাখতে হত।

অপরাধী শিক্ষার্থীকে নির্জন স্থানে, অন্যান্যদের চক্ষুর অন্তরালে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। দেহের কোন অংশের আঘাত শিক্ষার্থীর পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, এরূপ শাস্তি বিধান হতে জন দি ব্যাপটিষ্ট বিরত থাকতে বলতেন।

কমেনিয়াসের ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি।*

কমেনিয়াসের (Comenius 1592-1670) অবদান শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী। কমেনিয়াসের পূর্বে কোন শিক্ষাবিদই ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতির কথা বলেন নি। কিন্তু শিশু শিখে থাকে তার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বিশেষ করে। তাই কমেনিয়াস এই ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই পদ্ধতির আবিষ্কারক। কমেনিয়াস 'Orbis Pictus' অথবা 'Orbis Sensualium Pictus' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে প্রয়োজনীয় কথাগুলি চিত্রসম্বলিত করে সজ্জিত করা হয়েছে, যাতে শিশুরা দেখেই জিনিষটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারে। এই পুস্তকটি এতই হৃদয়গ্রাহী এবং শিশুশিক্ষা সহায়ক যে উহা প্রায় উনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষার অপরিহার্য পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। যে শিক্ষা শিশুরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পায়, সেই শিক্ষা শিশুদের পক্ষে স্থায়ী হয়। একথা কমেনিয়াস জোর গলায় বলেন এবং সেই হেতু কমেনিয়াসের ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষা, শিক্ষণ পদ্ধতির

* Discuss the Contribution of Comenius in the developments of Educational methods.

ক্ষেত্রে একটি গুরুতর পদক্ষেপ বলে বলা যায়। দুই বা তার বেশি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের ফলে শিশুদের শিক্ষা বিশেষ কার্যকরী বলে কমেনিয়াস দাবী করেন।

কমেনিয়াস প্রকৃতিগত শিক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন পাখি বসন্তকালে ডিম পাড়ে ও বাচ্চা ফোটায়। তেমনি শিশুদের শৈশব-কাল হতেই শিক্ষালাভে অভ্যস্ত করা উচিত, কারণ তখনই সে গ্রহণ করতে সক্ষম। তিনি বলতে চান যে প্রকৃতি একটি নিয়ম ধরে চলে এবং তার পথ থেকে সে বিচ্যুত হয় না। শিশুকে যদি প্রথম অবস্থা হতেই উপযুক্ত পদ্ধতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় ঘটবে না। মানুষের জীবনে প্রচুর অসাফল্যের বিবরণ পাওয়া যায় এবং কমেনিয়াসের মতে মানুষ শিক্ষালাভ করতে গিয়ে প্রকৃতির অনুশাসন হতে বিচ্যুত হয়েই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষালাভে অগ্রসর হয়েছিল।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ হয় ইংরেজ দার্শনিক বেকনের (Bacon 1561-1626) সময় হতে। তিনিই এ বিষয়ের পথ-প্রদর্শক। কমেনিয়াসের উপর বেকনের প্রভাব যথেষ্ট ভাবে পড়েছিল, তা কমেনিয়াসের ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি হতেই বুঝতে পারা যায়।

উন্নতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যাঁরা চেষ্টিত ছিলেন এমন নয়জন শিক্ষাবিদের নাম কমেনিয়াস করেছেন। এই নয়জনের মধ্যে উলফগ্যাঙ্গ র‍্যাটকি (Wolfgang Ratke 1571-1635) অন্যতম। র‍্যাটকি বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষাদানের কথা বলেন। এই বাস্তবভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি কমেনিয়াসকে প্রভাবান্বিত করেছিল এবং তিনি র‍্যাটকির পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্যাকরণের একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন।

জন লকের শিক্ষণ পদ্ধতি।

জন লক (John Locke 1632-1704) তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্ত চিন্তাধারা তাঁর 'Thoughts' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি Grammar Schools সমূহের প্রচলিত পদ্ধতিগুলির তীব্র সমালোচনা করেন। Grammar Schools-গুলিতে শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসাবে দৈহিক শাস্তিদানের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু তিনি এই শৃঙ্খলাভিত্তিক

শিক্ষণ পদ্ধতির ঘোরতর বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, 'Beating is the worst, and therefore the least means to be used in correction of the children'—অর্থাৎ শিশুদের সংশোধন কার্য দৈহিক শাস্তিদান সর্বশেষ বিধি হিসাবে ব্যবহৃত হবে, কারণ এই বিধিটির সংশোধনী ক্ষমতা একেবারে নাই বললেই চলে।

ভাষা শিক্ষাদান সম্পর্কে লক ব্যাকরণের কচকচির উপর গুরুত্ব আরোপ না করে প্রত্যক্ষ কথাবলার মাধ্যমে শিক্ষককে অগ্রসর হতে বলেন।

শিক্ষায় আগ্রহ উদ্রেক করার ক্ষেত্রে এবং শিশুর মনোবৃত্তি শিক্ষাক্ষেত্রে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে জন লক বর্তমান বিংশ শতাব্দির সপ্তদশকের শিক্ষাবিদের মতই তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে শিশুর মন কোন কিছু গ্রহণ করার মত অবস্থায় আসা পর্যন্ত শিক্ষাদান কার্য চলতে পারবে না। তাছাড়া যদি স্বাভাবিক ভাবে শিশুর মত নূতনকে গ্রহণ করবার জন্ত আগ্রহী না হয়, তাহলে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে শিশুর মনকে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

লক দুটি তরফ থেকে তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতির নিজস্ব ধারণা আহরণ করেন—মনন ও অনুভূতি। অনুভূতির উপরই তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

রুশো ও রোমান্টিক শিক্ষণ পদ্ধতি।*

শিক্ষা সম্বন্ধে লকের মতবাদ শীঘ্রই নানাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেই মতবাদের উপর ভিত্তি করে নূতন নূতন বিদ্যালয়ও গড়ে ওঠে। লকের মতবাদের ব্যাখ্যাকারিগণের মধ্যে রুশোকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু ভাল করে রুশোর শিক্ষণ সম্বন্ধীয় মতবাদ পড়লে বুঝতে পারা যায় যে রুশো শুধু লকের ব্যাখ্যাকারী ছিলেন না। তিনি লকের মতবাদের বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গে বিরোধিতা করেন ও নিজস্ব মতবাদ প্রচেষ্টা করেন।

রুশো তাঁর নানা গ্রন্থে শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা করলেও, তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থ হচ্ছে 'এমিল'। লর্ড মোলের মতে এই গ্রন্থ শিশুদের মুক্তির সনদ (It is the charter of emancipations for the children)।

রুশো শিশুর শৈশবকালের শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছেন তা

---

* Discuss the contribution of Rousseau in the development of Educational methods.

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শিশুকে অল্প বয়স হতেই স্বাধীনতা দিতে হবে। একটু সমর্থ হলেই তাকে ঘরময় হামাগুড়ি দিয়ে চলে বেড়াবার মত ব্যবস্থা করে দিতে হবে। একটু বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশু নানারকম কাজকর্ম করবে। ফলে তার দেহ সতেজ হবে, পরিপুষ্টি লাভ করবে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রখর হবে। রুশো বলেন যে শিশুর খেয়াল বা মর্জির কাছে কখনও নতি স্বীকার করা যুক্তিসম্মত নয়। তিনি আরও বলেন যে শিশুকে ১০/১২ বৎসরের পূর্বে প্রত্যক্ষভাবে পড়ানো বা লেখানো শিক্ষার প্রয়োজনই হবে না। যদি প্রয়োজন সৃষ্টি করা যায় তাহলে শিশু আপন তাগিদেই অন্যের সাহায্যে ব্যতিরেকেই পড়তে বা লিখতে শিখবে।

রুশোর মতে শিশুকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা কিছুই থাকবে না। শাস্তিদান শিক্ষণ পদ্ধতির সহায়ক নয়—একথা তিনি জোর দিয়ে বলেন।

রুশো শিক্ষণ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে শিশুর পরিণমনের দিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষকদের চলতে হবে। অতএব শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষণ পদ্ধতি হচ্ছে নেতিবাচক অর্থাৎ তাকে গুণ, পুণ্য, সাধুতা ইত্যাদি বিষয়ে কোন শিক্ষা দেওয়া হবে না, শুধু তাকে রক্ষা করে যাওয়া হবে ভুল, দোষ, ত্রুটী থেকে। এই কারণেই রুশো শিশুর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নগর হতে দূরে প্রকৃতির স্বাভাবিক আবেষ্টনীতে করেছেন।

শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে রুশোর নিজস্ব চিন্তাধারা আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় রুশোর চিন্তাধারা ও মতামত সমূহ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্টসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ করলে নিম্নলিখিত শীর্ষগুলিতে দাঁড়ায়।

(ক) **ব্যক্তিগত শিক্ষা**—ব্যক্তিগত শিক্ষার উপর রুশো বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে এবং সেই সূত্রেই শিক্ষণ পদ্ধতি গড়ে উঠবে।

(খ) **হাতে কলমে কাজ করার নীতি**—রুশো নিজে করে শেখো' এর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

(গ) **প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষা**—রুশো মনে করতেন যে প্রথমে শিশু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষালাভ করবে, পুঁথি হতে শিক্ষালাভ করবে না। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ও অভিজ্ঞতার অর্জনের ভিত্তিতে রুশোর শিক্ষণ পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয়।

(ঘ) আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি অনুসরণ—শিশু নিজেই আবিষ্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করে বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার করবে। এইগুলিই হচ্ছে রুশোর শিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথা। বর্তমান প্রগতিমূলক শিক্ষণ পদ্ধতির দিক হতে যে রুশো অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন, তা তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতির মূলকথাগুলি দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

জোহান হেনরিক বেসডো

শিক্ষণ পদ্ধতি জোহান হেনরিক বেসডোর (Johann Heinrich Basedow 1724-1790) হাতে রুশোর পরেই বিশেষ করে দানা বেঁধে উঠে। বেসডো তিন বৎসর ছাত্র পড়িয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তার উপরেই তিনি 'De Methodo Inusitato' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। কমেনিয়াসের 'Orbis Pictus' তিনি ছাত্র পড়ানোকালে ব্যবহার করেন এবং তার দ্বারা তিনি বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হন। শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর মূল কথা তিনি একটি বাক্যে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন, আমাদের সকল জ্ঞানের উৎস হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয় এবং অভিজ্ঞতা অর্জনই সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কথা (All our Knowledge begins with the senses and experience of things is all important)। খেলার মাধ্যমে তিনি জ্ঞানলাভের বিষয়বস্তু পরিবেশনের কথা উল্লেখ করেন এবং ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক পঠনের পূর্বে কথা বলার উপর এবং ভাবপ্রকাশের উপর বেশি গুরুত্ব দেন।

নবযুগের শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা

শিক্ষণ পদ্ধতির নূতন ভাবধারার দিক থেকে কমেনিয়াস, লক, রুশো, বেসডো ইত্যাদি মনীষীদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন মনীষিগণ শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অবদান রেখে গিয়েছেন, তার ফলে শিক্ষণ ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। রুশো পদ্ধতির দিক থেকে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি, কিন্তু তাঁর শিক্ষা সম্পর্কীয় ভাবধারা শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন সূচনা করে। এমিলের শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তত্ত্বের দিক থেকে যা প্রচার করেন, সেই তত্ত্বের বাস্তব রূপায়িত করবার ভার এসে পড়েছিল জোহান হেনরিক পেষ্টালৎসীর

(Johann Heinrich Pestalozzi 1746-1827), হারবার্ট (Johann Friedrich Herbart 1776-1834) এবং ফ্রয়েবেলের (Fredrick Froebel (1782 1852) এঁদের উপর।—এঁদের মধ্যে পেষ্টালৎসীই হচ্ছেন প্রথম ও প্রধান যিনি রুশোর তত্ত্বকে বাস্তবে রূপদান করবার জন্য মনস্তত্ত্ব-সম্পন্ন শিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন।

পেষ্টালৎসীর বাস্তবভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি।*

কোন কিছুর শিক্ষালাভ করা বলতে, সেই জিনিসটা শুধু মুখস্থ করা নয়, শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে, তার জন্য চাই উপলব্ধি। পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদগণের মধ্যে অনেকেই শিক্ষায় উপলব্ধির কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কি পদ্ধতিতে উপলব্ধি হবে, তার দিকে বিশেষ ইঙ্গিত দেন নি। কিন্তু পেষ্টালৎসী বাস্তবের ভিত্তিতে উপলব্ধি লাভের কথা বলছেন। পেষ্টালৎসীর শিক্ষানীতি ও নূতন শিক্ষণ পদ্ধতি একসাথে আলোচনা করে দেখতে পায়া যায়।

পেষ্টালৎসীর মতে শিক্ষা হবে অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং যেহেতু শিশুর অভিজ্ঞতা নেই, সেই হেতুগৃহে ও বিদ্যালয়ে তার অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করতে হবে। এই অভিজ্ঞতা হবে Anschauung দ্বারা। Anschauung শব্দটির অনুবাদ সম্ভব নয়, তবে এর মোটামুটি অর্থ হচ্ছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা পর্যবেক্ষণদ্বারা অভিজ্ঞতা অর্জন। পেষ্টালৎসী বলেন যে প্রথমতঃ শিশুর আবেষ্টনী ও তৎসংলগ্ন, ধারণাগুলি এলোমেলো থাকে এবং একটা ধারণার সঙ্গে অন্য ধারণা বিজড়িত হয়ে আরও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। মনোযোগের সঙ্গে সেগুলি নিরীক্ষণ করার পর সেগুলি ব্যক্তির মনের কোণে দানা বেঁধে উঠে। বস্তু ও বস্তুর গুণগুলি বিশ্লেষিত হয়ে সেগুলির পরিচয় সহজসাধ্য হয় এবং তারপর সেগুলির নাম দেওয়া হয় ও শ্রেণীভুক্ত করা হয়। নাম দেওয়া ও শ্রেণীভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমরা পর্যবেক্ষণের তৃতীয় পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়, তখন বস্তু আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থাকে না, তখন বস্তুকে অন্তবস্তু বা সকল বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভব হয়। ক্ষুদ্র বস্তু হতে সমস্ত বস্তুর বা জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা নির্বিকল্প প্রজ্ঞারই উদাহরণ। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে কতটুকু অংশই বা আমরা দেখতে

* Discuss the Contributions of Pestalozzi in the development of Educational methods.

পাই। অথচ সে বিষয়ে আমাদের নির্বিকল্প প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন আছে এবং পর্যবেক্ষণই হচ্ছে সেই জ্ঞানলাভের ভিত্তি। পেষ্টালৎসী এই কারণেই শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষণ পদ্ধতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষণ পদ্ধতি 'How Gertrude teaches her Children' নামক পুস্তকে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি নিম্নলিখিত শিক্ষা পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

(১) পেষ্টালৎসীয় মতে সমস্ত শিক্ষার মূলে হচ্ছে পর্যবেক্ষণ বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি।

(২) হাতে কলমে শিক্ষার উপর পেষ্টালৎসী গুরুত্ব আরোপ করেন।

(৩) পেষ্টালৎসী আরোহী পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন।

(৪) Morf নামে পেষ্টালৎসীর একজন শিষ্য পেষ্টালৎসীর শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হল।

(ক) পর্যবেক্ষণ বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি সকল শিক্ষার মূলে।

(খ) ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা সংযুক্ত থাকবে।

(গ) শিশু এক সময় শেখে এর পরে সেই শেখা জিনিসেরই সমালোচনা করে।

(ঘ) শিশুর পরিণমনের প্রতি দৃষ্টি রেখে শিশুকে সরল হতে জটিল বিষয় শিক্ষা দিতে হবে।

(ঙ) শিশুর একটি বিষয় হজম করে নিতে সময় লাগে, অতএব নূতন বিষয় শিক্ষা দেবার পূর্বে কিছু সময় তাকে দিতে হবে, যাতে পুরাতন জিনিসটি ভাল করে শিখে তারই ভিত্তিতে নূতন বিষয় শিখতে অগ্রসর হতে পারে।

(চ) শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর কতকগুলি শক্তির বিকাশ সাধন করা।

(ছ) শিক্ষকের কাছে শিশুর ব্যক্তিত্ব মর্যাদা পাবে।

(জ) শিশু যাতে তার অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করতে পারে, তার সুযোগ দিতে হবে।

(ঝ) ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক ভালবাসার উপর স্থাপিত হবে। উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষণ পদ্ধতি রচিত হবে। এই হচ্ছে পেষ্টালৎসীর শিক্ষণ পদ্ধতির মূলকথা।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষণ পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান সম্মত হলেও, তা পরিপূর্ণ মর্যাদা সেযুগে কোন দেশেই পায় নি, পেষ্টালৎসীর নূতন শিক্ষণ পদ্ধতি ইউরোপে কোথাও বিশেষ ব্যাপক ভাবে চালু হয়নি। কারণ, শিক্ষণ পদ্ধতির কোন দোষ ত্রুটির জন্য নয়। সেই যুগই, তাঁর শিক্ষণপদ্ধিতর প্রসারে প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পেষ্টালৎসীর যুগ ছিল শিল্প বিপ্লবের যুগ। শিল্প-প্রসারের ফলে সাধারণ আক্ষরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির চাহিদা হল প্রচুর, নূতন শিক্ষাধারা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সময় আর কারও হয়ে উঠল না। ডঃ এনড্রুবেল সাহেবের (Dr. Andrew Bell) সর্দার পড়োর সাহায্যে আক্ষরিক শিক্ষাদান সকলে সমাদরে গ্রহণ করল। পেষ্টালৎসী প্রবর্তিত মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণপদ্ধতি অবহেলিত হয়ে পড়ে রইল।

হার্বার্টীয় শিক্ষণপদ্ধতি।*

হার্বার্টীয় শিক্ষণপদ্ধতি বুঝতে হলে শিশুর গ্রহণধর্মী মন ও মনের 'ভাবজট' সম্বন্ধে জানতে হবে। শিশুর গ্রহণধর্মী মন নিয়তই পরিপার্শ্ব হতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে চলেছে। একই প্রকারের অভিজ্ঞতা সমতুল অভিজ্ঞতা আহরণ করতে সক্ষম। এভাবে নানা ধরণের অভিজ্ঞতা আমাদের মনে জট পাকিয়ে যায় বলে হার্বার্টের ধারণা জন্মে। তাই তিনি apperceptive mass বা ভাবজটের কথা বলেছেন। তিনি বলেন যে সমধর্মী কতকগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মানুষের চেতনায় একটি মণ্ডলী সৃষ্টি করে থাকে। এগুলিই হচ্ছে মনের প্রাথমিক সঞ্চয়। এই পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করে মন নূতন অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করে থাকে। হার্বার্ট একে অন্বয়ীকরণ বলেছেন। হার্বার্টের শিক্ষণপদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে অন্বয়ীকরণ।

হার্বার্টের শিক্ষণপদ্ধতির পরের কথা হচ্ছে তাঁর আগ্রহ তত্ত্ব। হার্বার্টের শিক্ষণপদ্ধতি পরিকল্পনায় এটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। আগ্রহ সৃষ্টি না করলে পাঠদান সুফলপ্রদ হবে না। পেষ্টালৎসীর মত হার্বার্টও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার্থীর মনে যদি

* Discuss the Contributions of Herbart in the development of Educational methods.

যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকে, হার্বার্ট সেখানে ছবি, অনুকৃতি এবং অন্যান্য প্রদীপনের সাহায্যে আলোচনা করার কথা উল্লেখ করেছেন। হার্বার্ট বলেছেন যে শিক্ষাদানের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনে বহুমুখী আগ্রহের সৃষ্টি করতে হবে এবং এই বহুমুখী স্থায়ী আগ্রহ শিক্ষার্থীর মনে গড়ে তুলতে হবে।

✓হার্বার্টের 'ভাবগুচ্ছ' তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্তটি হচ্ছে তাঁর আগ্রহের তত্ত্ব।

বিষয়বস্তু নির্ধারণের পর সেই সব বিষয়বস্তু কি পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে হবে, সে বিষয়ে হার্বার্ট সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করেছেন। বিমূর্তভাবকে শ্রেণীপাঠনার উপযুক্ত কর্মপদ্ধতিতে রূপায়িত করে তোলার জন্য তিনি পাঠন ক্রিয়াকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। (ক) স্পষ্টতা, (খ) সংযোগ, (গ) যুক্তিসংগত ধারাবাহিকতা ও (ঘ) প্রয়োগের জন্য পদ্ধতি।

কিন্তু হার্বার্টে এই স্তরগুলিকে কার্যকরী করে তোলার পূর্বেই পরলোক গমন করেন। হার্বার্টর এই চারিটি সোপানকে পরে তাঁর শিষ্য জিলার (Ziller) সংশোধন করেন। জিলার স্পষ্টতাকে দুভাগে ভাগ করলেন—আয়োজন (Preparation) এবং উপস্থাপন (Presentation)। পরে রেন (Rein) তার সাথে কিছু সংযোজনা করেন। ফলে হার্বার্টের চারিটি সোপান পাঁচটি সোপানে রূপান্তরিত হয়। যথা—(ক) আয়োজন বা প্রস্তুতি (Preparation), (খ) উপস্থাপন (Presentation), (গ) তুলনাকরণ ও সংযোগ (Comparison and Association), (ঘ) সামান্যীকরণ (Generalisation), (ঙ) অভিযোজন (Application)।

(ক) আয়োজন বা প্রস্তুতি (Preparation)—এ অবস্থায় শিক্ষার্থীকে নূতন জ্ঞান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়। পূর্বে জানা আছে এমন কিছু বিষয়বস্তুর সাথে সংযোগ স্থাপন করে শিশুকে নূতন কিছু জানবার জন্য আগ্রহ সঞ্চার করা হয়।

(খ) উপস্থাপন (Presentation) এই স্তরে শিশুদের কাছে নূতন বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করা হয়।

(গ) তুলনাকরণ ও সংযোগ (Comparism and Association)—যখন বিষয়বস্তুটি শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্ট হয়ে এসেছে, সেই অবস্থায় শিক্ষক শিক্ষার্থী যে নূতন জ্ঞান লাভ করেছে তার সঙ্গে তার পূর্বার্জিত জ্ঞানের সঙ্গে

তুলনা করবেন এবং উভয়ের সংযোগ স্থাপন করবেন এবং সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করবেন। এই ভাবেই নূতন ও পুরাতন জ্ঞানের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়।

(ঘ) সামান্যীকরণ (Generalisation)—শিক্ষার্থীরা যে সব ধারণা লাভ করল, তার মধ্য থেকে তারা সাধারণ মৌলিক-তত্ত্ব বের করবে এবং সামান্য (General) সত্য গঠন করবে। শিক্ষক অবশ্য এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে সাহায্য করবেন।

(ঙ) অভিযোজন (Application)—শিক্ষার্থীরা মৌলিক-তত্ত্ব আহরণ করার পর তারা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে।

হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতির সমালোচনা।

হার্বার্টের পঞ্চসোপান সোপান পদ্ধতি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পৃথিবীর সর্বত্র এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ এই পঞ্চসোপান পদ্ধতির মূল্য অনেকটা কমে এসেছে। অনেক শিক্ষাবিদই একে নানা দিক থেকে সমালোচনা করেছেন।

প্রথমতঃ, শিক্ষাদান হচ্ছে একটি সাবলীল নিরবচ্ছিন্ন স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া। একে একই নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলা বিধেয় নয়।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণী-পাঠনার জন্য এত অল্প সময় নির্দিষ্ট থাকে, যে তার মধ্যে বিষয়টি পঞ্চসোপানে টুকরো টুকরো করে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীদের শেখান চলে না। তাই বর্তমান সময়ে অনেকে পঞ্চসোপানকে ভেঙ্গে তিনটি সোপানে পরিবর্তিত করেছেন—প্রস্তুতি, উপস্থাপন ও প্রয়োগ (Preparation, Presentation, Application)। এতে অবশ্য হার্বার্টের সোপানগুলোর কাঠামো বজায় রাখা হলেও হার্বার্টের শিক্ষাদান সম্পর্কিত মূল তত্ত্বটিকেই ছেটে ফেলা হয়েছে। শিক্ষার প্রধান সহায়ক হচ্ছে তুলনাকরণ ও সামান্যী-করণ। এই দুটি ছেটে ফেলে হার্বার্টের মূল তত্ত্বটিকেই অঙ্গহীন করা হয়েছে।

হার্বার্টের পঞ্চসোপানের সব চেয়ে বিরোধিতা করেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক জন ডিউই। ডিউইও শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে পঞ্চসোপানের অবতারণা করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে। প্রথম পার্থক্য, ডিউইর মধ্যে যে কর্ম সম্পাদন বা সক্রিয়তা আছে, তা হার্বার্টের মধ্যে নেই। দ্বিতীয়তঃ, ডিউইর শিক্ষণ পদ্ধতিতে সমস্যা থেকে কাজের শুরু, হার্বার্টের

পদ্ধতির ক্ষেত্রে তা নেই। তৃতীয়তঃ, ডিউইর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় তথ্য আহরণ করে ও সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু হার্বার্টের পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষকই পূর্বে আহরিত তথ্যের সাথে মিল রেখে শিক্ষার্থীদের তথ্য আহরণ করতে সাহায্য করেন।

ফ্রয়েবেল ও স্বয়ং-কর্মের পদ্ধতি। *

ফ্রয়েবেলকে রুশোর ভাবশিষ্য বলে মনে করতে পারি। কারণ রুশোর মত ফ্রয়েবেলও শিশুর শিক্ষা প্রকৃতি অনুযায়ী হবে বলে মনে করেন। রুশো নিজে বাস্তবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার তত্ত্বের কথা প্রতিপন্ন করেন নি। কিন্তু ফ্রয়েবেল নিজে শিশুদের সাথে কাজ করে দেখেছেন যে শিশুর স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশে কোনওরূপ বাধা সৃষ্টি করা অসমীচীন। তাছাড়া শিশুর পরিবেশকে এমন ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করে তুলতে হবে যাতে শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের বিকাশ হতে পারে। শিশুর মনে সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে, তার প্রচ্ছন্ন শক্তিগুলির বিকাশ যাতে ধীরে ধীরে হয়, তার ব্যবস্থা শিশুকে করে দিতে হবে।

ফ্রয়েবেল শিশুদের এমন সব ক্রমবর্ধমান কাজ ও খেলার কথা চিন্তা করছিলেন যাদের সাহায্যে শিশুর দেহ, মন, অন্তর ও বাহির, পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অবধান-ক্ষমতা, স্বয়ংক্রিয়তা ও আত্মবিকাশ সুষ্ঠুভাবে বর্ধিত হতে পারে। শিশুর স্বাভাবিক সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত জীবনের সমন্বিত সুপ্রকাশ যেভাবে সম্ভব, সেই ধারা ও ক্রমের মধ্য দিয়েই ফ্রয়েবেল তাঁর স্বয়ংক্রিয়তার শিক্ষণ পদ্ধতির প্রকাশ করেন। তাঁর সৃষ্ট Kindergarten (শিশূদ্যান) এর কর্মধারার মধ্যে ফ্রয়েবেলের নূতন শিক্ষণ পদ্ধতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

উপহার ও কাজ।

ফ্রয়েবেল তাঁর কিণ্ডারগার্টেনে পেষ্টালৎসীর বস্তুভিত্তিক পাঠের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন বস্তু হতে কয়েকটি বস্তুকে গ্রহণ করে তাদেরই অবলম্বনে তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যক্ত করেন। এই বস্তুগুলিকে সাধারণতঃ উপহার (Gift) ও কাজ (Occupation) নামে অভিহিত করা হয়।

ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেনের ক্রীড়া দ্রব্যের মধ্য হচ্ছে মুখ্য দ্রব্য তিনটি। একটি Sphere (গোলা), একটি Cube (ঘনক্ষেত্র), ও একটি Cylinder

* Write a short note on Froebel's Self-Activity.

(নলাকৃতি বস্তু),—এগুলিকে Gifts বলা হয়। গোলা নিয়ে শিশুরা গড়িয়ে দিতে পারে বা ছুঁড়তে পারে। কিউব হচ্ছে সমতল ও আটকোণ বিশিষ্ট বস্তু। কিউবগুলি দিয়ে শিশুরা কোনও কিছু তৈরি করতে পারে। ফ্রয়েবেল একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সর্বত্র বৈপরীত্যের মধ্যে একত্ব খুঁজে বেড়াতেন। এই কারণেই তিনি গতিসম্পন্ন গোলা বা Sphere এবং স্থিতি সম্পন্ন ঘনক্ষেত্র বা cubeএর মিলন ঘটিয়ে স্থিতি ও গতি এই উভয়ের সমন্বিত গুণসম্পন্ন নলাকার বস্তু বা Cylinder আমদানী করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপরীত্যের ধারণা দেওয়া একান্তই প্রয়োজনীয় বলে ফ্রয়েবেল মনে করতেন। তিনি মনে করেন যে বিভিন্ন ক্রীড়ণকগুলির রূপক শিশুজীবনের বাস্তব বিশ্লেষণে সাহায্য করে অর্থাৎ জীব ও জগতের মধ্যে বৈপরীত্যগুলির সমাধান করে ভগবানের একত্বকে উপলব্ধি করতে শিশু ধীরে ধীরে সক্ষম হয়।

উপহার হচ্ছে সর্বশুদ্ধ ৬টি, তাদের মধ্যে মূল হচ্ছে প্রথমে উল্লেখিত ৩টি। প্রথম তিনটি হতেই পরে আরও তিনটি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই ৬টি উপহারের সঙ্গে আরও কয়েকটি জিনিস যথা কাঠ, আংটি ত্রিকোণাকৃতি বা চতুষ্কোণাকৃতি বস্তু মিলিত হয়ে সর্বশুদ্ধ ৯টি উপহারে দাঁড়িয়েছে। শিশুরা এসব উপহারগুলি নিয়ে খেলবে এবং এই সক্রিয়তার ফলে বহু জিনিস শিখবে।

উপহার ছাড়া ফ্রয়েবেল কিছু কাজের (Occupations) নির্দেশও দিয়েছিলেন। সেগুলো, বালি, মাটি, কাগজ, কাঠ ইত্যাদি নিয়ে খেলা। তাছাড়া গান, ছড়া আবৃত্তিও আছে। ফ্রয়েবেলের শিষ্যগণের মধ্যে পরবর্তী-কালের শিষ্যগণ উপহারের চাইতে কাজের উপর বেশি গুরুত্ব দেন।

উপহার ও কাজের মাধ্যমে শিশুরা যে খেলা করবে, তার মধ্য দিয়ে শিশুদের সমাজধর্মী চেতনা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে বলে ফ্রয়েবেল মনে করতেন।

শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে ফ্রয়েবেলের অবদান।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষণ পদ্ধতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে সমালোচিত হতে পারে। কিন্তু তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি যত বেশি অনুসৃত হয়েছে, এমনটি কোন শিক্ষাবিদের ক্ষেত্রে হয় নি। শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সংক্ষেপে হচ্ছে তিনটি (১) কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি (২) খেলাভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি ও (৩) শিশুদের সক্রিয়তার পদ্ধতি।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষণ পদ্ধতি তাঁর দেশে যতটা সমাদর পায়নি, তার চেয়ে বেশি প্রসার লাভ করেছে আমেরিকায়।

ডাঃ মণ্টেসরির স্বয়ং-শিক্ষা। *

ডাঃ মণ্টেসরি যে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে শিক্ষণ পদ্ধতি রচনা করেছিলেন তা আলোচনা করা যেতে পারে।

১। প্রত্যেক শিশু অন্য একটি সমবয়স্ক শিশু হতে বিভিন্ন।

২। প্রত্যেক শিশুই তার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্নরূপ আচরণ করে।

৩। শিক্ষা শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।

৪। শিশুর জীবনের সম্ভাবনাকে বিকাশ করতে শিশুকে সুযোগ দিতে হলে তাকে স্বাধীনভাবে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করতে হবে।

৫। শিশুর সাবলীল আত্মপ্রকাশই হচ্ছে শিশুর স্বাধীনতার মূল কথা।

শিশুর স্বাধীন আত্মপ্রকাশের জন্য ডাঃ মণ্টেসরি কতকগুলি ডাইডাকটিক এ্যাপারাটাস (Didactic Apparatus) বা শিক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করেন। 'ডাইডাকটিক এ্যাপারাটাস' ডাঃ মণ্টেসরির শিক্ষণ পদ্ধতির বিশেষ অঙ্গ। তিনি এই শিক্ষোপকরণের সাহায্যে শিশুর স্বয়ংশিক্ষার (auto-education) ব্যবস্থা করেন। শিক্ষা সরঞ্জামগুলি এমনভাবে তৈরি যে শিশু ভুল করলেও সে নিজের তাগিদেই তা শুধরে নেবার সুযোগ পাবে।

ডাঃ মণ্টেসরি তাঁর শিক্ষণপদ্ধতিতে শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির উপযুক্ত ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু শিশুর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

মণ্টেসরি শিক্ষণ পদ্ধতির সমালোচনা অনেকে করেছেন। তাঁদের মধ্যে Kilpatrick, Stern, Sergius Hessen প্রভৃতি শিক্ষাবিদের নাম করা যেতে পারে। কিলপ্যাট্রিক মণ্টেসরির Practical exercisesগুলো মেনে নিতে পারেন নি। শিশুরা ড্রেসিং ফ্রেম নিয়ে কাজ করে থাকে,—কিলপ্যাট্রিক এই জাতীয় কাজকে জীবন-যাত্রার পরিপন্থী বলে বর্ণনা করেন। তাছাড়া শিক্ষা সরঞ্জাম নিয়ে যে সব কর্মের ব্যবস্থা আছে তা বুদ্ধিমান শিশুদের পক্ষে একান্তই সহজ বলে তিনি মনে করেন।

ডাঃ মণ্টেসরির প্রবর্তিত শিক্ষণ পদ্ধতিতে সবচেয়ে বড় আপত্তি হচ্ছে শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশের ব্যবস্থা নিয়ে। ডাঃ মণ্টেসরি শিশুর কল্পনাশক্তি

* Q. Write a short note on Montessori's Auto-Education.

বিকাশের দিক থেকে বিরোধিতা করেন। এ বিষয়ে তিনি রুশোর সাথে একমত। তাছাড়া তিনি হচ্ছেন স্বয়ংশিক্ষার পোষক। তিনি যদি কল্পনাশক্তির বিকাশের দিকে গুরুত্ব দেন, তাহলে প্রয়োজন হয় শিক্ষিকার ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ সাহায্য এবং তিনি যদি শিশুদের প্রত্যক্ষ সাহায্য করেন তাহলে শিশুদের স্বয়ংশিক্ষা ব্যাহত হবে। এই কারণে মণ্টেসরি পদ্ধতিতে কল্পনার রূপকথা স্থান পায় নি। কিন্তু মণ্টেসরির সমালোচকগণ মণ্টেসরির সাথে একমত নন। তাঁরা বলেন যে শিশুর কল্পনাশক্তি যদি খর্ব করা হয়, তাহলে শিশুর বিকাশ ব্যাহত হবে।

বিংশ শতাব্দীর নূতন শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্য।

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা জগতে মনোবিজ্ঞান প্রবেশ করে, ফলে শিক্ষণ পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন দেখা যায়।

প্রথমতঃ, নূতন শিক্ষাধারায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত গুরুত্বের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নূতন শিক্ষা, Adams এবং Dr. Stanby Hall-এর ভাষায় শিশু-কেন্দ্রিক। এর অর্থ হচ্ছে শিক্ষাধারায় শিশু হচ্ছে একজন সক্রিয় অংশীদার। ফলে শিক্ষণ পদ্ধতিও তারই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়। শিশু শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় তখনই সক্রিয় অংশীদার হতে পারে যখন সে তার স্বীয় কর্মকে প্রেরণা জোগায়, এবং তার প্রয়োজন ও শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তার শিক্ষার পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, নূতন শিক্ষণ পদ্ধতিতে কর্মের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একথা প্রথম নীতিরই পরিপূরক হিসেবে ধরা যেতে পারে।

নূতন শিক্ষাধারার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিশুর সাথে সমাজের যোগাযোগ।

নূতন শিক্ষাধারার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সহযোগিতা-মূলক কর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ। সহযোগিতামূলক কর্মের মধ্য দিয়েই শিশুদের সামাজিকতাবোধ জাগ্রত হতে পারে।

ডিউইর শিক্ষণ পদ্ধতি।*

(ক) আমেরিকার শিক্ষাবিদ জন ডিউয়ের মতে শিক্ষণ পদ্ধতির গোড়ার কথা হচ্ছে শিশু নিজে। তিনি মনে করেন যে শিশুর বাস্তব জীবন হতেই

* Q. Write a short note on Dewey's teaching methods.

শিক্ষা শুরু হবে। নূতন বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর আগ্রহ সঞ্চারিত করতে পারলে শিশু নিজের আগ্রহেই তা শিখবে। ডিউই নিম্নলিখিত সোপান অবলম্বন করে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। সোপানগুলি হচ্ছে—(১) সক্রিয়তা (Activity), (২) সমস্যা (Problem), (৩) তথ্য (Data), (৪) প্রকল্প (Hypothesis) এবং (৫) প্রকল্পের সত্যতা নিরূপণ (Verification)। ডিউই হার্বার্টীয় সোপানগুলিকে বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে শিশুর ভূমিকা আবিষ্কারকের।

সক্রিয়তামূলক কর্মের প্রধান সমর্থক হচ্ছেন ডিউই।

(খ) ডিউই কর্ম এবং জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিকে দাঁড় করিয়েছেন। শিক্ষক শিশুর কাছে সমস্যার আকারে কর্মসমূহ উপস্থাপিত করবেন। এবং তাতে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ উদ্রিক্ত হবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে বিদ্যালয়টি একটি গতিশীল সমাজ জীবনে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

(গ) জন ডিউই মনে করেন যে দুটি শিশু এক নয়। প্রত্যেক শিশুই নিজ নিজ ধারা অনুযায়ী শিক্ষালাভ করে ; অতএব তিনি স্বয়ংশিক্ষার (Self-Education) উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেন। তাছাড়া শিশুদেরও সৃজনমূলক শক্তির সম্ভাবনাও আছে। অতএব তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে সৃজনমূলক ক্ষমতার যাতে বিকাশ হয় তার ব্যবস্থাও রয়েছে।

(ঘ) জন ডিউই প্রবর্তিত শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project method) এবং প্রবলেম মেথড (Problem method) সর্বপ্রধান।

১। প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project method)।

প্রজেক্ট পদ্ধতি বা কার্যসমস্যা পদ্ধতি হচ্ছে বর্তমান প্রগতিশীল শিক্ষা পদ্ধতি-সমূহের মধ্যে অন্যতম। পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিশুর দৃষ্টিকোণ হতে দেখা হয়। প্রজেক্ট পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে ডিউইর শিক্ষাতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। প্রজেক্ট শব্দটির প্রয়োগ পূর্বে কৃষিবিদ্যা ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হত। কিন্তু ডিউইর শিষ্য কিলপ্যাট্রিক (Kilpatrick) ও ষ্টিভেনসনের (Stevension) হাতে এই পদ্ধতিটির পরিণতি ঘটে।

প্রজেক্ট পদ্ধতির সোপান।

কিলপ্যাট্রিকের মতে শিক্ষার্থীরা প্রজেক্টের ইউনিট স্থির করা থেকে কর্ম সম্পাদন পর্যন্ত সব প্রক্রিয়াতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে, তাদের উপর শিক্ষকের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া হবে না। শিক্ষকের স্থান প্রজেক্ট পদ্ধতিতে গৌণ। তিনি হিতৈষী বন্ধু ও পরিচালক মাত্র।

এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিক্ষার্থীদিগকে চারটি স্তরে কর্ম সম্পাদন করতে হবে।

(ক) কর্মের ইউনিট স্থির করা বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা (Purposing) ;

(খ) কর্মের পরিকল্পনা করা (Planning) ;

(গ) কর্ম সম্পাদন (Execution) ;

(ঘ) কর্মের শেষে বিচারকরণ ও সমালোচনা (Judgment)।

(ক) যোগ্য অবস্থার সৃষ্টি করে কর্মের ইউনিট স্থির করা ঃ

কিলপ্যাট্রিক ইউনিট স্থির করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষক কখনও কাজের ইউনিট স্থির করে দেবেন না। শিক্ষকের চাপিয়ে দেওয়া প্রজেক্টের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত মূল্য কিছু নেই। শিক্ষার্থীরা শিক্ষক থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমস্যা থেকে বেছে কর্মের ইউনিট স্থির করবে। শিক্ষক দেখবেন শিক্ষার্থীরা সমস্যাগুলি থেকে কোন কর্মের ইউনিট স্থির করতে পারে কিনা। সমস্যা স্থিরীকরণে শিক্ষক শিক্ষার্থীদিগকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছা শিশুদের উপর চাপিয়ে দেবেন না। শিক্ষার্থীরা জানবে সমস্যাটি তাদের এবং তারাই সমস্যাটি স্থির করেছে।

(খ) পরিকল্পনা করা—ইউনিটের পরিকল্পনা শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহযোগিতায়ই করবে। কিভাবে কোন কাজের সুপরিকল্পনা করতে হয়, তা শিক্ষার্থীরা নিজেরা পরিকল্পনা করতে গিয়েই শিখুক। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পরিকল্পনা গ্রহণে আলোচনা করতে বলবেন এবং পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য আলোচনাকালে তিনি নানা বিষয়ের উল্লেখ করবেন। সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা করা হলে কর্ম-সম্পাদনে শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবে।

(গ) কর্ম সম্পাদন—যেহেতু কর্মের পরিকল্পনা শিক্ষার্থীরা করেছে সেই হেতু কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা ভালভাবেই পাওয়া

যাবে, এ আশা করা অসঙ্গত নয়। শিক্ষার্থীকে হাতেকলমে কাজ করে এগিয়ে যেতে হবে এই হচ্ছে নীতি। শিক্ষকের স্থান এখানে গৌণ, অর্থাৎ তিনি পরিচালক এবং হিতৈষী বন্ধু মাত্র।

(ঘ) বিচার বা মূল্যায়ন—প্রতিদিন কর্মের শেষে, অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার মুখে প্রত্যেকটি দল প্রত্যেকটি দলের কাজ ভাল করে দেখবে এবং কাজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য সমালোচনা করবে। এই সমালোচনার ফলে দলগুলি নিজেদের ত্রুটিসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং পরের দিন কার্যকালে তাদের ত্রুটিগুলির কথা স্মরণ রেখে কর্মসমূহ যথাযথরূপে করতে চেষ্টিত হবে।

২। প্রব্লেম মেথড (Problem method)।

ডিউইর কর্মসমস্যা পদ্ধতি বা প্রজেক্ট মেথড ও সমস্যা পদ্ধতি বা প্রব্লেম মেথডের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে, যদিও বৈসাদৃশ্যও প্রচুর। প্রজেক্ট মেথডে বাস্তব অবস্থায় একটি সমস্যার কার্যকরী সমাধান বুঝতে পারা যায়। কিন্তু প্রব্লেম মেথডে প্রক্রিয়া অন্যরূপ। এখানে মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে। একমাত্র চিন্তনই হচ্ছে সমস্যা পদ্ধতির প্রক্রিয়ার সহায়। চিন্তনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হলে তা কতকগুলি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করতে হয়, সে কথা আমরা পূর্বেই জেনেছি। তবু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বললে প্রথমেই আসবে সমস্যার কথা। সমস্যাটি আসলে কি তা আমাদের জানতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, সমস্যাবিষয়ক নানারূপ তথ্য সংগ্রহ ; তৃতীয়তঃ, সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ; চতুর্থতঃ, প্রকল্পের সত্যতা নিরূপণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পঞ্চমতঃ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে আগমন। এই কয়টি স্তরের মধ্য দিয়ে এলেই সমস্যার পূর্ণ সমাধান হতে পারবে।

সমস্যা পদ্ধতি, ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ। সমস্যা পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ব্যবস্থা দু'ভাবে হতে পারে। প্রতিদিনের পাঠের বিষয়বস্তু কতকগুলো সমস্যামূলক প্রশ্নে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে রাখা যেতে পারে। এই সমস্যাগুলো শিক্ষার্থীরা সামান্য চেষ্টা করেই সমাধান করতে পারে।

অপরপক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমগ্র ইতিহাসের পাঠ্যসূচীকে অনেকগুলি সমস্যার আকারে রাখতে পারেন। সেই সমস্যাগুলো জেনে নিয়ে

শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহ, প্রকল্প প্রণয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রমাণীকরণ ইত্যাদি কাজ করতে পারে। চিন্তনের মধ্যে যুক্তিধারা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থী সমস্যার সমাধান, শিক্ষকের সহযোগিতায় করতে পারবে। এই হচ্ছে ডিউইর সমস্যা পদ্ধতির মূল কথা।

ইউনিট প্ল্যান (Unit Plan)।

বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে ইউনিট প্ল্যান পদ্ধতি ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করেছে। ইউনিট প্ল্যান কথাটি নানাভাবে বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে, যথা Units of work, Units of experience, Units of learning, Activity units ইত্যাদি। Unit plan কথাটি নূতন হলেও এর অন্তর্নিহিত অর্থ পুরাতন। হার্বার্টীয় পঞ্চসোপান পদ্ধতিতেও প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত একত্বের ভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিলপ্যাট্রিকের প্রজেক্ট মেথডেও এই একত্ববোধ পরিস্ফুট থাকলেও হেনরি মরিসন (Henry Morrison) হার্বার্টীয় শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি এবং কিলপ্যাট্রিকের শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতির মধ্যে একটি মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে ইউনিট প্ল্যান নাম দিয়ে বিষয়প্রধান এক পদ্ধতির অবতারণা করেছেন। মরিসনের মতে শিশুর পূর্বজ্ঞানের অবস্থা ভাল করে বিচার করে দেখা কর্তব্য এবং তারই উপর ভিত্তি করে নূতন বিষয়বস্তু শিশুকে শিক্ষাদান করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না শিশু শিক্ষার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে না পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ একই পদ্ধতি অবলম্বন করে তাকে শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হবে।

মরিসন ইউনিট প্ল্যানের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন।

(১) ইউনিটের একত্ব থাকবে। পাঠের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হবে না। ইউনিটে কতকগুলি পারস্পরিক সংযুক্ত এবং অর্থবোধক কার্যক্রম থাকবে (Series of related and meaningful activities)। এর অর্থই হচ্ছে পাঠে সমগ্রতাবোধের মালমসলা থাকবে।

(২) ইউনিট প্ল্যানে কাজের শুরু ও শেষের নির্দেশ থাকবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী উপলব্ধি করবে কোন স্থানে ঐ Unit plan সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর উদ্ভব ও কোথায় তার শেষ।

(৩) ইউনিট প্ল্যানে শিক্ষার্থী পথনির্দেশ পায়।

(৪) ইউনিট প্ল্যানে শিক্ষার্থীকে পূর্ণ উপলব্ধির পথে পরিচালিত করে।

(৫) ইউনিট প্ল্যানে শিক্ষামূলক কর্মগুলির গুরুত্বপূর্ণ মান বর্তমান। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতিতে দেখা যায় যে অনেক সময়ই কর্ম সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত হয় না। কিন্তু ইউনিট প্ল্যানে উদ্দেশ্যমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ কর্ম ব্যতিরেকে, অন্য কোন কর্মের স্থান নেই।

(৬) ইউনিটের প্রকৃতি হবে ব্যাপক।

(৭) ইউনিটের প্ল্যান মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখতে গিয়ে মরিসন নিম্নলিখিত কার্যক্রম বর্ণনা করেছেন :— (ক) মুখবন্ধ, (খ) উপস্থাপনা, (গ) উপলব্ধি, (ঘ) সংগঠন ও (ঙ) পুনরাবৃত্তি।

সমাজায়িত আবৃত্তি পদ্ধতি বা (Socialised Recitation techniques)।

গতানুগতিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানপদ্ধতিতে ছিল শিক্ষকদের প্রাধান্য। তারপর ধীরে ধীরে প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষকের সাথে সহযোগিতা করতে দেখা যায়। সমাজ উপযোগী করে শিক্ষাদান করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রজেক্ট পদ্ধতিকে ধরা যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষাদানের সমাজায়িত রূপকে সমাজায়িত আবৃত্তি পদ্ধতিতেই দেখতে পাওয়া যায় সব চেয়ে বেশি।

বর্তমান যুগের শিক্ষার গণতান্ত্রিক লক্ষ্য ও আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতির এই নূতনধারা প্রবর্তনে বিশেষ সাহায্য করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি ও স্বাধীনতা শিক্ষাকার্যকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করে ও উপলব্ধিতে সাহায্য করে, শ্রেণী ও শিক্ষকের সম্মুখে শিক্ষার্থীদের কিছু 'আবৃত্তি করবার' অর্থাৎ কিছু বলবার সুযোগ দেওয়া হয়। পরস্পর আলোচনার পথ দেখান হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের অভিব্যক্তি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে।

সমাজায়িত আবৃত্তি পদ্ধতির নানা ধরণের হতে পারে, যথা—(১) সেমিনার বা আলোচনা চক্র (Seminar), (২) প্যানেল ডিস্‌কাশন (Panel Discussion), (৩) সিমপোসিয়াম (Symposium), (৪) কর্মশালা পদ্ধতি (Workshop method) (৫) শিক্ষার্থীদের স্বয়ং-শাসনব্যবস্থা (Students' Self-Government) ইত্যাদি।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণপদ্ধতি (Individualised Instruction)।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অনেক শিক্ষাবিদ মনে করতে থাকেন যে যদিও ছাত্রছাত্রীরা আপাত দৃষ্টিতে দেখতে একই রকম বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত পার্থক্য রয়েছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মণ্টেসরি ছোট শিশুদের ব্যক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন। ১২ বৎসরের উপরের বয়সের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, ছোট শিশুদের মত, ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায় এবং তাদের জন্যও যদি ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তারাও উপকৃত হবে। এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিলেন হেলেন পার্কহার্স্ট (Helen Parkhurst)। আমেরিকার ম্যাসাচুসেট রাজ্যে ডালটন নামক স্থানে ব্যক্তিগত শিক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে হেলেন পার্কহার্স্ট বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার কার্য পরিচালনা করেন। সেই থেকেই ব্যক্তিগত শিক্ষার পরিকল্পনাটির নাম হয় ডালটন পরিকল্পনা বা প্রয়োগশালা পরিকল্পনা বা Laboratory Plan।

এই পরিকল্পনায় শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে সারা বৎসরে কতটা কাজ করতে হবে তা বুঝিয়ে দেন। প্রতি বিষয়ের সমগ্র কাজটি আবার কয়েকটি ভাগে বা ইউনিটে বিভক্ত করা হয়। ছাত্রছাত্রীদিগকে একসঙ্গে এক এক মাসের কাজ (assignment) নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং তাদের নিজের প্রচেষ্টায় কাজের ইউনিটগুলো শেষ করতে হয়। বলা বাহুল্য শিক্ষার্থীরা নিজেদের গ্রহণ করবার গতি অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত করে থাকে। বণ্টিত কাজগুলো সন্তোষজনক রূপে সম্পন্ন হলে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের নূতন কাজের ইউনিটের ভার প্রদান করেন। শিক্ষার্থীরা এরূপ অবস্থায় নিজেদের শক্তি, সামর্থ্য, কর্মপ্রবণতা অনুযায়ী কাজ করে যাবার স্বাধীনতা লাভ করে থাকে।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার সম্পর্কে আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিক্ষণ পদ্ধতি হল উইনেটকা প্ল্যান (Winnetka Plan) এই শিক্ষা পরিকল্পনাটি রচনা করেন Carl Washburne নামে একজন শিক্ষাবিদ। তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে উইনেটকা শহরের একটি বিদ্যালয়ে তাঁর পরিকল্পনাটি প্রয়োগ করেন। কার্ল ওয়াসবর্নও শ্রেণীগত শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন, তাই তিনি ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাঁর পরিকল্পনাটি রচনা করেন।

সকল ছাত্রছাত্রী একই গতিতে শিক্ষালাভ করতে পারে না বলে উইনেটকা পরিকল্পনায় অত্যাবশ্যক মূল বিষয়সমূহ শিশুর নিজ নিজ গতির হারে শিক্ষালাভ করবার ব্যবস্থা আছে। অত্যাবশ্যক মূল বিষয়সমূহ প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই অধিগত

করা বিশেষ প্রয়োজন। শ্রেণীগত শিক্ষায় সকলে একসাথে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আয়ত্ত করতে পারে না বলেই উইনেটকা পরিকল্পনা ব্যক্তিগত সমস্যাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে দেয়। শিক্ষার্থীরা ধাপে ধাপে স্তরে স্তরে শিক্ষালাভ করে এবং একটি অংশবিশেষ শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে সক্ষম না হলে পরের সংযুক্ত অংশকে শিক্ষালাভ করবার সুযোগ শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয় না। শিক্ষার্থীরা স্বীয় চেষ্টায় যাতে শিখতে পারে এমন সমস্ত স্বয়ং শোধনক্ষম নির্দেশ ও সূত্র শিক্ষার্থীদের দেওয়া থাকে।

উইনেটকা পরিকল্পনায় বিভিন্ন যৌথ কাজের সুযোগ রয়েছে। যৌথ কাজের সময় অপরাহ্নের শেষের দিকে। এসময় শিক্ষার্থীরা নানাবিধ যৌথ কাজ, যথা নাচগান গান, খেলাধূলা, আলোচনা, বিদ্যার্থী পরিষদের কাজ ইত্যাদি সম্পাদন করে।

এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের তাদের নিজেদের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার প্রচুর অবসর আছে।

পরিচালনাভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (Supervised Study)।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের পাঠে স্বাধীনতা দান, শিক্ষা প্রক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শ্রেণী শিক্ষায় সকল শিক্ষার্থী সমভাবে উপকৃত হয় না। শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে যতটুকু গ্রহণ করল, তার পরিপূরক হিসাবে স্বচেষ্টায় পাঠের ব্যবস্থা একান্তই প্রয়োজন। বর্তমান যুগে পরিপূরক হিসাবে গৃহ পাঠ প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ সঙ্কীর্ণ গৃহকোণ আর তার উপর লোকাধিক্য। তাই শিক্ষার্থীদিগকে বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ করে দিলে সুবিধা হয় বলে অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন। শিক্ষার্থীরা একজন শিক্ষকের উপস্থিতিতে পাঠাগারে কিংবা শ্রেণীকক্ষে নিজ নিজ গতি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে পড়বে, এবং প্রয়োজনবোধে শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করবে। এরূপ কর্ম পরিচালনায় সাংগঠনিক অসুবিধা আছে। কিন্তু সে অসুবিধা অনতিক্রম্য নয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যে সময়কাল থাকে, তা যদি একঘণ্টাকাল বর্ধিত করা যায়, তাহলে শিক্ষার্থীদের জন্য পরিচালনা-ভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থা করা সম্ভব। অবশ্য প্রতিদিন প্রত্যেকটি শিক্ষণীয় বিষয়ের জন্য পরিচালনাভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে না। সপ্তাহে একদিন এক ঘণ্টাকাল একটি বিষয়ের জন্য ব্যবস্থা করলেই শিক্ষার্থীরা স্বাধীন পাঠের প্রতি আগ্রহ অনুভব করতে শিক্ষালাভ করবে।

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষাদান সম্পর্কিত যুক্তিসম্মত ও মনস্তত্ত্বসম্মতপদ্ধতি সমূহ
(Logical and Psychological Methods) *

শিক্ষাদানকালে শিক্ষাদান পদ্ধতির গুরুত্ব খুবই বেশি। শিক্ষণ পদ্ধতি বলতে কি বুঝা যায় তা আমরা কিছুটা জেনেছি ও পরে আরও স্পষ্টভাবে জানতে চেষ্টা করব। এবিষয়ে দুটি বিষয় এসে যাচ্ছে, একটি হচ্ছে শিশুমন যা বিষয়বস্তু গ্রহণ করবে, আর একটি হচ্ছে বিষয়বস্তু। শিক্ষকের কাজ হচ্ছে এই দুইয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা।

মনের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে, একটি পুরাতন, এবং অপরটি হচ্ছে নূতন বা বর্তমান। পুরাতন মতবাদ অনুযায়ী মন বিভিন্ন শক্তির আধার, অর্থাৎ মনের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে। এই প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে কোন যোগাযোগ বর্তমান নেই। কিন্তু বর্তমান মতবাদ অনুযায়ী মনটি হচ্ছে একক এবং উহা প্রণালীবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ। এই মতবাদ অনুযায়ী মনের সমস্ত শক্তিগুলো একই সূত্রে আবদ্ধ এবং বিভিন্ন শক্তির বিকাশও একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। অতএব মন যদি সুসংবদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ হয়, তাহলে কোনও একটি বিষয় সম্পর্কিত খণ্ড খণ্ড জ্ঞানও প্রণালীবদ্ধ হতে হবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে নিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। ধরা যাক ফুলের কথা। ফুলের বিভিন্ন অংশ, তার রঙ, তার আকৃতি, গন্ধ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য আহরণ করা গেল। মন যদি প্রণালীবদ্ধ হয়, তাহলে ফুল সম্বন্ধে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানও প্রণালীবদ্ধ হতে হবে। ফুল সম্বন্ধে একটি একক ধারণা জন্মাবে। এ সমস্ত আলোচনা থেকে বলতে পারা যায় যে জ্ঞানের প্রকৃতি যদি সুসম্বদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ হয়, তাহলে শিক্ষণ পদ্ধতিও সুসম্বদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ হতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে শিশুর গ্রহণ ক্ষমতার উপরই নির্ভর করছে শিক্ষণ পদ্ধতি। এর ফলে দুটি পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে—একটি হচ্ছে যৌক্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি ও অপরটি হচ্ছে মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি। যৌক্তিক পদ্ধতি বিষয়বস্তুর প্রকৃতি উপর ভিত্তি করে যুক্তি নির্ভর। এই পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু যুক্তি ও

---

* Q. State the Significance of Logical and Psychological methods in Education.

পারম্পর্য রক্ষা করা সন্নিবেশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মনস্তত্ত্বনির্ভর শিক্ষণ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর পারম্পর্যের উপর গুরুত্ব না দিয়ে শিশু প্রকৃতির বৈশিষ্টগুলির উপর নির্ভর করেই শিশুর শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ যা গ্রহণে শিশু উন্মুখ তারই অবলম্বনে শিক্ষাদান পরিচালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতি প্রেরণা লাভ করেছে শিশু প্রকৃতি থেকেই।

এই দুটি পদ্ধতির স্বরূপ সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের Logic বা তর্কবিদ্যা এবং Psychology বা মনস্তত্ত্ব এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য ভাল ভাবেজানা প্রয়োজন। Logic বা তর্কবিদ্যা শব্দটির উৎপত্তি Logos থেকে, যার অর্থ হচ্ছে যুক্তি। সুতরাং যৌক্তিক পদ্ধতি শিশুমনের যুক্তি ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমান যুগে মনোবিদ্‌গণ বলছেন যে শিশুমন যুক্তিসম্মত ভাবে বিষয়বস্তুর পারম্পর্য রক্ষা করে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে মনস্তত্ত্ব সম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষক শিশুমনের উপর গুরুত্ব দেন। শিশুমন যা গ্রহণ করতে আগ্রহী, তাই শিশুমনের অনায়াসলব্ধ বিষয়বস্তু। এর পর শিশুর মন যখন পরিণমিত হবে, তখনই উহা যৌক্তিক পদ্ধতি অনুযায়ী বিষয়বস্তুর পারম্পর্য রক্ষা করে উহা গ্রহণ করতে সক্ষম।

তাছাড়া যুক্তিসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে যে চিন্তন প্রক্রিয়া আছে তা শিশুমন সহজে গ্রহণ করতে পারে না। অপরপক্ষে সর্ব সময়েই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় যুক্তিসম্মত প্রণালী অবলম্বন করেই মানুষ চিন্তা করে তাই নয়, সাধারণ হৃদয়গ্রাহী বিষয়বস্তু শিশুমনকে অনায়াসে আকর্ষণ করতে পারে। তাই যুক্তি ও তর্কের কচকচি শিশুমনের কাছে উপস্থাপিত না করে শিশুমনকে আলোড়িত করবার মত বিষয়বস্তু শিশুর মনের কাছে তুলে ধরাই বিধেয়।

দুটি পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্ক ভাল করে বিচার করে দেখতে গেলে দেখা যাবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যৌক্তিক শিক্ষণপদ্ধতিও মনস্তত্ত্বনির্ভর শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে বিরোধ বর্তমান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। একটি হচ্ছে অপরটির পরিপূরক। যাকে আমরা মনস্তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতি বলছি সেই সেই হচ্ছে অপরিণত শিক্ষার্থীদের পক্ষে যুক্তিনির্ভর কারণ যতটুকু শিশু তার বয়স, পরিণমন, আগ্রহ ও ঔৎসুক্য হতে গ্রহণ করতে পারবে, তার চেয়ে বেশী তাকে দেওয়া মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। অতএব উহা

যুক্তিনির্ভর বললেও অত্যুক্তি হয় না। পক্ষান্তরে যাকে বলছি যুক্তিনির্ভর তা হচ্ছে বয়স্কদের বা পরিণত শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্বনির্ভর।

কিন্তু যদিও উভয় পদ্ধতিই যুক্তি ও মনস্তত্ত্বনির্ভর তবু তারা একই অবস্থায় কার্যকরী নয়। মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতি হচ্ছে তাদেরই জন্য, যাদের মন এখনও অপরিণত অবস্থায় আছে এবং উহা পরিণত শিক্ষার্থী বা বয়স্ক, যাদের যুক্তিজ্ঞান বৃদ্ধি লাভ করেছে তাদের জন্য নয়। পরিণত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যৌক্তিক পদ্ধতিই বিশেষ কার্যকরী। যুক্তিসম্মত ও মনস্তত্ত্ব শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে বিরোধ একেবারেই নেই, বরং একটি অপরটির পরিপূরক। দুইয়ের সম্পর্ক আরও ভালভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করলে বলা যায় যে মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মন কি অবস্থায় রয়েছে তারই উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। পক্ষান্তরে যুক্তিসম্মত পদ্ধতি গুরুত্ব দিচ্ছে মনের সেই প্রকৃতির উপর যা ভবিষ্যতে হওয়া উচিত।

শিক্ষকের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষণ পদ্ধতি অনুযায়ী বিষয়বস্তু পরিবেশন করে শিক্ষার্থীর মনের উন্মেষ সাধন করা এবং তা করতে হলে শিশুর মনকে ধীরে ধীরে মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতি হতে সরিয়ে নিয়ে এনে যুক্তিসম্মত পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করে দেওয়া। যে স্থলে মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ প্রয়োজন সেস্থলে তা প্রয়োগ নিশ্চয়ই করতে হবে, কিন্তু ধীরে ধীরে তার পরিবর্তনও প্রয়োজন, না হলে শিক্ষার্থীর মন অসম্পূর্ণ ও ক্রটিবিশিষ্ট থেকে যাবে।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে বিষয়ের পারম্পর্যের কথা উল্লেখ করেছি। যুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু যুক্তির উপর নির্ভর করে সাজান। যেমন ভূগোল শিক্ষায় মহাদেশ, দেশ, প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, মহকুমা ইত্যাদি ভাবে বিষয়বস্তু সাজান থাকে। আবার মনস্তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতি অনুযায়ী আমরা স্থানীয় পরিবেশ ও স্থানীয় ভূগোল হতে আরম্ভ করে সমগ্রের দিকে অগ্রসর হতে পারি। দুইই যুক্তিনির্ভর। কিন্তু নিম্নস্তরে শিক্ষার্থী যে বিষয়বস্তু বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করে জানল এবং যার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী সমগ্রতার দিকে অগ্রসর হল, তা মনস্তত্ত্বনির্ভর, কারণ শিশুর মনের গঠন, শিশুর গ্রহণের ক্ষমতা, মনের গতি-প্রকৃতি, সব কিছু নির্ধারণ করে তবেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মনের এই স্বাভাবিক আকর্ষণের দিকে আমরা গুরুত্ব না দিয়ে যদি আমরা যুক্তিনির্ভর করেই ছোট শিশুদের জন্য পদ্ধতি গড়ে তুলি তাহলে শিক্ষণ পদ্ধতি হতে সার্থকতা লাভ করার সম্ভাবনা কম থাকে।

মনস্তত্বনির্ভর শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিশুদের মন ভারাক্রান্ত করে না। কারণ শিশুর মন যা আকর্ষণ করেছে বা করতে পারে, তারত অর্ধেক শিশুর শেখা হয়েই গেছে, কারণ সেই বিষয়বস্তু শেখবার জন্য শিশুর মন আকৃষ্ট হয়েছে এবং আকৃষ্ট হওয়ার কালেই কিছুটা উপলব্ধি তার হয়েছে। অপরপক্ষে আমরা পাঠ্যক্রমে যেভাবে বিষয়বস্তু যুক্তিনির্ভর করে সাজিয়েছি তা আমরা বয়স্ক দৃষ্টিভঙ্গী হতে ক্রমকঠিন হিসাবে সাজিয়েছি। কিন্তু তা শিক্ষার্থীর কাছে যৌক্তিকতাপূর্ণ নাও হতে পারে। যুক্তির দিকে থেকে বিচার করে দেখলে বাক্য শেখাবার পূর্বে বর্ণ ও শব্দ শেখান প্রয়োজন, কিন্তু আমরা বাস্তবক্ষেত্রে দেখতে পাই বাক্যের অর্থ শিশুদের সমগ্রভাবে উপলব্ধি হয় এবং বাক্য তারা তাড়াতাড়ি শিখে ফেলে। কারণ সেটাই তাদের কাছে মনস্তত্বসম্মত।

শিক্ষাদান কার্যে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিই হচ্ছে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। যে শিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয়, সেই পদ্ধতিই আমাদের অবলম্বন করা উচিত। যুক্তিসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি ও মনস্তত্বসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে কোন সময় নির্দেশক বা বস্তু নির্দেশক ভাগাভাগির চিহ্ন বর্তমান নেই, অতএব শিক্ষার্থীদের কাছে যা প্রকৃতিসম্মত, তাই তাদের কাছে মনস্তত্বসম্মত ও যুক্তিসম্মত। শিক্ষার্থীদের আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে, তাই হবে যুক্তিসম্মত, অযৌক্তিক কিছুই হবে না।

সংশ্লেষণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (Synthetic and Analytic method)।

কোন একটি বিষয়বস্তুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে পরে সেই অংশগুলিকে শিশুর কাছে উপস্থাপিত করে শিশুদের সেগুলো শেখানকে বলে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি বা Analytic Method।

পক্ষান্তরে কোনও বিষয়বস্তুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত না করে সমগ্রভাবে যদি শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করা যায় তা হলে তা হবে সংশ্লেষণমূলক পদ্ধতি বা Synthetic Method।

বিশ্লেষণমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করেছিল। শিক্ষকগণ মনে করতেন যে যদি বিষয়বস্তু ভালভাবে বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু উপলব্ধি

করতে অবিলম্বে সক্ষম হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, শিক্ষার্থীদের কবিতা পাঠদানকালে যদি শিক্ষক কবিতাটির বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে টুকরো টুকরো করে ব্যাখ্যা করে দেন, তা হলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে ঐ কবিতা বুঝতে পারা সহজ হবে। কিন্তু বর্তমান যুগে মনোবিজ্ঞানীরা অন্য কথা বলেন। বিশেষ করে গেষ্টাল্ট মতাবলম্বীরা বলেন বিশ্লেষণ না করে সামগ্রিক ধারণা দিলে কবিতাটির সমগ্র রূপ শিক্ষার্থীর কাছে ধরা পড়বে। তাঁদের মতে বিষয়বস্তুটি সমগ্রভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করলে তা শিক্ষার্থীদের উপলব্ধির সহায়ক হবে এবং বিজ্ঞানসম্মত হবে। অতএব সংশ্লেষণমূলক শিক্ষণ পদ্ধতির অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু সংশ্লেষণমূলক শিক্ষণপদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত বলে দাবী করলেও অনেক ক্ষেত্রে সমগ্র বিষয়বস্তু একসাথে শিক্ষার্থীর কাছে পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হয় না। ফলে বিষয়বস্তুটি সমগ্রভাবে উপস্থাপিত করবার পরও অংশগুলি সম্বন্ধে আলোচনাও প্রয়োজন হয়ে পড়ে, না হলে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু ভাল করে উপলব্ধি করতে পারে না। এই কারণে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ শিক্ষণ পদ্ধতি দুইয়েরই প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

———

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রেণী শিক্ষণ*

(Class teaching)

শিক্ষার সুরু হয়েছে মানব সভ্যতার সুরু থেকেই। আমরা পূর্বেই দেখেছি শিক্ষণ পদ্ধতি ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রগতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতিতে এসে পৌঁচেছে। প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে ও ব্রাহ্মণ্য যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে শিক্ষা ছিল ব্যক্তিমুখী। শ্রেণীগত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষার্থীকে একত্র করে পড়ান হত বটে, কিন্তু বর্তমান শ্রেণী শিক্ষণ যেরূপ ভাবে হয়ে থাকে, তেমনি অবস্থা তখন ছিল না। শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ছিল ভিন্ন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আলোচনাতে রত থাকতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণোত্তর যুগে অর্থাৎ বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধ শিক্ষার প্রচলনের সময় থেকে বিভিন্ন বিহারে, বিশেষ করে নালন্দা ও বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয়ে শ্রেণী শিক্ষণের সূচনা দেখা যেতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বহু ছাত্রের সমাবেশ হত এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে উপলব্ধি করতেন। বিহারগুলোর বাইরে গিয়েও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ গ্রামে গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। সেখানেও শ্রেণী শিক্ষণের ধারা কিছুটা দেখা যায়। এদিক থেকে বৌদ্ধ শিক্ষার অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান যুগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎস সেই বৌদ্ধ যুগে একথা বললে ভুল করা হবে না।

অন্যদিকে ধীরে ধীরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, সমাজব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হয়। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুরও আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য যুগে গুরুগৃহে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয়। আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য যুগে জাতিভেদ প্রথা এত বেশি কঠোর ছিল যে, সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার খুলে দেওয়া যায় নি। কিন্তু বৌদ্ধগণ জাতিভেদ প্রথা মানতেন না। তারা জনসাধারণের শিক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন এবং এদিকে শিক্ষার্থী সংখ্যাও খুব বেশি বৃদ্ধি পেয়ে গেল, ফলে ব্যক্তিগত শিক্ষার

---

* Q. Describe the origin and development of class teaching.

ব্যবস্থা আর স্থায়ী হয়ে রইল না। শ্রেণী শিক্ষণের জন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ধীরে ধীরে বেড়ে যায়। ফলে জন্ম নিল কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—বিদ্যালয়—সমাজ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ নান বলেছেন, "বিদ্যালয়ই হচ্ছে জাতির প্রাণশক্তির কেন্দ্র, যার প্রকৃত কাজ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শক্তি দৃঢ় করা, ঐতিহাসিক ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখা, অতীতের গৌরবকে বাঁচিয়ে রাখা, ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জিইয়ে রাখা। বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমেই সমগ্র জাতি, জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলকর শক্তিসমূহের উৎস কোথায়, সে সম্বন্ধে সচেতন হবে। দেশের মহাপুরুষগণ যে স্বপ্ন দেখে গিয়েছেন, সেই স্বপ্নের অংশ গ্রহণ করতে এইগুলিই দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করবে। তাদের আত্মসমালোচনার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে, স্বীয় আদর্শের সংশোধন এবং কর্মশক্তির পরিবর্তন ও পুনর্গঠন করবার শক্তি আনবে।"

এই হচ্ছে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উদ্দেশ্যের কথা নানের কথায় বিবৃত হল।

বিদ্যালয় কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত। অংশ হিসাবে শ্রেণী বিদ্যালয়ের আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে চলবে—এটি হোল শ্রেণী শিক্ষণের মূল তত্ত্বকথা।

শ্রেণী সংগঠন কিভাবে হবে*

বিদ্যালয়ের শ্রেণী বলতে মোটামুটি একই বয়সের এবং একই রূপ ধীসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বুঝে থাকি। এদের গ্রহণ করার ও শিখন শক্তি একই রূপ থাকবে বলে আমরা আশা করব। কারণ শ্রেণী পাঠনায় শিক্ষক সমগ্র শ্রেণীকে উদ্দেশ্য করে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বিবৃত করেন এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষার কাজে অগ্রসর হয়ে থাকেন। এ নীতির উপর নির্ভর করেই বিদ্যালয়ের সমগ্র ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাকে পাঠ্যক্রমের কাঠিন্যের পারম্পর্য রক্ষা করে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সারা বৎসর ধরে তাদের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে পাঠদান করা হয় এবং বৎসর শেষে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে

* Q. How are classes formed now a days ? Discuss why the teacher faces disadvantages in class teaching.

শিক্ষার্থীকে পরবর্তী উঁচু শ্রেণীতে উন্নীত করা অথবা সেই শ্রেণীতেই থাকতে বাধ্য করা হয়।

এই নীতি থেকে আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, শ্রেণী সংগঠনের মূলনীতি হচ্ছে মানসিক শক্তির সমতা ও বয়সের সমতা রক্ষা করা। প্রকৃত-পক্ষে সমজাতীয় দল সংগঠন করলে শ্রেণী শিক্ষণের বিশেষ সুবিধা হয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। মনোবিজ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি ব্যক্তিবৈষম্যের নীতি। প্রত্যেকটি শিশু অন্য একটি শিশুর থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ মানসিক বয়সের দিক থেকে দুটি শিশু এক হলেও, শিক্ষার গতি, প্রবণতা, আগ্রহ, ঔৎসুক্য, বংশানুক্রম, আবেষ্টনী ইত্যাদির দিক থেকে এক নয়। অতএব সমজাতীয় শ্রেণী গঠন হয়তো বা সম্ভব নয়। তাছাড়া সমাজ থেকে বহু ধরণের শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত হয়। তাদের নিয়ে সমজাতীয় দল গঠনের অসুবিধা আছে। ধরা যাক একই বয়সের এবং প্রায় একইরূপ বিষয় জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীতে ভর্তি হতে এল ; তাদের বুদ্ধি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে হয়তো যে তারা সমজাতীয় নয়। ব্যক্তিবৈষম্যের এই নীতি থেকেই দেখা যাচ্ছে যে যদি নির্বাচনে কঠিন বিধিনিষেধ আরোপ না করে প্রায় একই বয়সের শিক্ষার্থীদের ভর্তি করে নেওয়া যায় তাহলে শিক্ষার্থীদিগের বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা করলে ও বুধ্যঙ্ক বের করলে দেখা যাবে যে শিক্ষার্থীরা তিনটি স্তরে বিভক্ত হয়ে গেছে যথা—উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, ও অনগ্রসর। মানসিক স্তরে এই বৈষম্যের ফলে দেখা যায় শিক্ষার্থীরা শ্রেণী পাঠনায় সমভাবে অগ্রসর হতে পারছে না। যারা উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন তারা তাড়াতাড়ি শ্রেণীর পঠনীয় বিষয়বস্তু অধিগত করে এবং বেশী নম্বর পেয়ে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হয়ে থাকে। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও মোটামুটি নম্বর পেয়ে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হয়, কিন্তু অনগ্রসর বা স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ পরীক্ষায় পাশ করলেও কেউ কেউ পরীক্ষায় ফেলও করে থাকে।

শ্রেণী পাঠনায়ও নানারকম অসুবিধা দেখা যায়। শ্রেণীতে তিন রকমের শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষক কাদের লক্ষ্য করে প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তু বোঝাবেন? যারা সাধারণ বা average তাদের সংখ্যা মোটামুটি ৬৬%—৬৮%। অতএব শিক্ষককে এদের দিকে লক্ষ্য করেই পাঠদান করতে হচ্ছে। অথচ এতে উন্নত বুদ্ধিসম্পন্নগণ (১৬%) সন্তুষ্ট হতে পারছে না। ফলে তারা অমনোযোগী

হয়ে যাচ্ছে। যারা স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন (১৬%) তারা আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তবে যদি এমন বিদ্যালয় থাকে যেখানে কোনও এক স্তরে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী আছে, তাহলে শিক্ষার্থীদের উপর বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার প্রয়োগ করে তিনটি শাখার শ্রেণী সংগঠন চলতে পারে। তারও আবার অসুবিধা আছে। কারণ একই রকমের পাঠ্যক্রম যদি অবলম্বন করা যায় তাহলে 'ক' শাখার শিক্ষার্থীরা তাড়াতাড়ি সেটা আয়ত্ত করে ফেলবে, 'খ' শাখার শিক্ষার্থীরা সেটা মোটামুটি আয়ত্ত করবে আর 'গ' শাখার শিক্ষার্থীরা ঐ পাঠ্যক্রম যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারবে না। অথচ নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুযায়ী সকলকেই চলতে হবে। এছাড়া 'ক' শাখা (উন্নত), 'খ' শাখা (সাধারণ) এবং 'গ' শাখা স্বল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন এরূপভাবে শ্রেণী ভাগ করলে তা শিক্ষার্থীদের উপর প্রক্ষোভজনিত চাপও সৃষ্টি করতে পারে এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। 'খ' ও 'গ' শাখার শিক্ষার্থীদের মনে হীনমন্যতাবোধ জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 'ক' শাখার শিক্ষার্থীদের মনে পক্ষান্তরে এমন উচ্চ ধারণা জাগ্রত হয়, যার ফলে পরবর্তীকালে তারা পড়াশুনায় অবহেলা সুরু করে দিতে পারে।

তাছাড়া অনেক সময় অভিভাবকগণও এসে স্বীয় সন্তানকে 'ক' শাখায় পড়ার সুযোগ দেবার জন্য শিক্ষক মহাশয়দের অনুরোধ করেন কারণ তারা মনে করেন যে 'ক' শাখা উন্নত স্তরের এবং সেখানে উন্নত ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়। সবচেয়ে মুশকিল এই যে অভিভাবকগণকে এই জাতীয় শ্রেণী সংগঠনের উপকারিতা কিছুতেই বোঝান যাবে না। এ কারণে অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করতে সুরু করবেন। ফলে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার ঘটবে। বস্তুতঃ, এরূপ শ্রেণী সংগঠন পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান ও সামাজিক গতি প্রকৃতির পরিপন্থী।

শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠান যেতে পারে। এরূপভাবে সমস্যা সমাধানের নজির ডালটন ও উইনেটকা পরিকল্পনায় আছে। এই নীতি অবলম্বন করে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে কাজও হয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রমোশনের ব্যবস্থাও হয়েছিল। এক বিষয়ের প্রমোশন অন্য বিষয়ের উপর নির্ভর করত না। একটি ছেলে হয়ত পঞ্চম শ্রেণীতে সাহিত্য ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে

অঙ্ক শিখছে আবার তারই পাশে অপর একটি ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে সাহিত্য ও পঞ্চম শ্রেণীতে অঙ্ক কষছে। কিন্তু এরূপ কাজ আমেরিকার উইনেটকা নামক স্থানে চললেও বাংলাদেশে অচিরে পরিত্যক্ত হয়েছিল। কারণ সময়-পত্র, শিক্ষক ইত্যাদি নানাদিক থেকে সমস্যা দেখা যায়। আর তাছাড়া শিক্ষা যখন সামগ্রিক ব্যাপার, তখন শিক্ষার্থী কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তা স্থির করা এ ব্যবস্থায় যায় না।

কিন্তু শ্রেণী সংগঠনের এরূপ প্রথা কোন কোন স্থানে এখনও প্রচলিত আছে। এই প্রথাকে স্বাধীন প্রথা বা Free System বলা হয়। ডালটন প্ল্যানেও এরূপ স্বাধীন শ্রেণী সংগঠনের কাজ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে অসুবিধা হচ্ছে এই যে শিক্ষার্থী সেখানে সরাসরি শ্রেণী অনুযায়ী পাঠ গ্রহণ করে না, শিক্ষকগণও শিক্ষাদান করেন না। তাঁরা শিক্ষার্থীদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন মাত্র।

শ্রেণী সংগঠনের আর একটি প্রথা আছে তাকে বলে অপরিবর্তনীয় প্রথা বা Rigid System ; এই ধরণের শ্রেণী সংগঠনে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে প্রত্যেক বিষয়ে সমান পারদর্শিতা দেখিয়ে তবে উচ্চ শ্রেণীতে যেতে হয়। নির্ধারিত পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীকে পুরোপুরি শিখে নিতে হয়। এই পদ্ধতিতে উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন ও ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বিশেষ লাভবান হয় না। কারণ উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে সব বিষয়ে শুধু পাশ করলেই চলবে, তার চেয়ে উৎকর্ষতার চেষ্টা অপ্রয়োজনীয়, পক্ষান্তরে ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সব বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে সক্ষম নয় বলে হতাশায় জর্জরিত হয়ে থাকে, এগিয়ে যাবার জন্য প্রেরণাবোধ করে না। ফলে উভয় পক্ষ দ্বারাই শ্রেণীর শৃঙ্খলা অনেকাংশে ব্যাহত হয়। তাছাড়া অনেক সাধারণ বা avarage শিক্ষার্থী হয়ত কোন কোন বিষয়ে সমান পারদর্শিতা দেখাতে পারে না, তার জন্য তাকে উচ্চ শ্রেণীতে প্রমোশনও দেওয়া হয় না। এর ফলে শিক্ষার্থীর মনে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিরক্তি জন্মে থাকে।

শ্রেণী সংগঠনের আর একটি প্রথা হচ্ছে মিশ্র প্রথা বা Mixed System। এই ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীরা সাধারণ বিষয়গুলি একই সাথে পড়ে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয় যথা ইংরেজি, সাহিত্য, অঙ্ক প্রভৃতি বিষয় তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন উপশ্রেণীতে পড়ে থাকে।

অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের এ ব্যবস্থায় বিশেষ উপকার হয়। ফলে তারা বৎসর-শেষে সাফল্য অর্জনও করে থাকে।

শ্রেণী শিক্ষণের সুবিধা।*

শ্রেণী শিক্ষণের কতকগুলি সুবিধা আছে। সেগুলি হ'ল—

(ক) শ্রেণী শিক্ষণে শিক্ষক এক সাথে অনেক ছাত্র-ছাত্রী যথা ৩০।৪০ জনকে শিক্ষাদান করতে পারেন। ফলে একটি বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে শিক্ষাদান করা সম্ভব। ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষক-শিক্ষিকার যে পরিশ্রম করতে হয়, শ্রেণী শিক্ষণে সে জাতীয় পরিশ্রম তাঁদের করতে হয় না।

(খ) ব্যক্তিমুখী শিক্ষায় যত শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন হয় শ্রেণী শিক্ষণে তত শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া শিক্ষা সরঞ্জাম, সাজ-সজ্জা ও শিক্ষোপকরণও কম লাগে। ফলে অনেক কম ব্যয়ে, অল্পসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব।

(গ) শ্রেণী শিক্ষণে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করে। দলগত আলোচনা ও সক্রিয়তা শিক্ষার্থীদের মানসিক উন্নয়নে সাহায্য করে, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হয়। পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে অগ্রসর হলে শিক্ষার্থীদের সামাজিক দিকের বিকাশ হয় এবং শিক্ষার্থীর যদি কোন প্রাক্ষোভিক জট থাকে, তবে সেই জটের অবলুপ্তি ঘটে। শ্রেণী শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যৌথ বা দলগতভাবে কাজ করে। ফলে তাদের মধ্যে সহযোগিতা, সহানুভূতি ও স্বার্থহীনতাবোধ ইত্যাদি জাগ্রত হয় এবং সেই সব গুণগুলির প্রকাশ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

(ঘ) শ্রেণী শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে যে সহযোগিতার সুযোগ আছে, তার ফলে শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সকলেই লাভবান হতে পারে। একটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ধরা গেল কোনও একটি কাজে একজন শিক্ষার্থী দক্ষতা অর্জন করেছে, সে সেই বিষয়ে শ্রেণীর অপর শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে পারে। পক্ষান্তরে সে যদি কোন তত্ত্ব-বিষয়ে অনগ্রসর হয়, তাহলে অপরের সাহায্যে সে তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করতে পারে। এরূপ পারস্পরিক সাহায্যের ফলে শ্রেণীর সকলেই উপকৃত হয়ে থাকে।

*Q. What are the merits of class teaching ?

(ঙ) শ্রেণী শিক্ষণে বিভিন্ন ধরণের যৌথ কার্যাবলী যথা অভিনয়, বক্তৃতা, বিতর্ক, খেলাধূলা ইত্যাদি ব্যবস্থা করা সম্ভব। এই জাতীয় কাজ সমাজাশ্রিত কাজ, ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক গুণাবলী দৃষ্ট হয়।

(চ) শ্রেণী শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহ সঞ্চার করা বেশি সহজ। কারণ দেখা গিয়েছে যে শ্রেণী শিক্ষণে উৎসাহবোধটা অনেকটা সংক্রামক। ব্যক্তিমুখী শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করে। একে জানে না, অপরে কি করছে। ফলে একজনের আগ্রহ অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে না। কিন্তু শ্রেণী শিক্ষণে শ্রেণীতে উদ্দীপনা ও উৎসাহ সৃষ্টি করা সম্ভব।

(ছ) শ্রেণী শিক্ষণে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীর শৃঙ্খলা রক্ষায় অগ্রণী হতে পারে। শ্রেণীতে গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী স্বায়ত্ত-শাসন চলা সম্ভব এবং ছাত্রছাত্রীরা সেখানে প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। শ্রেণী শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চেষ্টিত হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সুনাগরিকরূপে গড়ে উঠবে।

(জ) শ্রেণী শিক্ষণে রসানুভূতিমূলক পাঠের সুবিধা সবচেয়ে বেশি। শিক্ষক শ্রেণীতে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবেগ সঞ্চার করে, পাঠটি রসাভিষিক্ত করে তুলতে পারেন। এরূপ সম্ভব শুধু শ্রেণীতেই, ব্যক্তিমুখীন শিক্ষায় নয়।

(ঝ) শ্রেণী শিক্ষণে অভিজ্ঞ ও কৃতী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণই অংশ গ্রহণ করেন। ব্যক্তিমুখী শিক্ষায় বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করে থাকেন, ফলে কোন শিক্ষার্থী অভিজ্ঞ ও কৃতী শিক্ষকের সাহায্য পায় আবার কেউ সে সুযোগ পায় না। শ্রেণী শিক্ষণে সে অসুবিধার কোন ভয় নেই।

(ঞ) শ্রেণী শিক্ষণ পদ্ধতিতে শ্রেণীতে জাতি, ধর্ম, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে শিক্ষার্থীরা সমবেত হয়। ফলে তাদের মধ্যে একাত্মবোধ গড়ে ওঠে, তাদের মন সংস্কারমুক্ত ও উদার হয়।

শ্রেণী শিক্ষণের অসুবিধা। *

শ্রেণী শিক্ষণের কতকগুলি সুবিধা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলে শ্রেণী শিক্ষণের অসুবিধা যে নেই তা নয়। যেমন—

* Q. What are the demerits of class teaching ?

(ক) শ্রেণী শিক্ষণে ধরে নেওয়া হয় যে শিক্ষার্থীরা প্রায় সমপর্যায়ের এবং তারই ফলে শিক্ষক শ্রেণী শিক্ষণে সমগ্র শ্রেণীকে লক্ষ্য করে শিক্ষাদান করে থাকেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কি দেখা যায়? বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যক্তি বৈষম্য। কোনও একটি শিক্ষার্থী অপর একজন শিক্ষার্থীর মত নয়। মানসিক গঠন ও বৌদ্ধিক বিকাশের দিক থেকে একই রকম শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না। শ্রেণীতে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষক কোন জাতীয় শিক্ষার্থীদের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদান করবেন? এইটি হচ্ছে মুখ্য প্রশ্ন। অতএব এদিক থেকে শ্রেণী শিক্ষণের অসুবিধা খুব বেশী।

(খ) শ্রেণীতে সাধারণতঃ তিন স্তরের শিক্ষার্থী থাকে—উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও অনগ্রসর। শিক্ষক সাধারণতঃ পাঠদানের মান নির্ণয় করেন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দিক থেকে কারণ শ্রেণীতে তাদের সংখ্যা অর্ধেকের অনেক বেশি। ফলে উন্নত বুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষার্থী ও অনগ্রসর শিক্ষার্থী উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উন্নত বুদ্ধি-সম্পন্নদের কাছে পাঠের মান নিম্ন ধরণের ফলে তারা এই পাঠ থেকে উপকৃত হয় না। পক্ষান্তরে অনগ্রসরদের জন্য এই পাঠের মান উচ্চ, ফলে তারা এ ধরণের পাঠদান থেকে খুব কমই লাভবান হতে পারে।

(গ) শ্রেণী শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সামর্থ্য, দৃষ্টিকোণ ইত্যাদির দিক থেকে বিবেচনা করে পাঠদান করা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয় না।

(ঘ) শ্রেণী শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার দাবী অনেক শিক্ষাবিদ মানেন না। তাঁরা মনে করেন যে শ্রেণী শিক্ষণে প্রতি-যোগিতার মনোভাব জাগ্রত হয়।

(ঙ) বেশী শিক্ষার্থী যদি একটি শ্রেণীতে পাঠ গ্রহণ করে তাহলে শ্রেণী শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

(চ) শ্রেণী শিক্ষণে একটি বড় অসুবিধা হচ্ছে এই যে, যে শিক্ষার্থী শ্রমবিমুখ, সে অনায়াসে শিক্ষকের দৃষ্টি থেকে সরে থাকবার সুযোগ পায়।

(ছ) শ্রেণী শিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর উপর একইরূপ মনোযোগ দিতে পারেন না। ফলে তিনি শিক্ষার্থীদের উপর তাঁর চারিত্রিক প্রভাবও বিস্তার করতে সক্ষম হন না।

(জ) শ্রেণী শিক্ষণে বহু শিক্ষার্থী এক সাথে পাঠ গ্রহণ করে, ফলে শ্রেণী-কক্ষের আলো-বাতাস সকলে সমানভাবে ভোগ করতে পারে না।

(ঝ) শ্রেণীতে বেশি শিক্ষার্থী থাকার দরুণ শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে কতটা সম্ভাবনা রয়েছে, এবং কোন কাজে কে কি রকম দক্ষ তা সহজে স্থির করতে পারেন না।

পাঠদান কালে শৃঙ্খলারক্ষায় শিক্ষকের দায়িত্ব।*

শ্রেণী শিক্ষণে শ্রেণীর শৃঙ্খলা রক্ষা করা একান্তই আবশ্যক। শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বজায় না থাকলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের পাঠদান থেকে কোনও রূপ উপকৃত হবে না। শ্রেণীর মধ্যে যদি সুপরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, তাহলেই শ্রেণী শৃঙ্খলা বজায় থাকতে পারে।

সুপরিবেশ বলতে কি বোঝা যায়? শ্রেণীর সুপরিবেশ বলতে আমরা দুটি দিক হতে বিষয়টি আলোচনা করতে পারি। প্রথমটি হচ্ছে পরিবেশের স্বাভাবিক আনন্দময় বৈশিষ্ট্য, অপরটি হচ্ছে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষণ পদ্ধতি।

শ্রেণীকক্ষে স্বাভাবিক আনন্দময় বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা অতি গরম, অতি ঠাণ্ডা, অধিক বাতাস ইত্যাদি দ্বারা যাতে বিপর্যস্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেদিকে অসুবিধা থাকলে শ্রেণীশৃঙ্খলা ব্যাহত হবে এবং শিক্ষাদানও সুফলপ্রসূ হতে পারবে না। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির কথা ধরা যাক না কেন। সেইসব বিদ্যালয়ে প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীকক্ষ নেই, আছে চারদিকে ঘোরান বারান্দা। বারান্দাতে শ্রেণীর কাজ চলে। আর আছে একটি কাতাই ঘর। সেখানেও কোন কোন ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণী বসে। বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে শিক্ষার্থীদের বারান্দায় বসা নানাদিক থেকে অসুবিধাজনক এবং তাতে শ্রেণীশৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। তা ছাড়া কোনও কোনও বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ যদিও থাকে যেখানে স্থানের অপ্রতুলতা, আলো-বাতাসের অভাব শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে তোলে। ফলে শ্রেণীশৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। অতএব শ্রেণীকক্ষের স্বাভাবিক পরিবেশ যাতে শ্রেণী শিক্ষণের অনুকূল হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষকের দায়িত্ব এখানে সীমিত। তিনি প্রাকৃতিক

---

*Q. Write a note on the responsiblity of the teacher in maintaining discipline in class teaching.

অসুবিধাগুলি দূর করতে পারেন না। কিন্তু শ্রেণীবিন্যাসের জন্য শ্রেণীতে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, তিনি সেদিকে দৃষ্টি দিতে পারেন এবং শ্রেণীবিন্যাস যথোপযুক্ত করতে পারেন।

সুপরিবেশের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষণ পদ্ধতি। প্রথমে ব্যক্তিত্বের কথাই ধরা যাক। শিক্ষককে কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে। তার মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক তাঁর চরিত্রের প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপর বিস্তার করবেন এবং 'আপনি আচরি ধর্ম, পরেরে শিখায়', এই কথা মনে রেখে শিক্ষককে নানা সদ্‌গুণের অধিকারী হতে হবে এবং আচার-আচরণে যথেষ্ট মার্জিত ও সৌজন্যপূর্ণ হতে হবে। তা হলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকেই শিখবে অভিনিবেশ, একাগ্রতা, বিনয়, নম্র ব্যবহার ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি এসব গুণ জাগ্রত হয়, তাহলে শ্রেণীশৃঙ্খলা সহজেই রক্ষিত হবে। শিক্ষক শ্রেণীশৃঙ্খলা স্থাপনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করে স্বায়ত-শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করবেন। শিক্ষার্থীদের উপরই বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব থাকবে। এরূপ স্বায়ত্ব-শাসন প্রথা অবলম্বনের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং শ্রেণীশৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

শ্রেণীশৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হতে পারে তখনই, যখন শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের উপর বিশ্বাস হারায়। শিক্ষক যদি বিষয়বস্তুতে ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে বিশেষভাবে পারদর্শী না হন তা হলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। অতএব প্রথমে শিক্ষক পঠনীয় বিষয়বস্তু ভাল করে আয়ত্ত করে তবে শ্রেণীকক্ষে যাবেন। কোন বিষয়ে তাঁর যেন কোন দ্বিধা না থাকে এরূপভাবে শিক্ষক বিষয়বস্তু অধিগত করবেন।

তা ছাড়া শিক্ষক যে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদিগকে পরিবেশন করবেন, তা পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকমহাশয় বিষয়বস্তু ভালভাবে জানতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি এলোমেলো ভাবে পড়িয়ে যান, তা হলে শিক্ষার্থীদের মনে বিভ্রান্তি আসবে, তখন তারা শ্রেণীশৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে। ধরা যাক, একজন শিক্ষক বেশ ভালভাবে পঠনীয় বিষয়বস্তু নিজের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি যদি মাঝে মাঝে শ্রেণীকে প্রশ্ন না করেন, তা হলে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকের সব কথা ভালভাবে বুঝতে পারবে না, শিক্ষককে ভাল করে অনুসরণ করতে পারবে না, ফলে তারা অন্যমনস্ক

হবে এবং তাদের মধ্যে অধৈর্যভাবে দেখা যাবে; এতে শ্রেণীশৃঙ্খলা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা।

অপরদিকে শ্রেণী পাঠনা ছাত্র ও শিক্ষকের সহযোগিতায় পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে যদি সমঝোতা না থাকে তা হলে শিক্ষার্থীদের বিচিত্রধর্মী মন পঠনীয় বিষয়বস্তু হতে দূরে সরে যাবে এবং শ্রেণীশৃঙ্খলা নষ্ট হবে।[১]

শ্রেণী শিক্ষণে শুধু তাত্ত্বিক দিকে সমাজায়িত আবৃত্তি (Socialised recitation) নয়, কর্মের মধ্যেও সমাজায়িত কর্মের বন্দোবস্ত করতে হবে। সমাজায়িত আবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা, সুবিবেচনা, ভদ্রতা, কোমলতা সৌহার্দ্য ইত্যাদি গুণের অধিকারী হতে পারবে।

সমস্তই নির্ভর করছে শিক্ষকের উপর, শিক্ষক যে ভাবে পরিবেশ রচনা করবেন এবং শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করবেন, শ্রেণীশৃঙ্খলার রূপ তার উপরই রচিত হবে।

শ্রেণীতে সাধারণতঃ তিন রকমের শিক্ষার্থী থাকে, তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। শিক্ষক সাধারণতঃ সাধারণ বা average শিক্ষার্থীদের দিকে লক্ষ্য করে পাঠদান করেন। এতে উচ্চস্তর ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীরা লাভবান হয় না। শুধু যে লাভবান হয় না, তা নয়, তারা শ্রেণী শৃঙ্খলাও নষ্ট করতে পারে। যারা উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন তাদের কাছে শ্রেণীর পঠিতব্য বিষয় জানা, অতএব তারা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে না, এ ওর সাথে কথা বলবে, খুনসুটি করবে, ইত্যাদি। যারা অনগ্রসর তারা ত কিছুই বুঝবে না এবং ফলে তারাও গণ্ডগোল সৃষ্টি করবে। এমতাবস্থায় শিক্ষক সাধারণদের কিছু কাজ দিয়ে উচ্চস্তর ও অনগ্রসরদের সাহায্য করতে পারেন। এর ফলে শ্রেণীশৃঙ্খলা ব্যাহত হবে না।

———

১। **Bossing** :—There should be definite rules adopted, with full cooperation and understanding on the part of the class, governing the relation of student to teacher and student to student in class discussion and other forms of class participation.

পঞ্চম অধ্যায়
ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি*
(Individualised Instruction)

মামুলি শিক্ষার একটি বিশেষ ত্রুটি হচ্ছে সমস্ত শিক্ষার্থীকে একই ছাঁচে ঢেলে সাজানর চেষ্টা। কিন্তু আমরা পূর্বেই জেনেছি শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য রয়েছে। বৌদ্ধিক পার্থক্য ত আছেই, তাছাড়া আছে শারীরিক শক্তির ক্ষেত্রেও পার্থক্য। অতএব সব শিশুই যে একই মামুলি পুস্তকাশ্রয়ী শিক্ষণ পদ্ধতি দ্বারা উপকৃত হবে, এমন কোন কথা নেই। কিন্তু প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই কর্মচঞ্চলতা ও কর্মপ্রবণতা আছেই। তাদের মধ্যে কর্মপ্রবণতা কম বেশি হারে থাকবে একথা মনস্তত্ত্বসম্মত। বৌদ্ধিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল শিশুকে একটি অবিমিশ্র দল হিসাবে গণ্য করে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার থেকে সবাই সমানভাবে লাভবান হতে পারে না। এমন কি কোন কোন শিশু যান্ত্রিকতার চাপে পড়ে জীবনে পিছিয়ে পড়ে। এই কারণেই শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে শিক্ষাদান করা প্রয়োজন। তা করতে হলে ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা এসে পড়ে।

শুধু যে শিশুরা স্বাভাবিক কর্মক্ষমতার পার্থক্য দেখায় তা নয়, তারা প্রতিন্যাসেও সেই পার্থক্য দেখিয়ে থাকে। প্রতিদিনকার শারীরিক অবস্থার ভিত্তিতে, অর্থাৎ শারীরিক সুস্থতা-অসুস্থতার জন্য শিশুতে শিশুতে পার্থক্য বৃদ্ধি পেয়েই চলে। কোন একটি শিশু যদি শারীরিক অসুস্থতার জন্য কিছু দিনের জন্য বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে, তার বিদ্যালয়ে প্রত্যাগমনের পর, সে বিদ্যালয়ে পাঠের গতির সঙ্গে সমতা রাখতে পারছে না, সে পিছিয়ে পড়ছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষণব্যবস্থা এমনই ত্রুটিপূর্ণ যে শিক্ষার্থীকে নিজের গতি অনুযায়ী ফাঁকগুলি পূরণ করিয়ে দেবার মত কোন সুব্যবস্থাই নেই। অতএব ব্যক্তিগত শিক্ষাদান একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিশুদের মধ্যে বুদ্ধিগত পার্থক্য দেখা যায় একথা আমরা জানি। বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা (Intelligence tests) প্রয়োগ করে শিশুদের বুদ্ধিগত

* Q. Write a note on Individualised Instruction.

পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। বুধ্যঙ্ক (I. Q.) হিসাবে ভাগ করলে দেখা যাবে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের বুধ্যঙ্ক হচ্ছে ৯০ হতে ১১০ পর্যন্ত। আর যারা উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন তাদের বুধ্যঙ্ক হচ্ছে ১১০ হতে ১৪০ বা কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে তারও বেশি। আর যারা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন তাদের বুধ্যঙ্ক হচ্ছে ৯০ এর নীচে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তিন স্তরের বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের এক সাথে শিক্ষাদান করা চলতে পারে না। যে কোন একটি স্তরকে লক্ষ্য করে শিক্ষাদান করলে অপর দুটি স্তর বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই জন্তই প্রয়োজন ব্যক্তিগত শিক্ষার।

বিভিন্ন শক্তি সম্পর্কিত পার্থক্য।

মানসিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে শুধু নয়, বিভিন্ন শক্তি সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। কোন শিক্ষার্থীকে দেখা গেল যে যন্ত্রমূলক শিক্ষা গ্রহণে বিশেষ পারদর্শী, আবার কোনও শিক্ষার্থী বা চারুশিল্পে বেশী দক্ষ, আবার আর একজনকে দেখা গেল সে ভাষায় বেশী দক্ষ। অতএব সকলকে একই ছাঁচে ফেলে শিক্ষা দেওয়া অর্থহীন এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষে ক্ষতিকর। বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিভিন্ন ধরণের হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রবণতা জনিত পার্থক্য।

শিক্ষার্থীরা যে বুদ্ধির দিক থেকে এবং বিভিন্ন শক্তির দিক থেকে একে অন্তের থেকে পৃথক তাই নয়, তাদের মধ্যে প্রবণতা ও আগ্রহের ক্ষেত্রেও পার্থক্য দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায় তারা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিভিন্নতা প্রদর্শন করে। তাছাড়া কর্মজীবনেও ব্যক্তির প্রবণতা ও আগ্রহ তার জীবনকে সাফল্যের দুয়ারে পৌঁছে দেয়। শিক্ষার্থীর জীবনে প্রবণতা ও আগ্রহ কোন বিষয়ে দেখা দিলেই শিক্ষার্থীর কর্মক্ষমতা সেই দিকে বেড়ে যায়। আবার দেখা যায় কোন একটি কাজ করতে করতে, সেই কাজের উপর শিক্ষার্থীর মমত্ববোধ বৃদ্ধি পায় এবং সে কাজে দক্ষতা অর্জন করে।

সে যাহোক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে একে অন্ত থেকে নানাভাবে পৃথক, সে বিষয়ে আলোচিত হ'ল এবং তাদের সকলকে একই ছাঁচে শিক্ষা দেওয়া

কোনওভাবে বিধেয় নয়। অতএব ব্যক্তিবৈষম্যের নীতির উপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শক্তির প্রতি পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে আমাদের শিক্ষাদান ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে।

ব্যক্তি বৈষম্যের নীতি ও ইউনিট ভিত্তিক পাঠ-পরিকল্পনা

ব্যক্তি বৈষম্যের নীতি অনুযায়ী শ্রেণী শিক্ষণ যে শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত নয় তা দেখা গেল। তা হলে এমন শিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে যে শিক্ষার্থী তার দ্বারা উপযুক্তভাবে উপকৃত হয় অর্থাৎ শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন হয় এবং বিভিন্ন স্তরের মানসিক বুদ্ধিসম্পন্ন বা বিভিন্ন ধরণের শক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ গতি অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। একে ইউনিট ভিত্তিক পাঠ-পরিকল্পনা বা Unit assignment plansও বলা হয়। পাঠ-এককের বিভিন্ন অংশগুলি বিচ্ছিন্ন নয় এবং এগুলি সম্পূর্ণ পূর্ণ অভিজ্ঞতার অংশ মাত্র। Unit-এর বা পাঠের এককের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Morton Shipley বলেছেন unit বা পাঠের একক হচ্ছে এমন একটি বিষয়বস্তু যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একত্ব বা এক ভিত্তিক (the term unit may be defined as a single thing having oneness as its main attribute)। সাধারণতঃ একটি এককের মধ্যে অনেকগুলি পাঠ, অনেকগুলি কর্ম-কেন্দ্রিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি থাকতে পারে, যার জন্য এককটি শেষ করতে সপ্তাহ পর্যন্ত প্রয়োজন হয়, আবার এটি কয়েকটি পিরিয়ডেও, শেষ হতে পারে। ধরা যাক দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য একটি পাঠের একক "আমাদের সমাজের বন্ধু", এই এককের জন্য একদিন একটি করে সমাজের বন্ধু নিলে প্রায় দুসপ্তাহ চলতে পারে। আবার '১০ দিয়ে দশমিকের ভগ্নাংশ গুণ' এই এককটি গ্রহণ করলে, একদিনে এক পিরিয়ডেই শিক্ষাদান সমাপ্ত হয়ে যায়। এ ভাবেই একক পাঠ পরিকল্পনা করা হয়।

বর্তমান সময়ে অনেকগুলো শিক্ষা পরিকল্পনার কথা বলা হয় যার মধ্যে এই একক পাঠ ব্যবস্থা রয়েছে। এই শিক্ষা পরিকল্পনাগুলি হচ্ছে ডালটন পরিকল্পনা (Dalton Plan), উইনেটকা পরিকল্পনা (Winnetka Plan), মরিসন পরিকল্পনা (Morrison Plan) ইত্যাদি।

১। **ডালটন পরিকল্পনা** (Dalton Plan).*

হেলেন পার্কহার্ষ্ট (Helen Parkhurst) হচ্ছেন ডালটন পরিকল্পনার প্রবর্তক। তিনি ম্যাসাচুসেট রাজ্যের ডালটন নামক স্থানে তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, সেই থেকে এই পরিকল্পনাটির নাম হয়েছে ডালটন পরিকল্পনা বা প্রয়োগশালা পরিকল্পনা বা Laboratory plan।

পার্কহার্ষ্ট দেখেছিলেন ১২ বৎসরের উপরের ছাত্রছাত্রীদেরও ছোট শিশুদের মত ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায় এবং তাদের জন্যও যদি ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তারা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। তাই পার্কহার্ষ্ট ব্যক্তিগত শিক্ষার দিকে গুরুত্ব দেন। এই পরিকল্পনায় শিক্ষকের দায়িত্ব যেমন হ্রাস পেয়েছে, তেমন ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

John Adams ডালটন পরিকল্পনাকে শ্রেণীপাঠনার মৃত্যুঘণ্টা (Death-knell) বলে অভিহিত করেছেন। তার কারণ এই পরিকল্পনায় শ্রেণী শিক্ষণের সামান্য ব্যবস্থাই আছে।

ব্যক্তিগত শিক্ষা পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনায় শিক্ষক, শিক্ষার্থীদিগকে প্রতি বিষয়ে সারা বৎসরে কতটা কর্মসম্পাদন করতে হবে তা বুঝিয়ে দেন। প্রতি বিষয়ের সমগ্র কাজটি আবার বিভিন্ন এককে ভাগ করে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদিগকে এক সঙ্গে এক এক মাসের কাজ (assignment) নির্দিষ্ট করে দিয়ে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় কর্মের এককগুলি সম্পাদন করতে হবে। এই পরিকল্পনায় শ্রেণীশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। প্রতিটি কাজ করবার সময় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যেমন—

আমি ……শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী অঙ্গীকার করছি যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাকে দেওয়া কাজ আমি সম্পূর্ণ করে দেব।

এক একটি বিষয় শিক্ষার জন্য এক একটি শ্রেণীকক্ষ নির্দিষ্ট থাকে এবং

* Q. What are the essential features of Dalton plan? What are its merits? Do you know of any experiments that have been tried in this country on the Dalton plan or any modified version thereof? (C.U.B.T. 54)

সেখানে নির্দিষ্ট বিষয়টি শিক্ষালাভের উপযুক্ত নানা পুস্তক, শিক্ষাসরঞ্জাম, চিত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি রাখা হয়। বিদ্যালয়ে কোন সময়-পত্রিকা থাকে না। কিন্তু সময়-পত্রিকা না থাকলেও দিনের সমগ্র সময়কে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম ভাগে থাকে সাধারণতঃ মুখ্য বিষয়সমূহ, যথা :— ইংরেজী, মাতৃভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি। দিনের শেষ ভাগে থাকে অন্যান্য বিষয়।

ছাত্রছাত্রীদের যেসব assignment লিখতে হয়, সেগুলো তারা সমভাবে জানে না। বিষয়গুলির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীরা হয়ত যথেষ্ট অগ্রসর, আবার অন্যান্য বিষয়ে অনগ্রসর। অতএব ছাত্রছাত্রীরা নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সময় বিভাগ করে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারে। সময়-পত্রিকা যদি থাকত তাহলে তারা নিজ নিজ গতি অনুযায়ী স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হতে পারত না। ছাত্রছাত্রীরা এই পরিকল্পনায় নিজ নিজ রুচি, প্রবণতা, শক্তি ও বুদ্ধি অনুযায়ী শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পায়, ছাত্রছাত্রীরা assignment-এর দিক থেকে একটা একক বা ইউনিট থেকে আর একটি এককে বা ইউনিটে তখনই যেতে পারবে, যখন দেখা যাবে যে তার চুক্তি অনুযায়ী একটি ইউনিটের কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছে।

ডালটন পরিকল্পনায় কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ ইউনিটের কাজে কতটা অগ্রসর হল তা জানবার জন্য প্রত্যেক বিষয়ের এবং একত্রে সবগুলি বিষয়ের পাঠোন্নতির গতি বোঝাবার উদ্দেশ্যে, রেখা চিত্র (Graph) রাখা হয়। এই পরিকল্পনায় তিন প্রকারের রেখাচিত্র থাকে। শিক্ষার্থীরা রাখে দুরকমের এবং বিষয়-শিক্ষক রাখেন একপ্রকারের। এই রেখাচিত্রগুলি হতে শিক্ষার্থীরা জানতে পারে যে চুক্তি সম্পাদন করবার দিক থেকে তারা কতটা অগ্রসর হয়েছে এবং কতটা কাজ নির্দিষ্ট সময়ে তাদের সম্পন্ন করতে হবে। সে হিসাবে তারা সময়-বণ্টন করেও নিতে পারে।

সম্মেলন বা (Conference)।

ডালটন পরিকল্পনায় শ্রেণী শিক্ষণ বাতিল করা হলেও, এর কিছুটা বৈশিষ্ট্য অন্যভাবে রাখা হয়েছে। শিক্ষকের শ্রেণী শিক্ষণে যে মুখ্য ভূমিকা ছিল, তা আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এই পরিকল্পনায় শ্রেণী সম্মেলনের ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা একসাথে বসেন এবং আলোচনায়

যোগদান করে থাকেন। শিক্ষার্থীরা এই সম্মেলনে নিজেদের সমস্যাসমূহ উপস্থাপিত করে এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্যাসমূহের সমাধান করে নেয়। শিক্ষার্থীরা তাদের বিষয়কক্ষে একদিন পর একদিন মিলিত হয় এবং শিক্ষকের পরিচালনাধীন আলোচনায় ব্যাপৃত হয়। শিক্ষক প্রয়োজনবোধে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন।

এই জাতীয় সম্মেলনের এক ধরণের বৈশিষ্ট্য আছে। এই সম্মেলনে শিক্ষার্থীরাই যে শুধু শিক্ষকের সঙ্গে তাদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে তা নয়, ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মধ্যেও তাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে পারে। এইভাবে তাদের সামাজিকতা-বোধ ও স্বাধীন মতামত গড়ে উঠে।

ডালটন প্রণালীর সুবিধা (Merits of Dalton Plan)। *

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর নির্ভর করে ডালটন পরিকল্পনা রচিত হয়। এর কতকগুলি সুবিধা আছে :—

১। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতির একটি কুপ্রথা হচ্ছে, সেখানে ব্যক্তি বৈষম্যের উপর কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শিক্ষক সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান অনুযায়ী পাঠদান করেন, ফলে উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীরা মোটেই লাভবান হয় না। ডালটন পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ গতি ও ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

২। বিষয়বস্তু তৈরিতে স্বাধীনতা।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য পুস্তক থেকে শিক্ষণীয় বিষয়টিকে শিক্ষার্থীদের কাছে তৈরি করে তুলে ধরেন। কিন্তু ডালটন পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু বিভিন্ন পুস্তক হতে সংগ্রহ করে নেয়। শিক্ষার্থীদের এই কার্যক্রম অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ এর ফলে তাদের চিন্তাশক্তি ও সৃজনাত্মক শক্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

৩। নানারকম শক্তির বিকাশ।

ডালটন পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের ভার নিজেদের উপর

* Q. What are the merits of Dalton Plan ?

বর্তায়। তারা কোন তৈরি বিষয়বস্তুর সাহায্য লাভ করে না। নিজ নিজ কাজের একক সম্পূর্ণ করবার জন্য তাদের নানা সূত্রের কাছে যেতে হয়। তার ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলী জন্মায়। নানারকমের সু-অভ্যাস তাদের মধ্যে গঠিত হয়। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রচেষ্টা, নেতৃত্ব গ্রহণ, উদ্ভাবনী শক্তি ইত্যাদির বিকাশ হয়।

৪। চুক্তি সম্পাদনের বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষার্থীরা কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে অগ্রসর হয়, অর্থাৎ তাদের সম্মুখে থাকে কর্মসম্পাদনের চুক্তি। দায়িত্ব গ্রহণ করে কর্ম সম্পাদন করা ডালটন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থী এর ফলে শ্রমের অর্থ ও মর্যাদা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

৫। কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত।

প্রচলিত শ্রেণী শিক্ষণে শিক্ষার্থী যদি বিদ্যালয়ে কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তাকে খুব বেশি অসুবিধায় পড়তে হয়। কারণ শ্রেণী শিক্ষক কয়দিন যা পড়িয়ে গেছেন, তা আর পুনরাবৃত্তি হয় না। কিন্তু ডালটন পরিকল্পনায় সে অসুবিধা নেই। সময়ের অপব্যবহার হবার এখানে উপায় নেই। অনিবার্য কারণে যে শিক্ষার্থী যদি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে না পারে, তাহলে সে যেদিন বিদ্যালয়ে আসবে, সেদিন সে যেখানে কাজ পূর্বে শেষ করে গিয়েছিল, সেখান থেকেই কাজ শুরু করবে। অনুপস্থিতির জন্য তার যে ক্ষতি হয়েছে, তা সে অচিরেই পূরণ করে নিতে পারবে।

৬। শৃঙ্খলার সমস্যা ন্যূনতম।

ডালটন পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা কোনও ভাবে ব্যাহত হয় না। কারণ শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ দায়িত্বে তাদের চুক্তি সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যয়ন ও নানা কাজে ব্যাপৃত থাকছে। অতএব তাদের সেদিক থেকে কোন সমস্যা নেই।

৭। মূল্যায়ন সমস্যা আয়ত্বাধীন।

ডালটন পরিকল্পনা পরীক্ষা-শাসিত নয়। শিক্ষার্থীরা তাদের assignments সম্পাদনের নিজ নিজ তাগিদে কাজ করে যায় এবং তারা পরীক্ষার

জন্যও প্রস্তুত হয় না। তাই পরীক্ষা বিভিন্ন কুফল এখানে অনুপ্রবেশ করতে পারে না।

৮। গৃহ-কাজের সমস্যা নেই।

শ্রেণী শিক্ষণে গৃহ-কাজের চাপ যথেষ্ট থাকে। কিন্তু ডালটন পরিকল্পনায় সে চাপের কোনও ভয়াবহতা নেই, শিক্ষার্থীরা তাদের বিষয়-কক্ষে বসে তাদের চুক্তির কাজ সম্পাদন করে থাকে। বিভিন্ন বিষয়-কক্ষে তারা নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অবস্থান করে এবং কর্ম সম্পাদন করে। গৃহে যদি তাদের কোন কাজ করতে হয়, তাহলে সেটা তাদের কাছে সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক, চাপপ্রসূত নয়।

৯। শিক্ষক ছাত্রের সুসম্পর্ক।

শ্রেণী শিক্ষণে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক যেন সব সময় স্বাভাবিক নয়। শিক্ষকের চাহিদা মেটানোর জন্ত শিক্ষার্থী যেন সর্বদাই ভয়ে ভীত। কিন্তু ডালটন পরিকল্পনায় শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক বিদ্যমান। শিক্ষকের ভূমিকা এখানে বন্ধু ও পরিচালকের।

১০। যৌথ কর্ম।

বিষয়-কক্ষগুলি হচ্ছে এক একটি শিক্ষা কর্মশালা, যেখানে বিভিন্ন শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনের জন্ত ব্যাপৃত। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাহায্য সর্বক্ষেত্রে পায় না। সেক্ষেত্রে সহপাঠীদের নিকট হতে পরস্পর সাহায্য পেয়ে থাকে এবং যৌথ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ মেলামেশার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা নানা সামাজিক গুণ লাভ করে।

১১। শিক্ষার গতি নিরূপণ।

রেখাচিত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের গতি নিরূপণ ডালটন পরিকল্পনার একটি উত্তম প্রক্রিয়া। শিক্ষক এই রেখাচিত্রের সাহায্যে জানতে পারেন যে শিক্ষার্থী ঐ সময়কাল পর্যন্ত কতটা কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। তা ছাড়া শিক্ষার্থীও বুঝতে পারে সে সঠিক কোন স্তরে রয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয় সম্পর্কে তার সময়ের হেরফের করতে সে সক্ষম হয়।

ডালটন পরিকল্পনার অসুবিধা (Demerits of Dalton plan)। *

ডালটন পরিকল্পনায় নানা দিক থেকে সুবিধা থাকলেও, উহা বিশেষ জনপ্রিয় হয় নি, সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে পরিকল্পনাটি কার্যকরী হতে পারে নি, তার কারণ এই পরিকল্পনায় কতকগুলি অসুবিধা আছে।

১। শিক্ষোপকরণের অসুবিধা।

ডালটন পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে বিভিন্ন বিষয়-সম্বন্ধীয় প্রচুর সংখ্যক পুস্তকের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে মাতৃভাষা। মাতৃভাষাতে সে রকম পুস্তকের অভাব আমাদের দেশে রয়েছে, তা ছাড়া বিষয়-কক্ষে ও প্রয়োগশালায় প্রচুর শিক্ষামূলক সরঞ্জামেরও প্রয়োজন। এত অর্থ সাধারণ বিদ্যালয় যোগাবে কোথা থেকে? ফলে ডালটন পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম প্রচেষ্টা বেশী স্থানে হতে পারে নি।

২। শিক্ষকদের রক্ষণশীলতা।

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ শিক্ষক শিক্ষিকা অত্যন্ত রক্ষণশীল। বিদ্যালয়ের যে কার্যক্রমে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে আছেন, তার আমূল পরিবর্তন তাঁরা করতে রাজী নন। তাই তাঁরা শিক্ষার্থীদের বিষয়-কক্ষে বসে স্বাধীনভাবে ইউনিট অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের সম্ভাবনায় আশঙ্কিত। তাঁরা শিক্ষকের ভূমিকা ছেড়ে বন্ধু ও পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করতে মোটেই আগ্রহান্বিত নন।

৩। স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব।

আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির শ্রেণীকক্ষ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় বহু কক্ষ আছে, যেগুলি শ্রেণীকক্ষই হবার উপযুক্ত নয়, সেগুলি বহু পুস্তক সম্বলিত ও শিক্ষাসরঞ্জাম সম্বলিত বিষয়-কক্ষ হবে কি করে? প্রয়োগশালাতেই বা কিভাবে রূপান্তরিত হবে? প্রয়োগশালাতে শিক্ষার্থীরা নানা কাজে ঘুরে বেড়াবে, এটা পড়বে, ওটা পড়বে, এটা ওটা সংগ্রহ করবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে। কিন্তু তার জন্য আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে স্থান কোথায়? এই কারণে ডালটন পরিকল্পনা কোনও বিদ্যালয়ে সাদরে গৃহীত হয় নি।

* Q. What are the demerits of Dalton plan?

৪। ব্যক্তিমুখী ঝোঁক।

ডালটন পরিকল্পনায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ assignment শেষ করতে হয়। সে মাঝে মাঝে হয়ত সহপাঠীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু মূল কাজটি তাকেই সম্পন্ন করতে হবে। অতএব নিজের কাজের মধ্যে নিজের অবলুপ্তি হতে তার জীবনে একটি ব্যক্তিমুখী ঝোঁকের সৃষ্টি হবে, সামাজিকতার পথ রুদ্ধ হবে।

৫। উপলব্ধির ক্ষেত্রে অসুবিধা।

ডালটন পরিকল্পনায় একক কাজ বা ইউনিট এর উপর নির্ভর করে assignment সম্পাদন করতে হয়। শিক্ষার্থীরা নিজেদের পড়াশুনার উপর নির্ভর করেই লিখবে। কিন্তু বিষয়বস্তুটি তাদের সঠিকভাবে উপলব্ধি হবে কি? শিক্ষক যখন বিষয়বস্তু উদাহরণ, বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও প্রদীপনের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করেন, তখন তা ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, কিন্তু একলা পড়ায় তা হয়ে ওঠে না। অতএব ডালটন পরিকল্পনায় উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা জনক, বিশেষ করে সাধারণ বুদ্ধি ও স্বল্প বুদ্ধি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে। মেধাবী ছাত্ররা হয়তো এই পরিকল্পনায় খানিকটা লাভবান হতে পারে।

৬। ইউনিট রচনা

এই পরিকল্পনার সাফল্যলাভ নির্ভর করে সুচারুরূপে unit স্থির করার উপর। বলা বাহুল্য একাজের জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতা ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে পুরাতনপন্থীদেরই আধিক্য। তাঁরা যথাযথভাবে কাজের ইউনিট স্থির করতে সক্ষম নন। এরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করবার পূর্বে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নূতন কার্যক্রমের জন্য শিক্ষণদান অত্যাবশ্যক।

৭। চারু শিল্প শিক্ষায় অসুবিধা।

কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলো এককভাবে শিক্ষণদান করলে শিক্ষা খুব ভাল হয় না। যথা—কবিতা শিক্ষা, সঙ্গীত শিক্ষা ইত্যাদি। ফলে এগুলি ডালটন পরিকল্পনায় শিক্ষাদান ভালভাবে সম্ভব নয়।

৮। পাঠোন্নতির পরিমাপ অসুবিধাজনক।

শিক্ষার্থীদের রচিত assignment দেখে এবং কর্মসম্পাদনের গতি দেখে পাঠোন্নতির স্বরূপ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তার কারণ শিক্ষার্থীরা অনায়াসে অন্যকে দিয়ে assignment লিখিয়ে নিতে পারে।

৯। শিক্ষার্থীদের অপছন্দ বিষয়ে প্রচেষ্টার অভাব।

ডালটন পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ রুচি, পছন্দ ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ করতে অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা যে যে বিষয় পড়তে বা চর্চা করতে আনন্দ ও প্রেরণা লাভ করে, তারই উপর বেশী গুরুত্ব দেয়। আর যে সব বিষয় তাদের অপছন্দ, সে সব বিষয়ে তারা অবহেলা করে থাকে।

১০। ডালটন পরিকল্পনা ছোট শিশুদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়।

ছোট শিশুদের মধ্যে পূর্ণ দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয় না বলে ডালটন পরিকল্পনা ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে ডালটন পরিকল্পনা তত্ত্ব হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট, কারণ এরই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত বৈষম্যের দিক থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব। কিন্তু এর নানা অসুবিধা আছে বলে কোন বিদ্যালয়ই সম্পূর্ণ ডালটন পরিকল্পনায় পাঠ পরিচালিত হতে পারে নি।

পরিবর্তিত ডালটন পরিকল্পনা (Modified Dalton Plan)। *

অবিভক্ত বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কতগুলো সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডালটন পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা চলে নি, কারণ উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এবং পাঠাগারে পুস্তকের অভাব। এই দুটি কারণে ডালটন পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

কিন্তু পরে ডালটন পরিকল্পনাকে কিছুটা সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হলে এটি গ্রহণযোগ্য হয়।

* Q. Write a note on the Modified Dalton plan.

সংশোধিত ডালটন পরিকল্পনা হচ্ছে নিম্নরূপ।

১। ডালটন পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা না করে শ্রেণী শিক্ষণের অনুপূরক হিসাবে এর ব্যবহার প্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থীরা তাতে উপকৃত হবে, অথচ পরিকল্পনার যে কুফল তা দেখা যাবে না।

২। স্কুলের সময়কে দুটি ভাগে বিভক্ত করে, প্রথম ভাগে চলবে শ্রেণী শিক্ষণ আর দ্বিতীয় ভাগে ডালটন পরিকল্পনা অনুযায়ী assignment লেখনের ব্যবস্থা থাকবে।

৩। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রকৃতি পাঠ ইত্যাদির জন্য বিষয়-কক্ষ থাকবে। অন্য বিষয়গুলি শিক্ষার্থীরা শিক্ষা করবে শ্রেণীকক্ষে।

৪। বিষয়-কক্ষে যখন শিক্ষার্থীরা থাকবে, তখন বিষয়-শিক্ষকগণ নিরপেক্ষ পরিচালক না হয়ে সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধান করবেন।

৫। শ্রেণী শিক্ষণে এবং বিষয়-কক্ষে assignment লেখা সম্পর্কে সময়-পত্রিকা রচনা করতে হবে।

৬। শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতির নির্ধারণের জন্য শুধু assignment লেখার উপর নির্ভর করলেই চলবে না, মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে।

২। উইনেটকা পরিকল্পনা (Winnetka Plan)।*

উইনেটকা পরিকল্পনা রচনা করেন কার্লটন ওয়াসবার্ন (Carlton Washburne) নামে একজন শিক্ষাবিদ। তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে উইনেটকা শহরের একটি বিদ্যালয়ে তাঁর পরিকল্পনাটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং তাই থেকে পরিকল্পনাটির নাম হয় উইনেটকা পরিকল্পনা। ওয়াসবার্ন শ্রেণীশিক্ষণের বিরোধী ছিলেন। তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার ভিত্তিতে পরিকল্পনাটি রচনা করেন। যদিও ডালটন পরিকল্পনা ও উইনেটকা পরিকল্পনা একই উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রচিত, তাহলেও দুইয়ের প্রক্রিয়ার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

উইনেটকো পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ্যক্রমটিকে ঢেলে সাজা হয়েছে। প্রথমে পাঠ্যক্রমটি দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

---

*Q. What are the features of Winnetka Plan? Discuss its merits and demerits.

Q. Compare Dalton plan with Winnetka plan and state in what way one has the advantages over the other.

(১) সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় অংশ বা Common essentials, অর্থাৎ প্রথমভাগের বিষয়সমূহ সকলই শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক।

(২) যৌথ কার্যাবলী বা Group activities; অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগের বিষয়সমূহ সবই দলগত কাজ এবং কাজগুলিকে 'সৃষ্টিমূলক', 'আত্মপ্রকাশমূলক' এবং 'সামাজিকতাপূর্ণ' কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(ক) সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

এই বিভাগের কর্মসমূহ সকলই ব্যক্তিগত কাজ। এই বিভাগের বিষয়গুলিকে কতকগুলি ইউনিটে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি ইউনিট বা এককের জন্য Assignment sheet বা কার্যভারের তালিকা, Work sheet বা কার্যক্রম তালিকা, Diagnostic Practice sheet বা ত্রুটি নির্ণায়ক অনুশীলন লিপি এবং Final Test বা সর্বশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজের ইউনিটের উপর কাজ করে যায় এবং ইউনিটের কাজ সমাপ্ত হলে যে শিক্ষক হতে প্রাপ্ত ইউনিটের উত্তর সম্বলিত কাগজখানির সাথে তার নিজের উত্তর মিলিয়ে নেয়। যদি সে দেখতে পায় যে তার উত্তর ঠিকই আছে, তাহলে সে ইউনিটের অন্য অংশের কাজ শুরু করে দেয়, কিন্তু যদি সে দেখতে পায় যে তার উত্তরে ভুল রয়েছে তাহলে সে তার ভুল সংশোধন করতে পুনরায় উদ্যোগী হয়। যখন এভাবে একটি ইউনিটের সমস্ত অংশের কাজ সম্পন্ন হয়, তখন শিক্ষার্থী শিক্ষককে তার শেষ অভীক্ষা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানায়। এই শেষ অভীক্ষায় যদি শিক্ষার্থী সাফল্য অর্জন করে, তাহলে তাকে তখন নূতন কাজের ইউনিট নিতে দেওয়া হয়। এই ইউনিটগুলি সম্পাদন করবার সময়, শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের ইচ্ছা, আগ্রহ ও রুচি অনুসরণ করতে পারে।

ডালটন প্রণালীর সাথে উইনেটকা প্রণালীর এক্ষেত্রে একটু অমিল রয়েছে। ডালটন প্রণালীতে শিক্ষার্থী প্রতি মাসের জন্য নির্দিষ্ট সবগুলো ইউনিটের কাজ শেষ না করলে, তাকে পরের মাসের ইউনিটে হাত দিতে দেওয়া হয় না, কিন্তু উইনেটকা পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে তাদের নিজস্ব কর্মপন্থা অনুসরণ করতে পারে। এই পরিকল্পনায় এমনও দেখা যায় যে একজন শিক্ষার্থী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে রয়েছে দশম শ্রেণীতে গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে একাদশ শ্রেণীতে আবার ইতিহাস শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে নবম শ্রেণীতে।

(খ) দলগত কাজ

দ্বিতীয় ভাগের কাজ হচ্ছে দলগত কাজ। শিক্ষার্থীরা সকাল এবং দ্বিপ্রহরের অর্ধেক অংশ পর্যন্ত ব্যক্তিগত অত্যাবশ্যকীয় কর্ম সম্পাদন করে। বাকী সময়টুকু তারা দলগত সামাজিক কাজ করে। এ সমস্ত কাজ হচ্ছে নাচ-গান, চিত্রাঙ্কন, অভিনয়, খেলা, সাহিত্য সভা, বিদ্যালয় পরিশাসনের জন্য বিভিন্ন অধিবেশন, ভ্রমণ, শিল্পকাজ, বিদ্যালয়-পত্রিকা সম্পাদন ইত্যাদি যা কিছু শিক্ষার্থীদের সৃজনাত্মক মনোভাব, দলপ্রীতি, সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে এবং তাদের সামাজিকতা-বোধ জাগ্রত করে। এ ধরণের বিভিন্ন বিষয় সমূহে, অত্যাবশ্যকীয় অংশে যে রকম পরীক্ষার কড়াকড়ি আছে, তা নেই। শিক্ষার্থীই এ সকল কাজ যৌথভাবে সম্পাদন করে আনন্দলাভ করে থাকে।

উইনেটকো পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের সামাজিক দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ডালটন পরিকল্পনায় সেরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয় না, সেখানে ব্যক্তিগত বিকাশের দিকটাকেই বড় করে দেখা হয়।

উইনেটকা শিক্ষা পরিকল্পনার বিশেষত্ব

উইনেটকা পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার্থী পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়ে একজন মনোবিদ (Psychologist), মনঃসমীক্ষণবিদ (Psychoanalyst), একজন চিকিৎসক (Physician) এবং একজন সচিব (Secretary) থাকেন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও শিক্ষার মান অনুযায়ী বিদ্যালয়ে স্বয়ং-শোধনক্ষম কার্যক্রম তালিকা ও পুস্তকাদি আছে। যিনি মনঃসমীক্ষক, তিনি শিক্ষার্থীদের আচরণ বিষয়ক সমস্যাদির উপর লক্ষ্য রাখেন এবং চিকিৎসক লক্ষ্য রাখেন ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের উপর। সেক্রেটারী বা সচিব বিভিন্ন শাখার কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করেন।

এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের নিজেদের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার প্রচুর অবকাশ আছে। তার ফলে তারা পরবর্তী জীবনে কোনও ক্ষেত্রে গিয়ে বেমানান হবে না। যদি উপযুক্তভাবে কর্ম পরিচালনা করা যায় তবে এই পরিকল্পনার প্রচুর সম্ভাব্যতা রয়েছে।

৩। **মরিসন পরিকল্পনা** (Morrison plan)।*

ডালটন ও উইনেটকা পরিকল্পনা ব্যক্তিমুখী শিখনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক H. C. Morrison যে ইউনিট পদ্ধতির উদ্ভাবন করে, তাও ব্যক্তিমুখী শিক্ষণ পদ্ধতির পরিপোষক। মরিসনের কৃতিত্ব হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইউনিট পদ্ধতি অবলম্বন করে একটি নূতন পদ্ধতি গড়ে তোলা এবং তার প্রয়োগ বিধি প্রণয়ন করা।

ইউনিট পদ্ধতির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মরিসন উদ্দেশ্যকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। অংশগুলি হচ্ছে পাঠদানের,

(ক) সামগ্রিক উদ্দেশ্য (aims),

(খ) সাধারণ উদ্দেশ্য (general objectives) এবং

(গ) বিশেষ উদ্দেশ্য (specific objectives)।

সামগ্রিক উদ্দেশ্যের কথা বলতে মরিসন বোঝাতে চাইছেন, সেই বিষয়টি যাকে অবলম্বন করে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক চিন্তাধারা ও আচার আচরণের পরিবর্তন ঘটবে।

সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে চর্চা ও নৈপুণ্য অর্জন।

বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানের মূল্যায়ন নির্দেশক।

মরিসনের মতে পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু প্রতিদিনকার পাঠের অংশটুকু আয়ত্ত করা নয়, পাঠের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত প্রাসঙ্গিক অংশ এই পাঠের সঙ্গে জড়িত থাকবে। তা ছাড়া সম্পৃক্ত থাকবে শিক্ষার্থীর জীবনের অভিজ্ঞতা। তাহলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারবে।

মরিসন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রেণী শিক্ষণের ধারা বজায় রাখা এবং সাথে সাথে ব্যক্তিমুখী শিক্ষণের ব্যবস্থাও করা।

মরিসন পরিকল্পনায় শিক্ষণ পদ্ধতির ক্রম হচ্ছে নিম্নরূপ।

প্রথম অবস্থায় সমগ্র পাঠনীয় বিষয়বস্তুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হচ্ছে দৈনিক পাঠের একক। পরে নিম্নলিখিত স্তর ও ক্রম অনুসরণ করে পাঠ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।

(ক) **প্রথম স্তরে পরীক্ষণ**—নূতন বিষয় সম্পর্কিত পাঠদানের পূর্বে শিক্ষার্থী সে বিষয়ে কতটুকু জানে, তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

* Q. What are the special features of the Morrison Plan ?

(খ) **শিক্ষণ**—পরের স্তর হচ্ছে সেদিনকার পঠনীয় এককটি শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া।

(গ) **ফল পরীক্ষাকরণ**—পরের স্তরে শিক্ষার্থী পাঠ শ্রবণের ফলে কতটা গ্রহণ করতে পেরেছে, তা পরীক্ষা করে দেখা হয়।

(ঘ) **ব্যবস্থা গ্রহণ**—শিক্ষার্থী পাঠ গ্রহণের মধ্যে যে অসঙ্গতি ও ত্রুটি ধরা পড়বে, সেগুলি অপসারণ করবার জন্য পরে ব্যবস্থা করা হবে।

(ঙ) **পুনরায় শিক্ষা দান**—পরের স্তরে বিষয়বস্তুটি পুনরালোচনার আবার শেখানোর ব্যবস্থা করা হবে।

(চ) **পুনরায় পরীক্ষাকরণ**—সবশেষে শিক্ষার্থী সম্পূর্ণভাবে বিষয়-বস্তু শিখতে পারল কিনা জানবার জন্য পুনরায় পরীক্ষা করা হবে।

শিক্ষার্থী যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়বস্তুটি সন্তোষজনকভাবে শিক্ষা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সোপান কয়টি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মরিসন মনে করেন। বিদ্যালয়-জীবনের প্রত্যেকটি শিক্ষণীয় বিষয় ও আচার-আচরণ, উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক ও পরস্পর সমন্বিত। এই কারণে শিক্ষণ দেওয়া হয় শ্রেণীগত-ভাবেই। কিন্তু তা হলে ব্যক্তি বৈষম্যের ভিত্তিতে উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন ও অনগ্রসরদের স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষণ দান করা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। সে জন্য ব্যবস্থাও আছে। পাঠদানের মধ্যে যে বিস্তৃত স্তরগুলি রয়েছে, সেই স্তরগুলোর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সকল প্রকার শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। এই পরিকল্পনায় গুণ হল এটি অতি সহজে প্রয়োগ করা সম্ভব। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই পরিকল্পনায় শ্রেণীভিত্তিক ব্যবস্থায় কোনও রূপ রদ-বদল করতে হয় না বলে বিদ্যালয়ের পরিচালকবৃন্দ ও অভিভাবকবৃন্দ, এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি

(Activity Methods)*

মামুলি শিক্ষণ পদ্ধতিতে কর্মের কোন স্থান নেই। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গলাধঃকরণের জন্য কিছু বিষয়বস্তু পরিবেশন করেন এবং ছাত্রছাত্রীরাও তা না বুঝেই কখনও কখনও মুখস্থ করে। তার ফলে শিক্ষার্থীদের মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির সুসম্বন্ধিত স্ফুরণ হয় না। এতদ্ব্যতীত পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয়বস্তুর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের বিশেষ সম্পর্ক না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের জীবন ও শিক্ষার মধ্যে একটি বৃহৎ ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যায়।

আমরা পশ্চিমী দেশসমূহের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখানকার শিক্ষাবিদগণ কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা, হাতে-কলমে শিক্ষা প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিশুরা হাতে-কলমে কাজ করে শেখে এবং শিক্ষকদের মুখে নীরস কথা শুনে তারা বিষয়বস্তু গ্রহণে অনাগ্রহী।

শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মের স্থান অতি উচ্চে। শিশুরা স্বভাবতঃই সক্রিয়। তাদের মধ্যে প্রচুর কাজ করার ক্ষমতা বিদ্যমান। যদি তারা কাজে আগ্রহ বোধ করে, এবং কাজে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে তারা কর্ম সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হবে না। তারা বরং বিশেষ উৎসাহী হয়ে কাজে নিমগ্ন হয়ে যাবে। অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলেও তারা কাজে বিরক্তি বা ক্লান্তি বোধ করবে না। অভিভাবক ও শিক্ষক সম্প্রদায় শিশুদের এই বৈশিষ্ট্যের সুযোগ নিতে পারেন।

প্রতি শিশুই প্রায় সময়েই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে কাদামাটি নিয়ে খেলা করে, ইটের টুকরো কুড়োয়, এটা ভাঙ্গে, ওটা গড়ে, এটা সংগ্রহ করে, ওটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ইত্যাদি। কিন্তু এসব কাজ সে করে কেন? সে করে, তার কর্মপ্রেরণাকে পরিতৃপ্ত করতে। শিশু একটি যন্ত্র নয়, সে প্রাণবন্ত, তার মধ্যে কর্মশক্তি ভরপুর হয়ে আছে। তার সৃজনাত্মক স্বয়ংকর্মের মধ্য দিয়ে সে তার নিজের বুদ্ধির পথ করে নেয়। তার ব্যক্তিগত কর্মপ্রসূত অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সে তার জীবন গঠিত করে এবং বাহিরের সঙ্গে তার

* Q. What are the principles on which the Activity Methods are based?

জীবনের ভারসাম্য স্থাপন করে। শিশু কাজ করতে চায়। বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, মানুষের সাথেও তাই করে। আনন্দপূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত কর্মই তখন তার জীবনযাপনের প্রেরণা দান করে। শিশুর সহজ উৎসাহ ও আনন্দের কেন্দ্র থেকেই শিশু নানারকম কাজ করে। আবার শিশু কাজ করে আনন্দ পায়। কাজ করতে করতেই সে সমস্যার সমাধান করতে আগ্রহান্বিত বোধ করে।

শিশুরা খেলা, দৌড়ান, লাফান, গান করা, কোন কিছু পরীক্ষা করে দেখা, কোন কিছু গড়া, জন্তু-জানোয়ার পোষা, ছবি আঁকা, মাটি দিয়ে কাজ করা, বাগান করা, সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তারা আত্মপ্রকাশ করে থাকে। অতএব বিদ্যালয়ে শিশুদের কর্মসূচীর মধ্যে এসব কাজের উপযুক্ত সুযোগ থাকতে হবে। কারণ এ জাতীয় খেলা ও কাজই হচ্ছে শিশুদের পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব শিশুদের সক্রিয়তাকে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে মোটেই অবহেলা করিতে পারি না।

শিশুরা এই জাতীয় ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্ম থেকে কতটা লাভবান হয় তা আমরা দেখতে পারি। শিশুরা কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে নানাবিধ অভিজ্ঞতা লাভ করে।

(১) শিশুরা হাতে-কলমে কাজ করে বস্তু ও তার গঠন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা লাভ করে। শিশু এই কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতা বহুদিন পর্যন্ত মনে সজীব রাখতে পারে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, দলের সাথে মিশিয়ে দিয়ে যখন কর্মের মাধ্যমে কোন অভিজ্ঞতা শিশু অর্জন করে, তখন সে লৌকিক বা সামাজিক অভিজ্ঞতা লাভ করে।

(৩) শিশুরা কর্মের মাধ্যমে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা বহু সমস্যার প্রেরণা জোগায়। শিশুরা বহুমুখী কর্মের প্রতি আগ্রহ বোধ করে এবং তারা নানা জাতীয় অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিভিন্ন ধরণের কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করে।

(৪) দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও কাজের মধ্য থেকে শিশুরা কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও উপযোগী বৌদ্ধিক শিক্ষাও লাভ করে। শিশুদের স্বাভাবিক আগ্রহের সঙ্গে এটি সংযুক্ত বলে এই সব তথ্যাদিতে তাদের মানসিক বদহজমের কোন সম্ভাবনা নেই।

প্রাথমিক স্তরে শিশুদের কর্মচঞ্চলতা একটি নির্দিষ্ট ধারা বেয়ে প্রবাহিত হয় না। শিশুরা স্বেচ্ছায় যে কোন কাজ করতে পারে। যে কোন কাজই তারা করুক না কেন, কিছুটা অভিজ্ঞতা তা থেকে লাভ হয়ই এবং সেই অভিজ্ঞতাও তার জীবনে নানা ধরণের ছাপ রেখে যায়। এসব কাজ অনির্দেশিত কাজের পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুরা নির্দেশিত কর্ম করবে। অনির্দেশিত কর্মের ক্ষেত্রে শিশুদের হস্ত সঞ্চালন ও অঙ্গুলি সঞ্চালনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নির্দেশিত কর্মে শিশুরা শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে এবং কর্মে ধীরে ধীরে কুশলতা ও দক্ষতা অর্জন করে।

কর্মের উপর শিক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে বলে জন ডিউই, কিলপ্যাট্রিক, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ শিক্ষাবিদগণ কর্মের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

যে কর্ম করার মাধ্যমে বস্তুসমূহ দক্ষতা সহকারে হস্তচালন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যে কর্মের মধ্যে মস্তিষ্ক ও হস্তকুশলতার বিকাশ হয় তাই হচ্ছে কর্মকেন্দ্রিক নীতির 'করা'। ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যদি ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করে অভিজ্ঞতা লাভে অগ্রসর হয়, তাহলে সেটা হবে 'কর্মভিত্তিক' শিক্ষা। ইতিহাস শিক্ষাকালে যদি শিক্ষার্থীরা ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান পরিভ্রমণ করে এবং তথ্যাদির বিন্যাস করে এবং ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ নাটকে রূপায়িত করে শিক্ষালাভ করে, তাহলে বলা যেতে পারে ইতিহাস শিক্ষা 'কর্মনীতি' অনুযায়ী হয়েছে।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রজেক্ট মেথডের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। প্রজেক্ট হল একটি সমস্যামূলক কাজ যা স্বাভাবিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা এর বিশদ বিবরণ পরে দেব।

মহাত্মা গান্ধীও বুনিয়াদী শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিকতার উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষণ পদ্ধতিও পরে বিশদভাবে আলোচনা করব।

প্রজেক্ট পদ্ধতি বা কার্য সমস্যা পদ্ধতি *

প্রজেক্ট পদ্ধতি বা কার্যসমস্যা পদ্ধতি হচ্ছে বর্তমান প্রগতিশীল শিক্ষাজগতে একটি প্রগতিশীল পদ্ধতি। পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিশুর দৃষ্টিকোণ থেকে এক্ষেত্রে দেখা হয়।

প্রজেক্ট পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে ডিউইর শিক্ষাতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। ডিউইর মতে কর্মে সমস্যার উপক্রম হয় এবং তার পরিণতি ঘটে সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়েই। সমস্যা সমাধান করতে গেলে সক্রিয়ভাবে তা করতে হয়। কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করে সমস্যার সমাধান হয় না। অতএব নূতন জ্ঞান অর্জনে দুটি বিষয়বস্তু একান্তই প্রয়োজনীয় এবং সেগুলি হচ্ছে সমস্যা এবং সক্রিয়ভাবে সমস্যার সমাধান। প্রজেক্ট পদ্ধতি ডিউইর এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ডিউই নিজেই তাঁর নিজস্ব তত্ত্বের উপর নির্ভর করে একটি শিক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং তার নাম রাখেন 'প্রব্লেম মেথড' বা সমস্যা পদ্ধতি। কিন্তু সেই পদ্ধতির মধ্যে এতটা জটিলতা ছিল যে সাধারণে তা গ্রহণ করতে পারে নি। এই সময় ডিউইর শিষ্য কিলপ্যাট্রিক (Kilpatrick) ডিউইর সমস্যা পদ্ধতিটিকে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করে প্রজেক্ট মেথডের সৃষ্টি করেন। এই পদ্ধতিটি সকল শিক্ষাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ক্রমে এটি প্রগতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে।

প্রজেক্টের সংজ্ঞা।

ষ্টিভেনসন (Stevenson) এবং কিলপ্যাট্রিক (Kilpatrick) দুজনেই প্রজেক্ট পদ্ধতির ব্যাপক রূপদান করতে অগ্রসর হন। ষ্টিভেনসন প্রজেক্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, প্রজেক্ট হল একটি সমস্যামূলক কাজ যা স্বাভাবিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় (A Project is a problematic act carried to completion in its natural setting)। কিন্তু প্রজেক্ট পদ্ধতি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসারলাভ করে কিলপ্যাট্রিকের হাতে। তিনি প্রজেক্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রজেক্ট হল একটি কর্ম যা সামাজিক পরিবেশে

* Q. Explain Project method. What are its merits and limitations? How can it be used in our schools with advantage?

(C. U. B. T. 1956).

উদ্দেশ্যমূলকভাবে মন প্রাণ দিয়ে করা হয় (A Project is a wholehearted purposeful activity, proceeding in a social environment)।

ষ্টিভেনসন প্রজেক্ট সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার মধ্যে মানসিক কর্মের বিশেষ উল্লেখ নেই। তিনি কর্মের উপরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু কিলপ্যাট্রিক প্রজেক্ট পদ্ধতির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা অনেক বেশি ব্যাপক। তিনি বলেন যে প্রজেক্ট পদ্ধতি হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যমূলক কার্যক্রম এবং কাজের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হবে স্বতঃপ্রণোদিত উদ্দেশ্য দ্বারা এবং কাজের পদ্ধতিও সেই সূত্রেই নিয়ন্ত্রিত হবে এবং তার পশ্চাতে থাকবে একটি প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণাবোধ।

কিলপ্যাট্রিক জন ডিউইর শিষ্য। জন ডিউই ছিলেন প্রয়োগবাদী (Pragmatist); অতএব কিলপ্যাট্রিকের প্রজেক্টও প্রয়োগ সাপেক্ষ। যদি তা বিদ্যালয়ে উপযুক্তভাবে প্রয়োগ না করা যায় তাহলে তার কোন সার্থকতা নেই।

প্রজেক্ট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

প্রজেক্ট পদ্ধতি সম্পর্কে যে সব সংজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে, তা থেকে আমরা প্রজেক্ট পদ্ধতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

(১) সমস্যা সমাধান—প্রতিটি প্রজেক্টে সমস্যা সমাধানের বিষয় অঙ্গীভূত থাকবে। যদি কোন সমস্যা না থাকে, তাহলে সেটা প্রজেক্ট হিসাবে নাম দেওয়া চলবে না।

(২) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য—সমস্যা সমাধানকে অবলম্বন করে একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পাওয়া যাবে। উদ্দেশ্যের অভাব থাকলে কর্ম যান্ত্রিকতায় পরিণত হবে।

(৩) স্বতস্ফূর্ততা—প্রজেক্ট মেথডে শিক্ষা হবে স্বতঃস্ফূর্ত। শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপর কোন কার্যক্রম চাপিয়ে দেবেন না। প্রজেক্টের উদ্ভব সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থেকে। সেই সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং কোন সঙ্কীর্ণ পাঠ্যক্রম ও সময়-পত্রিকা তাদের কর্মপ্রবাহকে ব্যাহত করতে পারে না।

(৪) স্বাভাবিক পরিবেশ—প্রজেক্ট যথাসম্ভব স্বাভাবিক পরিবেশে

সম্পাদিত হবে। মামুলি শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী অপ্রাকৃত পটভূমিকায় শিক্ষালাভ করত বলে শিক্ষা বাস্তবতাবর্জিত হত। তাই প্রজেক্টের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশের উপর এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(৫) **কর্ম সম্পাদন**—জীবনের জন্ত শিক্ষা স্বভাবতঃই কর্মচঞ্চল জীবনের মধ্য দিয়ে দেওয়াই বিধেয়। শিক্ষার্থীরা সকলেই কর্মচঞ্চল। অতএব কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান করলে শিক্ষা সরস ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। পুস্তকাশ্রয়ী বিদ্যা শিক্ষার্থীকে কোন কোন বিষয় জানতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু কর্মের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান তা সে লাভ করতে পারে না। এই কারণেই প্রজেক্টে কর্মের স্থান এতটা গুরুত্বপূর্ণ।

(৬) **সামাজিক অভিজ্ঞতা**—শিক্ষার্থী সমাজের একটি অংশ। সে এককভাবে জীবন যাপন করবে এমন আশা করা যায় না। অতএব তাকে অন্তের সাথে এক সাথে বসবাস করতে এবং বিভিন্ন জিনিসের অংশীদার হতে শিক্ষা দেওয়া বিশেষ কর্তব্য। জগৎ ও জীবন সবই গণতান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকছে। এই কারণে প্রজেক্ট পদ্ধতিতে যৌথ কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশ করা গ্রহণযোগ্য নীতি বলে শিক্ষাবিদরা মত পোষণ করেন।

বিভিন্ন ধরণের প্রজেক্ট।

প্রজেক্ট পদ্ধতি বিদ্যালয়ে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে কিলপ্যাট্রিক চার রকম প্রজেক্টের কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) উৎপাদকের প্রজেক্ট (Producer's Project) ঃ

এই ধরণের প্রজেক্টে কোন কিছু উৎপাদন করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। উৎপাদন বলতে শুধু বস্তুর উৎপাদনের কথা বলা হয় নি, চিন্তার উৎপাদনও বটে, যথা, যেমনি রাস্তা বা পুল নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা, আবার তেমনি নাটক অভিনয় করা ইত্যাদি।

(২) ভোগকারীর প্রজেক্ট বা উপভোগমূলক প্রজেক্ট (Consumers' Project) ঃ

এই জাতীয় প্রজেক্টে কোন কিছু ভোগ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, অর্থাৎ কোনও সৌন্দর্যমূলক অভিজ্ঞতা লাভ করাই হচ্ছে এই জাতীয়

প্রজেক্টের উদ্দেশ্য। যথা—গান বা গল্প শোনা বা চিত্রকলার সৌন্দর্য বিচার ইত্যাদি।

(৩) সমস্যামূলক প্রজেক্ট (Problem Project) :

এই জাতীয় প্রজেক্টে শুধু বৌদ্ধিক উপায়ে সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। নিজের ইচ্ছায় কাজটি নিয়ে সমস্যার সমাধান করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। যেমন, কুয়াশা কেন পড়ে, গাছ থেকে ফল মাটিতে কেন পড়ে, ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করা হয়।

(৪) নৈপুণ্য অর্জন সম্পর্কিত প্রজেক্ট (Skill Project) :

এই প্রকার প্রজেক্ট দ্বারা জ্ঞানার্জন বা নৈপুণ্য অর্জনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শুধু পদ্ধতির দিক থেকে নয়, কার্যের স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও প্রজেক্ট দুরকমের হতে পারে। যথা—(ক) বুদ্ধিমূলক ও (খ) কর্মমূলক।

(ক) বুদ্ধিমূলক সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদিগকে হাতে-কলমে কাজ করতে হয় না, বুদ্ধির সাহায্যে পরিকল্পনাটি রচনা করতে হয়।

(খ) কর্মমূলক প্রজেক্টে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিটি কাজ হাতে-কলমে করতে হয়।

প্রজেক্ট পদ্ধতির সোপান।*

কিলপ্যাট্রিকের মতে ছাত্রছাত্রীরা প্রজেক্টের ইউনিট স্থির করা থেকে কর্ম সম্পাদন পর্যন্ত সমগ্র জিনিসটাই করবে, তাদের উপর শিক্ষকের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া হবে না। শিক্ষকের স্থান প্রজেক্ট পদ্ধতিতে গৌণ। তিনি হিতৈষী বন্ধু ও পরিচালক মাত্র।

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদিগকে চারটি স্তরে কর্ম সম্পাদন করতে হয়।

(১) কার্যের ইউনিট স্থির করা বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Purposing),

(২) কার্যের পরিকল্পনা করা (Planning),

(৩) কর্ম সম্পাদন (Execution) এবং

(৪) মূল্যায়ন ও সমালোচনা (Judgment)।

* Q. What are the different stages of Project work ?

(১) কার্যের ইউনিট স্থির করা (Purposing)।

কিলপ্যাট্রিক ইউনিট স্থির করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রজেক্টের ইউনিট শিক্ষক কখনও স্থির করবেন না। কারণ তার শিক্ষাগত মূল্য কিছু নেই। প্রজেক্টের প্রক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং ঐ সমস্যাগুলির মধ্যে একটি সমস্যা কর্মের মাধ্যমে সমাধানের জন্য স্থির করবে। আসল কথা হচ্ছে, কর্মের ইউনিট স্থিরীকরণে ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছা, আগ্রহ ও ঔৎসুক্যকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। তাহলেই কর্ম সম্পাদনে ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

(২) পরিকল্পনা করা (Planning)।

ইউনিটের পরিকল্পনা ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকার সহযোগিতায় করবে। শিক্ষকের ভূমিকা এখানে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর নয়। তিনি ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে দেবেন যে কোনও কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হলে প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে তার জন্য পরিকল্পনা করা। তিনি সকল ছাত্রছাত্রীদের পরিকল্পনা গ্রহণে আলোচনা করতে বলবেন এবং পরিকল্পনার জন্য আলোচনাকালে তিনি নানা বিষয়ের আলোচনা করবেন। ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রজেক্ট সম্পর্কিত কর্ম পরিকল্পনা শিক্ষকের সহযোগিতায় লিখে ফেলবে। দল বিভাগ এবং কোন দল কিভাবে কর্ম সম্পাদন করবে, তারও ইঙ্গিত কর্ম পরিকল্পনায় থাকবে।

(৩) কর্ম সম্পাদন।

যেহেতু কর্ম সম্পাদনের পরিকল্পনা ছাত্রছাত্রীরাই করেছে, সেইহেতু কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা ভালভাবেই পাওয়া যাবে, একথা নিশ্চয় করেই বলা চলে। শিক্ষক বিভিন্ন দলকে তাদের কাজে নানাভাবে পরামর্শ দেবেন, কিন্তু নিজে কর্ম সম্পাদন করে কর্মটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। এটি প্রজেক্ট পদ্ধতির পরিপন্থী। শিক্ষক পরিচালক ও হিতৈষী বন্ধুমাত্র। শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন কর্মের বিভিন্ন দিক সম্পাদনের পর তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা নিজ নিজ ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করবে।

বিভিন্ন প্রকারের কর্ম প্রক্রিয়া হতে শিক্ষক কি ধরণের সম্বন্ধিত পাঠ (Integrated lesson) দেবেন তা স্থির করবেন।

(৪) বিচার বা মূল্যায়ন।

প্রতিদিন কর্মের শেষে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার সময় প্রত্যেক দল প্রত্যেকটি দলের কাজ ভাল করে দেখবে এবং কাজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্ত সমালোচনা করবে। এই সমালোচনার ফলে দলগুলি নিজেদের ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং পরের দিন কর্ম সম্পাদনের সময় তাদের ত্রুটির কথা স্মরণ রেখে কর্মগুলি যথাযথভাবে করতে চেষ্টিত হবে।

তাছাড়া এই স্তরের একটি মূল্যবান শিক্ষাগত অবদান হল—প্রত্যেক দল তাদের কাজের শেষে বিবরণী পাঠ করবে, ফলে অভিজ্ঞতার বিনিময় হবে এবং শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হবে।

প্রজেক্টের সাফল্যের মানদণ্ড।

একটি প্রজেক্টের কাজ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে কিনা তা নিম্নলিখিত নির্ণায়ক বা মানদণ্ড হতে বুঝতে পারা যায়।

১। **অভিজ্ঞতা লাভের শক্তি**—যে প্রজেক্টের কাজে সামাজিক মূল্য আছে এমন অভিজ্ঞতা দান করে, তাকেই সাফল্যমণ্ডিত প্রজেক্ট আখ্যা দেওয়া চলে।

২। **শিক্ষার্থীদের কাজের দায়িত্ব**—যে প্রজেক্টের কাজে ছাত্রছাত্রীদের সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়, সে প্রজেক্টটি সাফল্যলাভ করেছে বলা যায়।

৩। **কার্যকরী প্রয়োগসিদ্ধ উদ্দেশ্য**—যে প্রজেক্টটি জীবনে কার্যকরী এবং প্রয়োগসিদ্ধ সেই প্রজেক্টটিই সবচেয়ে সাফল্যলাভ করেছে বলা যেতে পারে।

৪। **মিতব্যয়িতা**—আমরা প্রজেক্টের কাজে আশা করি সবচেয়ে কম অপচয় ও অধিক সুফল। যে প্রজেক্টের কাজে ভাল ফল পাওয়া যাবে এবং যে কর্ম পরিচালনায় অপচয় হবে কম, সেই প্রজেক্টের কাজটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলা যায়।

প্রজেক্টের গুণাবলী (Merits of Project)।*

প্রজেক্ট পদ্ধতি যে বিশেষ কার্যকরী তা বহু শিক্ষাবিদই স্বীকার করে

* Q. What are the merits of Project method ?

নিয়েছেন। ফলে বর্তমান সময়ে অনেক বিদ্যালয়ে প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। প্রজেক্টগুলির মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত গুণ বা সুবিধা দেখতে পাই।

১। প্রজেক্ট পদ্ধতি শিখন নীতির উপর ভিত্তিগত।

আমরা থর্নডাইকের শিখনের তিনটি মূল নীতির কথা জানি, সেগুলি হচ্ছে—(ক) প্রস্তুতি সূত্র বা The Law of Readiness, (খ) অনুশীলনের সূত্র বা The Law of Exercise, (গ) ফলভোগের সূত্র বা The Law of Effect।

(ক) প্রস্তুতির সূত্র (The Law of Readiness)—শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সঞ্চার করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে শিশুদের মন উহা গ্রহণ করতে উৎসুক হয়েছে কিনা। প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা এই নীতি দেখতে পাই। আমরা দেখি যে কর্মের ইউনিট নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শিশু কর্মের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

(খ) অনুশীলন সূত্র (The Law of Exercise)—বারে বারে কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে কাজটি ভাল করে শেখা যায়। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে তার অবকাশ রয়েছে ; অতএব শিক্ষার্থী ভাল করে শিখতে পারবে।

(গ) ফলভোগের সূত্র (The Law of Effect)—এর অর্থ হচ্ছে শিখন প্রক্রিয়ার সাথে পরিতৃপ্তির একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। প্রজেক্ট পদ্ধতিতেও আমরা এই নীতির সাক্ষাৎ পাই। ছাত্রছাত্রীরা যদি কাজ করতে গিয়ে আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করে, তবে শিক্ষাও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

২। প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষাদান করে থাকি। জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন দুইই সম্পৃক্ত আছে এমনি নীতিতেই প্রজেক্টগুলি স্থির করা হয়। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিষয়গুলি ছাড়াও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা সম্বন্ধিতভাবে দেওয়া হয় এবং এই অবিচ্ছিন্নতা শিক্ষার্থীদের কাছে খুব হৃদয়গ্রাহী হয়।

৩। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা হচ্ছে গণতান্ত্রিক উপায় শিক্ষা। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সহযোগিতামূলক শিক্ষা কিভাবে পেতে হয়, তা জানতে পারে। এই পদ্ধতি শিশুদের সামাজিক করে তোলে এবং গণতান্ত্রিক জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৪। প্রজেক্ট পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা হচ্ছে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে

কর্ম সম্পাদন করতে শিক্ষা পেয়ে তাদের অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করতে পারে।

৫। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করলে শ্রেণী পাঠনার একঘেয়েমী থাকে না। শিক্ষার্থীরা আনন্দের মধ্য দিয়ে কর্ম করে এবং তার সাথে সাথে উপযুক্ত বিষয়ও শিক্ষালাভ করে।

৬। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কর্মে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। শিক্ষক প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করেন বটে, কিন্তু তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন না।

৭। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কার্যক্রমই শিক্ষার্থীদের উপর নির্ভর করে। ফলে তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও আত্মনির্ভরতা ইত্যাদি গুণাবলী সৃষ্ট হয়ে থাকে।

৮। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগে।

৯। এই পদ্ধতি মারফৎ সত্যিকার নাগরিকতা শিক্ষা দেওয়া হয়। কারণ নাগরিকতার বিভিন্ন গুণ, যথা স্বাধীনতাবোধ, নেতৃত্ব গ্রহণ, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা, অন্যের প্রতি মমত্ববোধ, অন্যের মতামতকে মর্যাদা দান প্রভৃতি গুণের বিকাশ হয়।

১০। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে বিষয় শিক্ষা, কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে, ক্লান্তিদায়ক হয় না।

১১। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা চিন্তা, যুক্তি, দক্ষতা দ্বারা সমস্যার সমাধান করে, তাদের সে ক্ষেত্রে কোন বিষয় আয়ত্ত করবার জন্য মুখস্থ বিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করতে হয় না।

প্রজেক্ট পদ্ধতির অসুবিধা।*

প্রজেক্ট পদ্ধতির নানা দিক থেকে সুবিধা থাকলেও এর বহুল প্রচলন হয় নি। তার কারণসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হল।

১। পাঠ্যসূচীর কোন কোন অংশ প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা গেলেও, সমগ্র পাঠ্যসূচী প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শেষ করা যায় না। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের ধারাবাহিক জ্ঞান দেওয়া চলে না। ফলে অনেক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তবে শ্রেণীপাঠনার অনুপূরক

* Q. What are the limitations of Project method ?

হিসাবে যদি প্রজেক্ট পদ্ধতির ব্যবহার করা যায়, তাহলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অনেক উন্নতি হবে।

২। প্রজেক্ট পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক শিক্ষকের ভুল ধারণাই এই পদ্ধতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা মনে করেন হাতের কাজ কিছুটা করাই হচ্ছে প্রজেক্টের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু তা যে সবটা সত্যি নয়, তা আমরা আগেই জেনেছি। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে একটি সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত থাকবে এবং তা স্থির করবে শিক্ষার্থীরাই, পরিকল্পনা ও কর্ম সম্পাদন করবে তারাই।

৩। গতানুগতিক ও মামুলি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষককে অনেক কম পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু একটি উৎকৃষ্ট প্রজেক্ট গড়ে তুলতে হলে যথেষ্ট পরিশ্রম ও সময়ের প্রয়োজন। প্রজেক্ট সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ শিক্ষকের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট প্রজেক্ট গড়ে তোলা সময়ের অপচয় মাত্র। এটাও শিক্ষকের ত্রুটি, পদ্ধতির ত্রুটি নয়।

৪। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে কর্মের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী থাকে যারা কাজে এগিয়ে যায় এবং কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করে, পক্ষান্তরে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন কোন শিক্ষার্থী কর্মের কোন দায়িত্বই গ্রহণ করে না এবং অন্যান্য কর্মী ছাত্রছাত্রীদের অন্তরালে থেকে কর্মে ফাঁকি দেয়।

৫। প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুযায়ী হাতের কাজের উপর গুরুত্ব থাকায়, বিষয়শিক্ষা ব্যাহত হয়।

৬। প্রজেক্টের কাজে নানা জিনিসের সমাবেশ প্রয়োজন। তাতে খরচও অনেক বেশি হয়। আমাদের দরিদ্র দেশে প্রজেক্টের ব্যয়ভার বহন করা বিদ্যালয়গুলির পক্ষে সম্ভব নয়।

৭। প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে শিক্ষার্থীরা প্রজেক্টের ইউনিট স্থির করে নেবে, যেখানে শিক্ষক হস্তক্ষেপ করবেন না। কিন্তু শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে তাদের উপর প্রজেক্টর ইউনিট স্থিরীকরণের ভার দেওয়া সমীচীন নয়।

৮। যে সব বিষয়-শিক্ষা করতে হলে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের প্রয়োজন, যে সব বিষয় প্রজেক্ট পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা করা চলে না।

৯। প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুসরণ করলে বিদ্যালয়ের সময়-তালিকা বিপর্যস্ত হয়, ফলে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়।

১০। আমাদের দেশে প্রজেক্ট পরিচালনা করবার জন্য উপযুক্ত পুস্তকের অভাব। তাই এটি অনুসরণ করা অসুবিধাজনক।

১১। শিক্ষার্থীদের যদি মাঝপথে বিদ্যালয় পরিবর্তন করতে হয়, অর্থাৎ প্রজেক্ট পদ্ধতিতে পরিচালিত বিদ্যালয় হতে সাধারণ বিদ্যালয়ে আসতে হয় কিংবা তার উল্টোটা হয় তা হলে শিক্ষার্থীদের চরম অসুবিধা হয়।

১২। সর্বশেষে বলা যেতে পারে যে প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা হলে তা মনস্তত্ত্বসম্মত হবে এবং থর্ণডাইকের শিখন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে আমরা যে দাবী করেছি, তা গেষ্টালিষ্টবাদীরা সমালোচনা করেছেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে এই তত্ত্বটি ভুল। আমরা যদি গেষ্টালিষ্ট-বাদীদের মতবাদ স্বীকার করে নিই, তা হলে প্রজেক্ট পদ্ধতির ভিত্তি নড়ে উঠবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

প্রজেক্ট পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা দুদিক লক্ষ্য করে একথা বলা যেতে পারে যে প্রজেক্ট পদ্ধতিকে একান্ত অন্ধভাবে অনুসরণ করা ঠিক হবে না। প্রজেক্ট পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে একমাত্র সর্বব্যাধিহর এরূপ দাবী করা উচিত নয়। কিন্তু তা হলেও এর সুবিধাগুলিকে একেবারে এড়িয়ে গেলেও চলবে না। আমাদের পক্ষে উচিত হচ্ছে মধ্য পথ অবলম্বন করা। প্রজেক্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা দরকার, কিন্তু এই পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে যে সব ফাঁক থেকে যাবে সেই ফাঁকগুলিকে পূরণ করতে হবে বিষয়-শিক্ষার মধ্য দিয়ে। একথা সত্যি যে কিছু শিক্ষার্থী কর্মের ক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের চাইতে হয়তো এগিয়ে যাবে। কিন্তু শিক্ষক ত সেখানে রয়েছেন। তিনি দেখবেন যে বিভিন্ন শিক্ষার্থীরা প্রয়োজন ও দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত হয়ে ঠিকমত কাজ করছে কিনা। তা ছাড়া সারা বৎসরে একটি শ্রেণীতে মাত্র একটি প্রজেক্টই পরিচালিত হবে না এবং বিভিন্ন প্রজেক্টের মধ্যে শিক্ষার্থীরা একই ধরণের কাজও করবে না। বিভিন্ন ধরণের কাজ তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, যাতে তারা বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও প্রজেক্ট পদ্ধতি—

বুনিয়াদী শিক্ষার শিল্প-কাজই হচ্ছে একটি বড় প্রজেক্ট। বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করার খুব সুযোগ রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় হাতের কাজের ব্যবস্থা আছে এবং হাতের কাজ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় সমাজ-সংযোগ খুব বেশি এবং শিক্ষার সমস্ত কাজের সঙ্গে জীবন সম্পৃক্ত। এদিকে বিষয়-শিক্ষায় প্রতি গুরুত্বও বুনিয়াদী শিক্ষায় কম নয়। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পগত প্রজেক্ট পদ্ধতির একটি বড় ত্রুটি আছে। এখানে একটি বা দুটি শিল্পকে অবলম্বন করে কাজ করতে হয়, এখানে কর্মের ইউনিট বেছে নেবার সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের আগ্রহ শিল্প-কাজে ততটা নাও থাকতে পারে। কিন্তু সমস্ত কাজ যদি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় এবং সমাজ জীবনের প্রধান চাহিদার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে শিক্ষার্থীদের মনে অনাগ্রহই বা সৃষ্টি হবে কেন? তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রজেক্ট পদ্ধতির মত একটি বিশেষ পদ্ধতি নয়। এটি জীবনযাপনের একটি উপায় মাত্র এবং এটি যে কোন শিক্ষণ পদ্ধতির থেকে অনেক বেশি ব্যাপক।

———

সপ্তম অধ্যায়
সংঘ পদ্ধতি

একটি প্রবাদের সঙ্গে সকলেই পরিচিত, 'একা না বোকা', অর্থাৎ একা একা কাজ করলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। পক্ষান্তরে "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ', অর্থাৎ অনেকে এক সাথে মিলে কাজ করলে কাজটি অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়। গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ক্রম-বিকাশের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পক্ষান্তরে সংঘস্বার্থ জাগ্রত করার দিকে, দলীয় মর্যাদা বৃদ্ধির দিকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা যাচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই একই চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ সংঘ পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বেশি।

সংঘ হল কিছু সংখ্যক লোক বা শিক্ষার্থী কোন উদ্দেশ্যে মিলিত অবস্থা। সংঘ পদ্ধতি বলতে বুঝায় একের অধিক শিক্ষার্থী মিলিত হয়ে, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সমস্যার বিভিন্ন দিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা করবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে উঠবে। এখানে শিক্ষক তাঁর উচ্চাসন থেকে শিক্ষার্থীদের স্তরে নেমে এসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

সংঘ পদ্ধতি পরিচালনার নিয়ম।

সংঘ পদ্ধতিতে সমগ্র শ্রেণীকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে সেই দলগুলি দিয়ে সমগ্র সমস্যার এক একটি সমাধানের চেষ্টা করা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দল বিভাগ অত্যন্ত কঠিন কাজ। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় দল বিভাগ করবেন। শিক্ষক হিতৈষী বন্ধু হলেও এখানে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্যই এগিয়ে আসবেন এবং তাদের সহযোগিতার ভিত্তিতেই যে দল বিভাগ করছেন এমন ব্যবস্থা করবেন। কর্মের উদ্দেশ্য হিসেবে সভ্যসংখ্যা এবং তার মান স্থির করা হবে। প্রত্যেক দলে থাকবে একজন দলনেতা ও একজন লিপিকার (Recorder)। দলের উপর ন্যস্ত বিষয়টি দলের শিক্ষার্থীসমূহ দলনেতার নেতৃত্বে আলোচনা করবে এবং প্রয়োজনবোধে তারা তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি (Resource person) হিসাবে শিক্ষকের সাহায্য নেবে। লিপিকার দলীয় আলোচনার বিষয়বস্তু

লিপিবদ্ধ করবে এবং শ্রেণীগত সাধারণ আলোচনা সভায় সকলের কাছে তা উপস্থাপিত করবে। শুধু দলীয় শিক্ষার্থী নয় সমগ্র শ্রেণী সেই সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করতে পারবে।

শিক্ষক শুধু হিতৈষীবন্ধু হলেও দল পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা গুরুত্ব-পূর্ণ। তাঁকে সব সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রত্যেক দলীয় সদস্য যেন আলোচনায় যোগদান করে। কেউ যেন নিষ্ক্রিয়ভাগে বসে না থাকে সেদিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। দল বিভাগের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক অবস্থা, সংখ্যা, পারদর্শিতা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে দল গঠন করবেন, তা হলে দলগুলির সমতা বজায় থাকবে। যদি কর্মের উদ্দেশ্য হয় প্রতিযোগিতামূলক তাহলে শিক্ষককে এমনিভাবে দল বিভাগে সাহায্য করতে হবে, যাতে কোনও প্রকার অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি না হয়। তা ছাড়া কোন শিক্ষার্থী হয়ত কোন বিষয়বস্তু তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে, আবার কেউ হয়ত তাড়াতাড়ি পারে না, সেক্ষেত্রে শিক্ষককে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। শিক্ষককে আরও বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, 'যার কাজ সেই যেন করে'।

সংঘ পদ্ধতি বিভিন্নভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে। এখানে কয়েকটি প্রচলিত সংঘ পদ্ধতির কার্যক্রম বিবৃত করা হল। যথা—

(১) কর্মশালা বা ওয়ার্কশপ পদ্ধতি (Workshop method),
(২) সেমিনার বা আলোচনা চক্র (Seminar method),
(৩) প্যানেল ডিসকাশান (Panel Discussion),
(৪) শিক্ষা শিবির পরিচালনা (Educational Camps),
(৫) প্রজেক্ট ইত্যাদি

আমরা এখানে পদ্ধতিগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

১। ওয়ার্কশপ পদ্ধতি ও কর্মশালা পদ্ধতি (Workshop Method)।*

ওয়ার্কশপ বলতে কারখানা বুঝায়। কারখানার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক কোথায় প্রশ্ন সকলের মনেই জেগেছে।

বর্তমান উচ্চতর মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে যে সংযোগ অতীতে

*Q. What is workshop method? How is teaching carried on by workshop method?

ছিল, তা আর এখন নেই। তাছাড়া অনেক বিদ্যালয়েই সকাল, দুপুর ও রাত্রিতে তিন শিফ্‌টে কাজ চলছে ফলে এগুলি প্রায় কারখানার আকারই ধারণ করতে চলেছে। তাছাড়া প্রাথমিক (elementary) শিক্ষা অর্থাৎ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা আবশ্যিক হয়ে গেলে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে তাতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। এই কারণেই বর্ধিত সংখ্যার ক্ষেত্রে যদি মধ্যপথ অবলম্বন করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি সংযোগরক্ষাকারী পদ্ধতির ব্যবস্থা করা যায় তাহলে উভয়ের পক্ষেরই মঙ্গল।

সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই ওয়ার্কশপ বা কর্মশালা পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছে। পদ্ধতিটি কি ও এর মূল লক্ষ্যই বা কি তা আমাদের জানা উচিত। তাছাড়া বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এর প্রয়োগ কতটা কার্যকরী তাও আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে। আমরা শ্রেণী শিক্ষণে লক্ষ্য করে দেখেছি, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের উপর পূর্ণ গুরুত্ব সব সময় দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই কারণেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন শিক্ষাবিদ ওয়ার্কশপ বা কর্মশালা পদ্ধতি নামে একটি শিক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে কোন সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের স্থান গৌণ, সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের নেতৃত্বকে খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, তিনি থাকবেন তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি (Resource person) হিসেবে ও বন্ধু হিসেবে। শিক্ষার্থীরা সমবেতভাবে নিজেরাই সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা এবং তার কার্যক্রম স্থির করবে, কিন্তু তারা যদি কোথায়ও আটকে যায়, তাহলে তারা তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি বা Resource person-এর সাহায্য অবশ্যই গ্রহণ করবে। পরিচালক বা Director দলের নেতারূপে কাজ করবেন এবং তাঁকে সাহায্য করবেন পরামর্শদাতারা (Consultants)। শিক্ষার্থীদের নিয়ে কর্মপরিষদ গঠিত হবে এবং শিক্ষক সেখানে তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি বা Resource person হিসাবে থাকবেন। পরামর্শদাতা ও পরিচালক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হবে। কর্মপরিষদের প্রথম সভাতে শিক্ষক দ্বারা সমস্যাটির বিভিন্ন দিক আলোচিত হবে এবং বিভিন্ন দিকের আলোচনার জন্য কয়েকটি উপদল গঠিত হবে। উপদলগুলি তাদের নির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা সভায় বসবে ও সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন উপদলগুলির নেতারা

তাদের মন্তব্যসমূহ কর্মপরিষদের সাধারণ সভায় পাঠ করবে। কর্মপরিষদের সকল সভ্য সমস্যাটির সমগ্ররূপ সম্বন্ধে অবহিত হবে, বিশ্লেষণ করবে এবং এর সমাধানে অগ্রণী হবে।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা উচ্চবিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণীগুলিতে কর্মশালা পদ্ধতিতে কাজ করে সুফল পাওয়া গিয়েছে। কর্মশালা পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমস্যা সমাধানে সক্রিয় অংশ করে থাকে। এখানে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান অন্বেষণ করে, তথ্যসংগ্রহ করে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তাছাড়া তারা দলগতভাবে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে দলবদ্ধভাবে কর্তব্য সম্পাদন করে এবং এর ফলে তাদের সামাজিক গুণও প্রকাশ পায়। তাছাড়া সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকে। এই কর্মশালা পদ্ধতি শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক। এছাড়া এটি শিক্ষাশ্রয়ী মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাশ্রয়ী সমাজ বিজ্ঞানের মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্মতৎপরতা, সহযোগিতা অনুসন্ধিৎসা, প্রতিযোগিতা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সহিষ্ণু প্রচেষ্টা দ্বারা শিক্ষার্থীরা নিজেদের ব্যক্তিত্বের বিকাশকে সহজেই সম্ভব করে। শিক্ষার্থীরা আগ্রহের ভিত্তিতে নানা জাতীয় কর্ম ও চিন্তন কার্য করে বলে তাদের মধ্যে অন্তর্জাত শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি হয়। কর্মশালা পদ্ধতিকে সার্থক করে তুলতে হলে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাগার, প্রয়োগশালা (labroatory) ইত্যাদি থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

কর্মশালা পদ্ধতির প্রয়োগ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীতে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ-বিদ্যা, বিজ্ঞান ইত্যাদি সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু এজন্য প্রথমতঃ শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ একান্তই প্রয়োজনীয়।

২। সেমিনার ও আলোচনা চক্র (Seminar)।*

শ্রেণীতে কোন মূল বিষয় সামগ্রিকভাবে আলোচনা করার পর বিস্তৃত আলোচনার জন্য মূল বিষয়কে কয়েকটি সংগতিপূর্ণ উপবিষয়ে ভাগ করা হয়। শ্রেণীকে উপবিষয় অনুযায়ী বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়। উপদলগুলি কিভাবে উপবিষয়গুলি আলোচনা করা হবে। তার জন্য Terms of Reference

* **Q. Explain Seminar Procedures in teaching.**

এবং Reference-এর জন্য পুস্তকাদি দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে তাদের দলনেতা ও লিপিকার নিয়ে বসে, আলোচনা করে, আলোচনার বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করে। প্রয়োজনবোধে উপদলীয় শিক্ষার্থীরা তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি বা Resource person বা শিক্ষকের কাছে যেতে পারে। শিক্ষক সেক্ষেত্রে সেই উপদলকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে সমৃদ্ধ করবেন। উপদলগুলি মাঝে মাঝে একসাথে মিলিত হয়ে পারস্পরিক আলোচনা করে তারা সমগ্রের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হয়েছে, তা জেনে নিতে পারে। এই ভাবে উপদলীয় আলোচনা নির্দিষ্ট দিন ধরে চলবে এবং শেষে সাধারণ শ্রেণী-সভায় শিক্ষকের সভাপতিত্বে বিবরণীগুলি পঠিত হবে। শিক্ষার্থীরা এই বিবরণীগুলির উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। সবশেষে শিক্ষক এই বিবরণীগুলির সারসংক্ষেপ করবেন এবং নিজ মন্তব্য প্রকাশ করবেন।

শিক্ষণ সংস্থায় বা মহাবিদ্যালয়ে একাজ আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে। ধরা যাক, গান্ধীজীর জন্মতিথিতে, গান্ধীজীর সমগ্র জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটি আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা হল। গান্ধীজীর শৈশব জীবন ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা পাশ পর্যন্ত, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজী ও গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা —এই চারটি ভাগে গান্ধীজীর জীবনকে বিভক্ত করে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চারটি দলে বিভক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। অধ্যক্ষ মূল সভায় কাজগুলি ভাগ করে দিলেন এবং Terms of Reference টাইপ (type) করে বিভিন্ন দলকে দিয়ে দিলেন আর প্রত্যেক দলের সঙ্গে একজন বা দুজন তথ্যজ্ঞ অধ্যাপক যুক্ত করে দিলেন। ৫ দিন কিংবা ৬ দিন পরে শেষ অধিবেশনে বিবরণী পাঠ, আলোচনা ও অধ্যক্ষের মন্তব্যের পর আলোচনা-চক্রের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে।

৩। প্যানেল ডিসকাশন (Panel Discussion)।*

এই পদ্ধতিতে একটি বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেবার জন্য কয়েকজন শিক্ষককে আহ্বান জানান হয়, এতে একজন সভাপতি থাকেন। আলোচ্য বিষয়টিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে শিক্ষকগণ একের পর এক বক্তৃতা দেন। সকলের বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে বিষয়টির

* Q. Write a note on Panel Discussion.

সামগ্রিক রূপ সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়। এর উপর শ্রোতৃবর্গের কিছুটা আলোচনা বা প্রশ্নোত্তরও চলতে পারে। সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় সমগ্র বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ করেন এবং নিজস্ব মন্তব্য রাখেন।

প্যানেল ডিসকাশন ট্রেনিং কলেজগুলিতে ভালভাবে চলতে পারে। যেমন ধরা যাক, বিদ্যালয়ের একটি সমস্যা—শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা। শৃঙ্খলাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে যথা, শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ, অন্তর্জাত শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা, স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার সমন্বয়ের উপায়, শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সমস্যা ইত্যাদি। শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের এক একজন অধ্যাপক শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিভিন্ন উপবিভাগকে অবলম্বন করে বক্তৃতা দিতে পারেন, পরে শিক্ষার্থীরা ঐ বিষয়ে আলোচনায় যোগদান করতে পারে এবং সর্বশেষে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমগ্র সমস্যাটির সারসংক্ষেপ করে নিজের মন্তব্য রাখতে পারেন।

৪। শিক্ষা শিবির পরিচালনা (Educational Camps)।*

অনেক সময়ে শিক্ষামূলক অভিপ্রায় নিয়ে কিছু শিক্ষক-শিক্ষার্থী একত্রিত হয়ে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারা শিক্ষা শিবিরে অতিবাহিত করে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হয়ে থাকেন। এই শিক্ষা শিবির বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সাধারণতঃ পরিকল্পিত হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কোনও সময়ে ঐরূপ শিক্ষা শিবিরে মিলিত হয়ে তাঁদের সমস্যার সমাধানে অগ্রণী হতে পারেন।

ধরা যাক, একটি সমস্যা—প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুপ্রবেশ করান।

এই সমস্যাটিকে অবলম্বন করে ত্রিশজন স্থানীয় শিক্ষক পনের দিনের জন্য একত্রিত হতে পারেন এবং সামুদায়িক জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলির অনুপ্রবেশের রীতিনীতিগুলি শিখে যেতে পারেন। তাঁরা শিবির স্থাপনার জন্য এরূপ স্থান বেছে নেবেন যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়টি সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করতে পারেন। এরূপ শিবির পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় বা বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থার সন্নিকটস্থ কোন স্থান নির্বাচন করলেই ভাল হয়। তবে নূতন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শুধু

* Q. Write a note on Educational Camps.

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ও শিক্ষণ সংস্থার কর্ম পরিচালনা পর্যবেক্ষণ করেই তথ্য আহরণ করবেন না, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ সম্ভব কিনা হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখবেন। শিক্ষণ সংস্থার অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ সক্রিয়ভাবে নূতন শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারবেন।

সমস্ত সমস্যাটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হবে। কতকগুলি সম্বন্ধে চলবে পর্যবেক্ষণ, কতকগুলি সম্বন্ধে চলবে যথা শিল্পকাজ, স্বায়ত্তশাসন, নীতিশিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে চলবে হাতে-কলমে কাজ করে শিক্ষা এবং অন্যান্য তত্ত্বগত ব্যাপারে বক্তৃতা এবং আলোচনা-চক্রের মাধ্যমে শিক্ষার কাজ চলবে। কয়েকজন দলনেতা শিক্ষার্থীদের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

শিক্ষা শিবির সম্পর্কিত সংঘ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মনের জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা দূর হয় এবং তাঁরা উৎসাহী, সচেষ্ট ও উদ্যমশীল হয়ে উঠে।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, উচ্চ বিদ্যালয়েও এরূপ শিক্ষা শিবির পরিচালিত হয় যেমন N. C. C. শিক্ষা শিবির।

৫। প্রজেক্ট ইত্যাদি।

এ ধরণের দলীয় কাজের কথা আমরা পূর্বেই বিবৃত করেছি।

ডেক্রলি পদ্ধতি (Decroly method)।*

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ওভাইড ডেক্রলি (Ovide Decroly) নামে একজন প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ একটি নূতন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এই শিক্ষা-পদ্ধতি ডেক্রলি পদ্ধতি নামে খ্যাত। ওভাইড ডেক্রলি প্রথম জীবনে একজন ডাক্তার ছিলেন এবং পরে মণ্টেসরীর মতই মানসিক রোগগ্রস্তদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

ডেক্রলি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি ঃ

ব্রাসেলসের কয়েকটি বিদ্যালয়ে ডেক্রলির শিক্ষা সম্বন্ধীয় মূলনীতি অবলম্বন করে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ডেক্রলি পদ্ধতির প্রধান বিশেষত্ব হল শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় জীবনযাপনের

---

* Q. What are the principles on which Decroly method is based ? What are the significant features of Decroly method ?

মধ্যে দিয়েই শিক্ষালাভ করবে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের আদর্শ পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। তাঁর শিক্ষা-নীতির মূল কথা হল শিক্ষার্থীদের জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে জীবনের জন্য শিক্ষালাভ। ডেক্রলি শিক্ষাপদ্ধতি পাঁচটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

১। শিশু একটি সজীব সত্তা, সে প্রতি মুহূর্তেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বয়সের প্রতি স্তরেই সে বিভিন্ন।

২। শিশু একটি সজীব সত্তা বলে সমাজ-জীবনের উপযোগী করে তার বৃদ্ধি সাধন প্রয়োজন।

৩। একই বয়সের শিশুদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান।

৪। বিভিন্ন বয়ঃক্রমের শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য দৃষ্ট হয়। এই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সমূহই শিশুর মানসিক কাজের সংগঠনের সহায়ক।

৫। শিশুর জীবনে সঞ্চালনমূলক আচরণই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলিকে সুবিবেচনার সঙ্গে পরিচালিত করা প্রয়োজন।

ডেক্রলি প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের স্বরূপ ও বিদ্যালয়ের কার্যপদ্ধতি :

১। ডেক্রলি পদ্ধতিতে পরিচালিত বিদ্যালয়ের সঙ্গে বর্তমানে আমেরিকায় প্রচলিত ওয়ার্কশপ বা কর্মশালা পদ্ধতির যথেষ্ট মিল রয়েছে। বিদ্যালয়টি স্বাভাবিক আদর্শ পরিবেশে স্থাপিত, বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ-সমূহ বক্তৃতার স্থান হিসাবে বিন্যস্ত থাকে না। কর্মশালা (ওয়ার্কশপ) কিংবা প্রয়োগশালার (Laboratory) মত শ্রেণীগুলি বিন্যস্ত থাকে।

২। প্রতিটি শ্রেণী বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত থাকে। প্রত্যেক দল বা ইউনিটকে একটি করে বিষয় শিখতে বা সে সম্বন্ধে আলোচনা করে লিখতে দেওয়া হয়। কক্ষগুলিতে যথেষ্ট সক্রিয়তা থাকে।

৩। শ্রেণীতে যে দলগুলি গঠিত হয় সেগুলি যথাসম্ভব সমজাতীয় হয়।

৪। শ্রেণীকক্ষে প্রত্যেকটি দল পরিচালনা করবার জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ থাকেন।

৫। শ্রেণীর উপদলসমূহ নিজ নিজ প্রচেষ্টায় তাদের সমস্যার সমাধান করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শ্রেণীর সমস্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবিদদের সম্মুখে তাদের বিবরণী পেশ করে। বিবরণী পেশ করবার

সময় তারা চার্ট, মানচিত্র, নক্সা ইত্যাদি দেখাতে পারে এবং যে যে পুস্তকের সাহায্য নিয়ে তারা বিবরণীটি লিখেছে, তার উল্লেখ করবে।

৬। যদি রিপোর্টটি যথেষ্ট তথ্যসম্বলিত না হয়, তাহলে ঐ উপদলকে পুনরায় বিবরণী লিখতে হয়।

বিবরণীটিকে শ্রেণীর অপর শিক্ষার্থীরা এবং উপস্থিত শিক্ষাবিদগণ সমালোচনা করতে পারেন এবং উপদলীয় শিক্ষার্থীরা সেই সমালোচনাকে যাতে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারে তার শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়। এতে শিক্ষার্থীদের সামাজিকতা-বোধ বৃদ্ধি পায়।

৭। ডেক্রলি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কারুর সাথে তুলনা করে কাউকে ভাল বা কাউকে মন্দ বলা হয় না।

৮। এই বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়ে একসাথে পড়ে। বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে।

৯। ডেক্রলি বিদ্যালয়ে পরীক্ষার নম্বর বা marks দেওয়ার অবকাশ নেই।

১০। এই বিদ্যালয়ে অভিভাবকের সাথে বিদ্যালয়ের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করাও ডেক্রলি বিদ্যালয়ের কাজ।

ডেক্রলি পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের চরিত্রের বহু ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণের উদ্ভব হয়ে থাকে। তাদের যুক্তভাবে কাজ করবার শক্তি, সহানুভূতি-বোধ, সামাজিক সচেতনতা, একক ও যৌথ দায়িত্ব-বোধ, সমালোচনা করবার ক্ষমতা ইত্যাদি বহু সদ্গুণের উন্মেষ হয়। এই শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা এসে যুক্ত হয়।

———

অষ্টম অধ্যায়

বুনিয়াদী শিক্ষা

(Basic Education)*

ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা ঃ

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস যখন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের নীতি কি হবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন এক সমস্যার উদ্ভব হয়। সমস্যাটি অর্থ-নৈতিক। মাদক দ্রব্য যদি বর্জন করতে হয়, তাহলে প্রাদেশিক আয় কমে যাবে এবং ফলে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারও হবে না। সাময়িকভাবে মাদক দ্রব্য বর্জন পরিকল্পনা করা হলে গান্ধীজীর সমর্থন মেলে না। বিকল্প হিসেবে তিনি শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন করবার জন্য সুপারিশ করেন। তিনি ঐ সময়েই বলেছিলেন যে প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা কোন হস্ত-শিল্পকে কেন্দ্র করে দিতে হবে। পূর্বে বৃত্তিশিক্ষা কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হত বটে, কিন্তু বর্তমানে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার কথা গান্ধীজী বললেন। এই হচ্ছে ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার কথা।

বুনিয়াদী শিক্ষা ঃ

গান্ধীজী প্রচলিত শিক্ষার দোষ-ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করে এমন একটি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলনের কথা বলেছিলেন, যে শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ববর্তী শিক্ষার দোষ-ত্রুটিগুলির অপসারণ করে ভারতকে শিক্ষার মাধ্যমে নূতন পথে নিয়ে যেতে পারবে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধা শিক্ষা সম্মেলনে চারিটি শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবগুলিই বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য। প্রস্তাবগুলি হচ্ছে—

(ক) অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে।

(খ) শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রিক।

(গ) মাতৃভাষাকে শিশুর শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে।

(ঘ) এই শিক্ষা নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষকদিগের ভাতা শিক্ষার্থীদের উপার্জন থেকে প্রদান করা হবে।

---

* Q. What are merits and defects of the Basic Education ?

এই প্রস্তাবসমূহকে কেন্দ্র করে একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করবার জন্য এই সম্মেলন একটি কমিটির উপর ভার অর্পণ করেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ডঃ জাকির হোসেন (Dr. Zakir Hussain)। জাকির হোসেন কমিটি দুমাসের মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। এরপর ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা আলোচিত হয় এবং ওয়ার্ধা শিক্ষা সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি ঃ

১। সাত বৎসরের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা—৭ বৎসর হতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষা আবশ্যিক হবে এবং তা হবে অবৈতনিক।

২। শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা—কোনও হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে শিক্ষা-দানের কাজ চলবে। শিল্পকাজ হবে উৎপাদনমূলক। এই শিল্পকাজটির শিক্ষাদানের প্রচুর সম্ভাবনা থাকবে। গান্ধীজী বলেন, "শিশুদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক সমস্ত শিক্ষা, তাদের যে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হবে, তার মাধ্যমে হবে। শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হবে। ইতিহাস, ভূগোল ও গণিতবিষয়ক পাঠসমূহ শিল্পের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হবে।"

৩। শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা—গান্ধীজীর মতে মাতৃভাষা শুধু শিক্ষার মাধ্যমই হবে না, অন্যান্য ভাষার মধ্যে শিক্ষার্থীর কাছে মাতৃভাষা হবে মুখ্য শিক্ষণীয় ভাষা। জাকির হোসেন কমিটিও গান্ধীজীর কথার পুনরুক্তি করে বলেছেন যে শিক্ষার ভিত্তি হবে মাতৃভাষা। ভাল করে পাঠ করা ও উত্তমরূপে প্রকাশ করার ক্ষমতা না জন্মালে, কারও চিন্তাধারা সুষ্ঠু ও সম্যক বিকাশলাভ করতে পারে না।

৪। বুনিয়াদী শিক্ষার অহিংস ভিত্তি—গান্ধীজীর অহিংস নীতি অনুযায়ী শিক্ষার মাধ্যমে নূতন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং সেখানে একে অপরকে শোষণ করতে পারবে না।

৫। বুনিয়াদী শিক্ষায় স্বাবলম্বনের ভিত্তি—দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহণ করা যে কত কঠিন, সে সম্বন্ধে গান্ধীজী ভালভাবেই অবহিত ছিলেন। দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক

ও বাধ্যতামূলক করার দায়িত্ব সরকারের এবং সরকার সেই বাবদে অর্থব্যয় করতে বাধ্য। কিন্তু তখন সরকার ছিল বিদেশী সরকার। তার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ অর্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব। এই কারণেই গান্ধীজী শিক্ষাকে আত্মনির্ভরশীল করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার্থীরা হস্তশিল্পের মাধ্যমে যা উৎপাদন করবে তাতে বিদ্যালয়ের ব্যয়বহণ করা সম্ভব হবে, এই ছিল গান্ধীজীর বিশ্বাস।

৬। **জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্তের নীতি**—শিল্প জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে। বুনিয়াদী শিক্ষা অবিভাজ্য নীতি অবলম্বন করে শিক্ষা, অর্থাৎ অনুবন্ধ প্রণালী অবলম্বন করে সামগ্রিক শিক্ষা।

৭। **যৌথকর্মের ভিত্তি**—বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় যৌথকর্মের ব্যবস্থা রয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে সুনাগরিকতার বিকাশ সম্ভব।

বুনিয়াদী শিক্ষণ পদ্ধতি ঃ

বুনিয়াদী শিক্ষা কোন একটি বিশেষপদ্ধতি নয়, এটি জীবনধারণের একটি উপায় মাত্র, একথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

তবু বুনিয়াদী শিক্ষানীতি থেকে যে পন্থা অবলম্বন করে শিক্ষাকার্য সম্পন্ন হয় তা দেখতে গিয়ে আমরা শিক্ষণ পদ্ধতির কিছু অবতারণা করতে পারি। বুনিয়াদী নীতি অনুযায়ী যে শিক্ষণ পদ্ধতিতে আমরা পৌছুতে পারি, তা হচ্ছে বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি। এর সাথে প্রজেক্ট পদ্ধতির কিছুটা মিল আছে। বুনিয়াদী শিক্ষণ পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

(১) হাতে-কলমে শেখা।

(২) বাস্তব জিনিসমূহ নাড়াচাড়া করে শিক্ষা।

(৩) অনুবন্ধ প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা।

(৪) আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি।

মামুলি শিক্ষণ পদ্ধতিতে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে, এটা একান্তই তাত্ত্বিক। শিশুদের মুখস্থ করে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে হয়। হয়ত বিষয়বস্তু এমন সব থাকে যার সাথে শিশুর জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে শিশুরা সে সব বিষয় শিখতে আনন্দ বা আগ্রহ প্রকাশ করবে কেন? বুনিয়াদী

শিক্ষণে শিক্ষার জীবন সম্পর্ক উদ্দেশ্য থাকে এবং শিক্ষাও শিশুর কাছে অর্থপূর্ণ হয়। শিশু কোনও হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে। সে বস্তুসমূহ নেড়েচেড়ে দেখে এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা করে। সে উৎপাদন করে এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়াসমূহের সাথে পরিচিত হয়। সে প্রতিটি জিনিসের উপাদানের সাথে পরিচিত হয় এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করে সব কিছু শিক্ষা করে। শিশু শুধু নেড়ে চেড়ে দেখে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কোন জিনিস সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে না, সে জিনিসগুলোর মাধ্যমে শিক্ষালাভও করে। শিশু যা উৎপাদন করে সেগুলো খেলনা নয়, কাজের জিনিস, প্রয়োজনীয় জিনিস—শুধু নিজের কাছে নয়, সমাজের কাছেও বটে। উৎপাদন করে স্বাভাবিক আনন্দ লাভ করে বলে সে কাজ করতে আগ্রহও বোধ করে। অতএব গান্ধীজীর শিল্পাশ্রয়ী কর্মের নীতি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ এবং শিক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে এর সম্ভাবনা সীমাহীন।

অনুবন্ধ প্রণালী (Correlation method): *

বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্রে রয়েছে একটি শিল্পকাজ। এই শিল্পকাজকে কেন্দ্র করে অন্যান্য পাঠ্যবিষয় শেখা—এই হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষণ পদ্ধতির অভিনবত্ব।

কি করে হাতের কাজের মাধ্যমে মনকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তা বুঝাবার জন্য গান্ধীজী শ্রীমতী আশা আর্যনায়কমকে বলেছিলেন, "পুরাতন রীতি ছিল বিদ্যালয়ে প্রচলিত সাধারণ পাঠ্যক্রমের মধ্যে হস্তশিল্পের যোগ সাধন করা এবং শিল্পকে শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে গ্রহণ করা। আমার কাছে এটি মারাত্মক ভুল বলে মনে হয়। শিশুকে অবশ্যই শিল্পকাজ করতে হবে এবং সেই শিল্পের সঙ্গে তার জ্ঞানকে সম্বন্ধযুক্ত করতে হবে। শিক্ষক যে শিল্প বেছে নেবেন, দেখতে হবে তার মাধ্যমে তিনি যেন শিশুদের অন্যান্য বিষয়ও শিক্ষা দিতে পারেন। সুতা কাটার দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়। আমি যদি গণিত না জানি তাহলে তকলিতে কত তার সুতা কাটলাম বা কত পরিমাণ সুতা কাটা হল তা কিছুই বুঝতে পারব না। এই সমস্ত বুঝতে হলে আমাকে অঙ্ক শিখতে হবে এবং আমাকে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ অঙ্ক শিখতেই হবে। দুরূহ অঙ্ক শিখতে হলে আমাকে সঙ্কেতের ব্যবহার করতে হবে। কাজেই বীজগণিত শিক্ষা করবারও দরকার হবে।"

---
* Q. Describe the effectiveness of Correlation method.

এইভাবে গান্ধীজী সূতা কাটার মধ্য দিয়ে জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার কথা বলেছেন।

বুনিয়াদী শিক্ষা হচ্ছে জীবনের জন্য শিক্ষা। বুনিয়াদী শিক্ষায় পাঠ্যক্রম বলতে শুধু কতগুলি পুস্তকের নামের তালিকা নয়। বয়সজনোচিত সমস্ত কর্ম ও অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে পাঠ্যক্রম রচিত। এটি ক্রমবর্ধমান শিশুর বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত বলেই এর অভিনবত্ব বেশি। এরূপ পাঠ্যক্রমের মধ্যে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কোন বিষয়-শিক্ষাই বিভাজ্য নীতি অনুযায়ী শিক্ষণীয় হবে না।

শিশুর জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশু তার সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবে এবং পক্ষান্তরে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে এমনভাবে রূপায়িত করবে যাতে তারা তার জীবনের সাথে খাপ খায়।

শিশু এই দুই ধরণের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কাজে কতটা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে তার সূত্র অনুসরণ করতে হলে, যেতে হবে তার শিক্ষার ধারার কাছে। তার সমস্ত বিষয়শিক্ষা ও কর্মাশ্রয়ী শিক্ষা এই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। শিল্পকাজই এই উদ্দেশ্যে পৌছানোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উদ্দীপক বলা যেতে পারে। শিল্পকাজ শিশুর প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত। শিশু তার শিল্পকাজের জন্য যাবতীয় কাঁচা মাল পাচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশের কাছ থেকে। অতএব সে প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে জানতে স্বাভাবিক আগ্রহ-বোধ করবে। পক্ষান্তরে সে শিল্পকাজ করে কিছু উৎপাদনও করবে। উৎপন্ন দ্রব্যাদি সামাজিক প্রয়োজনে উৎপাদিত, অতএব সে সামাজিক পরিবেশের সাথেও যুক্ত হয়ে যায়। এইভাবে শিশু তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠে।

সূতা কাটার কথায় আবার ফিরে আসা যাক। শিশুরা সূতা কাটবে। কাঁচা মাল কি? তুলো। তুলো কিভাবে উৎপাদন হবে? এর জন্য জমি, বীজবপন, সেচ ইত্যাদি প্রয়োজন। তুলো হল। তারপর তুলো হতে সূতা কাটা। সূতা কাটা হলে সূতোর মাপ, কতটা সূতা তৈরি হল ইত্যাদি। সূতা রঙ করে কাপড় বোনা, তাতে আবার নানারকম নক্সা করা হবে। এসমস্ত কাজগুলি হতে শিশুরা নানা জ্ঞান প্রসঙ্গক্রমে অর্জন করে। তুলো চাষের জন্য জমির ব্যবস্থায় শিশুরা শেখে প্রকৃতি বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা। কোথায় ভাল তুলো হয় জানতে গিয়ে শিশুদের ভূগোল জানতে হয়। তুলোর পাতা,

ফুল ইত্যাদি জানতে গিয়ে শিশুদের জানতে হয় উদ্ভিদবিদ্যা। কাপড় তৈরি করার সাথে সাথে শিশুরা শিখবে পরিধেয় বস্ত্রের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব। কাপড়ের মধ্যে নানা প্যাটার্ণ ফুটিয়ে তোলার মধ্য থেকে শিশুরা জানবে অঙ্কন ইত্যাদি। তাছাড়া এর মধ্যে যে গাণিতিক হিসাব কত আছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। এইভাবে একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে শিশুরা ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য, মাতৃভাষা, গণিত ইত্যাদি বহু বিষয় জানতে পারে।

অনুবন্ধ প্রণালীর অসুবিধা ঃ

অনুবন্ধ প্রণালী তত্ত্বের দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ সে বিষয়ে মতভেদ নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এটি কার্যকরী করতে বিশেষ অসুবিধা দেখা যায়। যেমন একটি মাত্র মূলশিল্পকে অবলম্বন করে পাঠ্যক্রম শেষ করা সম্ভব হয় না। তাই অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান করলে সমগ্র পাঠদানই অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়ায়।

এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য মূল শিল্পের সাথে অন্যান্য শিল্প এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা পরে নেওয়া হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদনমূলক কাজ বনাম সৃজনাত্মক কাজ (Productive and creative work in Basic Education)।*

বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদনমূলক কাজের সম্পর্কে অনেক শিক্ষাবিদ বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু কর্মকে তারা কেউ উপেক্ষা করেন নি। কর্ম মানে সৃজনাত্মক কর্ম, যার মধ্যে সৃষ্টির উপাদান বর্তমান, কিন্তু অর্থকরী উপাদানের লেশ মাত্র নেই।

কিন্তু উৎপাদনমূলক কর্ম যদি কর্মীর উপর চাপিয়ে না দেওয়া হয়, তাহলে সে কর্ম, সৃজনাত্মক কর্মপ্রেরণার কখনও পরিপন্থী হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সৃজনাত্মক কর্মপ্রেরণা উৎপাদনমূলক কর্মেরই কার্যকরী রূপ।

প্রথমতঃ যখন উৎপাদনমূলক কর্ম, সৃজনাত্মক কর্ম প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত না থাকে, তখন উৎপাদনমূলক কর্ম শুধু যান্ত্রিক কর্মে পর্যবসিত হয়।

* Q. Explain the productive and creative aspects of Basic Education.

দ্বিতীয়তঃ, যখন উৎপাদনমূলক কর্ম শ্রমিকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন তার মধ্যে সৃজনাত্মক প্রেরণাবোধ থাকে না। কর্মী উৎপাদন করে বাইরের শক্তির প্রভাবে। যে মন-প্রাণ ঢেলে কাজ করতে অপারক হয়।

তৃতীয়তঃ, যান্ত্রিক কাজে যে একঘেয়েমি, তাতে কর্মীর স্বাভাবিক প্রেরণা নষ্ট হয়। যখন যে দিনের পর দিন একই কাজ করে যায়, তখন তার মধ্যে কর্মস্পৃহা বিলুপ্ত হয়ে যাবে তাতে আর সন্দেহ কি?

চতুর্থতঃ, এইরূপ একঘেয়ে কর্মের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি এসে পড়ে।

কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদনমূলক কাজের কথা স্বতন্ত্র।

—প্রথমতঃ কারখানায় যে জাতীয় কর্মব্যবস্থা, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তা নেই। বুনিয়াদী শিক্ষায় কয়েকটি শিল্পকাজের ব্যবস্থা আছে মাত্র। শিশু কারখানার শ্রমিক নয়, সে একজন শিশুশিল্পী মাত্র। সে যা কিছু উৎপাদন করে, তার সাথে তার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। তাছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষায় সেই সব শিল্প-কর্মেরই ব্যবস্থা আছে, যেগুলির তাদের ও সমাজের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এবং যার মধ্যে শিক্ষাগত সম্ভাবনাও প্রচুর। ফলে এইসব কর্মের মধ্যে সৃজনাত্মক প্রেরণা-বোধ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উৎপাদনমূলক কাজ করতে শিশুরা বিশেষভাবে আগ্রহ অনুভব করে, কারণ শিশুর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের উপর নির্ভর করেই শিল্পকাজ স্থির করা হয়।

তৃতীয়তঃ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিল্পকাজ শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুসৃত হয়। শিশুরা উৎপাদনের সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি শিক্ষা করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সমস্ত স্তরের সাথে অনুবন্ধ প্রণালীতে অন্যান্য বৌদ্ধিক বিষয়গুলিও শিশুরা শিক্ষালাভ করে থাকে। এই জাতীয় শিক্ষা 'গতিশীল' শিক্ষা।

শেষকালে বলা যেতে পারে যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্পকাজ শিশুদের সতেজ করে তোলে। এখানে ক্লান্তির কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। এখানে কর্ম সারাদিন ধরে চলে না, চলে নির্দিষ্ট সময়ে। শিল্পকাজের মধ্যে শরীর ও মন একসাথে চলে। বরং বৌদ্ধিক শিক্ষার ফলে যে ক্লান্তি আসে, তার অপনোদন হয় শারীরিক শ্রমের ফলে।

বুনিয়াদী শিক্ষানীতির সামান্য পরিবর্তনের ফলে নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিকে অনুবন্ধ প্রণালীর কেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

(ক) মূল শিল্পগুলি হল বস্ত্রশিল্প, কৃষিশিল্প, দারুশিল্প ও কামারশিল্প।

(খ) কতকগুলি ক্ষুদ্রতর শিল্প যথা, চিত্রশিল্প, খেলনা-শিল্প, মৃৎশিল্প, চর্মশিল্প, কার্ডবোর্ড-শিল্প, উদ্যান-শিল্প, জ্যাম তৈরি শিল্প, সাবান-শিল্প, বাঁশ-বেতশিল্প, কার্পেট-শিল্প ইত্যাদিও অনুবন্ধ প্রণালীর আওতায় আনা হয়।

(গ) শিশুর প্রাকৃতিক পরিবেশ।

(ঘ) শিশুর সামাজিক পরিবেশ।

(ঙ) ফটোগ্রাফ তোলা, এ্যালবাম তৈরি।

(চ) বিভিন্ন ধরণের প্রজেক্ট, সমবায় সমিতি ইত্যাদি কার্যাবলীও অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষণলাভে সাহায্য করবে বলে মনে করা হয়।

আরও পরিবর্তন দেখা গেল শিল্পকাজের সময় নিয়ে। পূর্বে শিল্পকাজ ও অনুবন্ধ প্রণালীতে বিষয় শিক্ষার জন্য দেওয়া হত তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিট সময়। তা পরিবর্তন করে করা হল আড়াই ঘণ্টা।

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা তথা পদ্ধতির গুণাবলী।

বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি যে শিশুকে সামগ্রিক অগ্রগতিতে সাহায্য করে, তা কিভাবে জানা যায়?

১। বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিশুরা উদ্দেশ্য-মূলক শিক্ষালাভ করতে পারে। এর ফলে জানা যায় এই শিক্ষা কতখানি ফলপ্রসূ।

২। বুনিয়াদী শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বুনিয়াদী শিক্ষা জীবনের শিক্ষা, জীবনের জন্য শিক্ষা ও জীবনের মাধ্যমে শিক্ষা। এই শিক্ষা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত আনন্দমূলক অভিজ্ঞতা এবং এই শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি হয়।

৩। বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি শিশুর স্বাভাবিক চাহিদার পরিপূর্তি ঘটায়। শিশুর কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি আছে যেগুলি শিশুদের মধ্যে বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়। শিশু কিছু গঠনমূলক কাজ করতে চায়; বুনিয়াদী শিক্ষায় তার ব্যবস্থা রয়েছে। শিশু আত্মজাহির করতে চায়। শিশুরা উৎপাদনমূলক কাজের মাধ্যমে সেই আত্মজাহির করার প্রচেষ্টাকে

প্রকাশ করে। শিশুরা সকল কাজে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। ঔৎসুক্যের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান।

৪। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে হাতে-কলমে কর্ম সম্পাদন করতে হয় তাই তাদের অভিজ্ঞতা সুদৃঢ়ভিত্তিক হয়।

৫। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে যে শিল্পকাজটি নির্বাচিত হয় তার সৃজনাত্মক ও সামাজিক মূল্য যথেষ্ট। অতএব শিশু ঐ শিল্পকাজটি সম্পাদন করার মধ্য দিয়ে সামাজিক কল্যাণের নীতি অনুসরণ করবে।

৬। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশু উৎপাদন করে এবং তার উৎপাদিত বস্তুর অর্থকরী মূল্য আছে। সে স্ব-নির্ভর হতে শেখে।

৭। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কায়িক শ্রমের স্থান গুরুত্বপূর্ণ থাকায় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শ্রমের মর্যাদা দান করা হয়েছে।

৮। শিক্ষায় কর্মের স্থান থাকায় তত্ত্বমূলক শিক্ষার একঘেয়েমি নষ্ট হয়েছে।

৯। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা মামুলি পুঁথিগত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে অনেক বেশি বাস্তবধর্মী।

১০। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর বৃত্তিশিক্ষার দিকে ঝোঁকের সৃষ্টি হয়।

১১। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষায় গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

১২। এই শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তার বিকাশ লাভ হয়ে থাকে।

১৩। বুনিয়াদী শিক্ষা সামাজিক পরিবেশে সম্পন্ন হয় বলে প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই সামাজিকতা-বোধ জাগ্রত হয়; সহযোগিতা, নেতৃত্ব স্বীকার, আত্মত্যাগ ইত্যাদি গুণের অধিকারী তারা হয়।

১৪। শিশুরা হস্তশিল্পের মাধ্যমে তথা কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষা গ্রহণ করে বলে শিক্ষা হয় দীর্ঘস্থায়ী।

বুনিয়াদী শিক্ষার ত্রুটি।

১। বুনিয়াদী শিক্ষা সভ্যতার ঘড়ি বা অগ্রগতিকে পিছিয়ে দিয়েছে। এই পরমানবিক যুগে আমরা লাঙল ও হস্তশিল্পের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি।

২। বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রামীণ অবস্থাতেই বিশেষভাবে যুক্ত। সর্ব শ্রেণীর শিশুদের জন্ত নয়।

৩। বুনিয়াদী শিক্ষা আধ্যাত্মিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে নি, ধর্মনিরপেক্ষতার অজুহাতে গান্ধীজী ধর্মশিক্ষাকে পাঠ্যক্রমে স্থান দেন নি।

৪। বুনিয়াদী শিক্ষায় উৎপাদন করতে গিয়ে শিশুদের উপর এত শ্রমের চাপ দেওয়া হয়েছে যে তারা হয়ে দাঁড়িয়েছে শিশু শ্রমিক।

৫। বুনিয়াদী শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ।

৬। আমাদের এই বৃহৎ শিল্পের যুগে বুনিয়াদী শিক্ষার হস্তশিল্প অভিপ্রেত নয়।

৭। বুনিয়াদী শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, কারণ অনুবন্ধ প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষাদান সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়।

৮। ইংরেজী ভাষাকে অবহেলা করার দরুণ আমরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছি।

৯। মাত্র একটি মূল শিল্প প্রথমে শিশুদের অনুসরণ করতে হত, ফলে তাদের সক্রিয়তাকে সীমায়িত করা হত। বর্তমানে সক্রিয়তার সীমা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হল অনুবন্ধ পদ্ধতি। কিন্তু একটিমাত্র মূল শিল্পকে অনুবন্ধ পদ্ধতির অনুযায়ী অনুসরণের ফলে অনেক সময়েই পাঠদান অসম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন হয়ে দাঁড়ায়। বুনিয়াদী শিক্ষাকে এরূপ বহু সমালোচনায় সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি সমালোচনারই উত্তর দেওয়া চলে।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় বুনিয়াদী শিক্ষার যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে তবে তা শিক্ষার পরিকল্পনার মধ্যে নিহিত নেই, তা আছে এই শিক্ষার বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে। পরিকল্পনা ও রূপায়ণের মধ্যে বিরাট ব্যবধান তৈরি হয়েছে, ফলে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এই শিক্ষাকে ত্রুটিপূর্ণ বলা হয়েছে।

বর্তমান প্রগতিশীল শিক্ষার সমস্ত নীতিগুলিই এই বুনিয়াদী শিক্ষায় সমর্থন লাভ করেছে। এমন কি অতি আধুনিক ধারণা 'Work Experience' (কোঠারী কমিশন) তাও এই শিক্ষার মধ্যে আছে। কাজেই এই শিক্ষা একেবারে অকেজো একথা না বলে—এই শিক্ষাকে কেমন করে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করে গ্রহণযোগ্য করা যায় তার কথা চিন্তা করতে হবে।

নবম অধ্যায়

প্রগতিমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি

(Progressive methods of Teaching)*

বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কোন একটি পদ্ধতিই প্রগতিমূলক শিক্ষণ পদ্ধতির পর্যায়ে গিয়ে পড়ে না। তবে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতির প্রগতিমূলক নীতি ও প্রবণতাগুলিকে যদি বিশ্লেষণ করে সন্নিবেশিত করা যায়, তাহলে হয়ত প্রগতিমূলক শিক্ষণ পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন পদ্ধতি এমনভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে যার ভেতর নিম্নলিখিত শিক্ষানীতিগুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

১। নূতন বা প্রগতিমূলক শিক্ষণ পদ্ধতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া। প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দিয়ে শিশুকে শিক্ষায় অগ্রণী হতে দিতে হবে। মণ্টেসরী পদ্ধতি বা ডালটন পরিকল্পনায় সে সুযোগ আছে। শিশু থাকবে সকল প্রকার শিক্ষা ও কার্যক্রমের কেন্দ্রে। অতএব প্রগতিমূলক শিক্ষণ পদ্ধতিতে আগ্রহ বিষয়বস্তু হতে শিশুতে স্থানান্তরিত করতে হবে। অর্থাৎ শিশু শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে শিশু জীবন্ত এবং তার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সম্ভাবনা লুক্কায়িত রয়েছে, এই কারণে শিক্ষণ পদ্ধতি শিশুর পক্ষে উপযোগী হবে। শিক্ষণের এই দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে প্লেটো (Plato) বলেছিলেন, 'Nature is more important than Nurture. It is the function of education to provide nurture for innate human nature।

২। দ্বিতীয়তঃ, প্রগতিমূলক শিক্ষণ পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব। একথা প্রথম নীতিরই অনুপূরক হিসেবে ধরা যেতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে যারা প্রগতিপন্থী, তাঁরা সবাই বলেন যে শিশু কর্মচঞ্চল। এই কর্মচঞ্চলতা তাদের সহজাত। শিশু শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীর বাইরেও সর্বদাই নানাবিধ কর্মে প্রবৃত্ত থাকে। কর্মগুলি বৌদ্ধিক, শারীরিক, আবেগ-জনিত ও ইন্দ্রিয় অনুভূতি সম্বন্ধীয়, কাজের মধ্য দিয়েই শিশু তা শিক্ষালাভ

* Q. What are the salient features of the progressive methods of teaching?

করে। প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে প্রগতিশীল পদ্ধতি অনুযায়ী শিশুদের জন্য কর্মের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেই কর্মের মধ্য দিয়েই শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির বিকাশ হয়।

৩ প্রগতিমূলক পদ্ধতি শিক্ষাধারার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, শিশুর সঙ্গে সমাজের যোগাযোগ। শিশু ব্যক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু তার পটভূমিকা হচ্ছে সমাজ। তাই প্রগতিশীল শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়, গৃহ ও সমাজ ওতপ্রোতভাবে সংযোজিত করে।

৪। প্রগতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, সহযোগিতামূলক কর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ। তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের অনুপূরক হিসাবে এই বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করা চলে। শিক্ষার্থীর সামাজিকতা-বোধ বৃদ্ধি হবে কি করে? যদি শিশুদের সহযোগিতামূলক কর্মে প্রবৃত্ত করা যায়, তাহলে তারা সহজেই একে অন্যের সাথে মিলে মিশে কাজ করতে শিখবে এবং তা হলেই তাদের মধ্যে সমাজ-বোধ জাগ্রত হবে। তাছাড়া প্রগতিশীল শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে ত লক্ষ্য রাখা হয়েছেই। তাই রাইবার্ণ (Ryburn) বলেছেন, "the new education deals with the individual as an individual in a social group, while never losing sight of the task of developing social consciousness।"

৫। প্রগতিশীল পদ্ধতিতে শিক্ষকের মর্যাদাকে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। শিক্ষক পূর্বে ছিলেন শ্রেণীকক্ষে একনায়ক। তাঁর ছিল অসীম ক্ষমতা, এখন তিনি সে স্থান হতে নেমে এসেছেন। তিনি এখন প্রায় শিক্ষার্থীর স্তরে পৌঁছে গেছেন, হয়েছেন শিক্ষার্থীদের ভ্রাতা, বন্ধু ও পরিচালক।

৬। প্রগতিশীল শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণকালে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই একটা পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গী জন্মে থাকে। কোন কিছুকেই একান্ত সত্য বলে উভয়েই গ্রহণ করতে নারাজ। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, জীবনের ক্ষেত্রেও তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যত্যয় দেখা যায় না। এর উৎস কোথায়? শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই প্রগতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ইত্যাদি করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অতএব তাঁদের দৃষ্টিকোণ যে সেই পথা বলম্বী হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

৭। প্রগতিমূলক শিক্ষণ পদ্ধতির অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সৃষ্টি, যাতে সকলে গণতান্ত্রিক জীবনযাপন করতে পারে। ঐ গণতান্ত্রিক জীবনের পরিবেশ হবে স্বাধীনতা। সেখানে শিশুর স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের সুযোগ থাকবে।

তাছাড়া প্রগতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে সকল শিক্ষণ পদ্ধতির মনস্তত্ত্ব-সম্মত বৈশিষ্ট্যগুলির যথার্থ সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

গতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ (Dynamic methods of Teaching)।*

প্রগতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতিকে মুদালিয়র কমিশনে Dynamic methods of teaching আখ্যা দেওয়া হয়েছে। Dynamics method বা গতিশীল পদ্ধতি কোন বিশেষ পদ্ধতি নয়। বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে যে সমস্ত বিষয় ভাল ও মনস্তত্ত্বসম্পন্ন তাই নিয়েই Dynamic methods রূপ পরিগ্রহ করেছে। মুদালিয়র কমিশন কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি যথা, হার্বার্টীয় পদ্ধতি বা প্রজেক্ট পদ্ধতি ইত্যাদির কোনটিকে বিশেষ করে অনুসরণের সুপারিশ করেন নি। গতিশীল জগতে, ততোধিক গতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় যা শ্রেয় ও প্রেয় তাকেই অবলম্বন করে শিক্ষা দেবার কথা সুপারিশ করেছেন।

Dynamic methods সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ। সংক্ষেপে তা বিবৃত করা গেল।

(ক) শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজের জন্য উপযুক্ত অভ্যাস ও মনোভাব গঠন।

(খ) বাস্তব জিনিসের মাধ্যমে শিক্ষাদান।

(গ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুচিন্তন ও আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন।

(ঘ) উপযুক্ত গৃহকাজের ব্যবস্থা।

(ঙ) শিক্ষার্থীদের আগ্রহের সীমা বর্ধন।

(চ) বিভিন্ন বৌদ্ধিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ।

(ছ) Assignment বা নির্দিষ্ট কাজ শিক্ষার্থীদের দ্বারা করানো।

সংক্ষেপে এগুলিই হচ্ছে মুদালিয়র কমিশনের 'গতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতি'র বা Dynamic methods of teaching-এর সারসংক্ষেপ।

---

* Q What are the dynamic methods of teaching recommended by Mudaliar Commission?

এগুলির সাথে প্রগতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হয়েছে, তার যথেষ্টই মিল আছে।

অতএব উপরে যে সমস্ত কথা আলোচনা করা গেল, তা থেকে আমরা শুধু একটি সিদ্ধান্তেই আসতে পারি এবং সেটি হচ্ছে আমরা শিক্ষণের ক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি বা পদ্ধতিসমূহের সমন্বয়-রূপ প্রয়োগ করব, যাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করে। সাফল্যের কষ্টিপাথরে বিচার করে দেখলেই প্রগতিশীল পদ্ধতির রূপটি আমাদের কাছে পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হবে।

সার্থক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Criteria of a Good Method)।*

শিক্ষাপদ্ধতির নীতি কি হওয়া উচিত এবং পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে কি কি সূত্রের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে সে কথা আমরা আলোচনা করেছি।

নীতি ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তম পদ্ধতি কি রূপ পরিগ্রহ করবে, তা একবার ভেবে দেখা যাক।

(১) **শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বনের মধ্য দিয়ে যথার্থরূপ পাবে**—শিক্ষকের দেখতে হবে যে, যে শিক্ষাপদ্ধতি তিনি বিষয়বস্তু শিক্ষাদানের জন্য অবলম্বন করেছেন, সেই পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে যেন তিনি শিক্ষাদানক্ষেত্রে যে লক্ষ্যপথে চলেছিলেন, সেই লক্ষ্যে যেন যথার্থরূপে পৌছান চলে। নানারকম শিক্ষাদান পদ্ধতি আছে, যথা জ্ঞানমূলক পাঠ, নৈপুণ্যমূলক পাঠ ও রসানুভূতিমূলক পাঠ ; প্রত্যেকটির পাঠদান পদ্ধতি ভিন্ন হবে ; যেহেতু তাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যও ভিন্ন। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক পদ্ধতিই কিভাবে লক্ষ্যে পৌছানোর সহায়ক হয়, তা দেখতে হবে।

(২) **উপযুক্তভাবে পরিকল্পিত হবে**—শ্রেণীর শিশুদের উপযুক্ততা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। এবং সেজন্য সর্বার্থসাধক পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনার ত্রুটি থাকলে শিক্ষাদানকার্য ব্যাহত হবে।

(৩) **পদ্ধতি নির্বাচন**—ভিন্নধর্মী শিক্ষাদর্শনের সাহায্যে মধ্যপথ অবলম্বন করে শিক্ষাপদ্ধতি রচনা করা চলে। তাতে পদ্ধতির গোঁড়ামিও থাকে না, অথচ সু-পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়, শিক্ষাদানও সুষ্টুভাবে সম্পাদিত হয়।

---

* Q What are the Criteria of good methods of Teaching.

Morton Shipley and others বলেছেন যে, সমস্ত সূত্র (source) বা শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন থেকে, সংগ্রহ করে যে পদ্ধতি রচনা করে উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা দেওয়া যায়, শিক্ষার্থীদের জীবনযুদ্ধে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করা হয়, সৃজনাত্মক কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়, দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি করা যায়, সামাজিক পরিণমনে সাহায্য করে ইত্যাদি, সেই পদ্ধতি নির্দিষ্ট দর্শনাশ্রয়ী না হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।[১]

(৪) **পদ্ধতি সহজ সরল ও শ্রেণীর উপযোগী হবে**—শিক্ষাপদ্ধতি শ্রেণীর উপযোগী করে তৈরি করতে হবে। যে স্তরের শিশুদের জন্য শিক্ষাদানের কাজ চলবে, তাদের উপযুক্ত বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতেই পদ্ধতি স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। উচ্চশ্রেণীর জন্য যে জাতীয় পদ্ধতি অনুসৃত হবে, নিম্ন শ্রেণীর জন্য সাধারণতঃ সেই জাতীয় পদ্ধতি অনুসৃত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন পদ্ধতি যথা ডালটন প্ল্যান, মরিসন প্ল্যান বা সেমিনার মেথড ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর পক্ষে উপযুক্ত নয়। পক্ষান্তরে নিম্নশ্রেণীতে কর্মে প্রাধান্য আছে এমন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় কিন্তু ঐ কর্ম-প্রাধান্য আবার উচ্চশ্রেণীতে উপযুক্ত নয়। অতএব শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, যোগ্যতা ও বয়স অনুযায়ী পদ্ধতির প্রয়োগ হবে।

(৫) **পদ্ধতি অনমনীয় হবে না, পরিবর্তনশীল হবে**—প্রগতিশীল শিক্ষার যুগে, কোন কিছুকেই একান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলে মার্কা মেরে রাখা যাবে না। পরিস্থিতি এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পদ্ধতির রদবদল করা একান্তই প্রয়োজনীয়।

(৬) **শিক্ষাপদ্ধতি মনোবিজ্ঞানভিত্তিক হবে**—বর্তমান শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব খুব বেশি। অতএব শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানকে অবলম্বন করেই রচিত হবে। যদি শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানবিরোধী হয় তাহলে সেই পদ্ধতি কার্যকরী ও সুফলপ্রসূ হতে

১। 'Selecting methods from opposing philosophies may, on first analysis, appear something akin to trying to ride two horses at one time, but taking to middle course is not necessarily succumbing to the weakness of compromise. Indeed it is wise to borrow from all sources the methods, which make for meaningful learning, for adjustment to life situation for creative effort for the development of responsibility, for growth in social maturty, for the building of purpose and for other valuable objectives espoused by educational philosophers generally:—Shipley and others.

পারে না। অতীত যুগে আমরা তার প্রমান দেখতে পাই। অতীত যুগের শিক্ষকেরা যে ধ্যান-ধারণা নিয়ে শিক্ষকতা-কাজ করতেন, তাতে অনেক সময়েই শিক্ষকের দিক থেকে প্রাণের স্পন্দন থাকত বটে কিন্তু শিক্ষার্থীর মনের ভাব বা চিন্তাধারার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হত না, ফলে শিক্ষার্থীরা অনেক সময়েই বিষয়বস্তু মুখস্থ করত কিন্তু উপলব্ধি করতে পারত না, বা উপলব্ধি করতে বহু সময় ব্যয় করত।

(৭) **পদ্ধতিতে বিষয়মুখিতা থাকবে**—বিষয়মুখী পদ্ধতির কার্যকারিতা বেশি। অর্থাৎ যে পদ্ধতির মধ্যে নৈর্ব্যক্তিকতা (objectivity) আছে সেই পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়বস্তু পরিবেশন সহজ, আর তাছাড়া কতটুকু শিশুদের পরিবেশন করা হল, তার একটি হিসাবও বিষয়মুখী পদ্ধতিতে থাকে। প্রাচীন যুগের যেসব পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা ছিল ব্যক্তিকতা (subjectivity) দোষে দুষ্ট। ফলে সেসব পদ্ধতির মধ্যে শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বর্তমানেও ব্যক্তিগত প্রভাব যদি পদ্ধতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, তাহলে শিক্ষার মান স্তর অনুয়ায়ী স্থির থাকবে না এবং শিক্ষাদানের ফলও অনিশ্চয়তা দোষে দুষ্ট বলে প্রতিভাত হবে। বর্তমান সময়ে সকল শিক্ষাবিদই এ বিষয়ে একমত যে পদ্ধতির প্রয়োগ-কার্যটি নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী যদি সম্পন্ন হয় তাহলে ফল অত্যন্ত নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট আকার ধারণ করবে। এই কারণেই পদ্ধতি বিষয়মুখী হওয়া কর্তব্য।

(৮) **পদ্ধতি নির্দিষ্ট মানসম্পন্ন হবে**—বর্তমান যুগে বহু পদ্ধতিকেই আদর্শায়িত বা Standardised করা হয়। পদ্ধতি বিষয়মুখী করার ফলেই পদ্ধতি আদর্শায়িত করা সম্ভব হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি স্তর অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রে সুফলপ্রসূ কিনা তা দেখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ পদ্ধতিগুলি প্রয়োগসিদ্ধ বলে চিরকূট ও ছাপ না পেলে পদ্ধতির অপপ্রয়োগ হবে। এই কারণেই পদ্ধতিগুলিকে আদর্শায়িত করা হয়েছে।

(৯) **পদ্ধতির মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা থাকবে**—শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত উদ্দেশ্য হবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যুগ্ম উদ্দেশ্য। তারই ফলে পদ্ধতির মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাকবে। তাহলেই শিক্ষা হবে জীবনকেন্দ্রিক।

(১০) **পদ্ধতি তৃপ্তিকর হবে**—শিক্ষাদানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তৃপ্তি। শিক্ষাদান প্রক্রিয়া থেকে যদি শিক্ষার্থী তৃপ্তিজনক অনুভূতি লাভ

করে, তাহলেই শিক্ষা সার্থক বলে বিবেচিত হবে এবং শিক্ষার ফলও স্থায়ী হবে। এই তথ্যটি মনোবিজ্ঞানসম্মত। অতএব শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিকল্পনার সময় শিক্ষক দেখবেন যে শিক্ষার্থী যেন শিক্ষা হতে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করে এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়।

(১১) **পদ্ধতি ব্যয়বহুল হবে না**—উত্তম পদ্ধতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষা যেহেতু সর্বসাধারণের অধিকারের বস্তু সেইহেতু এটা ব্যয়-বহুল হবে না। যদি শিক্ষাপদ্ধতি ব্যয়বহুল হয়, তাহলে সাধারণভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রচলিত হতে পারবে না, ফলে শিক্ষার গতি ব্যাহত হবে।

———

দশম অধ্যায়

পাঠ পরিকল্পনা

(Lesson Planning)*

আমরা যখন কোন একটি কর্ম-সম্পাদন করতে অগ্রসর হই, তখন আমাদের সেই কর্মটি সম্বন্ধে জানবার প্রয়োজন হয়। কর্মটি কি, কিভাবে সেটা সম্পন্ন করা সম্ভব ইত্যাদি। কর্মটি যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে চাই, তাহলে আমাদের কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, কিভাবে ত্রুটিশূন্যভাবে কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব, ইত্যাদি নানা চিন্তা আমাদের মাথায় এসে ভিড় জমায়। চিন্তা এলেই ধীরে ধীরে মনের মধ্যে পরিকল্পনার ধারা জাগ্রত হয়, ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে কর্মে সাফল্যলাভ করা যায়। পরিকল্পনা নেই, প্রস্তুতি নেই, এমন কাজ কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে না।

পাঠপরিকল্পনার ক্ষেত্রেও তাই। পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষার্থীকে কিভাবে পরিচালিত করতে হবে, তারই নির্দেশনা। সেই নির্দেশনা শিক্ষককে প্রস্তুত করতে হবে। নির্দেশনার মধ্যে পাঠের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পাঠদানের রীতি পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিক্ষালাভ করেছে তার মূল্যায়ন থাকবে।

পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক শিক্ষকই বর্তমান সময়ে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রসিদ্ধ জার্মান শিক্ষাবিদ হার্বার্ট পরিকল্পনার একটি সুনির্দিষ্ট রীতি শিক্ষকদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। হার্বার্টের অনুগামীরা জ্ঞানমূলক শিক্ষাদানের জন্য পাঁচটি স্তরের কথা বলেন—(১) আয়োজন বা আগ্রহ সঞ্চারের জন্য প্রস্তুতি (Preparation or Introduction or Motivation), (২) উপস্থাপন (Presentation), (৩) তুলনা করা বা অনুষঙ্গ সংস্থাপন (Comparison or Association), (৪) সামান্যীকরণ (Generalisation) এবং অভিযোজন (Application)।

হার্বার্টীয় সোপানগুলির মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি। *

প্রসিদ্ধ জার্মান শিক্ষাবিদ কর্তৃক নির্দেশিত হার্বার্টীয় সোপানগুলি আলোচনা করবার পূর্বে হার্বার্টীয় সোপানগুলি বা পদ্ধতির মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন (পূর্বে শিক্ষণ পদ্ধতির ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এর বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে)।

Q. What are the psychologycal principles on which the basis of Herbartian planning is based?

১। ভাবগুচ্ছ তত্ত্ব—হার্বার্ট মনে করতেন যে, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়েই মানুষের অভিজ্ঞতা জন্মে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন মানসিক চিন্তাধারার উদ্ভব হয়। এই ধারণাসমূহ ব্যক্তিমানসে সঞ্চিত থাকে, এবং এগুলি মনোরাজ্য হতে কখনও উৎপাটিত হয় না। পক্ষান্তরে এগুলি অন্য ধারণাসমূহের সৃষ্টির সহায়ক হয়। হার্বার্টের মতানুযায়ী, নতুন ধারণার সৃষ্টি হয় পুরাতনের উপর নির্ভর করেই। হার্বার্ট এই অভিজ্ঞতা আহরণের প্রক্রিয়াটির নাম দিয়েছেন Apperception বা আয়ত্তীকরণ এবং পুরাতন অভিজ্ঞতা সমূহকে নাম দিয়েছেন Apperceptive mass বা ভাবজট। যে অভিজ্ঞতা শিশু তার ভাবজটের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে না, সে অভিজ্ঞতা শিশু আহরণ করতে সক্ষম হয় না। এজন্যই শিশুর শিক্ষাকে সুসংবদ্ধ করে তুলতে হলে, তার পুরাতন শেখা বিষয়গুলির সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

২। আগ্রহতত্ত্ব—হার্বার্টের 'ভাবগুচ্ছ' তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে তাঁর আগ্রহের তত্ত্ব। হার্বার্টের মতে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মনে প্রথমে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। হার্বার্টের শিক্ষা পরিকল্পনার এই হচ্ছে মূল কথা। আগ্রহ সৃষ্টি না করলে পাঠদান ফলপ্রসূ হয় না। এই আগ্রহ থেকেই আসবে মনোযোগ। শিক্ষাদানের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মনে বহুমুখী আগ্রহের সৃষ্টি করতে হবে এবং এই বহুমুখী স্থায়ী আগ্রহ শিক্ষার্থীর চরিত্র গড়ে তুলবে।

৩। অনুবন্ধের তত্ত্ব—হার্বার্টের মতে সমস্ত বিষয় শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় থাকবে। এর অর্থ হচ্ছে কোন একটি বিষয়ই একটি পৃথক বিষয় হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হবে না। 'ভাবজট' তত্ত্বের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে শিশু নূতন জ্ঞান আহরণ করে। অতএব বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু, যাদের মধ্যে যোগসূত্র আছে, এমন বিষয়বস্তুই শিক্ষার্থী সাগ্রহে শিখবে।

৪। স্পষ্টতা ও ধারাবাহিকতার তত্ত্ব—হার্বার্টের পাঠ পরিকল্পনায় অনুবন্ধের নীতির পরেইস্পষ্টতা ও ধারাবাহিকতার তত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করা হবে, সেই অভিজ্ঞতা সম্বলিত বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে ও স্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করা উচিত। যদি অভিজ্ঞতা অস্পষ্ট হয়, তাহলে ভাবগুচ্ছের সঙ্গে তার গ্রন্থিবন্ধন করা সহজ

হয় না। ধারাবাহিকতা বলতে বোঝায়, শিক্ষার্থীকে যে যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে তার মধ্যে যুক্তিভিত্তিক অনুক্রম বজায় থাকা।

৫। এককেন্দ্রিকতার নীতি—পূর্বেই বলা হয়েছে হার্বার্টের আগ্রহ-তত্ত্বের কথা। তাঁর মতে আগ্রহ ছাড়া কোনও বিষয় শিক্ষা করা যায় না। সেজন্য আগ্রহের বিষয়টি বেছে নিয়ে তাকে কেন্দ্র করে নূতন বিষয়ের অবতারণা করা যেতে পারে। একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দশটি বিষয় জানা যায়। একেই বলে Theory of concentration বা এককেন্দ্রিকতার নীতি।

এই পাঁচটি নীতি যথা, ভাবতত্ত্বের নীতি, আগ্রহতত্ত্ব, অনুবন্ধের তত্ত্ব, স্পষ্টতা ও ধারাবাহিকতার তত্ত্ব ও এককেন্দ্রিকতার নীতি অবলম্বন করেই হার্বাট পাঠন ক্রিয়াকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন, যথা—(ক) স্পষ্টতা, (খ) সংযোগ, (গ) যুক্তিসংগত ধারাবাহিকতা ও (ঘ) প্রয়োগের জন্য পদ্ধতি। এগুলি ভিত্তি করে পরে হার্বার্টের অনুগামীরা পঞ্চবিধক্রমের ব্যবস্থা দিয়েছেন।

হার্বার্টীয় পঞ্চসোপানের পরিবর্তিত অবস্থা।

হার্বার্টীয় পঞ্চসোপান একটি সুনির্দিষ্ট পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো এবং এই পাঠপরিকল্পনা এক শতাব্দীর উপর শিক্ষাজগতে স্থান পেয়ে এসেছে। কিন্তু এই পঞ্চসোপানের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ সোপান দুটি, অর্থাৎ তুলনাকরণ বা অনুসঙ্গ স্থাপন এবং সামান্যীকরণ—এই দুটি সোপান দ্বিতীয় সোপান বা উপস্থাপনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত। তাই শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার মধ্যে ঐ দুটি সোপান অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ সোপানের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয় না বলে ঐ সোপান দুটি অনেক শিক্ষকই অতিশয়োক্তি বলে বাদ দিয়েছেন। বর্তমানে পঞ্চসোপানের মধ্যে তিনটি সোপান প্রচলিত: (ক) প্রস্তুতি ও পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা (Preparation), (খ) উপস্থাপন (Presentation), (গ) অভিযোজন বা প্রয়োগ (Application)।

পাঠ-টীকা রচনা।*

পাঠ-পরিকল্পনার নীতি ও নির্দেশনা আমরা জানতে পারলাম; এখন পাঠ-টীকা হার্বাটীয় পদ্ধতিতে কিভাবে রচনা করতে হবে, তার কাঠামোর আলোচনা করব।

* Q. Give the particulars of a lesson plan.

১। **সাধারণ বিবরণ**—পাঠ-টীকা রচনাকালে উপরে দুই সারিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত থাকবে।

প্রথম সারি অর্থাৎ বামদিকের সারি	ডান দিকের সারি
বিদ্যালয়ের নাম—	বিষয়—
শ্রেণী—	বিশেষ বিষয়—
ছাত্রছাত্রী সংখ্যা—	অদ্যকার পাঠ—
ছাত্রছাত্রীদের গড় বয়স—	
তারিখ—	
পাঠদানের সময়—	
শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম —	

পাঠ-টীকা রচনাকালে এই প্রাথমিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষক/শিক্ষিকা বিশেষভাবে অবহিত হবেন। শ্রেণী, শিক্ষার্থী সংখ্যা ও তাদের গড় বয়স জানলে তবেই শিক্ষক/শিক্ষিকা শ্রেণীর শিক্ষাগত মান বুঝতে পারবেন এবং সেই অনুসারে পাঠ-টীকা রচনা করতে অগ্রসর হতে পারেন। তাছাড়া এক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সময়। শিক্ষক নির্দিষ্ট সময়ে কতটা বিষয়বস্তু শিক্ষালাভে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারবেন, তারই পটভূমিকায় পাঠ-টীকা রচিত হবে।

সাধারণ বিবরণের ডানদিকের অংশে কোন বিষয়ের অন্তর্গত কোন বিশেষ বিষয় ও সেদিনকার পাঠ লিপিবদ্ধ থাকবে। যথাযথ পাঠ নির্দিষ্ট থাকলেই ঐ বিষয়বস্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করতে অসুবিধা হয় না।

২। **উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ**—যে বিষয়টিকে অবলম্বন করে পাঠদান করা হবে, সেই বিশেষ বিষয়টি বা সেদিনকার পাঠ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য থাকবে। এই উদ্দেশ্যের বর্ণনা দান করতে হবে। পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষক/শিক্ষিকারা ভাল করে অবহিত থাকবেন। উদ্দেশ্য যদি স্থির না থাকে, তাহলে পাঠদানের গতি ভিন্নমুখী হতে পারে। এলোমেলো উদ্দেশ্য নিয়ে চললে পাঠদান কিছুতেই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। শিক্ষাদানের স্থির উদ্দেশ্য থাকলেই শিক্ষক সেই অভিমুখে চলতে পারবেন।

উদ্দেশ্য হবে দুরকমের—একটি হবে প্রত্যক্ষ বা মুখ্য এবং অপরটি হবে

পরোক্ষ বা গৌণ। সাধারণভাবে পাঠদানদ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধিত হবে, তাই হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা মুখ্য উদ্দেশ্য। আর সেই পাঠদান থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যান্য শক্তিগুলির যা বিকাশ হবে, তাই হচ্ছে পরোক্ষ বা গৌণ উদ্দেশ্য।

সাধারণতঃ তিন রকমের পাঠ আছে—জ্ঞানমূলক পাঠ (Knowledge Lesson), নৈপুণ্যমূলক পাঠ (Skill Lesson) এবং রসবোধমূলক পাঠ (Appreciation Lesson)।

জ্ঞানমূলক পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য বা অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা করা। মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানদান করা কখনও উদ্দেশ্য হবে না। তাহলে সেখানে শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে বলে মনে করা হবে। 'শিক্ষার্থীদিগকে জ্ঞানলাভে সহায়তা করা' এই উদ্দেশ্য যদি হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা সেখানে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার মধ্যে জড়িত থাকবে। ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি পাঠের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐরূপ। আর পরোক্ষ উদ্দেশ্য হচ্ছে চিন্তাশক্তি, যুক্তিশক্তি, বিশ্লেষণশক্তি ও কল্পনা শক্তির বিকাশ সাধন।

নৈপুণ্যমূলক পাঠের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সেই বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য। আর পরোক্ষ উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্ভাবনী শক্তির বৃদ্ধি সাধনে সহায়তা।

রসবোধমূলক পাঠে তথ্যের অভাব থাকে, কিন্তু বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত রসবৈচিত্র্য বর্তমান। এই জাতীয় পাঠের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদিগকে রসোপলব্ধি করতে সাহায্য করা। পরোক্ষ উদ্দেশ্যে হল ভাবের উদ্দীপনা ও কল্পনা-শক্তির বিকাশ।

৩। উপকরণ—পাঠদানের সহায়ক হিসাবে অনেক সময়ই শ্রুতি-নির্ভর ও দৃষ্টিনির্ভর শিক্ষোপকরণের (audio-visual aids) প্রয়োজন হয়। রসবোধমূলক পাঠের জন্য মূর্ত শিক্ষোপকরণের কোনও প্রয়োজন নেই। জ্ঞানমূলক ও নৈপুণ্যমূলক পাঠের জন্যই বিভিন্ন ধরণের শিক্ষোপকরণের প্রয়োজন হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট পাঠের পাঠ-টীকা রচনাকালে ঐ বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষোপকরণগুলির উল্লেখ পাঠ-টীকায় থাকতে হবে।

৪। প্রস্তুতি বা আয়োজন ও পাঠঘোষণা—শিক্ষার্থীদের মনকে

নূতন পাঠের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। যদি সেদিনের পাঠটি পুরাতন পাঠের সম্প্রসারণ হয় তাহলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অর্জিত অভিজ্ঞতাকেই ঝালাই করে নূতন পাঠের সঙ্গে সংযোজনা করতে পারেন এবং তখন পাঠঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু পাঠটি যদি সম্পূর্ণ নূতন হয়, তাহলে শিক্ষক নানাভাবে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের পুরাতন সঞ্চিত ভাবগুচ্ছের সঙ্গে নূতন অভিজ্ঞতার যোগাযোগ স্থাপন করে পাঠঘোষণা করতে পারেন।

এই সোপানের শেষের দিকেই পাঠঘোষণা করতে হয় এবং শিক্ষক কতটা অংশ সেদিন পাঠদান করবেন তা তিনি শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেবেন।

৫। **উপস্থাপন**—এই সোপানেই শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয়টি শিক্ষাদান করতে শুরু করবেন। বিষয়বস্তুটি শ্রেণীর সম্মুখে উপস্থিত করবার কালে শিক্ষক-শিক্ষিকা বিষয়বস্তুটি সুন্দরভাবে সাজিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে বর্ণনা দেবেন এবং তিনি শিক্ষার্থীদিগকে বিষয়বস্তু থেকে তুলনা করবার মত এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বের করবার মত পরিবেশ রচনা করে দেবেন যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাদান-কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের দ্বারা পরিবেশিত বিষয়বস্তু ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে কি না জানবার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদিগকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করবেন। প্রশ্ন কখন ও কিভাবে হবে তা স্থিরীকৃত হবে, শ্রেণী ও শিশুদের বয়স অনুযায়ী। খুব নীচু শ্রেণীতে শিক্ষক অল্প কয়েকটি কথার বর্ণনা দিয়েই বা ছবি দেখিয়েই প্রশ্ন করবেন। উঁচু শ্রেণীতে 'শীর্ষ' শেষে প্রশ্ন করতে হবে, কিন্তু প্রয়োজন হলে 'শীর্ষের' মাঝামাঝি স্তরেও প্রশ্ন করা চলতে পারবে। এই সোপানে প্রশ্নগুলির উত্তর ক্ষুদ্র হবে।

৬। **অভিযোজন**—সমগ্র পাঠটি একটি বা দুটি শীর্ষে শেষ হবার পর শিক্ষক সমগ্র পাঠটির উপর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রশ্ন করবেন। অর্থাৎ এই সোপানে শিক্ষার্থী কতটা শিখেছে তার পরিমাপ করা হবে। শিক্ষক বা শিক্ষিকা প্রশ্ন করে সমগ্র পাঠটির উপর পুনরালোচনা করবেন। পরে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় তিনি পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখে দেবেন। শিক্ষার্থীরা দেখে দেখে লিখবে এবং শিক্ষক/শিক্ষিকা ঘুরে ঘুরে দেখবেন। এই নির্দেশনা পাঠ-টীকায় ভালভাবে লেখা থাকবে। তবে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পাঠের সারাংশ বোর্ডে লেখা শিক্ষার্থীদের বয়সসীমার উপর

নির্ভর করবে। নীচু শ্রেণীতেই পাঠের সারাংশের নির্দেশনা পাঠ-টীকায় থাকবে, উপরের শ্রেণীতে নয়।

৭। গৃহকাজ—পাঠদানের শেষে শিক্ষক বাড়ী থেকে করে আনবার জন্য কতকগুলি কাজ নির্দিষ্ট করে দেবেন। এ নির্দেশনাও পাঠ-টীকায় থাকবে।

এখানে পাঠ-টীকার যে কাঠামো আলোচনা করা হয়েছে, তা হল জ্ঞানমূলক পাঠের ক্ষেত্রে কিভাবে পাঠদান চলবে, তারই নির্দেশনা মাত্র। কিন্তু জ্ঞানমূলক পাঠ ছাড়াও আরও দুরকমের পাঠ আছে—নৈপুণ্যমূলক পাঠ ও রসানুভূতিমূলক পাঠ। এদের জন্য পাঠ-টীকা কিভাবে রচিত হবে তার ইঙ্গিত দেওয়া হল।

নৈপুণ্যমূলক পাঠ।*

জ্ঞানমূলক পাঠ হার্বার্টীয় সোপান অনুযায়ী চললেও নৈপুণ্যমূলক পাঠদানের রূপরেখা ঠিক হার্বার্টীয় সোপান অনুযায়ী রচনা করলে চলবে না। সেখানে শিক্ষককে কিছুটা ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করতে হবে।

নৈপুণ্যমূলক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক কতকগুলি বিষয় মনে রাখবেন।

(১) কোনও বিষয় দক্ষতা অর্জনের জন্য যখন শিক্ষার্থীরা আগ্রহ প্রদর্শন করবে, তখনই সেকাজ শিক্ষার্থীদিগকে দেওয়া ভাল।

(২) শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুযায়ী কর্ম বণ্টিত হবে।

(৩) কাজের মান এমনি হবে যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও সেই মান অনুসারে কর্ম সম্পাদন করতে পারে।

এখানে মনে রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীরা কোন্ কাজে নৈপুণ্য অর্জন করতে যাচ্ছে। কি জাতীয় পাঠ নৈপুণ্যমূলক তা বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে হস্তশিল্প, চিত্রাঙ্কণ, ড্রইং, লিখন-পঠনের কৌশল অর্জন এগুলি হচ্ছে নৈপুণ্যমূলক পাঠ।

নিম্নলিখিত সোপানের মাধ্যমে নৈপুণ্যমূলক পাঠ দেওয়া চলে।

১। প্রস্তুতি—এই সোপান জ্ঞানমূলক পাঠেরই অনুরূপ। শিক্ষার্থী যে কাজ করবে, সেই কাজে শিক্ষার্থীকে আগ্রহান্বিত করে তুলতে হবে। কর্মটি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেই ভাল।

* Q. Discuss the teaching steps involved in the acquisitions of skills.

শিক্ষক বিভিন্ন উপায়ে পাঠটি শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করতে পারেন। যথা, (ক) কাজের মডেল দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সেই কাজটি করতে উৎসাহিত করবেন, (খ) তাছাড়া শিক্ষক এমন পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারেন যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সেই কাজ করতে আগ্রহবোধ করবে। যেমন, বিদ্যালয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হবে। তার জন্য পতাকা চাই। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাজ করার জন্য আগ্রহ সঞ্চার করতে পারেন তাহলে কাজটি ত্বরান্বিত হতে পারে। এই সোপানকে আগ্রহ সঞ্চার, ভূমিকা বা Motivation বা Introduction-ও বলা হয়।

২। **উদ্দেশ্য বর্ণনা**—শিক্ষার্থীরা জানবে তারা কি করতে যাচ্ছে। শিক্ষক তাতে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা বেশি পাবে।

৩। **উপস্থাপন**—তৃতীয় সোপান হচ্ছে উপস্থাপন। দু'ভাবে উপস্থাপনের পরিকল্পনা করা যায়। (১) শিক্ষকের দ্বারা মডেলটির অনুরূপ আরও একটি কর্ম সম্পাদন করে; অথবা (২) মুখে ব্যাখ্যা করে এবং মডেলের অনুকৃতি বোর্ডে অঙ্কন করে এবং তাকে অবলম্বন করে কর্ম সম্পাদন করতে নির্দেশ দিয়ে।

এই প্রক্রিয়ার মধ্যে শিক্ষার্থীরা হবে দর্শক ও পর্যবেক্ষক। শিক্ষক কর্ম সম্পাদনের মধ্যে প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদিগকে দেখিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীরা 'মডেল' বা 'আদর্শটিকে' নাড়াচাড়া করে দেখবে এবং সেই সূত্রে শিক্ষক প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে হাতে-কলমে কাজ করতে দেখেছে, এখন তারা তত্ত্বগতভাবে বিষয়বস্তুটি শিক্ষালাভ করবে।

৪। **অনুশীলন**—চতুর্থ সোপান হচ্ছে কর্ম সম্পাদন করবার জন্য অনুশীলন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে অনুকরণ করে কর্ম সম্পাদন করতে চেষ্টা করবে। এ সোপানে শিক্ষক সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

৫। **প্রয়োগ**—শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে কর্মের যে দক্ষতা অর্জন করেছে তা তারা বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ের বাইরে প্রয়োগ করে উৎপাদনের কাজে ব্রতী হবে।

রসানুভূতিমূলক পাঠ।*

রসানুভূতিমূলক পাঠে সুন্দরকে দর্শন করবার ও শ্রবণ করবার মাধ্যমে

* **Q.** What is an appreciation lesson? What does it aim at mainly? On what factor does the success of any teaching aiming at aesthetic appreciation depends?

উপভোগ করা এবং তার জন্য আকর্ষণ ও আকুতি সৃষ্টি করা। এর জন্য পরিবেশ রচনা করা হয় এবং এই আকর্ষণের অনুভূতি শিক্ষকের ইঙ্গিতে এর আবেদন আরও তীব্রতর করা হয়[১]।

রসানুভূতিমূলক পাঠে কোনরূপ জ্ঞানমূলক বিষয় বা নৈপুণ্যমূলক বিষয় আয়ত্তকরণের প্রেরণা নেই। এতে আছে শিক্ষার্থীদের রসগ্রাহী আলোচনা করবার জন্য প্রতিন্যাস (attitude) গঠন ও আবেগ প্রবণতার বিকাশ। সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদিগকে সৌন্দর্য উপলব্ধিকরণে সাহায্য করা। এসব পাঠে আবেগই হচ্ছে মানসিক উপাদান। যার ফলে মানুষ রূপ, রস, গন্ধকে উপলব্ধি করতে পারে। অনেকে বলেন, রসানুভূতি শিক্ষা দেওয়া যায় না। কিন্তু সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করবার পথ যদি শিক্ষক প্রদর্শন করেন, তাহলে শিক্ষার্থীদের রসানুভূতি হবে বই কি? তাছাড়া শিক্ষক নিজে যদি উপলব্ধির গভীর রসে অবগাহন করতে পারেন অর্থাৎ নিজের উপলব্ধির মধ্যে যদি কোন ফাঁক না থাকে তবে তাঁর উপলব্ধি তিনি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনায়াসে সঞ্চারিত করতে পারবেন। যেমন কবিতা পাঠ শিক্ষক যদি খুব ভাল করে কবিতাটি আবৃত্তি করতে পারেন ও তারপর সামান্য ব্যাখ্যা করেন তাহলে তিনি কবিতাটির রসোপলব্ধিতে ছাত্রাছাত্রীদের খুব সহজে নিমজ্জিত করতে পারেন, কবির হৃদয়ের সাথে সকলের যোগসূত্র রচনা করতে তিনি সফলকাম হতে পারবেন।

রসানুভূতিমূলক পাঠের সোপান বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন ধরণের হবে। তবুও কতকগুলি সাধারণ নীতি অনুসরণ করা চলে।

প্রস্তুতি—পাঠের সাফল্যের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি অত্যন্ত প্রয়োজন। শান্ত সুন্দর পরিবেশ এই জাতীয় পাঠের অনুকূল। বাহিরের আবেষ্টনীর সঙ্গে বিষয়বস্তুর মিল থাকবে। বাহিরে অতিমাত্রায় শীত পড়েছে। তখন শ্রেণীকক্ষে 'দারুণ অগ্নিবাণে, হৃদয় তৃষ্ণা হানে'—একথাগুলির রসানুভূতি শিক্ষার্থীদের হতে পারবে কি? প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবিশিষ্ট একটি কবিতার উপলব্ধি হবে শ্রেণীকক্ষের বাহিরে গাছতলায়, শ্রেণীকক্ষে নয়।

১। Smith and A. S. Harrison : Principles of Class Teaching—"The appreciaton lesson is an invitation to look at or to listen to something beautiful with leisure to enjoy it in a favourable atmosphere and with the teacher's use of suggestion to highten its appeal."

এই জাতীয় পাঠে শিক্ষকের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর সৌন্দর্যের রসোপলব্ধি। এই উপলব্ধি আরও তীব্রতর হতে পারে শিক্ষকের ইঙ্গিতের মাধ্যমে। শিক্ষক যখন ইঙ্গিত দিতে যাবেন, তখন তাকেও যথার্থভাবে আনন্দ ও রসকে দেহমানসে গ্রহণ করে নিতে হবে, তা না হলেই তিনি নিজেই রসের ইঙ্গিত শিক্ষার্থীদিগকে দিতে পারেন না। তদুপরি তিনি শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে বিষয়বস্তুকে সাঙ্গীকৃত করতে চেষ্টিত হবেন।

ভাষার দিক থেকে বিষয়বস্তুটি শিশুদের বোধগম্য হতে হবে। ভাষাগত অসুবিধা দেখা দিলে শিক্ষার্থীদের রসোপলব্ধি হবে না। যদি কোনও কবিতার কঠিন শব্দার্থ, ব্যাকরণগত নানা প্রশ্নের সমাধান রসানুভূতিমূলক পাঠে অনুপ্রবেশ করান যায়, তাহলে ঐ পাঠের উদ্দেশ্যই বিঘ্নিত হবে।

উপস্থাপন—দ্বিতীয় পর্যায়ে হচ্ছে রসানুভূতিমূলক পাঠের উপস্থাপন। শিক্ষকের উপস্থাপনের কলাকৌশল হবে অপূর্ব। শিক্ষক প্রথমে লেখকের স্থান গ্রহণ করবেন পরে ভূমিকা, গ্রহণ করবেন শিক্ষার্থীর। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে রসগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা। লেখক কি অনুভূতি নিয়ে বিষয়বস্তু রচনা করেছেন, তা দেহমনে শিক্ষক হজম করে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করবেন আর তা গ্রহণ করবার রীতি ও প্রদর্শন করবেন শিক্ষার্থী হয়ে।

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার। সমগ্র পাঠটি একক হিসাবে বিবেচিত হবে, তাহলেই তা সামগ্রিক উপলব্ধির সহায়ক হবে।

রসোপলব্ধিমূলক পাঠে নির্দেশনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। একথা প্রকারান্তরে পূর্বেই বলা হয়েছে। শিক্ষক সৌন্দর্যের বিষয়বস্তু নিজে উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করবেন, তারপর তাদের কিছু চিন্তা করবার ও মনে মনে রসগ্রহণ করবার সুযোগ দেবেন। এরপর নির্দেশনার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের রসগ্রাহী আলোচনা বা Critical appreciation-এ যোগদান করতে নির্দেশ দেবেন। বিষয়বস্তুর মধ্যে যেগুলি অত্যন্ত সুন্দর ও আবেগসৃষ্টিকারী সেগুলি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বের করতে বলবেন এবং তার সাথে সমান্তরাল বিষয়বস্তু অন্যস্থান হতে আহরণ করে আবৃত্তি করতে পারেন, শিক্ষার্থীরা তুলনামূলক রসগ্রহণ করতে আগ্রহী হবে।

উদাহরণস্বরূপ শিক্ষকের অষ্টম শ্রেণীতে অক্ষয় কুমার বড়ালের 'দুরন্ত ঝটিকা' পাঠদানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শিক্ষক সমগ্র কবিতাটি

আবৃত্তি করার পর অনুরূপ ভাবধারাপূর্ণ সমজাতীয় অন্য কবির লিখিত কবিতা আবৃত্তি করতে পারেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত 'ঝড়' কবিতাটি উল্লেখ করার পর শিক্ষার্থীদের মনে ঝড়ের বেগ, তার বিধ্বংসকারী প্রকৃতি, তার সৌন্দর্য ইত্যাদি সম্বন্ধে রস সঞ্চার করা সম্ভব।

অক্ষয় বড়ালের 'দুরন্ত ঝটিকা' হতে শিক্ষক পড়বেন,

"ঝাপটে দাপটে বায়ু ছাড়িছে হুঙ্কার
ভাঙে শাখা, পড়ে চাল, তরু উপড়ায়।"

সাথে সাথে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'ঝড়' থেকে আবৃত্তি করবেন,

"হতবল তরুদল ধরাতল লুঠিছে,
দলচয় স্থির নয়—বায়ুবেগে ছুটিছে।"

ঝড়ের প্রকৃতি উপলব্ধি করবার জন্য শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে সমধর্মী গানের ব্যবস্থা করতে পারেন, যথা রবীন্দ্রনাথের—

"করে গর্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হের ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল, নিরাশ পিয়াল তমাল বিতানে
উঠে রব ভৈরব তানে।"

ঝড়ের কবিতায় বৃষ্টির উল্লেখের সময় শিক্ষক বৃষ্টিবিষয়ক কবিতা হতে সমধর্মী কতকগুলি লাইন আবৃত্তি করতে পারেন।

রসগ্রাহী আলোচনার ক্ষেত্রে একটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করা প্রয়োজন। শিক্ষক জোর করে শিক্ষার্থীদের কোনরূপ রসানুভূতিতে পরিচালিত করবেন না। যে অনুভূতি শিক্ষার্থীদের মনে স্বতঃপ্রণোদিত, তার উপরই শিক্ষক গুরুত্ব দিতে পারেন।

অনুশীলন—যখন শিক্ষার্থীরা সত্যি সত্যি সৌন্দর্য থেকে রস গ্রহণ করতে সমর্থ হয়, তখন তাদের রসসৃষ্টি করতেও প্রণোদিত করতে পারা যায়। শিক্ষার্থীরা কবিতা রচনা করতে পারে বা চিত্রাঙ্কন করে তার মধ্যে রসের সন্ধান যোগাতে পারে। এই জাতীয় অনুশীলনের সার্থক ফল হচ্ছে শিক্ষার্থীরা অনুরূপ ক্ষেত্রে রস পরিগ্রহণ করতে অগ্রসর হয়ে আসবে। অনেক সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টা অসংস্কৃত ও অমার্জিত হতে পারে, কিন্তু এর শিক্ষামূলক যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

সার্থক রসানুভূতিমূলক পাঠ নির্ভর করে :—

(১) শিক্ষক নিজে পাঠ থেকে রসগ্রহণ করতে সক্ষম।

(২) শিক্ষক পাঠের জন্ত উপযুক্ত পরিবেশ রচনা।

(৩) পাঠ অনুযায়ী বাহিরের পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ।

(৪) শিশুদের বয়স, আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠটি নির্দিষ্ট।

(৫) ভাষাগত অসুবিধা থাকবে না।

(৬) শিক্ষকের যেমন ইঙ্গিতদানের ক্ষমতা থাকবে, তেমনি থাকবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবার মত কলাকৌশল।

পাঠ পরিকল্পনার গুণাবলী (Merits of Lesson Planning)।*

(১) পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করবার ফলে শিক্ষক পাঠদান করার জন্য প্রস্তুত হবার মত সুযোগ পান।

(২) পাঠ পরিকল্পনার ফলে পাঠদান করতে গিয়ে শিক্ষক উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিষয়বস্তু শিক্ষাদানকে সীমিত রাখতে পারেন।

(৩) পাঠদান কালে যেসব অসুবিধা দেখা যেতে পারে সেসব সম্বন্ধে পূর্বাভাষ পাঠ পরিকল্পনা কালে শিক্ষক পেতে পারেন এবং সেই অনুসারে তিনি পূর্ব থেকে প্রস্তুত বা সতর্ক থাকতে পারেন।

(৪) শিক্ষাদান প্রাণবন্ত করবার জন্য শিক্ষক পূর্বাহ্নেই শ্রবণমূলক ও দর্শনমূলক শিক্ষোপকরণের ব্যবস্থা করতে পারেন।

(৫) শিক্ষক পাঠটিকে সুবিন্যস্ত করতে পারেন।

(৬) পাঠ পরিকল্পনা কালে শিক্ষক পাঠের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে চিন্তা করে থাকেন এবং কার্যকালে সেই ধারাই অনুসরণ করেন।

(৭) পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে শিক্ষকের পক্ষে অনুবন্ধ প্রণালীতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়।

(৮) পাঠ পরিকল্পনা রচনার ফলে শিক্ষকের পাঠের অভ্যাস জন্মে।

(৯) শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীনতা দেখা যায়। যে শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা করে গিয়েছেন তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে পাঠদান কার্যে রত হতে পারেন।

(১০) শিক্ষকের পক্ষে উপযুক্ত প্রশ্ন করার সুবিধা থাকে।

(১১) শিক্ষকের গৃহকাজ দেওয়ার সুবিধা হয়, কারণ পাঠ পরিকল্পনা কালে শিক্ষক পাঠের জটিলতাগুলিকে প্রত্যক্ষ করে দেখেছেন।

* Q. What are the merits and demerits of lesson planning ?

পাঠ পরিকল্পনার দোষ (Demerits of lesson planning)।

উপযুক্ত ভাবে পাঠ পরিকল্পনা করলে, সার্থক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তা বিশেষ উপযোগী, সে বিষয়ে হয়ত সকল শিক্ষাবিদই একমত হবেন। কিন্তু পাঠ পরিকল্পনা যদি উপযুক্ত বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ না করে রচনা করা হয়, তাহলে তা উত্তম শিক্ষাদানের পরিপন্থী হবে। তাছাড়া পাঠ পরিকল্পনার নিজস্ব ত্রুটিও আছে।

(১) পাঠ পরিকল্পনার অসুবিধা হচ্ছে, প্রথমতঃ এটি শিক্ষকের স্বকীয়তা বিরোধী। শিক্ষকের শিক্ষাদানের নিজস্ব একটি ভঙ্গী রয়েছে। একে সীমায়িত করলে বা পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে আটকে দিলে শিক্ষকের সাবলীলতা নষ্ট হবে, পাঠদান হবে যান্ত্রিক।

এ অভিযোগ আংশিক সত্যি, কারণ শিক্ষকের স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে নির্দিষ্ট ছকে ফেলে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে শিক্ষাদানে স্বাধীনতাকে খর্ব করা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষককে যদি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গী অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষাদান করতে দেওয়া যায় তাহলে তিনি হয়ত মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারেন, শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা লাভের সহায়ক ক্রমগুলি না মেনে নিজের আবেগে চলতে পারেন, ফলে শিক্ষকের দিক থেকে শিক্ষাদান চমৎকারিত্বের দাবী করলেও শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে হয়ত পূর্ণ ফলদায়ক নাও হতে পারে। এই কারণে পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান এবং পাঠ পরিকল্পনা যদি উপযুক্ত পদ্ধতি মেনে রচনা করা হয়, তাহলে উৎকৃষ্ট শিক্ষাদানে উহা সহায়ক হবে।

(২) পাঠ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ হচ্ছে এই যে পাঠ পরিকল্পনায় বিষয়বস্তুটি যুক্তিভিত্তিক হিসাবে সাজান রয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, বিষয়বস্তুতে মনস্তত্ত্বসম্মত প্রবেশপথ যুক্তিভিত্তিক প্রবেশপথ হতে পৃথক। শিক্ষার্থীর চিন্তাধারা অধিকাংশ সময়েই মনস্তত্ত্বসম্মত পথে অগ্রসর হয়, যুক্তিসম্মত পথ বর্জন করে চলে। এই কারণে যুক্তিভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হয় না এবং পাঠে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে না।

(৩) হার্বার্টীয় পাঠ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হচ্ছে যে সমস্ত পাঠের ক্ষেত্রেই এই পাঠ পরিকল্পনাটিকে খাপ খাওয়ান চলে না। শুধু

জ্ঞানমূলক পাঠেই এই সোপানগুলি চলতে পারে। এবং তার মধ্যেও কৃত্রিমতা রয়েছে, কারণ এই পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষকের ভূমিকাকে উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষকই স্বপ্রচেষ্টায় কোন সিদ্ধান্তে আগমন করে তার পথ প্রদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীকে তা বাধ্য হয়েই গ্রহণ করতে হয়, সেখানে শিক্ষার্থীর স্বকীয় প্রচেষ্টার কোন স্থান নেই। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষাদান কার্য সমাজায়িত (socialised) হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আদান-প্রদানের মাধ্যমেই শিক্ষাদান কার্য দানা বেঁধে উঠবে। হার্বার্টীয় পরিকল্পনায় শিক্ষক এমনিভাবে পাঠ পরিকল্পনা করেন, যেখানে শিক্ষার্থীর কিছু 'করার' বা ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করার কিছু নেই। তাছাড়া হার্বার্ট তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনাটিকে অনুবন্ধবাদের বা associationism-এর উপর স্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক, মনোবিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ সর্বদা অনুবন্ধ নীতি অনুসরণ করে চলে না।

(৪) প্রগতিশীল শিক্ষাবিদদের মতে শিক্ষা হবে সক্রিয়তাভিত্তিক, অর্থাৎ শিশুরা শিক্ষাদান কালে সক্রিয় হবে। শিক্ষকের সাথে চলবে আদান-প্রদান। তাছাড়া কর্মের ব্যবস্থাও শিক্ষাদান ক্ষেত্রে থাকবে। কিন্তু হার্বার্টীয় শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে মানসিক প্রক্রিয়া, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের উপরই এর গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়েছে। এর ফলে পাঠ পরিকল্পনা বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে না। বর্তমান শিক্ষাবিদদের মতানুযায়ী সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনাই বিশেষভাবে কার্যকরী। এই কারণেই আমরা হার্বার্টের বুদ্ধিভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনার পরিবর্তে জন ডিউইর সমস্যা পদ্ধতি (Problem method) এবং ডিউ শিষ্যর কিলপ্যাট্রিক প্রবর্তিত কার্যসমস্যা পদ্ধতির (Project method) প্রসার দেখতে পাই।

উত্তম পাঠ পরিকল্পনার (হার্বার্টীয়) লক্ষণ (Marks of a good Herbartian lesson plan)

(১) একটি উত্তম পাঠ পরিকল্পনা লিখিত থাকবে।
(২) উত্তম পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ থাকবে।
(৩) শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু সুবিন্যস্ত থাকবে।
(৪) শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল লিপিবদ্ধ থাকবে।

(৫) শিক্ষাদান কালে যেসব দর্শনমূলক ও শ্রবণমূলক শিক্ষোপকরণ প্রয়োজনীয় হবে, তার উল্লেখ পাঠ পরিকল্পনায় থাকবে।

(৬) পাঠ পরিকল্পনায় পাঠের যুক্তিভিত্তিক ধারাবাহিকতা থাকবে।

(৭) শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, বয়সের অনুপাত, ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা রচিত হবে।

(৮) শীর্ষভাগ করে বিষয়টি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পাঠ পরিকল্পনায় থাকবে।

(৯) পাঠদানের সময় যেসব পরীক্ষামূলক প্রশ্ন, বিকাশমূলক প্রশ্ন ও পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন প্রয়োজন হবে, তা পাঠ পরিকল্পনায় লিপিবদ্ধ থাকবে।

(১০) পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

(১১) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের উপর দৃষ্টি রেখে পাঠ পরিকল্পনাটি রচিত হবে।

(১২) অন্যান্য পুস্তক হতে বিষয়বস্তুটি আলোচনা করে দেখবার অবকাশ পাঠ পরিকল্পনায় থাকবে।

(১) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠটি শেষ করবার ব্যবস্থা পাঠ পরিকল্পনায় থাকা একান্তই কর্তব্য।

(১৪) পাঠ পরিকল্পনায় অনুবন্ধ পদ্ধতিতে শেখার ব্যবস্থার অবকাশ আছে।

(১৫) পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের গৃহকাজের বিষয়টি লিপিবদ্ধ থাকে।

(১৬) পাঠ পরিকল্পনায় আত্মসমালোচনার সুযোগ আছে।

বিকল্প পাঠ পরিকল্পনা।*

A. H. T. Glover তাঁর New Teaching for a New Age নামক পুস্তকে হার্বার্টীয় সোপানের বিশেষ সমালোচনা করেন। হার্বার্টীয় পরিকল্পনার বিভিন্ন ত্রুটির জন্য গ্লোভার একটি বিকল্প পরিকল্পনা শিক্ষকদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন, তার ভিত্তি হচ্ছে—প্রশ্ন, আলোচনা, অনুসন্ধান ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা (Questions, discussions, investigations and pupil activities)।

শিক্ষাদান কৌশল হিসাবে গ্লোভার প্রশ্নের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন যে প্রশ্ন থেকে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে

* Q. What is the form of lesson plan suggested by A. H. T. Glover in lieu of Herbartian steps?

শিক্ষাদান কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে এজন্য শিক্ষার্থীদেরও প্রশ্ন করতে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষক সকল ধরণের প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের করবেন— ভূমিকামূলক, বিকাশমূলক ও পুনরালোচনামূলক। এদের ভেতর থেকেই আলোচনার সূত্র দেখা দেবে। পরে প্রশ্নের ভিত্তিতে সূত্র অবলম্বন করে আলোচনা চলবে। সমস্যা তখন এসে দেখা দেবে। সেই সমস্যাগুলি তখন শিক্ষার্থীরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে এবং সকলেই সেই বিষয়ে কিছু না কিছু মতামত প্রকাশ করবে। এর পর শিক্ষক আলোচনার ভিত্তিতে প্রধান প্রধান সংকেতসমূহ শ্রেণীবদ্ধ করবেন। অপ্রাসঙ্গিক সংকেতগুলি পৃথক করে বাদ দেওয়া হবে।

তারপর চলবে সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধান। অনুসন্ধানের পরবর্তী সোপান হচ্ছে Expression বা প্রকাশ। প্রকাশ হবে চার রকমের।

(ক) নিষ্ক্রিয় কর্ম, (খ) সক্রিয় কর্ম, (গ) সুরুচিসম্পন্ন কর্ম, (ঘ) সাংগঠনিক কর্ম।

নিষ্ক্রিয় কর্মাবস্থা হচ্ছে যেখানে অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক বাস্তব জিনিসের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে।

সক্রিয় কর্মাদি হচ্ছে হাতের কাজ, শিল্পকাজ, অঙ্কণ, দোকান বা ডাকঘর পরিচালনা, বিদ্যালয়ের দ্বিপ্রাহরিক খাদ্যব্যবস্থা, বাগানের কাজ ইত্যাদি।

সুরুচিসম্পন্ন কর্মাদি হচ্ছে খেলাধূলা, শারীর শিক্ষণ, ছন্দানুভঙ্গী, নৃত্য, গীত, অভিনয়, সৃজনাত্মক কর্ম ইত্যাদি।

এই সমস্ত কর্মগুলির একটি সাংগঠনিক দিকও আছে।

অতএব হার্বার্টীয় পরিকল্পনার বিকল্প পরিকল্পনা নিম্ন ধরণের হতে পারে।

প্রাথমিক প্রশ্ন (Initial questions)
↓
আলোচনা (Discussion)
↓
উপাদানসমূহের শ্রেণীবিভাগ (Classification of material)
↓
প্রসঙ্গ স্থিরীকরণ (Selection of topic)
↓
অনুসন্ধান (Investigation)
↓
প্রকাশ (Expression)

একাদশ অধ্যায়

শিক্ষাদানের কৌশল

(The Devices and Techinques of Teaching)*

শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষককে শিক্ষানীতি অনুসরণ ব্যতিরেকে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাদান কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই শিক্ষাদান কৌশলগুলি হচ্ছে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার বহিরঙ্গ স্বরূপ। উপস্থাপনের বিভিন্ন দিক হিসাবে, প্রশ্ন, উত্তর, প্রদীপন, গৃহকাজ, গ্রন্থাগার ব্যবহার, পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার, হচ্ছে বিশেষভাবে আলোচ্য। উপস্থাপনের বিভিন্ন শিক্ষণ প্রক্রিয়া ও কৌশল শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানবর্ধন এবং প্রতিন্যাস সংগঠনের সহায়ক। এ ছাড়া মৌখিক শিক্ষাদানের কৌশলও আছে এবং সেগুলি হচ্ছে বর্ণনা (Narration), বিবরণী দান (Description) ও ব্যাখ্যা (Explanation)। মূল শিক্ষাদান কৌশলগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্বে বর্ণনা, বিবরণী দান ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

মৌখিক শিক্ষাদান কৌশল

বর্ণনা (Narration)

বর্ণনা হচ্ছে শ্রোতৃবর্গের নিকট ঘটনাসমূহের বিভিন্ন বিষয়বস্তু, ধারাবাহিক ভাবে বলা। বর্ণনাদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিস্কার, স্পষ্ট ও আগ্রহব্যঞ্জক ভাষায় পারম্পর্য বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের কাছে বলা, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের মনোরাজ্যে ঘটনাগুলি সন্নিবেশিত করে রাখতে পারে এবং কল্পনায় তাকে রক্ষণ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের মনে হবে, শিক্ষার্থীরা যেন ঐ ঘটনা বা গল্পের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। যে শিক্ষক উত্তম বর্ণনা প্রদান করতে আগ্রহী, তাঁকে মাতৃভাষায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করতে হবে। যে ভাষা তিনি বর্ণনাকালে ব্যবহার করবেন তা হবে অবস্থা ও ঘটনাসাপেক্ষ এবং ভঙ্গিটি যেন শিক্ষার্থীদের মনোরাজ্যের পটভূমিকায় খাপ খায় এমন অবস্থার সৃষ্টি করে বর্ণনা প্রদান করতে হবে।

বর্ণনার প্রয়োজন প্রায় প্রতি পাঠেই, কোন পাঠে হয়ত বেশি, কোনও

* Q. What are the devices and techinques of teaching.

পাঠে কম। বর্ণনা হবে চিত্তাকর্ষক, সুন্দর ও জীবন্ত। শিক্ষার্থীরা যেন শিক্ষকের কথা শুনে মনে মনে একটি ছবি অঙ্কন করে নেয়, এমনি হবে বর্ণনার ধারা। অতএব শিক্ষক যখনই কোন বিষয়ের বা ঘটনার বর্ণনা করবেন, তখনই তাঁর প্রচেষ্টা হবে একটি মৌখিক চিত্র শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরা। শিক্ষকের বর্ণনা শুনে শিক্ষার্থীরা আরও বর্ণনা শুনবার জন্য আগ্রহবোধ করবে।

বর্ণনাদানের কলাকৌশল শিক্ষক স্বচেষ্টায় উৎকর্ষসাধন করতে পারেন। তিনি অপর নিপুণ-বর্ণনাকারীর বর্ণনার ধারা লক্ষ্য করে বর্ণনা কৌশল শিখতে পারেন। বিভিন্ন লেখকের শিশুসাহিত্য অনেকবার পাঠ করে তিনি বর্ণনা কৌশলে দক্ষতা লাভ করতে পারেন এবং গল্প বলা অভ্যাস করে নিজের বর্ণনাশক্তির উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হন। শিক্ষক সহজ ও পরিচিত উপমা, রূপক অলঙ্কার ইত্যাদি প্রয়োগ করে বর্ণনা পরিবেশন করবেন এবং তাতে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পাবে বেশি।

বর্ণনা শিক্ষাপ্রদ ও উপলব্ধির সহায়ক করতে হলে শিক্ষক

১। সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা দেবেন। বর্ণনা যেন শ্রেণীর উপযুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২। প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক বর্ণনাকালে তাঁর স্বর উঁচু নীচু করবেন এবং তিনি সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ করবেন।

৩। গভীর অনুরাগের সঙ্গে ঘটনার বা গল্পের বিবরণ দেবেন। শিক্ষকের আন্তরিকতার অভাব থাকলে তা শিশুমনকে আকর্ষণ করতে পারবে না।

৪। বর্ণনা একটানা দীর্ঘ করবেন না, তাহলে বর্ণনাদান একঘেয়ে হয়ে যাবে।

৫। বর্ণনাকালে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কথার উপর বেশি জোর দেবেন।

৬। পাঠের উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে বর্ণনা এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ তাঁকে যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে।

বিবরণী দান (Description)।

বর্ণনা ও বিবরণী প্রদান (Description) একই পর্যায়ের শিক্ষাদান কৌশল। অভিধান অনুযায়ী বিবরণী দান বা Description হচ্ছে ভাষায় সুস্পষ্ট বর্ণনা করা বা কথার মালায় চিত্রিত করা বা সংজ্ঞা প্রদান করা।

বর্ণনা বা Narration এর ক্ষেত্রে ভাষার যে চিত্তাকর্ষক উপায় অবলম্বন করে বিষয়বস্তু পরিবেশন করা হয়, বিবরণী দানের ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি চিত্তাকর্ষক করা প্রয়োজন। বর্ণনার ক্ষেত্রে গল্পের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে বিবরণী দানের ক্ষেত্রে গল্প বলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে না, হবে অন্যান্য ধরণের বিবরণের উপর অর্থাৎ জড়বস্তুর বা সাধারণ জীবনের উপর কিংবা কোন সমস্যার উপর। গল্প সরল বিষয়বস্তু, ফলে তার আকর্ষণী শক্তি বেশি, কিন্তু বিবরণী প্রদানের মধ্যে গল্পের বিষয়বস্তু নেই, আছে অপেক্ষাকৃত নীরস জিনিষ, তাই বিবরণীকে সহজ উপমা ও আলঙ্কারিক ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে যথাসম্ভব সরস করে তুলতে হবে।

ব্যাখ্যা (Explanation)—ব্যাখ্যা হচ্ছে আর একপ্রকারের শিক্ষাদান কৌশল। একজন সফল শিক্ষকের পক্ষে বহুমুখী নৈপুণ্যের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন এবং সেই নৈপুণ্যগুলির মধ্যে ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য হচ্ছে অন্যতম। ব্যাখ্যা করার অর্থ হচ্ছে বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করা, বিশদ করা, দুর্বোধ্যতা নিরসন করা ইত্যাদি। ভাষার কাঠিন্য দূর করবার জন্যই যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন এমন কোন কথা শুধু নেই, ভাবের কাঠিন্য দূর করবার জন্যও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। শুধু সাহিত্য-পাঠের ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত বিষয় পাঠদানের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রয়োজন হতে পারে। ব্যাখ্যা সুফলপ্রসূ করবার জন্য সরলভাষা ব্যবহার করতে হবে এবং খুব বেশি কথার সমাবেশ সেখানে থাকবে না। বেশি কথা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গেলে শিক্ষার্থীরা মূল বিষয়বস্তু হতে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে। শুধু মৌখিক ভাবে নয়, কার্য সম্পাদনদ্বারাও ব্যাখ্যার কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

প্রশ্নকরণ কৌশল (Questioning Technique)।*

শিক্ষাদানের বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে 'প্রশ্নকরণ' হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নের মাধ্যমেই শিক্ষক শ্রেণীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম হন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্যালমন বলেছেন, "একজন শিক্ষক ভাল বক্তা হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি রীতি অনুযায়ী প্রশ্ন না করতে পারেন, তাহলে তিনি মোটেই সুশিক্ষক নন।"[১] রেমণ্ট (Raymont) বলেছেন 'একজন নূতন শিক্ষাব্রতীর

* Q. What is the importance of questioning as a device of teaching ?

১। Salmon : "A bad questioner is a bad Teacher, he may be a good lecturer."

অন্যতম আবশ্যিক উচ্চভিলাষ হওয়া উচিত যে তিনি উত্তম প্রশ্ন রচনা করবার কৌশলের অধিকারী হবেন।[২]

শিক্ষার উদ্দীপক হিসাবে প্রশ্নের স্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অতীত যুগের শিক্ষকগণ এর গুরুত্বকে কখনও অস্বীকার করেন নি। S. S. Colvin তাঁর 'An Introduction to High School Teaching' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে শ্রেণী-শিক্ষাদানের উৎকর্ষতার পরিমাপ হবে কিভাবে শিক্ষক শ্রেণীতে প্রশ্ন করবেন এবং কতটা পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি দিয়ে সেই প্রশ্নগুলি রচনা করেছেন তার উপর নির্ভর করে।

একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন,

'I keep six honest serving men,
They taught me all I know.
Their names are what and why and when,
And How and where and who."

(আমি রেখেছি ছয়টি সৎ ভৃত্য.
তারা আমায় খবর জোগায় নিত্য।
তাদের পরিচয় বলব আমি হেথায়
কে, কি, কেন, কবে, কখন, কোথায় ?)

প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ জিজ্ঞাসিত হয় বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে—(ক) শিশু কি জানে ও কি জানে না তা জানবার জন্য, (খ) শিশুকে মনোযোগী ও সতর্ক রাখবার জন্য, (গ) শিশু সত্যি করে শিক্ষণের সোপানগুলি অনুসরণ করে চলেছে কিনা দেখবার জন্য (ঘ) শিশুমনে বিষয়বস্তুটি থিতিয়ে দেবার জন্য এবং (ঙ) চিন্তাধারায় উৎসাহী করতে, ঔৎসুক্য ও উদ্দীপনা জাগ্রত করতে।

এই লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছানোর সোপান হচ্ছে তিন ধরনের প্রশ্ন—(১) প্রারম্ভিক প্রশ্ন বা Introductory or Preliminary questions, (২) বিকাশমূলক প্রশ্ন বা Developing questions এবং (৩) পরীক্ষা ও পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন বা Testing and recapitulatory questions.

বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন সম্পর্কীয় আলোচনার পূর্বে প্রশ্ন কলা-কৌশল সম্পর্কিত শিক্ষকদের আবশ্যক গুণাবলীর কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

২। Raymont : "the acquisition of a good style of questioning may be laid down definitely as one of the essential ambitions of a young teacher."

(১) স্পষ্ট ও দ্রুত চিন্তন শক্তি—প্রশ্নকারী সকল শিক্ষকের প্রাথমিক গুণ হচ্ছে যে তাঁর বিষয়বস্তুর উপর অধিকার ব্যাপক হবে ও তিনি যুক্তিভিত্তিক চিন্তনে দক্ষ হবেন। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অভাব থাকলে শিক্ষকের প্রশ্নগুলি বিষয়বস্তুর জটিলতার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলবে। ফলে তিনি যদি বিষয়বস্তু ভাল করে বুঝতে না পারেন, তাহলে শিক্ষার্থীদের অন্তরে প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে প্রবেশ করবেন কি করে?

(২) প্রশ্নের উপযুক্ত শব্দ-বিন্যাসের দক্ষতা—শিক্ষাবিদ পার্কারের মতে শিক্ষক হয়ত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, হয়ত তিনি যুক্তিভিত্তিক চিন্তনে পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে সক্ষম। কিন্তু তিনি সঠিক ভাবে উপযুক্ত শব্দ সংযোগে প্রশ্নরচনা নাও করতে পারেন। অতএব পূর্ণ অনুশীলনদ্বারা শিক্ষক ঐ কৌশলটি আয়ত্ব করবেন।

প্রশ্নের কার্যকারিতা (Functions of the Questions)। *

প্রশ্নরচনার কার্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্ণ তালিকা রচনা করা সম্ভব নয়। কারণ শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী এর মধ্যে ব্যতিক্রম দেখা যেতে পারে। তবে যেগুলি সাধারণতঃ গুরুত্বপূর্ণ, তাদের উল্লেখ এখানে করা যাচ্ছে।

১। শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতার মূল্যায়ন।

(ক) শিক্ষার্থী শ্রেণীতে পাঠ গ্রহণ কতটা করতে সক্ষম হয়েছে প্রশ্নের মাধ্যমে তা স্থির করা হয়। মিস্ ষ্টিভেন্স্ (Miss Stevens) নামে একজন শিক্ষাবিদ কিছুদিন পূর্বে শ্রেণী-প্রশ্নের স্বরূপ জানবার জন্য নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীর স্মৃতি শক্তির পরিচায়ক হিসেবে রচিত হয়েছে মাত্র। তার মধ্যে চিন্তন ও বিশ্লেষণ শক্তির নির্দেশনা কিছু নেই।

(খ) কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু উপলব্ধিরও মূল্যায়নও করা হয়। মুখস্থ করে বিষয়বস্তু উদগীরণ ও উপলব্ধিকরণ এক নয়। উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রশ্নভিত্তিক আলোচনা হবে বেশি।

২। পাঠ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শিক্ষাদানে সাহায্য।

শিক্ষার্থীরা নানাভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কিন্তু বিষয়বস্তুর পূর্ণ

* Q. What are the functions of questions?

উপলব্ধি তাদের সব সময়ে হয় না। শিক্ষক প্রশ্ন করে করে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু উপলব্ধিতে সাহায্য করতে সক্ষম।

৩। আগ্রহ জাগরণ।

শিক্ষক নানা প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে কৌতূহল ও ঔৎসুক্য জাগ্রত করতে পারেন।

৪। বার বার অনুশীলনের ব্যবস্থা।

এক-আধবার শুনলে ও পড়লে বিষয়বস্তু সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষক বিষয়বস্তু গ্রহণে সাহায্য করতে সক্ষম হন।

৫। চিন্তনে আগ্রহ সৃষ্টি।

প্রত্যেক সমস্যার মধ্যে যেমন প্রশ্ন লুক্কায়িত, তেমনি প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যে সমস্যার সন্ধান পাওয়া যায়। সমস্যা সৃষ্টি হলেই সমাধানের সূত্র খুঁজতে হয়। সমাধানের প্রচেষ্টার মধ্যে চিন্তন প্রক্রিয়াটি বিশেষ আবশ্যক। এই হিসাবে শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে চিন্তনের খোরাক জোগাতে পারেন। অতএব শিক্ষক শ্রেণী-শিক্ষণকালে সবসময় শুধু ঘটনাশ্রয়ী প্রশ্ন শিক্ষার্থীর কাছে করবেন না। চিন্তাশ্রয়ী প্রশ্নও শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করবেন।

৬। মূল্যায়নের শক্তি ও অভ্যাসের বিকাশ।

সঠিক চিন্তনের একটি একটি বিশেষ ধাপ হচ্ছে মূল্যায়ন। আমরা সবসময়েই কোনও ঘটনা বা বিষয়ের মূল্যায়ন করবার সময় অন্য বিষয়বস্তু বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক সিদ্ধান্তে আগমন করি। হয়ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেখি, কোনটা যথার্থ, কোনটা ত্রুটিপূর্ণ, কোনটি অকিঞ্চিৎকর, কোনটি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্লেষণের ক্ষমতা এবং মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গী উপযুক্ত চিন্তনের ভূমিকা। এই কারণে শিক্ষক প্রভেদমূলক সূক্ষ্মদর্শী প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদিগকে মূল্যায়নের পথ প্রদর্শন করতে পারেন, যার ফলে শিক্ষার্থীদের যুক্তিভিত্তিক চিন্তনের বিকাশ হতে পারে।

৭। পাঠের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদানের উপর মনোযোগ আকর্ষণ।

পাঠের বিষয়বস্তুর মধ্যে কতকগুলি কেন্দ্রীভূত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে।

শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর মনে থিতিয়ে দিতে পারেন।

৮। শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত মনোযোগ আকর্ষণের সহায়ক।

অনেক সময় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অন্যমনস্ক হয়ে যায়। শিক্ষক আগ্রহ উৎপাদনকারী প্রশ্ন করে শ্রেণীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। শ্রেণীর কোন শিক্ষার্থী যদি অন্যমনস্ক হয় তাহলে শিক্ষক তাকে নির্দিষ্ট করে হৃদয়গ্রাহী প্রশ্ন করতে পারেন, তার ফলে সেই শিক্ষার্থীর মনোযোগ পাঠে ফিরে আসবে।

৯। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ আবিষ্কার এবং তাদের সঙ্গে শিক্ষকের সুসম্বন্ধ স্থাপন।

প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সন্ধান পেতে পারেন। শুধু তাই নয় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সুন্দর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

১০। রসোপলব্ধির সহায়ক।

যদি প্রশ্ন বুদ্ধিমূলক আগ্রহ এবং চিন্তন ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়, তাহলে তা শিক্ষার্থীর অনুভূতি বিকাশের সহায়কও হবে। শিক্ষক সূক্ষ্ম ইঙ্গিতমূলক প্রশ্নদ্বারা শিক্ষার্থীদের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করে তাদের মনকে উদ্বেল করে তুলতে পারেন। ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর রসগ্রহণের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবে।

১১। পাঠের জন্য সরাসরি উদ্দীপক যোগানো।

শিক্ষার ব্যাপক উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ। সর্বাঙ্গীন বিকাশের ক্ষেত্রে নিয়মিত পাঠ থেকে অভিজ্ঞতা আহরণ অন্যতম উপাদান। শিক্ষক নানারকম প্রশ্ন করেন। এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। কারণ পাঠ আয়ত্তীকরণ হয়েছে কিনা জানা প্রয়োজন। শিক্ষকের প্রশ্ন যাতে শিক্ষার্থীরা ভালভাবে উত্তর দিতে পারে এজন্যই তারা পাঠে আগ্রহী হবে।

বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন।*

প্রশ্ন হতে পারে তিন ধরনের—(ক) প্রারম্ভিক (খ) বিকাশমূলক ও (গ) পুনরালোচনামূলক। পর পৃষ্ঠায় এই ধরণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

---

* Q. What are the different types of questions? Elucidate them.

(ক) প্রারম্ভিক প্রশ্ন।

এই জাতীয় প্রশ্ন সাধারণতঃ পাঠের শুরুতে অবলম্বিত হয়। উদ্দেশ্য থাকে নূতন পাঠ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর পরিচিতি কতটুকু তা জানবার এবং নূতন পাঠে প্রেষণা জোগাবার। শিশুমন নূতন পাঠ গ্রহণে কতটা উদ্যোগী, তা জানবার সুবিধা এক্ষেত্রে। প্রাথমিক প্রশ্ন হবে স্বল্প।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে অশোক পড়াতে কয়েকটি প্রস্তুতিমূলক প্রারম্ভিক প্রশ্ন শিশুদের করা যেতে পারে।

(১) সম্রাট অশোকের পিতার নাম কি ?

(২) অশোক পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র না হয়েও সম্রাট হলেন কেন ?

(৩) অশোককে প্রথম জীবনে কি নামে সকলে ডাকত ?

(খ) বিকাশমূলক প্রশ্ন।

পাঠদান ক্রমের মধ্যে বিকাশমূলক প্রশ্ন করতে হয়। বিকাশমূলক প্রশ্নের দ্বারা শিশুর মানসিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। মানসিক ক্রিয়াকে সাহায্যও করে বটে। এই প্রশ্নগুলির সাহায্যেই শিক্ষক শিক্ষার্থীকে স্তরে স্তরে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। তাছাড়া এই বিকাশমূলক প্রশ্নের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীরা পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে অগ্রসর হয়। বিকাশমূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ, তুলনাকরণ, মনঃসংযোগ ইত্যাদি শক্তির প্রয়োগ করে। ফলে শিক্ষার্থীদের স্মৃতি-শক্তি, কল্পনা-শক্তি ও বিচার-শক্তির অনুশীলন ঘটে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যখন যুক্তিভিত্তিক বিষয় আলোচনায় লিপ্ত থাকে তখন বিকাশমূলক প্রশ্ন তাদের বৌদ্ধিক বিকাশের বিশেষ সহায়ক হয়। শিক্ষক এমনিভাবে প্রশ্ন করে যাবেন যাতে শিক্ষার্থীরা মনে করে যে তারাই যেন প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করে চলেছে।

কলকাতার ভৌগোলিক গুরুত্ব সম্বন্ধে পাঠ দিতে গিয়ে শিক্ষক নিম্নলিখিত বিকাশমূলক প্রশ্ন করতে পারেন।

(১) মানচিত্রে কলকাতার অবস্থান দেখাও।

(২) কলকাতার পশ্চাদ্ভূমি (hinterland) কোন কোন স্থান সম্বলিত বর্ণনা দাও।

(৩) কলকাতার পশ্চাদ্ভূমি এত জনবহুল কেন ?

(৪) এই পশ্চাদ্‌ভূমিতে কি কি শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়?

(৫) কলকাতা বন্দর হতে কি কি দ্রব্য বাহিরে রপ্তানি হয়ে যায়? কেন যায়?

(৬) ধান ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সাধারণতঃ কেন রপ্তানি হয় না?

(৭) কলকাতার সঙ্গে বোম্বাই ও মাদ্রাজের তুলনা কর।

পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন।

পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন পাঠশেষে বা পাঠের কোনও শীর্ষশেষে করা চলে। এই জাতীয় প্রশ্নদ্বারা দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়—শীর্ষগত অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন এবং সমগ্র বিষয় সম্পর্কিত পুনরালোচনা। এই প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীদের স্মৃতি-শক্তি মার্জিত করে, তদুপরি শিক্ষার্থীদের অর্জিত ধারণাকে গভীরভাবে মনে থিতিয়ে দেয়।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে "আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ও দেশে প্রত্যাবর্তন" এই বিষয়টি দু'টি শীর্ষে বিভক্ত করে পাঠদান করা হল। 'ক' শীর্ষ হল, 'আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ' এবং 'খ' শীর্ষ হল, 'আলোকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তন।' শীর্ষের মধ্যে মাঝে মাঝে পরীক্ষামূলক প্রশ্ন ছাড়া শীর্ষের শেষে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি হতে পারে।

'ক' শীর্ষের নমুনা প্রশ্ন ঃ

(১) আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ কেন আক্রমণ করেছিলেন?

(২) তক্ষশীলার রাজা অম্ভি কেন আলেকজাণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন?

(৩) রাজা পুরু কেন আলেকজাণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করেন নি?

(৪) রাজা পুরুর সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ বর্ণনা কর।

(৫) রাজা পুরু বন্দী অবস্থায় আলেকজাণ্ডারের কাছে নীত হলে আলেকজাণ্ডার তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেন?

'খ' শীর্ষের নমুনা প্রশ্ন ঃ

(১) আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষের পূর্বদিকে আর অগ্রসর হলেন না কেন?

(২) আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের কাহিনী বর্ণনা কর।

পাঠশেষে পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন।

(১) আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ কেন করেছিলেন ?

(২) পুরুর পরাজয়ের কারণ কি ?

(৩) আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলাফল কি ?

উত্তম প্রশ্নের বৈশিষ্টাবলী (Characteristics of Good Questions)।*

শিক্ষাদানের কৌশল হিসাবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে প্রশ্নকরণ। এর উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে যদি প্রশ্নগুলি ক্রটিপূর্ণ হয়। প্রশ্নকরণ হচ্ছে একটি বিশিষ্ট কলাকৌশল এবং একে খুব সাবধানতার সঙ্গে অনুশীলন করতে হবে।

উত্তম প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে :

১। প্রশ্নগুলি স্বল্প ভাষায় সঠিক নির্দেশনাবিশিষ্ট হবে। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তির বিস্তৃতি সীমাবদ্ধ, অতএব প্রশ্নের কথাগুলি এত সংক্ষিপ্তভাবে সজ্জিত থাকবে, যাতে শিক্ষার্থীরা তাড়াতাড়ি সহজে প্রশ্নের অর্থগ্রহণ করতে সক্ষম হয় এবং তারা উত্তরদানে সক্রিয় হয়ে উঠে।

২। প্রশ্নগুলি নির্দিষ্ট ভাবব্যঞ্জক হবে, দ্ব্যর্থব্যঞ্জক হবে না। দ্ব্যর্থব্যঞ্জক প্রশ্নে উত্তরের বিভিন্নতা ও ভুল দৃষ্ট হয়।

৩। প্রশ্নসমূহ শিক্ষার্থীদের বয়সোপযোগী ও তাদের সামর্থ্যের উপযোগী হবে। অনেক সময়ই শিক্ষার্থীদের কাছে এমন প্রশ্ন রাখা হয় যার উত্তর তারা দিতে সক্ষম হয় না। পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কাছে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে ? প্রশ্নটি সহজ। কিন্তু ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর কাজ কি ? এই প্রশ্নটি শ্রেণীর উপযোগী নয়।

৪। উত্তম প্রশ্ন চিন্তন প্রক্রিয়ার সহায়ক হবে। বিষয়গত প্রশ্নে চিন্তনের স্থান নেই, কারণ সেখানে যুক্তি ও চিন্তাধারার সাহায্যে প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের উপর চাপ নেই। এ জাতীয় প্রশ্নেরও প্রয়োজন আছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর নাম কর। কিন্তু সাধারণতঃ উত্তম প্রশ্ন শিক্ষার্থীর মানসিক সক্রিয়তাকে গতিশীল করে তুলবে তবেই তার উপলব্ধি হবে স্পষ্ট। যেমন পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা ছাড়া আর একটি সামুদ্রিক বন্দর স্থাপন করা উচিত কেন ?" এই প্রশ্নে শিক্ষার্থীদের চিন্তার খোরাক মিলবে, তারা যুক্তিদ্বারা সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হবে।

* Q, What are the characteristics of good questions ?

৫। উত্তম প্রশ্ন এমন হবে, যাতে তার মধ্যে উত্তরের ইঙ্গিত না থাকে, অর্থাৎ প্রশ্নটি তার উত্তর নির্দেশক হবে না। যথা—আকবরের পুত্রের নাম কি জাহাঙ্গীর? পশ্চিবঙ্গের রাজধানী কি কলকাতা? —এরূপ প্রশ্ন কখনও করা উচিত নয়।

৬। প্রশ্ন এমনিভাবে রচিত হবে যে তার একটি মাত্র উত্তর হয়। —স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রীর নাম কি এবং তিনি বাংলাদেশের স্বাধীন হবার আগে কোন শক্তির অধীনে কারাবরণ করেন?—এই প্রশ্নের মধ্যে দুটি প্রশ্ন সন্নিবেশিত রয়েছে, উত্তরও দুটি। এরূপ প্রশ্ন বর্জনীয়, কারণ শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিতে অসুবিধা বোধ করবে।

৭। প্রশ্নের মধ্যে বিষয়বস্তুর শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হবে। প্রশ্ন ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের কাছেই পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, এলোমেলো হবে না। 'অশোকের ধর্মপ্রচার' পড়াতে গিয়ে—আলেকজাণ্ডার কোথাকার রাজা ছিলেন?—এরূপ প্রশ্ন সঙ্গতিবিহীন।

৮। পাঠ্যপুস্তক হতে শব্দ সম্পদ গ্রহণ করে প্রশ্ন করা উচিত নয়। কারণ প্রশ্নে পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের ভাষা মুখস্থ করতে আগ্রহী হবে এবং তাদের মৌলিকত্ব নষ্ট হবে।

৯। প্রশ্নের উত্তর 'না' বা 'হঁা' যাতে না হয় সেদিকে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন—আকবর কি হুমায়ুনের পুত্র ছিলেন? তাজমহল কি সাজাহান তৈরি করেছিলেন?—এই জাতীয় প্রশ্নে না আছে বিষয়গত জ্ঞানের পরীক্ষা, না আছে চিন্তনের মূল্যায়ন, অতএব এই জাতীয় প্রশ্ন বর্জনীয়।

১০। প্রশ্নের মধ্যে যেন শিক্ষকের কথার পুনরুক্তি না থাকে। যেমন—অশোক ধর্মমহামাত্রদের সাহায্যে দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। এ কথা বলার পর শিক্ষক—অশোক ধর্মমহামাত্রদের সাহায্যে দেশের মধ্যে কি প্রচার করেছিলেন?—এরূপ প্রশ্ন করা উচিত নয়। এই প্রশ্নগুলিকে প্রতিধ্বনিমূলক প্রশ্ন (echo questions) বলা হয়। তা ছাড়া যে বিষয়বস্তু যখন পরিবেশিত হল, তখনই প্রতিধ্বনিমূলক প্রশ্ন একান্তই অনুচিত। বিষয়গত জ্ঞান মূল্যায়নের জন্য পরে প্রশ্ন অন্যভাবে করা যেতে পারে।

১১। প্রশ্ন যথেষ্ট পরিমাণে সহজ বা যথেষ্ট পরিমাণে কঠিন হবে না। খুব সহজ প্রশ্নে শিক্ষার্থীদের অমনোযোগী করে এবং খুব কঠিন প্রশ্নে শিক্ষার্থীদের নিরুৎসাহী করে।

১২। প্রশ্ন বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে যেমন হবে, তেমনি হবে ধারাবাহিক ও অবিছিন্ন। প্রশ্নগুলির মধ্যে পারম্পর্য থাকবে এবং একটি অপরটি হতে উদ্ভূত এ রকম অবস্থা বজায় থাকবে।

১৩। প্রশ্ন খুব তাড়াতাড়ি করা হবে না। সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় ধীরে ধীরে করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী শিক্ষকের প্রশ্নের ভাষা সঠিকভাবে ধরতে পারে।

১৪। প্রশ্ন সমগ্র শ্রেণীর কাছে উপস্থাপিত করতে হবে, তারপর নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলা হবে। নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর দিকে নির্দেশ করে প্রশ্ন করা হবে না। যেমন,—প্রতুল, তুমি বল, রাম কেন বনে গিয়েছিলেন?

১৫। শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীই যাতে প্রশ্নের উত্তর দেবার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক প্রশ্ন করবেন। রোল নম্বর অনুযায়ী বা শিক্ষার্থীদের বসবার ক্রম অনুযায়ী শিক্ষক প্রশ্ন করবেন না। তা হলে যারা ক্রমের বাইরে যাবে, তারা পরের প্রশ্নগুলির সম্পর্কে অমনোযোগী হবে।

১৬। শিক্ষার্থীদের ঠকানোর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করা হবে না। তা ছাড়া প্রশ্নে রূঢ়তা-প্রকাশক ভাব থাকবে না, থাকবে সমবেদনা।

১৭। প্রশ্ন করার পর কিছু সময় দিয়ে তবে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীকে উত্তর জিজ্ঞাসা করতে হবে।

১৮। অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে হবে। একে শ্রেণী-শৃঙ্খলাবিধানকারী প্রক্রিয়া বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যারাই অমনোযোগী হতে চাইবে, তাদের ভীতি থাকবে কখন শিক্ষক তাদের প্রশ্ন করে বসবেন। এ জন্য তারা মনোযোগ দিয়ে প্রশ্ন শুনতে ও উত্তরদানে আগ্রহী হবে।

শিক্ষার্থীর প্রশ্ন ও শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া।

শিক্ষার্থীর প্রশ্ন এবং শিক্ষকের উত্তরদান শিক্ষকের শিক্ষাদান সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষার্থীর প্রশ্ন কিরূপ হবে এবং উত্তরদানের ধারাই বা কিরূপ তা বিভিন্ন দিক হতে আলোচনা করা যেতে পারে।

১। শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করতে হবে—শিক্ষণদান বলতে শিক্ষক কতটা দান করলেন তারই ফিরিস্তি নয়। শিক্ষার্থীর কাছ

থেকে উত্তর হিসাবে কতটা বের করে নেওয়া হল তাও বিচার্য. শিক্ষার্থীরা শুধু শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দেবে না, তারা শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে নিজেদের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ধারণাকে আরও স্পষ্ট করে নেবে। এজন্যই শিক্ষক শিক্ষার্থীদিগকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।

২। **শিক্ষার্থীকে তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন করতে হবে**—শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান জানাতে হবে বটে, কিন্তু তারা যেন বাজে প্রশ্ন না করে, পাঠধারার বাইরে যেন প্রশ্ন না চলে যায়। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের মধ্যে উপযুক্ত চিন্তাধারার অপ্রাচুর্যতা দেখা যায় এবং ভাসাভাসা জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা যদি বেশি প্রশ্ন করতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তারা ধীরে ধীরে উপযুক্ত ধরণের প্রশ্ন করতে শিখবে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রেণী-পাঠনা সুসম্বদ্ধ হবে।

৩। **শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলি সৌজন্যের পরিচায়ক হবে**—শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করবার আগ্রহে মাঝে মাঝে শিক্ষককে একসাথে অনেক প্রশ্ন করে থাকে। একসাথে প্রশ্ন করাটা সমীচীন নয়, এটা অসৌজন্যের পরিচায়ক। শিক্ষক এই সমস্যাটিকেই কেন্দ্র করেই শিক্ষার্থীদের শেখাতে পারেন 'একে যবে কথা কয়, অন্যসবে মৌন রয়।'

(৪) শিক্ষককে সমালোচনা করার জন্য শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা।

শিক্ষকের মতামতের মানে শিক্ষার্থীর মতামতের সঙ্গে মিল নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থী চুপ করে থেকে শিক্ষকের কথা একান্তভাবে মেনে নেবে, এরূপ অবস্থা প্রকৃত শিক্ষার্থীর পরিপন্থী। অতএব শিক্ষকের মতামতের সঙ্গে শিক্ষার্থীর মতামতের বিরোধিতা থাকে, তবে তা শিক্ষার্থীকে প্রকাশ করতে স্বাধীনতা দিতে হবে। এর ফলে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়, তা হয় হৃদয়গ্রাহী, শিক্ষার্থীর পক্ষে সমৃদ্ধ হবার সহায়ক।

(৫) শিক্ষক প্রশ্নের উত্তরে অপারক হলে তা স্বীকার করবেন।

এতে লজ্জার কিছু নেই। সকলেই সব কিছু জানে না। শিক্ষক বলবেন, তিনি পরে পুস্তকাদি দেখে সঠিক উত্তর শিক্ষার্থীদিগকে দিবেন। শিক্ষার্থীরা এতে মনে কিছু করবে না। কিন্তু শিক্ষক যদি ভাওতা দিয়ে কিছু বলে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরকে ধামা চাপা দিতে চান, তাহলে শিক্ষার্থীরা অচিরে তা বুঝতে সক্ষম হবে এবং শিক্ষকের উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে।

শিক্ষার্থীদের উত্তরে শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া।

শ্রেণী-পাঠনার সাফল্যের ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তরের প্রতি শিক্ষকের মনোভাব, বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

(১) শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তরের প্রতি সপ্রশংস মনোভাব দর্শন।

শিক্ষার্থী কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অগ্রসর হলে শিক্ষক তাকে প্রশ্নের উত্তরদানে উৎসাহিত করবার জন্ম তার প্রচেষ্টা সম্পর্কে দু-একটি প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করবেন। শিক্ষকের উৎসাহমূলক কথা শ্রবণ করলে শিক্ষার্থীর উত্তর সম্বন্ধে মনের সন্দেহভাব চলে যাবে এবং সে যথাযথ উত্তর-দানের জন্ম চেষ্টিত হবে।

(২) শিক্ষার্থীর উত্তরদান কালে তাকে সাহায্য অনুচিত।

শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর কারও সাহায্য না নিয়ে নিরপেক্ষভাবে দেবে। অনেক সময় শিক্ষার্থীকে উত্তরদানে সাহায্য করলে তাকে সাহায্য করা ব্যতিরেকে, তার প্রতিবন্ধকতা করা হয়।

(৩) প্রশ্নের উত্তর পূর্ণবাক্যে হবে এবং তা ব্যাকরণগত শুদ্ধ হবে।

অনেকের ধারণা আছে যে ইংরেজি ভাষা ও মাতৃভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ব্যাকরণগত শুদ্ধ বাক্য বলা প্রয়োজন। অন্যত্র নয়। এ ধারণা ভুল। সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে উত্তরদান কালে শুদ্ধ ভাষা ও পূর্ণবাক্য ব্যবহার করতে হবে।

উত্তম উত্তরের লক্ষণ।

প্রশ্নের সমস্যার সঙ্গে উত্তর ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর দেখেই শিক্ষকের শিক্ষাদান সাফল্যের ধারা স্থির করা যায়।

(১) উত্তম উত্তরের মধ্যে বিষয়গত ও ভাষাগত নির্ভুলতা বিদ্যমান থাকবে। প্রশ্নের মধ্যে যা চাওয়া হয়েছে, উত্তরের মধ্যে তার সমস্ত বিবরণটুকু থাকবে।

(২) উত্তম উত্তর হচ্ছে পরিষ্কার, ছোট এবং ভাষায় সহজ ও সরল। উত্তম উত্তরের মধ্যে শিক্ষার্থীর চিন্তনের প্রক্রিয়ার বাস্তব পরিচয় পাওয়া যাবে। এটা সম্ভব যদি প্রশ্নগুলি সহজ সরল ভাষায় রচিত হয়, সংক্ষিপ্ত এবং বিকাশমূলক হয়।

(৩) শিক্ষার্থীর উত্তর শ্রেণীর সকলে শুনবে এমনি ভাবে উচ্চারিত হবে। সে অস্পষ্টভাবে, অপ্রাসঙ্গিক উত্তরদান করবে না। বলা বাহুল্য এই জাতীয় উত্তর মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

(৪) উত্তর গ্রহণ নীতির উপর শ্রেণী শিক্ষণের সাফল্য নির্ভর করে। ধৈর্য, উৎসাহ ও সমবেদনা এই তিনটি গুণ শিক্ষকের অতি প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে শিক্ষার্থীর উত্তর গ্রহণকালের সময়। শিক্ষক অধৈর্য হলে কিংবা কটুভাষী হলে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তম উত্তর আদায় করা যাবে না।

(৫) উত্তম ও সঠিক উত্তর পাওয়া গেলে বুঝতে হবে শিক্ষার্থী প্রশ্ন ভালভাবে বুঝতে সমর্থ হয়েছে এবং তার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রশংসাসূচক কথা বলতে হবে।

(৬) কোন কোন সময় প্রশ্নের উত্তর আংশিকভাবে ঠিক ও আংশিকভাবে ভুল হয়। এরূপ অবস্থা নানা কারণে দেখা যায়। হয়ত শিক্ষার্থীর অমনোযোগ, বা স্মৃতিভ্রংশ কিংবা প্রশ্নের অংশ বিশেষের ভুল বোঝার জন্যও হয়। যথার্থ উত্তর পাওয়া যায় নি বলে তা একান্তভাবে পরিত্যক্ত হবে না। শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে সঠিক উত্তরটি বের করে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু শেখাতে প্রকৃতপক্ষে সাহায্য করবেন।

(৭) সম্পূর্ণ ভুল উত্তরকে ব্যঙ্গ করে পরিত্যাগ করলেই চলবে না। সমবেদনামূলক তিরস্কারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সঠিক পথে চালাতে হবে।

(৮) সমগ্র শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা উত্তরদানে অংশ গ্রহণ করবে।

সর্বশেষে Ward এবং Roscoe-এর কথা উল্লেখ করে বলা যায়, যে উত্তর গ্রহণের নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই। সমস্ত ভুল উত্তর এড়িয়ে যাওয়া যেমন অনুচিত, তেমনি সমস্ত উত্তরগুলির বিশ্লেষণ করাও অসম্ভব। কতকগুলি উত্তর-সম্বন্ধীয় ত্রুটি হচ্ছে খাঁটি, যেগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন শিক্ষক তখনই বা পরে করতে পারেন; কতকগুলি প্রশ্ন অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিবিশিষ্ট যেগুলির সংশোধন তিনি করতে পারেন, কতকগুলি এলোমেলো, ও নির্বোচসূচক এবং এগুলি শিক্ষক দৃঢ়তার সঙ্গে পরিত্যাগ করতে পারেন।[১]

1. Ward and Roscoe : There are no rules. It is unwise to pass over all wrong answers, as it is unwise to attempt to deal with all. Some are genuine misconceptions, which the teacher must clear up at the time or later on ; others are imperfect and incomplete answers, genuine also, which must be rounded off ; others are haphazard or stupid and should be treated with contempt or else with such brief but emphatic words of disapproval as the teacher may have at command.

দ্বাদশ অধ্যায়

শিক্ষোপকরণ

(Teaching aids)*

শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচিত হয়েছে। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপলব্ধি। শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে শিশুদের উপলব্ধি ত্বরান্বিত হবে, যদি তাদের বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু সকল সময়ে বাস্তবের মাধ্যম পাওয়া সম্ভব নয়। তাই বাস্তবের প্রতীক হিসাবে শিক্ষোপকরণের সাহায্যে শিক্ষাদান করলে শিক্ষা সহজ ও স্থিতিধর্মী হবে। শিক্ষোপকরণের সাহায্যেই ঐরূপ শিক্ষাদান সম্ভব।

শিক্ষোপকরণের উপযোগিতা (Uses of Educational aids)*

শিক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত যদি করতে হয়, তাহলে শুধু বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দ্বারা সম্ভব নয়, কারণ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দ্বারা শিশু মানসে উপলব্ধিমূলক চিত্র অঙ্কন সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন শিক্ষোপকরণের।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিক্ষা।

ইন্দ্রিয়গণের তোরণ পথেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায়। শিক্ষার্থীরা জগৎ সম্বন্ধে পরিচিত হয় দর্শনেন্দ্রিয় ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। অতএব শিক্ষার্থীর শিক্ষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলে উহা কার্যকরী বেশি হবে। তাই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু আমদানি করলে শিক্ষা হবে সুফলপ্রসূ। শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্য করলে, অর্থাৎ পুঁথিগত বিষয়বস্তু পড়লে বা শুনলে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষাদান কার্যে দর্শণেন্দ্রিয়ের ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের, যথা—শ্রবণ, আঘ্রান, আস্বাদন ও স্পর্শন ইত্যাদির ব্যবহারোপযোগী শিক্ষোপকরণের আমদানি কর্তব্য।

বাস্তবধর্মী শিক্ষা।

শিক্ষাদান কার্য সুফলপ্রসূ করতে শিক্ষা যাতে বাস্তবধর্মী হয় সেদিকে লক্ষ্য করা কর্তব্য। সকল মনোবিজ্ঞানীই এ বিষয়ে একমত যে বাস্তবধর্মী

* Q. What are the uses of Teaching aids ?

শিক্ষা হলে শিক্ষা ত্বরান্বিত হবে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কার্য আমরা জানি। শিক্ষার্থী যদি বাস্তব জিনিস নাড়াচাড়া করে বা তার প্রতীক দেখে শিক্ষালাভে অগ্রসর হয় তাহলে শিক্ষণ সহজ ও স্থায়ী হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে যদি শিক্ষার্থীদিগকে 'নদীর গতি প্রকৃতি' শিক্ষাদান করা যায়, তাহলে শিক্ষার্থীকে নদীর উৎপত্তিস্থান থেকে সুরু করে সমুদ্রে পতন পর্যন্ত সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করান যাবে না। কিন্তু যদি তাকে নদীর ছবি ও আদর্শ বা মডেল দেখান যায়, তাহলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে। তেমনি যদি মুঘল যুগের ইতিহাস ও সভ্যতা ছাত্রদের শেখাতে হয়, তাহলে, মানচিত্র, চার্ট, নক্সা, ছবি, প্রতিকৃতি, মুঘল যুগের স্থাপত্য ও শিক্ষার নিদর্শন ইত্যাদির ছবি শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করা যায় তাহলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা হবে স্থায়ী।

বয়সভেদে বাস্তব ও বিকল্প শিক্ষোপকরণের ফল বিভিন্ন ধরণের। অতি অল্পবয়সে যথার্থ বাস্তব বস্তুর সাহায্যে শিক্ষা করলে শিশুরা আনন্দ পাবে বেশি, কিন্তু বিকল্প উপকরণ তারা বেশি পছন্দ করবে না। কারণ বিকল্প উপকরণের সাহায্যে অমূর্ত সম্বন্ধে ধারণা করা শিশুদের কাছে কষ্টসহ। কারণ সেখানে উচ্চ মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়গুলিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিকল্পে নানারূপ ব্যবস্থা হয়েছে। বিদ্যালয়গুলি প্রথমতঃ এমন পরিবেশে স্থাপিত যে তার-চাইতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু হতে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। তাছাড়া বিদ্যালয় কর্তৃক রচিত পরিবেশও শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সহায়ক। বিশেষ করে বিদ্যালয়ের ফুল, তরিতরকারি ও ফলের বাগান শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বলা বাহুল্য এই ক্ষেত্রগুলি উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষার সহায়ক। বিদ্যালয়ের যাদুঘরে (Museum) বহু বস্তু সংগৃহীত থাকে, তাদের মাধ্যমে শিক্ষা প্রাণবন্ত হয়। এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাস্তব জিনিসের প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় এবং অভিজ্ঞতাও হয় সাধারণতঃ স্থায়ী।

অমূর্ত ধারণালাভে শিক্ষা।

মূর্তবস্তু বা বাস্তব বিষয়বস্তুর সাহায্যে শিক্ষাদান করলে শিক্ষা সহজ হয়।

তাছাড়া বাস্তব বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই অমূর্ত ধারণা লাভে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা যায়। সত্যবাদিতা শিশুদের কাছে একটি অমূর্ত ধারণা। এর উপলব্ধির জন্য যে মানসিক প্রক্রিয়া প্রয়োজন, শিশুরা সেই মানসিক প্রক্রিয়াতে অপারক। তাই 'সত্যবাদিতা' রূপ অমূর্ত ধারণা দিতে হলে সত্যবাদিতার মূর্ত দৃষ্টান্ত দুই-চারিটি শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরতে হবে। তাহলেই শিক্ষার্থী সহজেই 'সত্যবাদিতা' রূপ অমূর্ত লোকটির পূর্ণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

পর্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশ।

শিক্ষার্থীরা শিক্ষোপকরণ ভাল করে দেখবে এবং খুঁটিনাটির ভিত্তিতে ধারাবাহিক তথ্য রচনা করবে। অতএব শিক্ষোপকরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে চিন্তন প্রক্রিয়া প্রয়োজন তা শিক্ষার্থীরা লাভ করে এবং সাথে সাথে তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তিরও বিকাশ ঘটে।

আগ্রহের বৃদ্ধি।

কোনও কিছু দর্শন ও শ্রবণ করার ফলে শিক্ষার্থীর যেমন তা উপলব্ধির সহায়ক হয়, তেমনি তাদের আরও জানবার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এই জন্যই বর্তমান সময়ে শিক্ষোপকরণসমূহ শ্রেণী শিক্ষণে একান্তই অপরিহার্য।

শিক্ষার আনন্দ।

পাঠদানে বিভিন্ন শিক্ষোপকরণের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীরা আনন্দলাভ করে এবং পাঠদানও বৈচিত্র্যময় হয়। বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠদানের মধ্যে নীরস ও একঘেয়েমি ভাব আছে, তার সম্পূর্ণ নিরসন হয় শিক্ষোপকরণের উপস্থাপনের মধ্যে। শিক্ষার্থীরা যেমন পাঠে আগ্রহবোধ করে, তেমনি তারা লাভ করে আনন্দ। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে শিক্ষক একটি গল্প বলছেন, কিন্তু তার জন্য তিনি কোন ছবি কিংবা আদর্শের ব্যবস্থা করেন নি। ফলে শিক্ষক যখন গল্পের বর্ণনা দান করবেন, তখন শিক্ষার্থীরা গল্পকে পূর্ণভাগ উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু তিনি যদি বিভিন্ন ধারাবাহিক চিত্রের সাহায্যে গল্পটির বর্ণনা দেন তা হলে শিক্ষার্থীরা গল্পকে পূর্ণ উপভোগ করতে পারবে এবং আনন্দও পাবে প্রচুর।

শিক্ষোপকরণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Educational Aids)*

ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা ও তার ব্যবহার অনুসারে শিক্ষোপকরণগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকে।

দর্শননির্ভর উপকরণ (Visual Aids)।

সাধারণতঃ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে যে সমস্ত শিক্ষোপকরণ সাহায্য করে থাকে, তাদেরই বলা হয় দর্শননির্ভর শিক্ষোপকরণ।

বর্তমান সময়ে নানা ধরণের দর্শননির্ভর শিক্ষোপকরণের প্রচলন আছে। উদাহরণস্বরূপ ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-বিদ্যা জীববিদ্যায় উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব বিষয়ের শিক্ষার সহায়ক হচ্ছে ভূগোলের ক্ষেত্রে মানচিত্র, গ্লোব, আদর্শ (মডেল), ছবি ; ইতিহাসের ক্ষেত্রে ছবি, মুদ্রা, শিলালিপি, সময় তালিকা ; সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে, খাদ্য, পরিচ্ছদ, কৃষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি, মডেল, চার্ট, নক্সা ইত্যাদি, জীববিদ্যার ক্ষেত্রে ছোট ছোট প্রাণী ও তার ছবি, উদ্ভিদবিদ্যার ক্ষেত্রে নানা ধরণের ফুল লতা পাতা ইত্যাদি, রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এসিড, বিভিন্ন ধরণের ধাতু, পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে নানাধরণের যন্ত্র ইত্যাদি। দর্শননির্ভর শিক্ষোপকরণ হিসাবে ব্ল্যাকবোর্ডের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রবণনির্ভর উপকরণ (Auditory Aids)।

দর্শনেন্দ্রিয়ের পরই স্থান শ্রবনেন্দ্রিয়ের, শিশুরা কানে শুনে অনেক কথা শিখে থাকে। শ্রবণনির্ভর শিক্ষোপকরণের মধ্যে গ্রামোফোন, রেডিও, টেপ রেকর্ডার, প্রভৃতি উপকরণ বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

দর্শন ও শ্রবণনির্ভর উপকরণ (Audio-visual Aids)।

শিক্ষাক্ষেত্রে এমন সব উপকরণ আছে যাদের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কানে শোনা ও চোখে দেখার সুবিধা আছে। যেমন শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, অভিনয়, পুতুল নাচ ইত্যাদি।

---

* Q. Classify the Educational aids and add notes to each type of aid.

দর্শননির্ভর বিভিন্ন শিক্ষোপকরণ (Different types of Visual Educational Aids)।

যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে তাদের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণে সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকরী হচ্ছে দর্শনেন্দ্রিয়। দর্শননির্ভর শিক্ষোপকরণগুলি নানা শ্রেণীর হয়।

পাঠ্যপুস্তক (Text-book)।

দর্শননির্ভর শিক্ষোপকরণ হিসাবে পাঠ্যপুস্তকের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মামুলী শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্য পুস্তকের স্থান অত্যন্ত উচ্চে ছিল। শিক্ষক পুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তু অনুসরণ করেই পাঠদান করতেন, তার কোন ব্যতিক্রম ঘটত না।

কিন্তু বর্তমান শিক্ষার ধারা অনুযায়ী পাঠ্য পুস্তক একটি শ্রবণনির্ভর শিক্ষোপকরণ ব্যতীত কিছুই নয়। শিক্ষক প্রকৃতপক্ষে পাঠদানের একক স্থির করে বিভিন্ন পুস্তক হতে বিষয়বস্তু উদ্ধার করবেন এবং শ্রেণীতে শিক্ষাদান করবেন। পাঠদান শেষে তিনি পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট অংশের কথা উল্লেখ করবেন যেখানে পাঠদানের এককটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। শিক্ষার্থী নির্দেশ অনুযায়ী পুস্তকের অংশ পাঠ করবে। এই হিসাবে পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্য পুস্তকের আর একটি দিক আছে। পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পুস্তক লিখতে গিয়ে লেখকগণ বিভিন্ন উৎস আলোচনা করে বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করেন। অতএব পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে সমস্ত বিষয় বস্তুই থেকে যায়।

নিম্ন শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অকিঞ্চিৎকর। বর্ণ শিক্ষা দেবার জন্য, বা প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার না হলেও চলে, কারণ শিশুরা প্রতিদিনকার কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই মনস্তত্ত্ব-সম্মতভাবে বর্ণমালা শিখতে পারে, এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিজ্ঞান শিক্ষালাভও সমর্থ হয়। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীতে পুস্তকের প্রয়োজন হয় বেশি কারণ উচ্চ শ্রেণীতে বিষয়বস্তু যুক্তিভিত্তিকভাবে সন্নিবেশিত। এই কারণে শ্রেণী শিক্ষণে পাঠ্যপুস্তকের স্থান এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তম পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য (Criteria of a good Text-book)।

১। নিম্নশ্রেণীতে পাঠ্য পুস্তক রচিত হবে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে. উচ্চ-শ্রেণীর পুস্তক হবে যুক্তিভিত্তিক।

২। সহজ হতে কঠিনের দিকে পাঠ্যপুস্তকের গতি বজায় থাকবে।

৩। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ছবি, নক্সা, ইত্যাদি দ্বারা শোভিত থাকবে।

৪। ভাষা হবে সহজ।

৫। কোন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচিত হচ্ছে, সেদিকে লক্ষ্য করে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত করতে হবে।

৬। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের জীবন-সমস্যার সঙ্গে বিজড়িত থাকবে।

৭। পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় অন্যান্য তথ্যমূলক সূত্রের কথা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

ব্ল্যাকবোর্ড (Black board)*

শিক্ষোপকরণের মধ্যে ব্ল্যাকবোর্ড সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের দাবী করতে পারে। বস্তুতপক্ষে শ্রেণীতে ব্ল্যাকবোর্ড ব্যতীত শিক্ষাদান অসম্ভব।

শ্রেণীতে ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার দ্বারা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।

শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয়—যেহেতু পাঠের অপরিহার্য সমস্ত বিশেষত্ব বোর্ডে লিপিবদ্ধ হয়, সেইহেতু ব্ল্যাকবোর্ডের গুরুত্ব খুব বেশি।

(২) **সর্বশ্রেষ্ঠ বিশদকারক শিক্ষোপকরণ**—শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় নানাবিধ অর্থবোধক ও ব্যাখ্যাকারক কৌশলের অবতারণা করা হয়। কিন্তু সমস্ত শিক্ষোপকরণ শ্রেণীকক্ষে সমাবেশ করা সম্ভব নয়। ব্ল্যাকবোর্ড সেদিক থেকে একটি বিশদকারক উপকরণ। শিক্ষক প্রয়োজনবোধে ব্ল্যাকবোর্ডে নানাবিধ শিক্ষাসহায়ক বিষয়বস্তু অঙ্কন করতে পারেন।

শিক্ষক কোন দেশের মানচিত্র অঙ্কন করে তাতে রেখা টেনে নদীর গতিপথ নির্ণয় করতে পারেন, মোটা মোটা রেখা টেনে পর্বত সূচিত করতে পারেন। তীর চিহ্ন দিয়ে মৌসুমী বায়ুর দিক দেখতে পারেন, ইত্যাদি। ব্ল্যাকবোর্ডে এসব কাজ করলে ব্ল্যাকবোর্ড একটি শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ হবে, এতে আর সন্দেহ কি? বস্তুতঃ পক্ষে জ্যামিতি,

* Q. Describe the importance of black board as an illustrative aid in the field of education.

অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয় ব্ল্যাকবোর্ডের সাহায্যে শ্রেণীতে উত্তমরূপে শিক্ষা চলে।

(৩) **পাঠের বিশেষত্ব নির্বাচন**—প্রত্যেক পাঠেরই কতকগুলি মুখ্য বিশেষত্ব থাকে। শিক্ষক যদি পাঠদানকালে বোর্ডে এই মুখ্য বিশেষত্বগুলি লিপিবদ্ধ করেন, তা হলে পাঠের পুনরালোচনা সহজে সম্পন্ন হয়।

(৪) **পাঠের সারাংশ তৈরি**—অপেক্ষাকৃত পূর্ণ উপলব্ধির জন্য এবং সুফলপ্রসূ পুনরালোচনার জন্য কখনও কখনও বিষয়বস্তুর সারাংশ লিখন প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে ব্ল্যাকবোর্ডের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) **বিভিন্ন বিশেষত্বের ব্যাখ্যাকরণের সুবিধা**—প্রতি পাঠেই দেখা যায় গুরুত্বর্ণপূর্ণ বিশেষত্ব। বোর্ডে সেই বিশেষত্বের উল্লেখ করে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

(৬) **শিক্ষণে বৈচিত্র্য**—ব্ল্যাকবোর্ড শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র্যের খোরাক জোগায়। শিক্ষকের একঘেয়ে বর্ণনা শিক্ষার্থীর মনে অবসাদ সৃষ্টি করে। শিক্ষক বোর্ডের কাজ করলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হয় এবং শিক্ষার্থীর দৃষ্টি সেদিকে সন্নিবেশিত হওয়ায় তার আর অবসাদগ্রস্ত হবার সুযোগ থাকে না।

(৭) **অনুকরণের আদর্শ**—ছোট শিশুরা অনুকরণের জন্য আদর্শ লিখন চায়। প্রত্যেক শিশুকে ব্যক্তিগত সাহায্য করতে শিক্ষক সক্ষম নহেন। তাই সেদিক থেকে শিক্ষক কর্তৃক ব্ল্যাকবোর্ডে লিখন শিশুদের পক্ষে আগ্রহ সঞ্চারক।

বোর্ডে ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষক অতিশয় সতর্ক থাকবেন।

১। সাধারণতঃ সাদা চক ব্যবহৃত হবে। মাঝে মাঝে কোনও কিছুর উপর গুরুত্ব দর্শাতে হলে রঙীন চক দিয়ে রেখা টানা প্রয়োজন।

২। বোর্ডের লেখা সুন্দর, স্পষ্ট ও বড় হবে।

৩। শ্রেণীতে স্বল্প দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু থাকে। তাদের প্রথম সারিতে বসাতে হবে, যাতে বোর্ডের লেখা স্পষ্ট দেখতে পারে।

৪। ব্ল্যাকবোর্ডে সারাংশ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কেন্দ্র করে ছোট করে লেখা হবে।

৫। ব্ল্যাকবোর্ডে কোনরকম বানান বা ভাষার ভুল থাকবে না।

(৬) ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার সময় শিক্ষক মাঝে মাঝে শ্রেণীর দিকে দৃষ্টি দিবেন, যাতে শ্রেণীশৃঙ্খলা বিঘ্নিত না হয়।

(৭) বোর্ডে কাজ করবার সময় শিক্ষক এমনিভাবে দাঁড়াবেন যে তিনি যেন শিক্ষার্থীদের বোর্ড দেখার ক্ষেত্রের অবরোধ সৃষ্টি না করেন।

আদর্শ বা প্রতিরূপ (Model)

অনেক সময়ই আসল বস্তুকে শ্রেণীকক্ষে নিয়ে আসা যায় না, আবার সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে আসল বস্তু দেখা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে আদর্শ বা প্রতিরূপ তৈরি করে শ্রেণীতে উপস্থাপন করলে শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। তাজমহলের একটি প্রতিরূপ শ্রেণীকক্ষে আনলে শিক্ষার্থীরা তাজমহলের গঠন নৈপুণ্য লক্ষ্য করতে পারে। পানামা খাল সম্বন্ধীয় পাঠে একটি প্রতিরূপ বা মডেল অপরিহার্য। একটি গ্লোব ব্যতিরেকে পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া খুবই মুস্কিল, ইত্যাদি।

প্রতিরূপ (model) তৈরির সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় কর্ম-সম্পাদন হলে কর্ম ও শিক্ষা উভয়েই ভালভাবে চলতে পারে।

ছবি (Picture)

অনেক সময়ই আদর্শ তৈরি করা বা জোগাড় করা সম্ভব হয় না। তাজমহলের ক্ষেত্রে দেখা গেল চেষ্টা করেও একটি মার্বেল পাথরের তাজমহলের অনুকৃতি সংগ্রহ করা গেল না। সেখানে তাজমহলের ছবি সংগ্রহ করে কাজ চালান যেতে পারে। ভূগোলের পাঠে আমরা জীবজন্তুর ছবি, বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের ছবি. পাহাড়, পর্বত, নদী, গিরিবর্ত্ম, মরুভূমির ছবি দেখাতে পারি। ছবিগুলি রঙীন ও মনোমুগ্ধকর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মানচিত্র ও চার্ট (Maps and charts)

মানচিত্র ও চার্ট পরিষ্কার ধারণাদানে খুবই সহায়ক শিক্ষোপকরণ। বস্তুতপক্ষে ভূগোলের পাঠে মানচিত্র ও চার্ট ব্যতিরেকে কোন 'পাঠেই' সাফল্যলাভ করা যায় না। কোনও স্থানের অবস্থান, নদীর গতিপথ নির্ণয়, রেলপথের নির্দেশনা, সমুদ্র ও দেশের আয়তন ইত্যাদি সবই আমরা মানচিত্র বা চার্ট থেকে বুঝতে পারি।

নক্সা (Diagrams)

নিপুণ উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন শিক্ষক বাইরের শিক্ষাপকরণের দিকে না তাকিয়ে মৌখিক বিষয় বোঝবার তাগিদে ব্ল্যাকবোর্ডে নক্সা আঁকতে পারেন এবং তারই সাহায্যে শিক্ষাদান করতে সক্ষম হন। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় শিক্ষাদানে শিক্ষা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়।

রেখাচিত্র (Graphs)

রেখাচিত্রগুলির তুলনামূলক মূল্য আছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের চিনি উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য আমরা রেখাচিত্র দ্বারা প্রকাশ করতে পারি, এবং সেস্থলে শিক্ষাদান অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়।

ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ

ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে ছবিযুক্ত স্বচ্ছ কাচ (slide) সাদা পর্দায় প্রক্ষেপ করা হয়। এর শিক্ষাগত সম্ভাব্যতা প্রচুর। বিভিন্ন দেশের শিক্ষামূলক দ্রষ্টব্য স্থানের ছবি এরই সাহায্য পর্দায় প্রক্ষিপ্ত হয় এবং শিক্ষার্থীরা সেই ছবি চোখের সম্মুখে দেখে অত্যন্ত লাভবান হয়। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কলেরা, প্রভৃতি রোগের জীবাণুর ছবি-সম্বলিত স্লাইড ও এবং রোগের ব্যাপ্তির ক্রম শিক্ষার্থীরা ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে দেখতে পারে এবং তাদের মনে এসব বিষয়ে গভীর ছাপ পড়ে থাকে।

এপিডায়াস্কোপ (Epidiascope)

ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের উন্নত সংস্করণ হচ্ছে এপিডায়াস্কোপ। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে শুধু ছবিযুক্ত স্বচ্ছ কাচেরই প্রক্ষেপ চলে কিন্তু এপিডায়াস্কোপে অস্বচ্ছ ছবি অর্থাৎ বইয়ের ছবিও বড় করে সাদা পর্দায় প্রক্ষেপ করা সম্ভব। অতএব এদিক থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি।

ফিল্ম প্রজেক্টর (Film Projector)

আমরা দেখেছি ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণে নিশ্চল ছবি পর্দায় দেখান হয়। কিন্তু ফিল্ম প্রজেক্টরের মাধ্যমে সচল ছবি সাদা পর্দায় প্রক্ষিপ্ত হয়। এই জাতীয় সচল ছবি নির্বাক।

ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের প্রক্ষিপ্ত ছবির চাইতে এর শিক্ষাগত মূল্য আরও বেশি। এর আকর্ষণী শক্তিও খুব। কারণ এই জাতীয় ছবিতে ধারাবাহিকতা বেশি থাকে। শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র (ফিল্ম) শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধির সহায়ক। ফলে তারা শিক্ষালাভের জন্য বিশেষ তাগিদ বোধ করে।

আমেরিকায় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে শিক্ষামূলক নির্বাক চলচ্চিত্র দেখার ফলে শিক্ষার্থীরা আরও জানবার আগ্রহে পাঠে আপাত মনঃসংযোগ করে থাকে।

শ্রবণনির্ভর বিভিন্ন শিক্ষোপকরণ (Different types of Auditory Educational Aids)।

দৃষ্টিনির্ভর শিক্ষোপকরণের ন্যায় শ্রবণনির্ভর শিক্ষোপকরণেরও প্রচলন শিক্ষাক্ষেত্রে আছে। সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হল।

রেডিও (Radio)। *

রেডিও সঙ্গীত ও কর্মধারা শিশু, যুবক-যুবতী, গায়ক-গায়িকা—সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। রেডিওর কর্মধারা শোনবার জন্য সকলেই এমন আগ্রহ প্রকাশ করে যে একে শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করা বিধেয় বলে শিক্ষার্থীগণ মনে করেন। শুনে শেখা—এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জর্জ ওয়াটসন (George Watson) বলেছেন যে রেডিও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত অতিরিক্ত বিষয়বস্তু নয়, শিক্ষার উপরিদেশে স্থাপন করবার মত জিনিসও রেডিও নয়, রেডিও আর শিক্ষা হচ্ছে সমার্থক।

শ্রেণী শিক্ষণে রেডিও একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রবণনির্ভর শিক্ষোপকরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য আকাশবাণী থেকে যেসব পাঠ প্রচারিত হয়, তা সত্যই অত্যন্ত মূল্যবান এবং ঐ জাতীয় তথ্যাদি সাধারণতঃ পাঠ্যপুস্তকে দুর্লভ। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য দেশসমূহে শিক্ষাক্ষেত্রে রেডিওর যে ভূমিকা দেখা যায়, সেরূপ ব্যাপকতর দৃষ্টিকোণ ভারতে এখনও সৃষ্টি হয় নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রেডিও ষ্টেশনগুলিতে শিক্ষামূলক সঙ্গীত, অভিনয়,

* Q. "The film and the radio are going to play an ever increasing part in the education of children". What part can the film and the radio play in the education of children in Schools in India? Give illustrations.

আলোচনা, বক্তৃতা ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সেই সমস্ত বেতার অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থাও আছে। দিল্লীতে এবং কলকাতায় আকাশবাণী কেন্দ্রেও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকাতে এই সব জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শোনবার জন্য কোনও সময় সংকেত নাই। আবার কোন কোন বিদ্যালয়ে রেডিও নেই। এ অত্যন্ত দুঃখজনক অবস্থা। প্রতিটি বিদ্যালয়ে রেডিও রাখা যেমন বাধ্যতামূলক করা উচিত, তেমনি বিদ্যার্থীদের জন্য বেতার আলোচনা শোনবার জন্যও সময়-তালিকায় ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

গ্রামোফোন (Gramophone)।

শ্রবণনির্ভর শিক্ষোপকরণের মধ্যে গ্রামোফোনের শিক্ষাগত মূল্য অপরিসীম, শিক্ষাগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রামোফোন নানাভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দেবার জন্য, সঙ্গীতের অনুরাগ সৃষ্টির জন্য, সঙ্গীত শোনবার জন্য, শারীর শিক্ষণকালে ছন্দানুভঙ্গীর জন্য গ্রামোফোনের ব্যবহার হয়। তা ছাড়া বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের বক্তৃতা রেকর্ডে ধরে রাখা যায় এবং গ্রামোফোনের রেকর্ডে তাঁদের স্বরব্যঞ্জনা শোনা ও অনুসরণ করা অতিশয় তৃপ্তিদায়ক।

টেপ-রেকর্ডার (Tape-Recorder)।

টেপ-রেকর্ডারও একটি শ্রবণনির্ভর শিক্ষোপকরণ। শিক্ষোপকরণ হিসাবে এর সম্ভাবনা খুব বেশি। কিন্তু এই জিনিসটি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলে এর প্রচলন খুব বেশি হয় নি। টেপ-রেকর্ডারে স্বল্প সময়ের মধ্যে রেকর্ড করা, বাজিয়ে দেখা, প্রয়োজন অনুযায়ী তা মুছে নূতন করে রেকর্ড করা সম্ভব। বড় বড় শিক্ষাবিদ, মনীষী এবং বিশেষদের আলোচনা টেপ-রেকর্ডারে তুলে রাখা যায় এবং প্রয়োজনবোধে সেগুলি শিক্ষার্থীদের শোনান চলে। শিক্ষকও নিজের আদর্শ পঠনভঙ্গী, ত্রুটিমুক্ত উচ্চারণ এবং বক্তৃতা টেপ-রেকর্ডারে রেকর্ড করে রেখে পরে শিক্ষার্থীদিগকে তা শোনাতে পারেন। শিক্ষার্থীরা এতে প্রচুর লাভবান হবে। পরিশেষে শিক্ষার্থীদের

পঠন, উচ্চারণ ভঙ্গী ইত্যাদিও টেপ-রেকর্ডারে রেকর্ড করে রেখে, পরে তাদের আবার শোনান যায়। শিক্ষার্থীরা এর ফলে নিজেদের ভুল ত্রুটি বুঝতে পারবে এবং তা সংশোধন করবার স্থযোগ পাবে।

দর্শন ও শ্রবণনির্ভর শিক্ষোপকরণ (Audio-visual Teaching Aids)

কতকগুলি শিক্ষোপকরণ আছে যেগুলির সাহায্যে যুগপৎ চোখে দেখা ও কানে শোনার কাজ চলে। এই শিক্ষোপকরণগুলিকে দর্শন ও শ্রবণনির্ভর শিক্ষোপকরণ (Audio-visual Aids) বলা হয়।

চলচ্চিত্র (Cinema)।*

দর্শন ও শ্রবণনির্ভর শিক্ষোপকরণগুলির মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে চলচ্চিত্রের। বর্তমান যুগের সকল চলচ্চিত্রই সবাক। অতএব আমরা চলচ্চিত্র দেখতে গিয়ে যুগপৎ চোখে দেখি ও কানে শুনতে পাই। আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র খুব কমই বের হয়েছে। তবু চলচ্চিত্র শিক্ষাকে যতটা সমৃদ্ধ করেছে, অন্য কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ততটা সমৃদ্ধ করে নি। কিন্তু ভারতের বিদ্যালয়গুলি এই আবিষ্কারের ব্যাপক প্রয়োগ করতে পারে নি। শিক্ষা প্রক্রিয়াতে চলচ্চিত্রের অবদান গুরুত্বপূর্ণ কারণ চলচ্চিত্র গতিসম্পন্ন এবং গতি বোঝাতে সক্ষম। শিক্ষামূলক আদর্শকে সম্মুখে রেখে তিনটি উপায়ে চলচ্চিত্রের ব্যবহার হতে পারে।

(১) যেসব চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে, যথা—ঝান্সীর রাণী, ম্যাডাম কুরি, গৌতম বুদ্ধ, লুই পাস্তুরের জীবনী, রবিন হুড, জোয়ান অব আর্ক, সুরদাস, এ টেল ও টু সিটিস প্রভৃতি ছবিতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষক যেতে পারেন।

(২) দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত তথ্যমূলক চলচ্চিত্র বা Documentary Film বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলে শিক্ষার্থীদের সেগুলো নিয়ে দেখান। 'Kashmir Valley', 'Rural Rajputana', 'our neighbour Nepal', 'Modern Discoveries in Medicine' প্রভৃতি তথ্যমূলক চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বিশেষ সহায়ক।

* N. B. 'রেডিও' শীর্ষের নীচে প্রশ্ন দেখুন।

(৩) তৃতীয় উপায় হচ্ছে বিদ্যালয়ে ১৬ মিলিমিটার প্রজেক্টর (16 mm Projector) রেখে সেই প্রজেক্টরের সাহায্যে বিদ্যালয়ের হলঘর অন্ধকার করে সেখানে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ছবি দেখান যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের দেশে শিশুদের উপযুক্ত যথার্থ চলচ্চিত্রের অভাব আছে। সরকার এবিষয়ে সচেষ্ট হলে ভাল হয়।

আরও কয়েকটি শিক্ষোপকরণ

সংবাদপত্র (Newspaper)।*

শিক্ষোপকরণ হিসেবে সংবাদপত্রেরও বিশেষ স্থান আছে। দৈনন্দিন জীবনের বহুবিধ সমস্যাই ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। পঞ্চম শ্রেণী হতে উপরের দিকের শিক্ষার্থীরা সংবাদপত্র হতে শিক্ষালাভ করতে পারে। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, উড়িষ্যাতে খরা, দিনের তাপমাত্রা, বাজার সরকারের ডায়েরী, সোনারূপার দর, ঝড়, জোয়ার-ভাঁটা, চন্দ্র অভিযান, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি শুধু শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান বর্ধনকারী নয়, এদের সাথে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্ক ইত্যাদিকে জড়িত করা চলে। "Illustrated Weekly of India", 'March of Time' প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় মনীষীদের জীবনী, ইতিহাস বিখ্যাত অট্টালিকার স্থাপত্যের বর্ণনা, ভাস্কর্য শিল্পের কথা ইত্যাদি বহুল পরিমাণে থাকে। অতএব সংবাদপত্র একটি শিক্ষোপকরণ বললে ভুল করা হবে না। বিদ্যালয়ের 'কমন রুমে' বিভিন্ন ধরণের পত্র পত্রিকা থাকবে। শিক্ষার্থীরা অবসর সময়ে পত্র পত্রিকা পড়ে লাভবান হবে।

অন্যভাবেও শিক্ষার্থীদের সাথে সংবাদপত্রের পরিচিতি রক্ষা করা যায়। বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হবার পূর্বে অনেক বিদ্যালয়ে প্রার্থনা সঙ্গীত হয়। মনীষীদের বাণী পাঠ করা হয়। এর পরেই শিক্ষার্থীদের পক্ষ হতে তথ্য মন্ত্রী বিশেষ বিশেষ সংবাদগুলি পড়ে শোনাতে পারে। এরূপ সংবাদ—স্থানীয় খবর, দেশীয় খবর ও বিদেশীয় খবর—এই তিনভাগে ভাগ করে পরিবেশন করলে ভাল।

* Q. What is the value of the Newspaper and magazines as aids to teaching?

বুলেটিন বোর্ড (Bulletin Board)।*

আমরা পূর্বেই ব্ল্যাকবোর্ড সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। ব্ল্যাকবোর্ডের মত বুলেটিন বোর্ডও শিক্ষোপকরণ হিসাবে বিশেষ কার্যকরী। বিদ্যালয়ে বারান্দায় বুলেটিন বোর্ড থাকে। এই বোর্ডে শিক্ষার্থীদের সৃজনাত্মক কর্ম, যথা চিত্রাঙ্কন, প্রবন্ধ, কার্টুন, ইত্যাদি থাকবে, তাছাড়া থাকবে দিনের বাণী, খবরের কাগজ হতে বিশেষ খবর, ফটোগ্রাফ, প্রধান শিক্ষকের কোন নির্দেশ বা সতর্কবাণী ইত্যাদি।

ফ্লানেল বোর্ড (Flannel Board)।

ফ্লানেল বোর্ড ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শিক্ষণ সহায়ক হিসাবে অতি অল্পকাল যাবতই ব্যবহৃত হচ্ছে। ফ্লানেল বোর্ড হচ্ছে একটি প্লাইউডের বোর্ড এবং উহার উপরিভাগ ফ্লানেল বা মোটা কাপড়ের দ্বারা আবৃত। শিক্ষার্থীদের কোনও ধারাবাহিক তথ্যের বা গল্পের বিভিন্ন ছবি দেখাতে হলে ফ্লানেল বোর্ড বিশেষ কার্যকরী। এই ছবিগুলোর পেছনে শিরীষ কাগজের টুকরো আঠা দিয়ে লাগান থাকে। শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী ছবিগুলি পরপর ফ্লানেল বোর্ডে এঁটে দেন। ছবির পেছনটা খসখসে থাকায় ছবিগুলি বোর্ডের কাপড়ে এঁটে যাবে। শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী ঐগুলি তুলে ফেলতে পারেন আবার সহজে লাগাতেও পারেন। গল্প বলার ক্লাশে এরূপ ছবি প্রদর্শন ছোট ছোট শিশুদের পক্ষে খুবই আনন্দবর্ধনকারী।

শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ (Educational Excursion)।*

শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ বলতে সেইসব ভ্রমণকেই বুঝতে পারা যায় যেগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মন সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। শুধু দেশ বিদেশের সৌন্দর্য দেখে বেড়ানই শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এই জাতীয় ভ্রমণের কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীর সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে একত্রে সচেতন ও সক্রিয় করে

* Q. Write short notes on the educational value and use of the bulletin board and the flannel graph.

* Q. What are the educative values of excursions to places of Educational interest.

তুলে সুসম্বদ্ধ অভিজ্ঞতা দানে সাহায্য করা। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে একত্রে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলার উপায় কি? শুধু পরিভ্রমণ হলেই চলবে না। পর্যবেক্ষণ শক্তি শিক্ষার্থীদের বাড়িয়ে তুলতে হবে, তবেই শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ সার্থক হবে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের বিলেতের Year book of Educationএর এক প্রবন্ধে মহাদেব দেশাই লিখেছিলেন যে, সাহিত্যিক শিক্ষা আমাদের এমনি অভিভূত করে ফেলেছে যে আমরা পর্যবেক্ষণ শক্তি হারিয়ে ফেলোছ. নিজের ফসলের জমির উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে আর কার জমি আছে, সেটুকু পর্যন্ত লক্ষ্য করে দেখতে শিখিনি।

বিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে F. F. Gaither তাঁর 'Excursion Project' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন যে শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ হচ্ছে এক জাতীয় কর্মপন্থা, যা ব্যক্তিগত জীবনের পরিবেশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ করে জীবন সংযোগকারী বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায়।[১]

শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাস্তব জিনিসসমূহ পর্যবেক্ষণ করে, পরীক্ষা করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। অবশ্য পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পুস্তক পড়ে বিভিন্ন বিষয় কিছুটা জানা সম্ভব হয়। কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি হবে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তাই প্রয়োজন নানা সময়ে শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ ব্যবস্থা। শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে নানা তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু সে যদি বাস্তবের ভিত্তিতে তা যাচাই করে নিতে পারে তাহলে সেই অভিজ্ঞতা তার জীবনের বিশেষ কার্যকরীরূপ পরিগ্রহ করবে। বাস্তব বস্তুর সঙ্গে যখনই শিক্ষার্থীর পরিচয় হয়, তখনই শিক্ষার্থীর জ্ঞান বাস্তবাশ্রয়ী হয় এবং তা স্থায়ীরূপ ধারণ করে। এর ফলে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতূহল বৃদ্ধি পাবে এবং সে আরও জানবার জন্য উৎসাহিত বোধ করবে। মুঘলযুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা ইত্যাদি পড়িয়ে যদি শিক্ষক শিক্ষার্থীদিগকে আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে নিয়ে গিয়ে স্থাপত্য, শিল্প ও ভাস্কর্যের সাথে বাস্তব পরিচয় করিয়ে দেন তাহলে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জ্ঞান দীর্ঘস্থায়ীত হবেই, তাছাড়া শিক্ষার্থীর জানবার শিখবার ইচ্ছা আরও বর্ধিত হবে।

১। F. F. Gaither : Educational Excursion "is any type of Project that tends itself to investigation, experimentation and gaining knowledge by first-hand contact with life, the individual's environment and the world at large.

তাছাড়া স্থানীয় ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করতে পারেন। বিদ্যালয়ের নিকটস্থ গ্রামে হয়ত অতি প্রাচীন মন্দির বা মসজিদ আছে, কিংবা আছে একটি দুইশত বৎসর আগেকার দীঘি কিংবা একটি পোড়ো বাড়ী। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সেখানে যেতে পারেন এবং বিভিন্ন বৃদ্ধ ও প্রবীণ লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঐ সমস্ত বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করতে পারেন। প্রশ্ন আসতে পারে যে এই সকল বিষয়বস্তুত ইতিহাসের পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত নয়, তবুও এসব জানবার এত প্রচেষ্টা কেন? একবার যদি শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করে তাকে বিশ্লেষণ করে তথ্য গ্রহণ করতে পারে এবং সেইসূত্রে সিদ্ধান্তে আগমন করতে পারে, তাহলে ইতিহাস সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত ইতিহাসের বিষয়বস্তু পড়তে তখন আর একঘেয়েমি লাগবে না। বিনিং এবং বিনিং বলেছেন যে স্থানীয় ইতিহাস শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীরা অতীতে ফিরে যাবে এবং কল্পনার অতীতে গিয়ে বাস করবে এবং সেইজন্যই গোটা ইতিহাসের প্রকৃতি ও তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।[১]

শিক্ষার্থীরা এমনি করে ভূগোল, সমাজবিদ্যা, শিল্প কারিগরি প্রভৃতি শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষামূলক পরিভ্রমণে যেতে পারে। শিক্ষক এরূপ পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ করে শেখার সুযোগ পাবে। শিক্ষার্থীদের দামোদরের বিভিন্ন বাঁধ দেখতে নিয়ে গেলে তারা দেখে শিখবে কিভাবে জল নিষ্কাশিত হচ্ছে, কিভাবে সেচের জল ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং কিভাবে জলবিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের কয়লার খনিতে নিয়ে যাওয়া হলে, কিভাবে খনি হতে কয়লা তোলা হয় ইত্যাদি জিনিস পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে। তাদের পুঁথিগত জ্ঞান পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আরও বেশি স্থায়িত্ব লাভ করবে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর জগৎকে সাধারণতঃ শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীকে যদি শ্রেণীর বাহিরে নিয়ে গিয়ে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে শিক্ষার্থীর পক্ষে যে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা গ্রহণই সুখকর ও তৃপ্তিকর হবে।

১। Bining and Bining: The study of local history will aid pupils to relive the past and will lead them to an understanding of the nature and significance of history as a whole.

শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিকল্পিত লক্ষ্যকে পর্যবেক্ষণ করে ও দেখে জ্ঞান আহরণ করা। এই উদ্দেশ্য ছাড়াও এর উপযোগিতা অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ দেশভ্রমণে যেমন আনন্দ আছে, তেমনি কষ্টও আছে। আনন্দ হচ্ছে নূতন দেশ দেখার আনন্দ, জ্ঞান আহরণ করার আনন্দ, আর কষ্ট হচ্ছে যাতায়াতের কষ্ট। বর্তমান সময়ে যাতায়াত একটি ঘোরতর সমস্যা। অতএব শিক্ষামূলক পরিভ্রমণে বের হলে কষ্ট-সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া যেখানে যাওয়া হবে, সেখানকার লোকদের আচার, আচরণ, খাদ্য, পোশাক, গৃহ, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ইত্যাদির পরিচয়ও পাওয়া যাবে, ভিন্ন স্থানের যা কিছু শিক্ষণীয় তাই গ্রহণ করার মত মনোবৃত্তিও সৃষ্টি হবে, মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পাবে, এবং দৃষ্টিভঙ্গী হবে উদার। বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়ানোর ফলে শিক্ষার্থীদের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হবে।

শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের যে বহুমুখী উপযোগিতা আছে তা স্বীকার করে নিলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ আবশ্যিক করা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের ব্যাপক ব্যবস্থা দেখা যায়। শুধু সরকারই নয়, বহু বেসরকারী সংস্থা এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়।

কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ ব্যাপকতর ব্যবস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় এবং ট্রেনিং কলেজগুলির ছাত্রছাত্রীরা মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক পরিভ্রমণে বের হয় বটে, কিন্তু পরিভ্রমণ যতটা পরিকল্পিত ও শিক্ষাপ্রদ হওয়া উচিত তা হয় না। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও রমণীয়তা দর্শনের মধ্যে পরিভ্রমণ সীমাবদ্ধ থাকে।

আমাদের বিদ্যালয়গুলির পরিভ্রমণ পরিকল্পনা নাই বললেই চলে। কারণ সরকার অর্থ সাহায্যে উদাসীন আর কোন বেসরকারী সংস্থা আজও এ বিষয়ে অগ্রসর হয়ে আসে নি।

কিন্তু শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের উপযোগিতা যথেষ্ট বলে, একে কার্যকরী রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টিত হতে হবে।

যদি কোনও বিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী শিক্ষামূলক পরিভ্রমণে যেতে এবং সেই বাবদ অর্থ ব্যয় করতে রাজী হয় তাহলে ভ্রমণে প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্থান নির্বাচন করতে হবে। যেমন, মুঘল যুগের স্থাপত্য ও শিল্পকলা দেখাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, দিল্লী, ইত্যাদি স্থানে যেতে হবে। অশোকের স্তূপ ও অশোক স্তম্ভ দেখতে হলে সারনাথে

যেতে হবে ইত্যাদি। শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ হবে উদ্দেশ্যপূর্ণ ও পরিকল্পিত। উদ্দেশ্যহীন ও পরিকল্পনাহীন পরিভ্রমণ কখনই শিক্ষাপ্রদ হতে পারে না।

ভ্রমণযোগ্য স্থান নির্বাচনের সাথে সাথে দেখতে হবে ভ্রমনার্থীদের পক্ষে খরচ সঙ্কুলান সম্ভব কিনা।

যাতায়াত, খাওয়া খরচ, অন্যান্য পরিবহন খরচ ইত্যাদি সহ কত মোট খরচ পড়বে, তা বের করে সেই অর্থ ভ্রমণার্থীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। পরিভ্রমণে পরিচালনার জন্য এক বা একাধিক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী স্থির করা বিধেয়। প্রতি দশজন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকলে ভাল হয়। শিক্ষকগণ এবং ভ্রমাণার্থী শিক্ষার্থীরা একত্র বসে ভ্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করবেন। বিভিন্ন স্থানে কোথায়, কবে গিয়ে উঠবেন, কোথায় খাবেন, কিভাবে দর্শনীয় স্থান দেখবেন তার পরিকল্পনা পূর্বাহ্নে করা প্রয়োজন। দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখার জন্য শিক্ষক আলাদা একটি প্রশ্নপত্র বা Questainare তৈরি করে শিক্ষার্থীদিগকে দেবেন।

পরিকল্পনাকালে রেল কর্তৃপক্ষ থেকে কি সুবিধা পাওয়া যাবে তা জেনে তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানের হোটেল বা ধর্মশালার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করাও প্রয়োজন, ইত্যাদি।

পরিভ্রমণে বের হবার পূর্বে ভ্রমণার্থী শিক্ষার্থীদের ভ্রমণে যাবার অনুমতি তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে নিতে হবে।

কিন্তু শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের যৌক্তিকতা বেশি থাকলেও বর্তমান সময়ে সকল বিদ্যালয়ের পক্ষে দীর্ঘপথ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। অথচ এইরূপ ভ্রমণ ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে করা অতি প্রয়োজন। তাই অল্প খরচে ভ্রমণ সীমিত রাখা কর্তব্য। অর্থাৎ পায়ে হেটে দীর্ঘ ভ্রমণ করে অর্থাৎ ১০।১২ মাইল হেটে বা hiking করে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা আহরণ করতে পারে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এ বিষয়ে অগ্রণী হবেন এবং এরূপ পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করবেন। সীমিত আবেষ্টনীর জড়তাকে শিক্ষার্থীর পক্ষে ছাড়িয়ে ওঠা একান্তই কর্তব্য। তাহলেই শিক্ষা হবে সাবলীল ও স্থায়ী।

বিদ্যালয়ে অনেক সময়ে সুবিধা থাকলেও hiking-এর সুযোগ গ্রহণ করা যায় না। কারণ ১০।১২ মাইল যাতায়াতে সময় লাগবে এবং তাকে সময়-পত্রে খাপ-খাওয়ান যাবে না। তাই শিক্ষার্থীরা একান্তভাবে আগ্রহী হলে সকাল

৭টায় সময় বিদ্যালয় হতে রওনা হয়ে আবার বিকেল চারটার সময় দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখে ফিরে আসা যায়। শীতকালে বিশেষ করে এরূপ hiking-এর ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে শারীরিক কষ্ট কম হবে। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক সকলেই সকালে কিছু খেয়ে বের হবেন এবং দুপুরের খাবারের জন্য রুটি, ডিম, আলুর দম ইত্যাদি সাথে করে নিয়ে যাবেন। দ্রষ্টব্য স্থান দেখে তারা একটি ছায়াঘন স্থানে বসে দ্বি-প্রাহরিক আহার সমাপ্ত করতে পারেন।

এরূপ পরিভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য একদিন করে শীতকালীন মাসে গ্রহণ করা যায় তাহলে তা বিদ্যালয়ের সময়-পত্র ও কার্যক্রম অনুসরণের বিশেষ পরিপন্থী হবে না।

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অনুবন্ধ পদ্ধতি ও সম্বন্ধিত পাঠ

(Correlation and Integration of Studies)

অনুবন্ধ পদ্ধতি কি ?*

শিশু প্রথম অবস্থা থেকেই নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে। জ্ঞান অখণ্ড ও অবিভাজ্য। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরণের উদ্দীপনা আসছে। পরে সেই উদ্দীপনাসমূহ মনের মধ্যে প্রবেশ করে বিভিন্নরূপ বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী প্রভাবের সামগ্রিক রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা থেকে নানা ভাব সঞ্চারিত হচ্ছে কিন্তু তা যখন জ্ঞানের স্তরে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে তখন আর তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ থাকছে না। নানা জাতীয় ধারণা ও ভাব একটি অখণ্ড জ্ঞানে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এ-বিষয়ে মনীষী হার্বাট গবেষণা করে দেখছেন। তিনি বলেছেন যে, বিভিন্ন ভাব হতে উদ্ভূত ভাবসমূহের মধ্যে দৃশ্যতঃ ব্যবধান দেখা গেলেও সেই ভাবসমূহ পরে একীভূত হয়ে প্রকাশ পায়। সর্বদাই নানা বিচিত্র ধরণের অভিজ্ঞতা আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে ; তাকে হার্বার্ট নাম দিয়েছেন 'ভাবজট' বা Apperceptive mass। মনের এই ভাবজট এর পরিপ্রেক্ষিতেই মনে নূতন ছবির আমদানি হয় এবং এদের সমন্বয়ের ফলেই জ্ঞানের সৃষ্টি।

কিন্তু বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় সমাবেশ হয় এবং একটি অন্যের নিরপেক্ষ হিসাবে ধরে নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা যে নীতির বিবরণ দিলাম, তাতে জ্ঞান ঐ পন্থায় কখনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ফলে শিক্ষার অখণ্ড আদর্শকে সফল করে তুলবার জন্য একটি শিক্ষণপদ্ধতি উদ্ভাবন অপরিহার্য। পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু খণ্ড খণ্ড অবস্থায় উপস্থাপন করার নীতি বিষয়বস্তু শিক্ষণের দিক থেকে সুবিধাজনক মনে হতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু উহা যথার্থ মনস্তত্ত্বসম্মত নয়। আপাতদৃষ্টিতে

* Q. What is Correlation? Illustrate your answer with examples. (CU B.T. 1948, 50, 53, 55).

বিষয়গুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দৃষ্ট হলেও তাদের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত মৌলিক ঐক্য বিদ্যমান।

রেমণ্ট (Raymont) বলেন যে, বিভিন্ন বিষয়গুলিয়ে আমরা 'রুদ্ধকক্ষ' (closed compartment) অর্থাৎ একটির সাথে আর একটি সম্পর্ক-বিহীন এরূপ কথা যেন মনে না করি।[১]

অনুবন্ধতির রূপরেখা।

এতদিন পর্যন্ত বিষয়-বিভাজন নীতি অনুযায়ী শিক্ষাদান করা হয়ে আসছিল। কিন্তু এই বিষয়-বিভাজন নীতি অবাঞ্ছিত বলে শিক্ষাবিদগণ বিষয়-বিভাজন নীতির প্রভাব দূর করবার উদ্দেশ্যে এক বিশেষ শিক্ষণপদ্ধতির অনুসরণ করেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় অনুবন্ধ পদ্ধতি।

সমজাতীয় বিষয়সমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে পাঠদান করার নামই হচ্ছে অনুবন্ধ প্রণালীতে পাঠদান।

অনুবন্ধ প্রণালী অনুসারে গতানুগতিক বিষয়-বিভাজনকে অক্ষুন্ন রেখে ঐগুলির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত মৌলিক সম্পর্ক বিদ্যমান, সেই সম্পর্কটির উপর গুরুত্ব দিয়ে তা শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিষয়বস্তুগুলি স্ব-স্ব প্রধান এরূপ মনে করা অসঙ্গত। উদাহরণস্বরূপ লেখা ও পড়া, ইতিহাস ও ভূগোল যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং তাদের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র রয়েছে তা আমরা শিক্ষার্থীদের বোঝাতে পারি। অনুবন্ধ প্রণালীর গোড়ার কথা হচ্ছে, এক বিষয় আলোচনার সময়, ঐ আলোচনার সূত্র অবলম্বন করে প্রাসঙ্গিক অন্য বিষয় অবতারণা করা এবং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বিভেদ ঘোচান।

অনুবন্ধ প্রণালীর সুবিধা।*

১। **পাঠ্যক্রমের চাপ হ্রাস**—আমাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিষয়বস্তুগুলি সংখ্যায় খুব বেশি। দিনে দিনেই সভ্যতার বৃদ্ধির সাথে

১। Raymont: No Serious argument is needed to Prove that the various subjects of instruction should not be regarded as so many closed Compartments.

* Q. What are the merits of Correlation?

সাথে বিষয় ও বিষয়বস্তুর চাপ ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিলে পাঠ্যবিষয়ের সংখ্যা কমান যাবে না সত্যি, কিন্তু তার চাপ কমবে। যেমন অশোক পড়াতে গিয়ে শিক্ষক ঐতিহাসিক তথ্যই শুধু পরিবেশন করবেন না; তিনি অশোকের সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান, পরিধি, বিস্তৃতি প্রভৃতি দেখাবেন। সাহিত্যের পাঠ হিসাবে শিক্ষক সাহিত্যের পাঠ দেবেন। সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে শিক্ষক অশোকের যুগের মানুষের জীবনচর্চা, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে পাঠ দিতে পারেন। অতএব পৃথক পৃথক ভাবে যেসব বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত ছিল, তা একই সূত্রে শিক্ষাদান করা সম্ভব হল।

২। **শিক্ষাকে সহজ ও স্বাভাবিক করে**—বিভিন্ন বিষয় স্বাভাবিক-ভাবে সন্নিবিদ্ধ। অনুবন্ধ পদ্ধতি ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা দেবার ফলে শিক্ষায় কৃত্রিমতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিলে উহা সহজ ও স্বাভাবিক হয়।

৩। **শিক্ষাদান অর্থপূর্ণ হয়**—অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদানের ফলে বিষয়গুলিকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা সহজ হয়। ইতিহাস শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান শিক্ষা, এমন কি অঙ্ক এবং অর্থশাস্ত্রও শিক্ষা দেওয়া চলে। অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদানের ফলে পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে উপলব্ধি সহজ হয়।

৪। **অনুবন্ধ প্রণালীতে জ্ঞানের ঐক্য স্থাপিত হয়**—শিক্ষা বিভিন্ন বিষয়াশ্রয়ী হবে না। শিক্ষা হবে সমগ্র মানুষের জন্য। এরূপ একভিত্তিক শিক্ষা অনুবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে।

৫। **অনুবন্ধ প্রণালীতে সঙ্কীর্ণ বিশেষীকরণ হয় না**—অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থী সমস্ত বিষয়গুলিতে একসাথেই আগ্রহবোধ করতে শিক্ষা করে এবং শিক্ষায় ভারসাম্য বজায় থাকে।

অনুবন্ধ প্রণালীর অসুবিধা।*

অনুবন্ধ পদ্ধতির বিভিন্ন সুবিধা সত্ত্বেও এর কতকগুলি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। যথা—

(১) পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিষয়গুলির মামুলি বিভাগগুলি এমনি যুক্তিভিত্তিক ও পরিকল্পিত যে তাদের ভিতরকার ব্যবধান ঘুচিয়ে সুসম্বদ্ধ

* Q. What are the demerits of Correlation ?

স্থাপন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়গুলি যুক্তিভিত্তিক উপায়ে নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং বিষয়ভিত্তিক ব্যবধান এতই প্রকট যে এদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ খুঁজে বের করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ভূগোল পরিকল্পিত হয়েছে দেশগতভাবে, ইতিহাস পরিকল্পিত হয়েছে কালগত ভাবে, বিজ্ঞান শাখাগুলি পরিকল্পিত হয়েছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক তথ্যের উপর, সাহিত্যের পরিকল্পনা হয়েছে মানব মনের সুদূরপ্রসারী কল্পনা ও চিন্তাকে অবলম্বন করে ইত্যাদি। এর ফলে প্রত্যেকটি বিষয় বিভাগের মধ্যে রুদ্ধদ্বার স্থাপিত হয়েছে, যার প্রাচীর ভেঙ্গে অনুবন্ধ স্থাপন করা কঠিন। আর তা ছাড়া যতটুকু সম্পর্ক ও অনুবন্ধও স্থাপন করা যায় না কেন, তা হয় অগভীর।

(২) দ্বিতীয়তঃ, দেখা যায় অনুবন্ধ স্থাপনের চেষ্টা কষ্ট করে করতে হয়। তার মধ্যে স্বাভাবিকতা থাকে না। এর ফলে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেবার জন্য যে পরিবেশ রচনা করা শিক্ষকের পক্ষে প্রয়োজন, তা হয়ে উঠে না। এই জন্যই অনুবন্ধ প্রক্রিয়াটি নীরস বলে প্রতিভাত হয়।

(৩) তৃতীয়তঃ, অনুবন্ধ স্থাপনের প্রচেষ্টায় দেখা যায় যে অনুবন্ধ বাহ্যিক ও আকারগত, দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। কিন্তু আকারগত, বাহ্যিক ও ভাসা ভাসা সম্পর্ক স্থাপনে অনুবন্ধ স্থাপনের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভব নয়।

(৪) চতুর্থতঃ, অনুবন্ধ পদ্ধতির ব্যবহারিক দিক সঠিকভাবে কি হবে তা নির্ভর করছে শিক্ষকের যোগ্যতার উপর। শিক্ষককে উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন হতে হবে, তখনই বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের মধ্যে, বিভিন্ন বিষয়ের সম্পর্কে অন্তর্নিহিত যোগসূত্র স্থাপনের ক্ষমতা খুবই কম। রসবেত্তা, জ্ঞানবৃদ্ধ এবং উদ্যোগী শিক্ষক ব্যতিরেকে একাজ সম্ভব নয়। উপযুক্ত শিক্ষকের স্বল্পতায় জন্য অনুবন্ধ পদ্ধতি কার্যকরী হতে পারছে না।

অনুবন্ধ প্রণালীর বিভিন্ন শ্রেণী।*

তিন প্রকারের অনুবন্ধ পদ্ধতির ব্যবহার হতে পারে :

(১) নির্দিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অনুবন্ধ।

* Q. How can you classify Correlation ?

(২) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ।

(৩) পাঠের বিষয়বস্তু ও জীবনের সঙ্গে এবং বহির্জগতের মধ্যে অনুবন্ধ।

(১) নির্দিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অনুবন্ধ।

গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের কৃত্রিম বিষয়-বিভাজন নীতি অনুবন্ধ পদ্ধতির সাহায্যে দূর হয়। সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। সাহিত্যের গদ্য, কবিতা, ব্যাকরণ, রচনা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু এসব অংশ বিশেষের মধ্যে যে সমগ্রসাহিত্যের একত্ববোধ আছে, তা শিক্ষার্থীদের জানতে হবে। খণ্ড খণ্ড করে শিক্ষা দিলে সময় নষ্ট হয় এবং শক্তিরও অপচয় হয়। কারণ বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি ঘটে মাত্র।

(২) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ।

এই জাতীয় অনুবন্ধ স্থাপনের ক্ষেত্রে রসবেত্তা, জ্ঞানবৃদ্ধ অভিজ্ঞ শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের 'সাজাহান ও তাজমহল' পড়াতে গিয়ে, ভূগোল, জ্যামিতি ও সাহিত্য টেনে আনা চলে। সাজাহান ও তাজমহল পড়াতে গিয়ে, ইতিহাসের বিষয়বস্তু বলার পর, ভূগোলের সাথে সংযোগ স্থাপন করে শিক্ষক উত্তর প্রদেশের আগ্রার জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি ইত্যাদির কথা বলতে পারেন, জ্যামিতির ক্ষেত্রে তাজমহল সৃষ্টির ভিত্তিস্বরূপ জ্যামিতিক যাথার্থ্য বোঝাতে পারেন এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'তাজমহল' কবিতাটি পড়াতে পারেন বা আবৃত্তি করে শোনাতে পারেন।

(৩) পাঠের বিষয়বস্তু ও জীবনের সঙ্গে এবং বহির্জগতের মধ্যে অনুবন্ধ।

এর প্রয়োজন যে কত বেশি তা বলে শেষ করা যাবে না। আমাদের দেশে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে জীবনের কোন সংযোগ ছিল না। অথচ পাঠ্যক্রম রচিত হওয়া উচিত আমাদের বর্তমান জীবন ও কৃষ্টিকে আধার করেই। বর্তমানের পাঠ্যক্রমেরও অনেক বিষয়ের মধ্যে সেই অবস্থা বর্তমান। কিন্তু আমাদের আচার-আচারণ ও শিক্ষার মধ্যে কোন সংযোগ স্থাপিত হয় নি। তাছাড়া বিষয়বস্তু জীবনের সাথে যুক্ত থাকলেও, জীবনে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি নি। আমরা 'পৌর কর্তব্য' সম্বন্ধে শিক্ষাদান

করছি। কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনতে গিয়ে লম্বা 'কিউ' দেখে 'কিউ'-এর সম্মুখভাগের লোকদের টিকিটখানা কিনে দেবার অনুরোধ করতে দ্বিধা করি না। তাই আমরা বিদ্যালয়ে যা কিছু শিক্ষালাভ করি, তার প্রয়োগ জীবনে হবে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

তাছাড়া পাঠ্যবিষয়ের সাথে বিশ্বজগতের অনুবন্ধ রচনা করতে পারলেই পাঠ্যবিষয় সহজ ও সাবলীল হয়ে উঠবে। সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস শিক্ষার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সমঝোতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে। তবেই ত বিষয়শিক্ষা সার্থক হবে।

আকস্মিক ও পূর্বপরিকল্পিত অনুবন্ধ।

অনুবন্ধ দুভাগে বিভক্ত করা চলে—আকস্মিক ও পূর্বপরিকল্পিত। শিক্ষক পড়ানো কালে, হঠাৎ কোন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেতে পারেন এবং তার সঙ্গে অনুবন্ধ স্থাপন করতে প্রয়াসী হন। যেমন দারুশিল্পের কাজ অনুসরণকালে শিক্ষক বিভিন্ন ধরণের কাঠের কথা আলোচনা করতে পারেন; বিভিন্ন ধরণের গাছ কোথায় জন্মে, কি করে সেগুলি আনা হয় সেসব কথা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করতে পারেন। এই ধরণের আলোচনা খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে এসে যায়। এই জাতীয় অনুবন্ধ হচ্ছে আকস্মিক।

পক্ষান্তরে পূর্বপরিকল্পিতভাবেও অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগ চলতে পারে। মূল বিষয়টি এবং প্রয়োজনীয় অংশগুলিকে ভিত্তি করে নূতন নূতন বিষয় সংযোগ সাধন করে নূতন জ্ঞান পরিবেশন করা যায়। এটি হচ্ছে পূর্ব-পরিকল্পিত অনুবন্ধ।

এস্থলে একটি সাবধানী বাণী উচ্চারণ করা প্রয়োজন। অনুবন্ধ স্থাপন হবে সহজ ও সাবলীল, কখনও কষ্টকল্পিত হবে না। কষ্টকল্পিত অনুবন্ধ শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেবে।

অনুবন্ধ প্রণালীর কেন্দ্রীকরণ (Plan of Concentration)।*

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে অখণ্ড ও অবিভাজ্য জ্ঞান অর্জন। হার্বার্ট ও তাঁর অনুগামিগণ এই নীতির উপর নির্ভর করে অনুবন্ধ প্রণালীর এক নূতন রূপরেখা দিয়েছেন। তাঁরা অনুবন্ধ পদ্ধতিকে 'কেন্দ্রবন্ধ' প্রণালীতে রূপান্তরিত

* Q. What is plan of concentration in Correlation ?

করার চেষ্টা করেন। 'কেন্দ্রবদ্ধ' পদ্ধতি অনুবন্ধ পদ্ধতির এক ধরণের বিকাশ মাত্র। এই 'কেন্দ্রবদ্ধ' পদ্ধতিতে বিবিধ মানব-অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে এমন একটি বিষয় বেছে নিতে হবে। সকল প্রকারের মানবিক অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে সাধারণতঃ ইতিহাসেই। এই কারণে ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্রবদ্ধ করে অন্যান্য বিষয়সমূহ পড়ান যেতে পারে। 'কেন্দ্রবদ্ধ' পদ্ধতিটি এই হিসাবে প্রশংসা দাবী করতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষায়ও এই 'কেন্দ্রবদ্ধ' পদ্ধতির সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পকাজ থাকে কেন্দ্রে এবং তাকে ঘিরেই অনুবদ্ধ পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

হার্বার্ট এবং তাঁর অনুগামিগণ একটু বড়দের ক্ষেত্রে ইতিহাসকে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করে অনুবদ্ধ প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন। যেমন 'বঙ্গভঙ্গকে' অবলম্বন করে ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, রচনা, মানচিত্র অঙ্কন, সঙ্গীত ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

আবার আমেরিকার শিক্ষাবিদ কর্ণেল পার্কার-এর মতে প্রকৃতিবিজ্ঞানকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে ধরে শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টাই বাঞ্ছনীয়।

'কেন্দ্রবদ্ধ' প্রণালীর অসুবিধাও আছে। কারণ শিক্ষক যদি মাত্রা বজায় না রেখে এই প্রণালী প্রয়োগের চেষ্টা করেন, এবং কষ্ট কল্পনা করে বিভিন্ন বিষয় আমদানি করেন, তবে তা উপযুক্তরূপ শিক্ষাসহায়ক হবে না, এবং অবাস্তব সংযোগ সাধন হবে। বঙ্গভঙ্গের ইতিহাস বোঝাতে গিয়ে মানচিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন ত বটেই, সাহিত্য এবং চিত্রাঙ্কনেরও সাহায্যও স্বাভাবিক-ভাবে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ইতিহাস পাঠের মধ্যে যদি অঙ্ক টেনে আনা যায় তাহলে সেটা স্বাভাবিক হবে না। যে বিষয়বস্তু টেনে আনলে শিক্ষার প্রয়োজনই সিদ্ধ হবে না এমন সব বিষয়বস্তু কেন্দ্রের দিকে টেনে আনায় লাভ কিছু নেই। অতএব কেন্দ্রবদ্ধ অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষকের অত্যন্ত সাবধান হয়ে চলতে হবে।

সম্বন্ধিত শিক্ষাদান প্রণালী (Integrated Teaching)।*

কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি বা কেন্দ্রবদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে প্রথমতঃ মূল বিষয়টিকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পড়ান হয় এবং পরে বিষয় সম্বন্ধিত বিভিন্ন তথ্যকে

* Q. Expiain Integrated Teaching with illustrations.

অবলম্বন করে পূর্ণ পাঠের একক স্থির করে পাঠদান করা হয়। এই জাতীয় পাঠদানকে বলা হয় Integrated Teaching বা সমন্বিত শিক্ষা।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে একটি প্রজেক্টের কাজ—সমস্যামূলক কাজটি হল 'ডায়মণ্ড হারবার রেল স্টেশনে ট্রেন চলাচল'। কর্মটি পরিকল্পিত হল। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করল। একদল তৈরি করল রেল লাইন, পাশে টেলিগ্রাফ পোষ্ট, আর একদল তৈরি করল ট্রেনের কামরা ও রেল ইঞ্জিন, আর একদল তৈরি করলে স্টেশন ঘর এবং শেষ দল তৈরি করল ডায়মণ্ড হারবার হতে শিয়ালদহ পর্যন্ত বিভিন্ন রেলষ্টেশনের টিকিট।

বিভিন্ন দল বিভিন্ন ধরণের কাজ করছে। এসব কাজ থেকে বিভিন্ন ধরণের সমন্বিত পাঠ আসতে পারে। বাষ্প, বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, বিদ্যুতচালিত ইঞ্জিন প্রথম ট্রেন চালনা, টেলিগ্রাফ, প্রভৃতি বিজ্ঞানমূলক এবং সমাজবিদ্যামূলক পাঠ, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র, টিকিট তৈরির হিসাব ইত্যাদি গণিতমূলক সমন্বিত পাঠের অবতারণা ঐ একটি প্রজেক্টের সমস্যামূলক কাজ হতে উদ্ভূত হতে পারে, তাছাড়া সাহিত্যমূলক পাঠও রেলগাড়ী সম্পর্কিত অনেক আছে। সেগুলিও সমন্বিত পাঠ হিসাবে দেওয়া চলে।

মনে রাখতে হবে সমন্বিত শিক্ষায় বাস্তব ঘটনার সাথে শিক্ষণীয় বিষয়টিকে যুক্ত করে মূর্তরূপে বিষয়গুলির উপস্থাপন করে শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করে তোলা হয়।

———

চতুর্দশ অধ্যায়

বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতি : পরীক্ষা ও অভীক্ষা

(Modern Methods of Evaluation : Examination and Tests)

সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে, শিক্ষাদান-কালে শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখল তা জানার জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন।

যেদিন থেকে শিক্ষাদান কাজ শুরু হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকেই পরীক্ষা গ্রহণও আরম্ভ হয়েছে। বলা বাহুল্য, তখন হয়ত পরীক্ষা গ্রহণের রূপটি এমনি ধারা ছিল না। পরীক্ষার যে তখন প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে সে বিষয়ে কারও মতদ্বৈধতা নেই।

পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য (Aims of Examination)।

(১) **শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপক**—শিক্ষার্থীরা পাঠাভ্যাসের মধ্য দিয়ে কতটুকু জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করলে তা যাচাই করে দেখা দরকার। পরীক্ষার ফলেই জানা যাবে কোন শিক্ষার্থী কতটা জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করেছে। এই জন্যই পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন।

(২) **শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের সাফল্যের পরিচায়ক**—পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলনের ফলে, পরীক্ষার ফল দেখে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ শিক্ষকদের পারদর্শিতার মূল্যায়ন করতে পারেন। তাছাড়া বিদ্যালয়ের সাফল্যও এই সূত্রে পরিমাপ করা যায়। স্কুলের সার্বিক পরীক্ষার ফলাফল ভাল হলে সাধারণ মানুষ তার প্রশংসা করে। আর তা না হলে নিন্দা করে থাকে। তাছাড়া আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের অনুমোদন নির্ভর করছে পরীক্ষার ভাল ফলের উপর।

৩। **শিক্ষার্থীদের ত্রুটি নির্ণয়ে সাহায্য করা**—পরীক্ষার ফল দেখে পিতামাতা ও অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতি লক্ষ্য করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের কোনও বিষয়ে কোন অসুবিধা আছে কিনা তা

শিক্ষক ও অভিভাবকের পক্ষে নির্ণয় পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সহজ হয়, এবং শিক্ষক সেই ত্রুটি শোধরাবার উপায় বের করে তাদের অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারেন।

৪। **ভবিষ্যৎ সাফল্যের নিরূপক**—পরীক্ষা গ্রহণের সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে (Prognosis) শিক্ষার্থীর প্রবণতাগুলি প্রথমে জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে পথ নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন অষ্টম শ্রেণীতে থাকাকালীন যদি শিক্ষার্থীর বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় এবং পরীক্ষার ফলও যদি সেই অনুযায়ী হয়, তাহলে শিক্ষার্থীকে নবম শ্রেণীতে 'বিজ্ঞান প্রবাহ' নিতে বলা যেতে পারে। উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় যদি কেহ ভালভাবে পাশ করে তাহলে তাকে ডিগ্রী ক্লাসে ভর্তি হতে বলা চলে, না হলে তাকে অন্য কোন প্রবাহ ধরে জীবিকা অর্জনের সন্ধানে বের হতে হবে।

৫। **অন্যান্য গুণ ও ব্যক্তিতার পরিমাপক**—পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শুধু বিষয়জ্ঞান পরিমাপ করা হয় না। তার চিন্তাধারা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, মনের তৎপরতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদিও পরীক্ষা করে বুঝতে পারা যায়। যে শিক্ষার্থী উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় খুব ভালভাবে পাশ করেছে সে যে শুধু স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলিতেই পারদর্শিতা লাভ করেছে এমন কোন কথা নেই। সে পাঠ্য-বিষয় বহির্ভূত অনেক অভিজ্ঞতাও লাভ করেছে, একথা ধরে নিতে পারা যায়।

৬। **শিক্ষা প্রচেষ্টার উদ্দীপক**—পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত আছে বলেই শিক্ষার্থীরা পাঠে আগ্রহ বোধ করে থাকে। পরীক্ষা ব্যবস্থা না থাকলে কম শিক্ষার্থীই স্বেচ্ছায় পড়াশুনা করত। এইজন্যই পরীক্ষা পদ্ধতির গুরুতর ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষাবিদই এর পূর্ণ অবলুপ্তির বিরোধিতা করেন।

কিন্তু পরীক্ষাকে পাঠের উদ্দীপক হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। পরীক্ষাদ্বারা পাঠে উৎসাহিত করতে হলে প্রতিযোগিতা, পুরস্কার, শাস্তির ভয়, প্রভৃতি অস্বাভাবিক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু ঐ সকল পন্থা মনস্তত্ত্ববিরোধী। তাই পাঠের উদ্দীপক হিসাবে পরীক্ষাকে ব্যবহার কখনই সঙ্গত নয়।

৭। **সুপরিচালনার উপযুক্ত ব্যবস্থা**—অনেক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ যথা ক্যাণ্ডেল (Kandel), ব্যালার্ড (Ballard) প্রভৃতির মতে বিদ্যালয়

সুপরিচালনার জন্যই পরীক্ষার প্রয়োজন। পরীক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুযায়ী দলবিভাগ করে পাঠদান করা সম্ভব হয় ফলে তাদের শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। পরীক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর ত্রুটি নির্ণয় করা (diagnosis) সম্ভব, এবং কিভাবে তাকে পরিচালিত করতে হবে সে প্রশ্ন এসে যায়। শিক্ষক ফলে সতর্ক হতে পারেন।

৮। **শিক্ষার মানের সমতা**—বিভিন্ন বিদ্যালয়ে একই পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান করা হয়। পরীক্ষা ব্যবস্থা যদি না থাকত, তাহলে শিক্ষার মানের সমতা আনা যেত না।

৯। **উচ্চ শিক্ষায় গমনের জন্য উপযুক্ততা পরীক্ষা**—পরীক্ষা দিয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কেউ নির্বাচিত হতে পারে।

১০। **প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনে সাহায্য**—চাকুরীর জন্য বা বিশেষ পুরস্কার দানের জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। পরীক্ষা ব্যবস্থা না থাকলে নির্বাচন সহজসাধ্য হত না।

প্রচলিত পরীক্ষার ত্রুটি (Defects of the Present System of Examination)।

পরীক্ষা গ্রহণের নানা সুবিধা থাকলেও বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির বহু ত্রুটি রয়েছে। ফলে পরীক্ষান্তে নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যায় না। Ryburn পরীক্ষা পদ্ধতি কঠোরভাবে সমালোচনা করে বলেছেন যে পরীক্ষা পদ্ধতি, অন্ততঃপক্ষে যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা সৃজনধর্মী কাজের শত্রু (Examinations are the enemies of creative work, at least as they are usually conducted) এরকম আরও অসংখ্য উক্তির সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে। কমিশন বলেছেন যে প্রায় অর্ধশত বৎসর যাবৎ ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণ, একটি নিকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্য বলে পরিচিত (For nearly half a century the examination has been recognised as one of the worst features of Indian Education)।

পরীক্ষার ত্রুটিগুলি নিম্নে বিশ্লেষণ করা গেল।

(১) **রচনা-ধর্মিতা**—বর্তমান পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির একটি বিশেষ ত্রুটি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের রচনাধর্মী উত্তর লিখতে হয়। 'ফা-হিয়েনের ভারত ভ্রমণ

সম্বন্ধে যা জান লিখ'—এই প্রশ্নের উত্তর লিখতে হলে বিস্তারিত এক রচনা লিখবার প্রয়োজন হয়। প্রচলিত পরীক্ষায় যে সব ত্রুটি ধরা পড়েছে, তার অধিকাংশই জন্মলাভ করেছে রচনা-ধর্মী পরীক্ষা থেকে। বর্তমান যেসব আধুনিক অভীক্ষা সৃষ্ট হচ্ছে, সেগুলি সম্পূর্ণ রচনাধর্মী নয়। তাই এই অভীক্ষাগুলি অনেকাংশেই ত্রুটিমুক্ত।

বর্তমান রচনাধর্মী পরীক্ষা-পদ্ধতিতে দেখা যায় যে, যে শিক্ষার্থীর হাতের লেখা ভাল, ভাব ও ভাষায় বিষয়বস্তুটির কিছু অংশও লিখতে পেরেছে, সে ভাল নম্বর পেয়েছে। অথচ অপেক্ষাকৃত খারাপ হাতের লেখায় সমস্ত বিষয়বস্তুটি আলোচনা করলেও সে হয়ত ভাল নম্বর পায় নি।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেছেন যে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পরীক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে সার্বিক পরীক্ষার (Public Examinations) উপর এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে তা দ্বারা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাই সঙ্কুচিত আকার ধারণ করেছে। পরীক্ষাই পাঠ্যক্রমকে প্রভাবান্বিত করেছে। পাঠ্যক্রমকে অনুসরণ করে পরীক্ষা গ্রহণ হচ্ছে না।

প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষা পদ্ধতিতে বর্তমান মনোবিজ্ঞানীদের নির্দেশ অনুযায়ী কতকগুলি অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে—(ক) নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity), (খ) নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), (গ) যাথার্থ্য (Validity), (ঘ) প্রয়োগশীলতা (Administrability), (ঙ) সংখ্যা ব্যাখ্যান ও তুলনীয়তা (Interpretation and Comparability) এবং (চ) পরিমিততা (Economy)।

(২) নৈর্ব্যক্তিকতার (Objectivity) অভাব—রচনাধর্মীতায় শিক্ষক নিজস্ব রুচি, পছন্দ অনুযায়ী নম্বর প্রদান করেন, ফলে ব্যক্তিকতা বা Subjectivity এসে দেখা দেয়। এজন্য পরীক্ষা-পত্রের মান নির্ণয়ে প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়। Dr. William পরীক্ষককে রহস্যময় ব্যক্তি বা Mysterious person বলে অভিহিত করেছেন। পরীক্ষকের হাতে উপযুক্ত ছাত্র ফেল করে যেতে পারে, আর যে ছাত্র অনুপযুক্ত সেও পাশ করে যায়। একই উত্তর-পত্র যদি তাঁকে বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে নম্বরের অনেক পার্থক্য থেকে গিয়েছে। পরীক্ষকের খেয়াল, মর্জি, মানসিক ভাব, পছন্দ, অপছন্দ মনের সাময়িক অবস্থা, দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি

দ্বারা উত্তর-পত্রের নম্বর প্রভাবান্বিত হয়। এক কথায় নির্দিষ্ট উত্তরের স্থান রচনাধর্মী প্রশ্নে নেই।

(৩) নির্ভরযোগ্যতার (Reliability) অভাব—বর্তমান রচনাধর্মী পরীক্ষা পদ্ধতির অন্যতম প্রধান ত্রুটি হল এর মধ্যে প্রকৃত নির্ভরযোগ্যতার অভাব রয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে একই উত্তরপত্র যদি একই পরীক্ষক সময়ের ব্যবধানে পরীক্ষা করে দেখেন, তাহলে নম্বর দেওয়ার মধ্যে তারতম্য ঘটবে। একই উত্তর-পত্র যদি দুজন পরীক্ষক পরীক্ষা করে দেখেন, তাহলেও প্রদত্ত নম্বরের মধ্যে ব্যবধান থাকবে। Vernon বলেছেন যে, খাওয়ার আগে ও পরে যদি পরীক্ষক একই উত্তর-পত্র দেখেন তবে নম্বরের পার্থক্য দেখা যাবে।

একবার এক পরীক্ষায় কয়েকটি উত্তর-পত্র একই রকম হওয়ায়, সকলে একই রকম নম্বর পাবে বলে বিবেচিত হয়, পরে সেই উত্তর-পত্রগুলি অভিজ্ঞ পরীক্ষকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরীক্ষান্তে দেখা গেল নম্বরের পার্থক্য হয়েছে ২১ – ৭০ পর্যন্ত।

Prof. Sandiford উল্লেখ করেছেন যে, এক ব্যক্তি এক প্রবন্ধ লিখে ৮০ নম্বর পেয়েছিল, আবার সেই প্রবন্ধটিই আর এক বছর লিখে পেয়েছিলেন ৩৯ নম্বর মাত্র।

Dr. Ballard কতকগুলি উত্তরপত্র কয়েকজন পরীক্ষককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিলেন। নম্বর দেওয়ার মধ্যে খুবই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। একজন পরীক্ষক এক উত্তরপত্রে দিয়েছেন ২৫ নম্বর। আবার সেই উত্তরপত্রেই আর একজন পরীক্ষক নম্বর দিয়েছেন ৭৫ নম্বর। কয়েক বছর পর Dr. Ballard সেই পুরোণো উত্তর-পত্রগুলিকে সেই পরীক্ষক দলকে আবার দেখতে পাঠান। এবার ফল দেখা গেল আরও আশ্চর্যজনক। যিনি একটি উত্তরপত্রে নম্বর দিয়েছিলেন ২৫ সেই উত্তরপত্রেই নম্বর দিয়েছেন ৭৫। পরে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলেও একই রকম পার্থক্য দেখা যায়।

(৪) যাথার্থ্যের (Validity) অভাব—রচনাধর্মী প্রশ্নসমূহের যেমন নির্ভরশীলতা নেই, তেমনি তাদের যাথার্থ্যও নিতান্ত নগণ্য, একথা বললে ভুল করা হবে না। যদি কোন বিশেষ জ্ঞান ও নৈপুণ্য পরিমাপের জন্য প্রশ্নপত্রটি রচিত হয় এবং তা দ্বারা সেই বিশেষ জ্ঞান ও নৈপুণ্যের পরিমাপ হয় তাহলে তার যাথার্থ্য আছে বলা চলে, কিন্তু তা যদি না করা সম্ভব হয়,

তাহলে সেই প্রশ্নপত্রটির যাথার্থ্য নেই বলা হয়। প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষায় এই ত্রুটি বিশেষভাবে দেখা যায়। উত্তর সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব না দিয়ে ভাষাজ্ঞান, রচনাশৈলী, হস্তাক্ষর ইত্যাদির উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে এই জাতীয় পরীক্ষায় যাথার্থ্যের অভাব দেখা যায়।

(৫) প্রয়োগশীলতার (Administrability) অভাব—'প্রয়োগশীলতা' কথাটির দুটি বৈশিষ্ট্য। একটি পরীক্ষার প্রয়োগের সুযোগ সুবিধা এবং অপরটি হচ্ছে নম্বর প্রদান। রচনাধর্মী পরীক্ষায় দুটির মধ্যে একটিও মর্যাদা পায় না। প্রথমতঃ পরীক্ষার প্রশ্নগুলি অত্যন্ত অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট। পরীক্ষক প্রশ্নদ্বারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কতটা আশা করেন. তা প্রশ্ন থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় না। ফলে পরীক্ষার্থীরা. অনুমানের উপর নির্ভর করে উত্তর লিখে থাকে। পক্ষান্তরে নম্বর দেওয়ারও কোন বিশিষ্ট রীতি নেই, যাকে অবলম্বন করে নম্বর দেওয়া চলতে পারে।

(৬) সংখ্যা ব্যাখ্যান ও তুলনীয়তার (Interpretation and Comparability) অভাব—একটি উত্তম পরীক্ষা তুলনীয় হবে অর্থাৎ অন্ত ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করে তার ব্যাখ্যা করা যাবে। এই বৈশিষ্ট্যটি প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষা পদ্ধতিতে পাওয়া যায় না। তার কারণ হচ্ছে এই জাতীয় পরীক্ষায় এমন কোন নির্দিষ্ট Standard বা মান নেই, যার সাথে বর্তমান প্রশ্নপত্রের ও পরীক্ষার তুলনা করা যেতে পারে।

(৭) পরিমিততার (Economy) অভাব—পরিমিততা বলতে সময় এবং অর্থের মিতব্যয়িতা বোঝায়। রচনাধর্মী প্রশ্ন রচনাতে সময় ও অর্থ কমই ব্যয় হয় বটে, কিন্তু শিক্ষার্থীরা উত্তর-পত্র লিখতে প্রচুর সময় ব্যয় করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষার্থীরা যথা সময়ে শেষ করতে পারে না, এবং আরও সময়ের জন্য আবেদন জানায়।

(৮) প্রচলিত পরীক্ষায় জ্ঞানের সত্যিকার পরিমাপ হয় না—শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের সত্যিকার পরিমাপ প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা সম্ভব নয়। অনেক সময়ই পরীক্ষার্থী ভাল নম্বর বা খারাপ নম্বর পায় তার অদৃষ্টের জন্য। হয়ত প্রশ্ন ও উত্তর নির্বাচন করে পরীক্ষার্থী পড়ে এল এবং হয়ত সেই প্রশ্নগুলিই পরীক্ষায় এসে গেছে। সে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়ে গেল। আবার দেখি যে, সে যে প্রশ্নগুলি নির্বাচন করে তাদের উত্তরগুলি ভাল

করে পড়ে এসেছে, তা পরীক্ষায় আসে নি। তাতে তার ফল খারাপ হবে, এতে আর আশ্চর্য কি!

(৯) **পরীক্ষা প্রক্ষোভজনিত ক্ষতি ও মানসিক চাপের সৃষ্টি করে**—H. G. Stead বলেছেন যে, পরীক্ষার কথা মনে হলেই শিক্ষার্থীদের মনে প্রক্ষোভজনিত চাপের সৃষ্টি হয় এবং পড়া তাতে ব্যাহত হয়। সার্বিক পরীক্ষার (Public Examinations) সময় অনেক সময়ে দেখা যায় যে পরীক্ষার পূর্ব থেকেই শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে। পরীক্ষা সম্বন্ধে তাদের ভীতি জন্মে গেছে তার ফলেই এরূপ অবনতি। পরীক্ষার তারিখ যতই এগিয়ে আসতে থাকে, ততই শিক্ষার্থীরা বেশি পরিশ্রম করে এবং তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং যুক্তি ও চিন্তন ক্ষমতা ইত্যাদির লোপ পেতে থাকে।

(১০) **শিক্ষকের উপর চাপ বৃদ্ধি**—বর্তমান রচনাধর্মী পরীক্ষার জন্য শিক্ষককে উত্তর-পত্রে অনেক লেখা দেখতে হয়। তাই তাঁদের দ্বারা উত্তর-পত্র ভালভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না।

(১১) **অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা**—প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের মধ্যে যে সহযোগিতা ও মৈত্রীর পরিবেশ থাকে, তা নষ্ট হয়ে যায়। শ্রেণীতে বাঞ্ছিত স্থান অধিকার করবার জন্য পরস্পরের সাথে কলহে লিপ্ত হয় এবং তাদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতি অপগুণের সৃষ্টি হয়। পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা অনেক সময় অসৎ পথ অবলম্বন করে। তারা নকল করে, খাতা বদল করে ও পর্যবেক্ষকদের ভয় দেখিয়ে নানা অসৎ উপায় অবলম্বন করে পরীক্ষা দেয়।

(১২) **বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি চারিত্রিক গুণগুলির মূল্যায়নে অসমর্থ**—প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মৌলিকত্ব, নেতৃত্ব, সামাজিকতা ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখবার মত কোনও পদ্ধতি বের করতে পারে নি। স্নলতান মহীউদ্দীন বলেছেন যে মৌলিকত্ব, স্বাধীন চিন্তাধারা, যুক্তি দিয়ে বিচার করা, মহান ভাবধারার প্রতি সাড়া দেওয়া, সৌন্দর্যানুভূতির সৃষ্টি ইত্যাদি আর শিক্ষা প্রচেষ্টায় শিক্ষকের লক্ষ্য থাকে না, কারণ প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা এগুলির মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন।

বর্তমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন, তথা শারীরিক,

মানসিক, সামাজিক, রুচিগত ও প্রক্ষোভজনিত বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সেই মত প্রকাশ করেছেন।[১] এই বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে শিশুকে অনেক অসুবিধা ও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এ অবস্থায় মূল্যায়ন করে দেখতে হবে যে কতখানি অসুবিধা সে অপসারণ করতে পেরেছে, কত সমস্যার সমাধান করতে সে সক্ষম হয়েছে, এবং পরে কি পদ্ধতি অনুসরণ করে তাকে আরও অগ্রসর করিয়ে নেওয়া যাবে। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে সর্বদাই তার বুদ্ধির, অর্জিত বিদ্যা প্রবণতা, পারদর্শিতা, আগ্রহ ইত্যাদি পরিমাপ করে দেখতে হয় এবং ফলে তার জন্য বিষয়বস্তু, পরিবেশ ও পদ্ধতি সেই হিসাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। আমাদের প্রচলিত পরীক্ষাব্যবস্থা, যা দ্বারা শিশুর বৌদ্ধিক মূল্যায়ন শুধু সম্ভব, তা দ্বারা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়ন চলবে না।

তাই বর্তমানে 'পরীক্ষা' কথাটি পরিবর্তিত করে মূল্যায়ন বা Evaluation কথাটি বসানোই যুক্তিসঙ্গত। মূল্যায়ন কথাটি দ্বারা ব্যাপকতর অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে।

মূল্যায়নের (Evaluation) অর্থ—Writingstone-এর মতে মূল্যায়ন হচ্ছে একটি অপেক্ষাকৃত নূতন শব্দ, যা দ্বারা পরিমাপ সম্বন্ধে একটি ব্যাপক ধারণা লাভ করা যায়। পরীক্ষা পুঁথিগত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু মূল্যায়ন হচ্ছে ব্যক্তিতার ক্রমবিকাশের পরিমাপ এবং তাছাড়া শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের হিসাব মূল্যায়ন দ্বারা সম্ভব।

Clara M. Brown বলেছেন শিশু জীবনে লক্ষ্যবস্তুর পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন একান্তই প্রয়োজন এবং পরিমাপের ফলেই নূতন লক্ষ্য বস্তুর সৃষ্টি।

আধুনিক অভীক্ষা একটি উন্নত ধরণের মূল্যায়ন কৌশল।

আধুনিক অভীক্ষা (New type Tests)।

প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে,

১। Secondary Education Commission: The School of today concerns itself not only with the intellectual pursuits but also with the emotional and social development of the child, his physical and mental health, his social adjustment and other equally important aspects of his life, in a word with an allround development of his personality.

তাতে দেখা গেছে যে এ পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার একান্তই বাঞ্ছনীয়। অনেকে এরূপ পরীক্ষাব্যবস্থাকে একেবারে বন্ধ করে দিতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু অনেক শিক্ষাবিদই বলেন যে পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি সংস্কার করা চলতে পারে কিন্তু একেবারে তুলে দেওয়া কখনও উচিত হবে না। সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা পরীক্ষা পদ্ধতির নূতন রূপ দিতে চেয়েছেন। এই উদ্দেশ্যের পটভূমিকায় নানাদিকে নানারূপ পরীক্ষা কার্য চলেছে এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ নূতন ধরনের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (New type Objective tests) শিক্ষাব্যবস্থায় এসে গিয়েছে।

এই নূতন ধরনের অভীক্ষাসমূহের সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলি ব্যক্তিকতাধর্মী প্রভাব হতে একান্তই মুক্ত, অর্থাৎ প্রকৃতিতে এরা একান্তই নৈর্ব্যক্তিক, এই অভীক্ষাগুলি ছোট ছোট প্রশ্ন দিয়ে গঠিত এবং প্রশ্নগুলি রচনাধর্মী নয় বলে রচনাধর্মী প্রশ্নের ত্রুটি এতে প্রবেশ করতে পারে নি। এই প্রশ্নগুলির উত্তর মোটে একটি। অতএব পরীক্ষাপত্র পরীক্ষা করবার সময় পরীক্ষকের কোনরূপ নিজস্ব রুচি, পছন্দ বা অপছন্দ দ্বারা প্রভাবান্বিত হবার উপায় নেই। তাছাড়া পরীক্ষার্থীদের ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ধরনের প্রশ্ন বুঝতে কোন কষ্ট হয় না এবং তাহার জ্ঞানের প্রকৃতি পরিমাপ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

এই নূতন ধরনের অভীক্ষা নানা ধরনের হয়। বলা বাহুল্য এইসব অভীক্ষার প্রশ্ন পত্র রচনা করতে হলে পাঠ্যসূচী ও সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে করতে হয়। নূতন অভীক্ষা বিভিন্ন ধরনগুলি হচ্ছে—

১। সম্পূর্ণীকরণ অভীক্ষা (Completion Test)।

এই জাতীয় প্রশ্নের বাক্যে দু-একটি পদ উহ্য থাকে। শূন্যস্থানে উপযুক্ত পদ বসিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ করতে হয়। উহ্যপদ এমনি ভাবে নির্বাচিত হবে যে শূন্যস্থান সমূহ পূরণের দ্বারা শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু ঘটিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

(ক) রোম সাম্রাজ্যের রাজপরিবারের মহিলারা — কাপড় পছন্দ করতেন। আদর করে ব্যবহার করতেন। মুঘল সম্রাজ্ঞীরাও — কাপড়ের সমাদর করতেন।

(খ) হলদিঘাটের গিরিপথে আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সহিত মহারাণা—ভীষণ যুদ্ধ হয়।

(গ) সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক—ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

যখন বাক্যের শেষে একটি মাত্র শূন্যস্থান থাকে তখন তাকে বলা হয় স্মরণ অভীক্ষা (Recall Type Test)। যেমন

পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী—। (উঃ কলিকাতা)।
শিবাজীর রাজ্যাভিষেক হয়—। (উঃ ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে)।

২। সত্যাসত্য অভীক্ষা (True False test)।

এই জাতীয় অভীক্ষাতে কতকগুলি উক্তি দেওয়া থাকে। এই উক্তিগুলির মধ্য থেকে পরীক্ষার্থীকে সত্য উক্তিটি বের করতে হয়। যে উক্তিটি সত্য তার পাশে টিক চিহ্ন (√) এবং যেটি মিথ্যা তার পাশে ক্রশ চিহ্ন (×) দিতে হয়।

যথা—(ক) দিল্লী ভারতের রাজধানী। ( )
(খ) লক্ষ্মণ সেন কাশী, কামরূপ ও কলিঙ্গ রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। ( )
(গ) বুদ্ধদেব সারনাথে জন্ম গ্রহণ করেন। ( )
(ঘ) সমুদ্রগুপ্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ( )
(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে ধানের চাইতে গম বেশি উৎপন্ন হয়। ( )

৩। সম্ভাব্য উত্তর নির্বাচন অভীক্ষা (Multiple Choice Test)

এই অভীক্ষায় কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য দেওয়া থাকে এবং প্রত্যেকটি বাক্যের সাথে চার পাঁচটি শব্দ বা বাক্যাংশ দেওয়া থাকে। ঐ অসম্পূর্ণ বাক্যটিকে তখন শব্দগুলি বা বাক্যাংশগুলি থেকে উপযুক্ত বাক্যাংশ নিয়ে সম্পূর্ণ করতে হয়। যেমন—

(ক) বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারের জন্য ধর্মমহামাত্র প্রেরণ করেন—। (হর্ষবর্ধন, অশোক, বল্লাল সেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য)।

(খ) শাজাহানের পর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন—(আকবর, ঔরঙ্গজীব, ইলতুৎমিস, গিয়াসউদ্দীন বলবন।)

(গ) আকবর নূতন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। কারণ—

(১) তিনি নূতন ধর্ম প্রবর্তনের জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হন।

(২) তিনি ধর্মগুরু হতে চেয়েছিলেন।

(৩) তিনি মনে করতেন প্রচলিত ধর্মগুলি থেকে উত্তম অংশ বেছে নিয়ে নূতন ধর্ম সংস্থাপন করা উচিত।

৪। সঠিক সাজান অভীক্ষা (Matching Test)।

(i) এই অভীক্ষায় দুটি পাশাপাশি তালিকা-স্তম্ভ থাকে। তালিকাগুলি এলোমেলোভাবে সাজান। প্রথম তালিকায় কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য, বা শব্দ থাকে। দ্বিতীয় তালিকায় বাক্যাংশগুলিকে বা শব্দকে সম্পূর্ণ করা যায় এমন শব্দ বা বাক্যাংশ এলোমেলোভাবে সাজান থাকে। এগুলিকে ঠিকভাবে সাজিয়ে বা নম্বর উল্লেখ করে কোনটার সাথে কোনটার মিল তা দেখিয়ে দিতে হয়। যেমন—

	প্রথম তালিকা-স্তম্ভ	দ্বিতীয় তালিকা-স্তম্ভ
ক।	(১) দিল্লী	স্বর্ণ মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।
	(২) টাটানগর	উত্তর প্রদেশের রাজধানী।
	(৩) করাচী	এখানে ইস্পাত উৎপাদন হয়।
	(৪) অমৃতসর	ভারতের রাজধানী।
	(৫) লক্ষ্ণৌ	পাকিস্তানের বন্দর।
খ।	(১) বাবরের মৃত্যু	১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে।
	(২) গান্ধীজীর মৃত্যু	১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে।
	(৩) ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু	১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে।

(ii) অভীক্ষার্থীদের কাছে কতকগুলি তথ্য দেওয়া হয় এবং সময় হিসাবে, কিংবা গুরুত্ব হিসাবে কিংবা আকৃতি হিসাবে কিংবা অবস্থান হিসাবে সাজিয়ে দেওয়ার নির্দেশ তাদের দেওয়া হয়। যেমন—

সময়ানুপাতিক ভাবে সাজাও :

পলাশীর যুদ্ধ, পাণিপথের যুদ্ধ, গৌতম বুদ্ধের জন্ম, মুসলমানদের ভারত আক্রমণ, ফা-হিয়েনের ভারত আগমন।

আদর্শীকৃত পরিমাপ বা মাননির্ণীত অভীক্ষা (Standardised Test)।

কোন অভীক্ষা ত্রুটিশূন্য হবে যদি তার নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity),

যাথার্থ্য (Validity) এবং নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) থাকে। কিন্তু এই গুণগুলি থাকলেই যে অভীক্ষা নির্ভুল হবে এমন কথা জোর করে বলা চলে না।

ধরা যাক, অষ্টম শ্রেণীর জন্য একটি অভীক্ষা-পত্র তৈরি করা হল কিন্তু তার মান হয়েছে সপ্তম শ্রেণীর উপযুক্ত। বলা বাহুল্য যে পরীক্ষার্থীরা এই অভীক্ষা-পত্রের উত্তরে ভাল ফল দর্শাবে, হয়ত শতকরা ৮০ জনই ৮০ নম্বর পেয়ে গেল। কিন্তু প্রশ্নের মান যদি দশম শ্রেণীর উপযুক্ত করে তৈরি হয়, তাহলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রের মান নিজস্ব। তাই কোন একটি বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল দেখে একই শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক বিচার করা চলে না। পূর্বে কোনও স্থানে ৮০ তোলায় একসের দুধ, আবার কোনও স্থানে ১১০ তোলায় ১ সের দুধ, আবার কোনও স্থানে ১৪০ তোলায় একসের দুধ বিক্রি হত। সেরের মান কি সমান? মান নিশ্চয়ই একরকম নয়। তাই মান সর্বত্র এক রাখার জন্য ১০০০ গ্রামে ১ কিলোগ্রাম ওজন স্থির করা হয়েছে। এই পরিমাপটিই হচ্ছে আদর্শীকৃত বা Standardised।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি নৈর্ব্যক্তিকতা, যাথার্থ্য ও নির্ভরযোগ্যতা যেমন অভীক্ষা-পত্রের থাকবে, তেমনি থাকবে তার তুলনীয়তা ও সংখ্যা ব্যাখ্যান (Comparability and Interpretation)। অভীক্ষাটির ফলাফল যাতে উপযুক্তরূপে ব্যাখ্যান করা সম্ভব হয় এবং এক শিক্ষার্থীর অভীক্ষার ফলের সাথে অন্য শিক্ষার্থী অভীক্ষার ফল যাতে তুলনা করা যায়, সেই বৈশিষ্ট্যসমূহও অভীক্ষাতে থাকবে। এই কারণেই অভীক্ষার বিজ্ঞানসম্মত নর্ম বা মান থাকা অপরিহার্য।

সাধারণ বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় এবং বহিরানুষ্ঠিত সার্বিক পরীক্ষায় কোনও রূপ আদর্শায়িত মান নেই। কেউ পাচ্ছে ৩০, কেউ ৬০, আর কেউ বা পাচ্ছে ৯০। এ-সব নম্বরের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা নেই। বিদ্যালয়-ভেদে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ৩০,৩৬, ৪০ বা ৪৫ পরীক্ষার পাশ নম্বর ধরা হয়। আবার বিষয়ভেদেও পরীক্ষার পাশের নম্বরের তারতম্য ঘটে। ইংরেজীতে ও মাতৃভাষায় ৩৬ পেলে পাশ, কিন্তু গণিতে, বিজ্ঞানে, ইতিহাস বা ভূগোলে ৩০ পেলে পাশ। সার্বিক পরীক্ষারও তাই। এরূপভাবে পরীক্ষার পাশের

নম্বর স্থির করা যুক্তিভিত্তিক নয়। খেয়ালখুশী বা রীতি অনুযায়ীই এই নম্বর স্থির করা হয়। এর ফলে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যথার্থ তুলনা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। অস্পষ্টভাবে তুলনা করা চলে মাত্র।

এই কারণে অভীক্ষা-পত্রের এমন একটি নর্ম (Norm) বা মান থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোরের সঙ্গে এই মানের বা Norm-এর সাথে তুলনা করলে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত-স্কোরের যথার্থ ব্যাখ্যা করা চলতে পারে এবং শিক্ষার্থী কোন স্তরে আছে তা বলতে পারা যায়। যে অভীক্ষাটির মান বা নর্ম থাকে তাকে আদর্শীকৃত পরিমাপ বা মাননির্ণীত অভীক্ষা বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ অষ্টম শ্রেণীর ভূগোলের একটি আদর্শীকৃত পরিমাপ বা মাননির্ণীত অভীক্ষা-পত্র তৈরি করা হল। পশ্চিমবাংলার অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োগ করার ফলে সাফল্যের মান বা নর্ম ঠিক করা হল। এরূপ মান নির্ণয় করার উপায় হল সকল অভীক্ষার্থীর স্কোরের যোগফলকে অভীক্ষার্থীদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। ধরা যাক সাফল্যের মান হচ্ছে ৪৫। যদি একজন শিক্ষার্থী ঐ অভীক্ষা-পত্রের উত্তরে ৪৩ পায়, তাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ বলতে পারি যে অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভূগোলের জ্ঞানের চাইতে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর জ্ঞান কিছুটা কম। কতটা কম হল তা আধুনিক পরিসংখ্যান (Statistics)-এর সাহায্যে বলা চলে।

কিন্তু যে প্রক্রিয়া দ্বারা নর্ম বা মান স্থিরীকৃত হয়েছে, তা বাস্তবে সম্ভব নয়। অর্থাৎ অভীক্ষা-পত্রটি অষ্টম শ্রেণীর সমস্ত শিক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করে স্কোর বের করা অসম্ভব। তাই অষ্টম শ্রেণীর বাছাই করা দলের বা Sample group-এর উপর অভীক্ষা-প্রয়োগ করা চলতে পারে এবং তাদের প্রাপ্ত স্কোর থেকে নর্ম বা মান নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু দৃষ্টি রাখতে হবে যে বাছাই দলটিতে যেন সমস্ত দলের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে। অর্থাৎ পিতা-মাতার সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, স্কুলে শিক্ষার মান, পরিবেশ ইত্যাদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার্থী যেন বাছাই করা দলে প্রতিনিধিত্ব করে। অভীক্ষার নির্ভুলতা প্রকৃতপক্ষে বাছাই করা প্রক্রিয়াটির উপর বেশি নির্ভর করে।

মাননির্ণীত অভীক্ষা বা আদর্শীকৃত পরিমাপ রচনা করবার জন্ত পরপৃষ্ঠায়লিখিত পন্থা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়।

(ক) প্রথম পর্যায়ে শ্রেণী অনুযায়ী অভীক্ষার প্রশ্নপত্রসমূহ রচনা করতে হবে। যা প্রয়োজন তার চাইতে দ্বিগুণ করে প্রশ্নপত্রগুলি রচনা করা দরকার।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি বাছাই করা দলের উপর অভীক্ষা-পত্রটি প্রয়োগ করতে হবে। উত্তরের ধারা দেখেই বুঝতে পারা যাবে, কতকগুলি প্রশ্ন ত্রুটিপূর্ণ। সেগুলিকে বাদ দিতে হবে।

(গ) এবারে ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্নগুলিকে বাদ দিয়ে নূতন করে অভীক্ষা-পত্র রচনা করে যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব করছে এমন সব দলের উপর তা প্রয়োগ করে অভীক্ষাটির মান বা নর্ম নির্ণয় করতে হবে।

(ঘ) চতুর্থ স্তরে অভীক্ষা-পত্রটির যাথার্থ্য (Validity) ও নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) পরিসংখ্যান (statistics) পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করে অভীক্ষা-পত্রটির মান বা নর্ম নির্ণয় করতে হবে।

আদর্শীকৃত পরিমাপ বা মান নির্ণীত অভীক্ষা (Standardised Tests) কোন একটি শ্রেণীর বহু অভীক্ষার প্রয়োগসিদ্ধ আদর্শ পরিমাপক বলে। এই অভীক্ষা-পত্র দ্বারা অভীক্ষার্থীর উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা বিচার করা সাফল্যের সাথে করা সম্ভব।

আধুনিক অভীক্ষার সুবিধা।

আধুনিক অভীক্ষার নানারকম সুবিধা আছে। এর মধ্যে যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান সেগুলি আমরা পূর্বেই জেনেছি। এর মধ্যে আছে নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity), নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) যাথার্থ্য (Validity), সংখ্যাব্যাখ্যান ও তুলনীয়তা (Interpretation and Comparability), পরিমিততা (Economy) ও প্রয়োগশীলতা (Administrability)। এই সব বৈশিষ্ট্য ও গুণ থাকার জন্য আধুনিক অভীক্ষাগুলি সঠিক পরিমাপক হিসাবে দাবী করতে পারে। এছাড়া আধুনিক অভীক্ষার আরও কতকগুলি গুণ আছে।

আধুনিক অভীক্ষার বিভিন্ন গুণ আছে বলেই এর সুবিধা। সুবিধাগুলি নিম্নরূপ :—

১। বৃহৎ পাঠ্যসূচীর মধ্যে যদি অনেকগুলি ছোট ছোট প্রশ্ন ছড়িয়ে থাকে তবে ঐগুলি বিষয়বস্তুর পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাতে বাছাই (Sampling) করা প্রক্রিয়াটির বেশি সুযোগ থাকায় আধুনিক অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতাও বেশি।

২। নূতন অভীক্ষায় সঠিক উত্তর মাত্র একটি এবং স্কোর বা নম্বর দানে কোন অসুবিধা নেই। নম্বর দানের মান নির্দিষ্ট থাকায় নম্বর দানে অপেক্ষাকৃত কম সময় ও কম শ্রম ব্যয়িত হবে। এতে রচনাধর্মী পরীক্ষার ব্যাক্তমূখী অসুবিধা দূরীভূত হয়। শিক্ষকের ব্যক্তিমুখী মনের অবস্থা যাই হোক না কেন, নম্বরের কোনও ব্যতিক্রম হবে না।

৩। সিমণ্ডস ও রিনসল্যাণ্ড (Symonds and Rinsland) বলেন যে শিক্ষার্থীরা নূতন অভীক্ষা পছন্দ করে কারণ তারা দেখতে পায় যে শিক্ষক তাঁর প্রিয় শিক্ষার্থীদের বেশী নম্বর দিতে সুযোগ পান না, সকলেই নিজ নিজ কৃতিত্ব অনুযায়ী নম্বর পেয়ে থাকে।

৪। অপ্রাসাঙ্গক কোন বিষয় নূতন অভীক্ষাতে প্রবেশ করতে পারে না। প্রশ্নগুলি এমনিভাবে সজ্জিত থাকে যে লেখা বা রচনার কাজ খুবই স্বল্প থাকে, ফলে রচনাশৈলী, হাতের লেখা, লিখনের ধীরতা, লিখনের অস্পষ্টতা ইত্যাদি যে-সব ত্রুটি নম্বর-দানকে প্রভাবান্বিত করে, তা নূতন অভীক্ষায় দেখা যায় না।

৫। যেহেতু নূতন অভীক্ষায় লিখতে হয় কম, সেইহেতু পরীক্ষার্থীরা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নগুলির উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা করতে সুযোগ পায়। একজন শিক্ষাবিদ বলেন, "Because the time element is reduced, a greater number of items can be tested. This is a decided advantage, since the greater number of items covered, the greater the validity of tests।"

(৬) এই অভীক্ষায় যে জিনিস পরীক্ষার অন্তর্গত করতে চায় সে জিনিসই এর ফলে পরিমাপ সম্ভব। অর্থাৎ এর যাথার্থ্য (Validity) আছে।

(৭) এই অভীক্ষার ফলে ফলাফল সহজেই তুলনা করা চলে।

(৮) আধুনিক অভীক্ষাসমূহে নির্দেশ সঠিক ও স্পষ্ট থাকায় পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তর-পত্র লিখনে কোনও অসুবিধা হয় না।

আধুনিক অভীক্ষার ত্রুটি (Defects of New type Tests)।

আধুনিক অভীক্ষাসমূহের গুণ অনেকগুলি আছে বটে, কিন্তু এরা মোটেই

ত্রুটিমুক্ত নয়। কিছু কিছু ত্রুটি আছে বলেই এই নূতন অভীক্ষাসমূহ পূর্ণাঙ্গ পরিমাপ মাধ্যম হয়ে ওঠে নি।

১। আধুনিক অভীক্ষাপত্র রচনা করতে বহু সময় ব্যয় হয় এবং তা ছাপান ব্যয়-সাপেক্ষও বটে।

২। এই আধুনিক অভীক্ষাসমূহ তৈরি করবার কলাকৌশলও জানতে হয়। সকল শিক্ষকই এই অভীক্ষা-পত্র প্রণয়ন করতে পারেন না। তাই সকল বিদ্যালয়ে এর পরিচালনা সম্ভব নয়।

৩। আধুনিক অভীক্ষার শিক্ষার্থীরা অনেক সময় অনুমান করে উত্তর দেয়, জেনে উত্তর দেয় না। অনুমানের উপর নির্ভর করে উত্তর দেবার ফলে অনেক সময় প্রশ্নের উত্তর ঠিক হয়ে যায়। এটি একটি বড় রকমের ত্রুটি।

৪। এই অভীক্ষায় শুধু ঘটনামূলক জ্ঞানের পরিমাপ হয়। কোন জিনিসের রসানুভূতি বা চিন্তার ধারা এই অভীক্ষার ফলে বুঝতে পারা যায় না।

৫। অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে এই নূতন অভীক্ষাসমূহেও ব্যক্তিকতার প্রভাব দেখা যায়। নম্বর দেওয়ার সময় ব্যক্তিকতার প্রভাব দেখা যায় না বটে, দেখা যায় অভীক্ষার প্রশ্নগুলির রচনা করবার সময়।

৬। আধুনিক অভীক্ষার বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে, এর মধ্যে শিক্ষার্থীর রচনাশৈলী প্রকাশ করবার মত সুযোগ নাই। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা শুধু বিষয়জ্ঞান প্রকাশ করতে সক্ষম, কিন্তু বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যান এবং মৌলিকত্ব প্রদর্শন করতে পারে না।

৭। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা-পত্রে সত্য-মিথ্যা বিচারের ক্ষেত্রে মিথ্যা ঘটনার উল্লেখ শিক্ষার্থীদের গ্রহণোন্মুখ মনের কাছে উপস্থাপন করা মনস্তত্ত্ব-বিরোধী।

৮। আধুনিক অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নগুলি ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রশ্নের সংগঠন অনুযায়ী উত্তর দিতে হলে বিষয় সম্পর্কিত উত্তর জানা ছাড়া অভীক্ষার নির্দেশ ও সংগঠন প্রণালী প্রভৃতি অন্যান্য মানসিক শক্তির প্রয়োগ করারও প্রয়োজন। সংগঠনের অভিনবত্ব থেকেই এই ত্রুটির জন্ম নিয়েছে। অভীক্ষার্থীকে যদি আগে থেকেই নূতন অভীক্ষার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত করে দেওয়া যায় তাহলে এই ত্রুটির প্রভাব কমে আসবে।

রচনাধর্মী পরীক্ষার সুবিধা এবং রচনাধর্মী পরীক্ষার উন্নীতকরণ (Merits of the Essay type Tests and Improvement of these Tests)।

রচনাধর্মী পরীক্ষার ব্যবস্থা বহুকাল ধরে চলে এসেছে। এর সুবিধা নিশ্চয়ই কিছুটা আছে। সেই সুবিধাগুলি আলোচনা করে, এর উন্নীতকরণ কতটা সম্ভব সে সম্বন্ধে কিছুটা সুপারিশ করা যেতে পারে।

১। রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুটিকে নিজের ধারণা অনুযায়ী সাজিয়ে গুছিয়ে লিখবার সুবিধা পায়, তাদের আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

২। রচনাধর্মী পরীক্ষাব্যবস্থা দ্বারা শিক্ষার্থীরা কতটুকু বিষয়বস্তু অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাঙ্গীকৃত করে হজম করতে পেরেছে তা বুঝতে পারা যায়।

৩। এই পরীক্ষার দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বৈশিষ্ট্য, যথা—বিচারশক্তি, কল্পনাশক্তি, মৌলিকত্ব ইত্যাদি বুঝতে পারা সম্ভব।

৪। এই পরীক্ষাদ্বারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিতার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

রচনাধর্মী পরীক্ষার নানা ত্রুটি সম্বন্ধে পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। সেসব কথা বাদ দিলেও এর সুবিধার দিকটা আমরা একেবারে অবহেলা করতে পারি না। তাছাড়া আধুনিক অভীক্ষা পদ্ধতিতে যখন ত্রুটি রয়েছে তখন যথার্থ পরিমাপের জন্য আমাদের রচনাধর্মী পরীক্ষা ও আধুনিক অভীক্ষার একটা মাঝামাঝি পথ (via-media) বেছে নেওয়াই কর্তব্য। রচনাধর্মী পরীক্ষার উন্নীতকরণের প্রচেষ্টায় আধুনিক অভীক্ষার উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করলে আমাদের উদ্দেশ্য হয়ত সফল হবে। কি উপায় অবলম্বন করে আমরা সেই পথে চলতে পারি, তার কয়েকটি সুপারিশ এখানে রাখা গেল।

১। উত্তম অভীক্ষার মান নির্ণয়ক হচ্ছে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত সমস্ত বিষয় প্রতিনিধিত্ব করে এমন সব প্রশ্নাবলী। কিন্তু রচনাধর্মী প্রশ্নে এত বেশি সংখ্যক প্রশ্নের সুযোগ নেই। অতএব এক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাকে কিছু স্থান দিয়ে প্রশ্নের সংখ্যাকে বর্ধিত করতে হবে।

২। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে ছোট ছোট আলোচনা-সমূহের প্রশ্ন, যার উত্তর নির্দিষ্ট করে চাওয়া হয়, সেগুলির নির্ভরযোগ্যতাই বেশি। কিন্তু প্রশ্নগুলি যদি অস্পষ্ট ধরণের হয়, তাহলে পরীক্ষার্থীরা কল্পনাবশে যথেষ্ট এলোমেলো উত্তর লিখবে। অস্পষ্ট ধরণের প্রশ্ন পরীক্ষার্থীদের কাছে

প্রিয় বটে, কিন্তু এর নির্ভরযোগ্যতার দিক হতে গুরুত্ব অনেক কম। অতএব অস্পষ্ট প্রশ্ন বর্জনীয়।

৩। প্রশ্নগুলির মধ্যে একটির সাথে অন্যটির তথ্যগত সামঞ্জস্য থাকবে না, কারণ একই তথ্য দুবার লিখতে হবে।

৪। প্রশ্নের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু শিক্ষার্থীদের উত্তরদানে কতটা সময় লাগবে, তা বিবেচনা করে প্রশ্নগুলি সন্নিবেশিত করতে হবে।

৫। প্রশ্নগুলি সহজ এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রচিত হবে।

৬। প্রশ্নের উত্তরের নম্বর কিভাবে দেওয়া হবে তার জন্য পরিকল্পনা পূর্বেই করে নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে সার্বিক পরীক্ষায় যেখানে অনেক পরীক্ষক একই প্রশ্নের বহুসংখ্যক উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন, সেখানে একই ধরণের নম্বরদান বাঞ্ছনীয় বলে নম্বরদানের একটি নীতিগত পরিকল্পনা রচনা অবশ্য কর্তব্য। পরিকল্পনার মধ্যে প্রশ্নে কি কি চাওয়া হয়েছে, তার পূর্ণ বিশ্লেষণ ও প্রত্যেকটি সংশ্লিষ্ট অংশের জন্য কিভাবে নম্বরদান করা হবে তার ইঙ্গিত থাকবে, তবেই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নম্বরদানের ক্ষেত্রে সমতা দেখা যাবে।

৭। রচনামূলক উত্তর পরীক্ষা করার সময় পরীক্ষক সমস্ত পরীক্ষার্থীর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আলাদা করে দেখে নেবেন, তাহলে তাঁর নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারনা জন্মাবে। তখন নম্বর দেওয়াও সহজ হবে।

৮। উত্তরের মান নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা-পত্রে সংখ্যাবাচক মূল্য না দিয়ে চিহ্নবাচক মূল্য যথা A, B, C, D, E ইত্যাদি দেওয়া উচিত। A হচ্ছে খুব ভাল, B হচ্ছে ভাল, C হচ্ছে সাধারণ, D হচ্ছে খারাপ, E হচ্ছে খুব খারাপ। এভাবে প্রশ্নের উত্তরগুলি শ্রেণীবিভাগ করে, পরে প্রয়োজন হলে সংখ্যায় পরিণত করা যায়। A হচ্ছে 70, B হচ্ছে 60, C হচ্ছে 50, D হচ্ছে 40, E হচ্ছে 30। এগুলিতে একই শ্রেণীর উত্তরের মধ্যে যদি পার্থক্য দেখা যায় তবে A+, AA+, A A−, B+A−, B+, BB+, B, ইত্যাদি করে আরও নির্দিষ্ট করে নম্বরের উল্লেখ করা যায়।

সার্বিক এবং বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষার ত্রুটি (Defects of the Public and External Examinations)।

যে পরীক্ষাদ্বারা বহু বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাফল্যের

পরিমাপ করা হয়ে থাকে, তাকে সার্বিক পরীক্ষা Public Examination বলা হয়। আর দ্বিতীয়তঃ যেস্থলে কোন বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাফল্য নিরূপনের জন্য কর্তৃপক্ষ বাইরের কোন শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানান, তখন হয় তা External Examination বা বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষা।

সার্বিক পরীক্ষাব্যবস্থা পৃথিবীর সব দেশেই প্রায় প্রচলিত। কিন্তু এ ব্যবস্থা নানা দিক হতে ত্রুটিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও এটি একটি প্রয়োজনীয় কুপ্রথা (a necessary evil) হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

সার্বিক পরীক্ষা সাধারণতঃ রচনাধর্মী, তাই রচনাধর্মী পরীক্ষার সব ত্রুটি এর মধ্যে বর্তমান, অর্থাৎ এতে রয়েছে—

(১) নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব।

(২) যাথার্থ্যের অভাব।

(৩) নির্ভরযোগ্যতার অভাব।

(৪) তুলনীয়তা ও সংব্যাখ্যানের অভাব।

(৫) পরিমততার অভাব।

(৬) প্রয়োগশীলতার অভাব।

এছাড়াও পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির মধ্যে আরও যেসব ত্রুটি আছে তাও সার্বিক পরীক্ষায় রয়েছে। যথা—

(৭) পরীক্ষার প্রশ্নে দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহৃত হয় বলে পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিতে সঠিক পথ খুঁজে পায় না।

(৮) পাঠ্যসূচী বৃহৎ, কিন্তু পরীক্ষার অন্তর্গত প্রশ্নগুলি যথেষ্ট নয়।

(৯) শিক্ষার সামগ্রিক রূপ এবং আদর্শ সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে পরীক্ষা পদ্ধতি অসম্পূর্ণ।

(১০) পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতা সম্পর্কিত কারণ উদ্ঘাটনের যোগ্যতা সার্বিক পরীক্ষায় নেই।

(১১) সার্বিক পরীক্ষার প্রশ্নগুলির আগ্রহ উদ্দীপনের ক্ষমতা নেই।

(১২) সার্বিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা অর্জন করবার মত সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যর দিকে লক্ষ্যীভূত হয়, তার ফলে শিক্ষার্থীরা সত্যিকার শিক্ষাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে না, পার্থিব সাফল্যটাই তাদের কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায়।

(১৩) পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মধ্যে সার্বিক পরীক্ষার কোনরূপ যোগাযোগ নেই। ফলে পরীক্ষার্থীর মনে ভীতির সঞ্চার হয়।

(১৪) ত্রুটিযুক্ত প্রশ্ন রচনার ফলে বিষয়বস্তুকে বিকৃত করে তোলা হয়।

(১৫) সার্বিক পরীক্ষার ফলে পরীক্ষার্থীদের মনের উপর খুবই চাপ পড়ে এবং চাপের ফলে তারা মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য উভয়ই হারিয়ে ফেলে।

(১৬) সর্বশেষ বলা যেতে পারে সার্বিক পরীক্ষা পাঠ্যক্রমকে প্রভাবান্বিত করছে, পাঠ্যক্রমকে অনুসরণ করে পরীক্ষা গ্রহণ হচ্ছে না।

সার্বিক পরীক্ষার মত বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষার ত্রুটিসমূহও একই ধরণের।

পরীক্ষার ত্রুটিগুলির সংস্কারের উপায় (Reforms of the Present Examination System)।

১। বহিস্থ: (External) পরীক্ষা যথাসম্ভব কমাতে হবে।

২। রচনাধর্মী পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের আধিক্য দ্বারা প্রশ্নের ধরণ পরিবর্তন করে ব্যক্তিকতা-ধর্মিতা খর্ব করতে হবে।

৩। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি জানবার জন্য এবং তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবার জন্য বিদ্যালয়ে উপযুক্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

৪। বিদ্যালয়ে বৎসর শেষে সর্বশেষ মূল্যায়নকালে শিক্ষার্থীর অন্তঃস্থ পরীক্ষার ফল এবং তার কাজের রেকর্ড বিবেচনা করে দেখতে হবে।

(৫) মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে একটিমাত্র সার্বিক পরীক্ষা হবে।

(৬) উত্তরের মান নির্ণয়ের জন্য সংখ্যাবাচক মূল্য না দিয়ে উত্তরপত্রের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করে চিহ্নবাচক মূল্য A, B, C, D, E দেওয়া প্রয়োজন। A হচ্ছে খুব ভাল, B হচ্ছে ভাল, C হচ্ছে মাঝারি, D হচ্ছে খারাপ, এবং E হচ্ছে খুব খারাপ।

(৭) শিক্ষার্থীকে যে পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে তাতে বিদ্যালয়ের অন্তঃস্থ পরীক্ষায় শিক্ষার্থী যে সব নম্বর পেয়েছে তা লিপিবদ্ধ থাকবে।

(৮) শেষ সার্বিক পরীক্ষায় কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা প্রথা চালু করতে হবে। যদি কোন শিক্ষার্থী একটি বা দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়, তাহলে তাকে পরে শুধু সেইসব বিষয়ে পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া হবে।

Norwood Committee পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে সুপারিশ করেছেন। তাতে অন্তঃস্থ পরীক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনও অন্তঃস্থ পরীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

কমিশন বলেছেন "In the final assessment of the pupils, due credit should be given to the internal tests and internal records of the pupils. Even the public examination need not be compulsory for all, that is, if pupils desire they need not be taken"। পরীক্ষা সংস্কারের দিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এবং নরউড কমিটির সুপারিশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবু এ ছাড়াও পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি সংকেত দেওয়া যেতে পারে।

(ক) **মাসিক পরীক্ষা**—শিক্ষার্থীর শিক্ষার প্রগতি বুঝবার জন্য মাসিক পরীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

(খ) **আদর্শীকৃত পরিমাপ**–মান নির্ণীত অভীক্ষা (Standardised Tests) পরীক্ষার ক্ষেত্রে চালু করলে পরীক্ষার মান সর্বত্র সমান হবে।

(গ) **মৌখিক পরীক্ষা**—লিখিত পরীক্ষার সাথে সাথে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন। মানসিক দৃষ্টিকোণ, বিশেষ আগ্রহ, প্রতিন্যাস প্রভৃতি মৌখিক পরীক্ষায় যতটা বুঝতে পারা যায়, ততটা লিখিত পরীক্ষা থেকে বুঝতে পারা যায় না।

(ঘ) **উপযুক্ত পরীক্ষক নিয়োগ**—উপযুক্ত পরীক্ষক নিয়োগ একটি সাংঘাতিক বড় সমস্যা। মানুষ সাধারণতঃ মনের বিশেষভাব বা খেয়াল-খুশীর ভৃত্য। সেই খেয়াল-খুশী অনেক সময় পাগলামিতে গিয়ে দাঁড়ায়। যেসব লোক নিজেকে সংযত করতে পারেন, তাঁরাই পরীক্ষক হবার মত উপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু এ ব্যবস্থা করতে গেলে গাঁ উজার হয়ে যাবে। একমাত্র পথ হচ্ছে পরীক্ষার উত্তর নির্দিষ্ট করা গেলে সেখানে আর কোন পরীক্ষকের নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে কম বেশি করার উপায় থাকবে না।

সর্বাত্মক পরিচয় লিপি (Cumulative Record Card)।

সর্বাত্মক পরিচয় লিপির স্বরূপ—বিদ্যালয়ে অন্তঃস্থ পরীক্ষা হয়ে থাকে—সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক, বাৎসরিকপরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর যথার্থ পরিচয় পাওয়া না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বাঙ্গীন বিকাশ, প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে পাওয়া যায় মোটে

বৌদ্ধিক বিকাশের দিক। শিক্ষার্থীর শুধু জ্ঞানমুখী পরিচয় এসব পরীক্ষা থেকে পাওয়া যায় বলে আমরা শিক্ষার্থীকে শুধু সীমাবদ্ধভাবে জানতে পারি। পরীক্ষার পরে পরীক্ষার ফলাফল অর্থাৎ পাঠের উন্নতিবিষয়ক প্রগতিপত্র (Progress Report) অভিভাবককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রগতিপত্র অভিভাবককে প্রেরণ করা আমাদের দেশে একটি প্রথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র। শিক্ষার্থীর সংশোধনী ব্যবস্থার কোনও সুযোগ এখানে নাই। তাছাড়া প্রগতিপত্র থেকে শিক্ষার্থী সম্বন্ধে আংশিক ধারণা হয় মাত্র।

বর্তমান প্রগতিশীল শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণভাবে জেনে তার শিক্ষাব্যবস্থা করা। কিন্তু শিক্ষার্থীর শুধু জ্ঞানমুখী পারদর্শিতার খবর জানাটাই শিক্ষার্থীর সবটুকু জানা নয়। শিক্ষার্থীকে গড়ে তুলতে হলে তার বিভিন্নমুখী শক্তি, আগ্রহ ও উৎকর্ষতার কথা আমাদের জানতে হবে। শিক্ষার্থীর দেহ, মন ও বুদ্ধির ধারাবাহিক বিকাশের বিবরণ যদি শিক্ষক না জানতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে শিক্ষার্থীকে সঠিক পথে পরিচালনা করা অসম্ভব। জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশই হচ্ছে শিক্ষা। এই বিকাশের ধারা আমাদের জানতে হবে। অতএব বিদ্যালয়ে থাকাকালীন শিক্ষার্থীর সকল রকমের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে তার পরিচয় লিপি শিক্ষকের সংরক্ষণ করতে হবে। যে পত্রে শিক্ষার্থীর পরিচয় লিপি রক্ষিত হয়ে থাকে তাকে 'সর্বাত্মক পরিচয় লিপি' বা Cumulative Record Card বলা হয়।

সর্বাত্মক পরিচয় লিপি রাখা সম্বন্ধে মুদালিয়র কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছেন। কমিশন বলেছেন যে বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রতিদিনকার, মাস থেকে মাসান্তরের, বিদ্যালয়ের একটি কার্যকাল হতে অন্য একটি কার্যকাল পর্যন্ত, বৎসর হতে আর এক বৎসর পর্যন্ত শিক্ষার্থীর কার্যকলাপের রেকর্ড রাখা অপরিহার্য। বিদ্যালয়ের এই রেকর্ডে শিক্ষার্থীর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক বৌদ্ধিক বিকাশের বিবরণী লিপিবদ্ধ থাকবে। তাছাড়া তার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত আগ্রহ, প্রবণতা, প্রতিন্যাস, সঙ্গতিবিধানের ক্ষমতা ইত্যাদি সব কিছুর পরিচয় তাতে লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ এই সর্বাত্মক পরিচয় লিপিতে

শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিচয় থাকবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই এই সর্বাত্মক লিপি সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয়।[১]

সর্বাত্মক পরিচয় লিপি প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত 'কেস ডাইরী'। ডাক্তার রোগী পরীক্ষা করার পর যেমন একটি 'কেস ডাইরী' রাখেন এও তাই। রোগীর 'কেস ডাইরী' রোগী দেখতে পায় না, ডাক্তার শুধু দেখেন এবং সেই অনুসারে চিকিৎসা করেন, তেমনি শিক্ষার্থী সর্বাত্মক পরিচয় লিপিও শিক্ষার্থীর দেবার কথা নয়। মনস্তত্ত্ববিদ শিক্ষক ঐ লিপি অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে যে ভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন মনে করেন, তা করে থাকেন। এই লিপি গোপনীয়। অভিভাবকের কাছে প্রগতিপত্র (Progress Report) পাঠাবার সময় সর্বাত্মক পরিচয় লিপি পাঠান হবে না। অভিভাবক দেখতে চাইলে নিজে বিদ্যালয়ে এসে গোপনে তা দেখতে পারেন মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদ ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য এবং নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন রেকর্ড কার্ড রাখার সুপারিশ করেছেন।

সর্বাত্মক পরিচয় লিপি রাখার উদ্দেশ্য।

সর্বাত্মক পরিচয় লিপির উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় জীবনের বিস্তৃততর বিবরণ অভিভাবকদের কাছে সরবরাহ নয়। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে তার জীবনের পথে চলাকালীন তার উপযোগী পথটি বাৎলে দেওয়া। শিক্ষার্থী বহুকাল বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করেছে, অতএব সে কিভাবে তৈরি হয়ে কোন পথের সন্ধানী হতে পেরেছে, তা বুঝে নিয়ে শিক্ষককে সেই অনুযায়ী নির্দেশ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে সমাজ থেকে শিক্ষার্থী এসেছে বিদ্যালয়ে। অতএব শিক্ষার্থীর মঙ্গলামঙ্গলের জন্য

১। Mudalior Commission: "For this purpose a proper system of school records should be maintained for every pupil indicating the work done by him in the school from day to day, month to month, term to term, year to year. Such a school record will present a clear and continuous statement of the attainment of the child in different intellectual pursuits throughout the successive stages of education. It will also contain a progressive evaluation of development in other directions of no less importance such as the growth of interest, attitudes and personality traits, his social adjustment, the practical and social activities in which he takes part. In other words it will give a complete career, such records should be a common feature all over the country."

পথনির্দেশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষকের। শিক্ষক শিক্ষার্থীর এই ক্রমবর্ধমান সঞ্চয়মূলক রেকর্ড কার্ড দেখে শিক্ষার্থীকে পথনির্দেশ দেবেন।[১]

এছাড়া সর্বাত্মক পরিচয় লিপির আরও উদ্দেশ্য আছে। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ—সব দিক থেকে অভিযোগ এলেও সার্বিক পরীক্ষাকে একেবারে বাতিল করে দেওয়া অসম্ভব। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন সার্বিক পরীক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে অন্য কোন ভাবে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার পরিমাপ করা যায় কিনা সেদিক থেকে চিন্তা করেছেন। যদি সর্বাত্মক পরিচয় লিপির মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ পরিমাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তাহলে সার্বিক পরীক্ষার গুরুত্ব কিছুটা কমিয়ে সর্বাত্মক পরিচয় লিপির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর সাফল্যের ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে। সর্বাত্মক পরিচয় লিপি বহু পরিমাপের সমষ্টি, তাই এর গুরুত্ব সার্বিক পরীক্ষার চাইতে বেশি এবং অধিক নির্ভরযোগ্য। তাই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফলাফল সর্বাত্মক পরিচয় লিপির ভিত্তিতে গ্রহণ করলে তা একান্ত নির্ভরযোগ্য হতে পারে। সর্বাত্মক পরিচয় লিপি সংরক্ষণ যদি ত্রুটিশূন্য হয় তাহলেই এক সময়ে তারই ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল নির্ণীত হতে পারবে।

তৃতীয়তঃ, সর্বাত্মক পরিচয় লিপি সংরক্ষণ করলে শিক্ষার্থীর ত্রুটি-বিচ্যুতি, উন্নতি অবনতির খোঁজ পাওয়া যেতে পারে এবং তার অন্তর্নিহিত কারণেরও সন্ধান মিলবে।

চতুর্থতঃ, সর্বাত্মক পরিচয় লিপি যেমন শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে চলার পথে সাহায্য করবে, তেমনি তাকে দেবে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে বৃত্তি নির্বাচনে তাকে যেমন সাহায্য করবে, তেমনি তাকে উপযুক্ত পথ নির্দেশ দেবে।

সর্বাত্মক পরিচয় লিপি ত্রুটিমুক্ত করতে হলে প্রধানতঃ চাই শিক্ষকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী। এটা যদি পক্ষপাত দুষ্ট হয়, তাহলে এর সামগ্রিক গঠনটিই ভেঙ্গে পড়বে।

সর্বাত্মক পরিচয় লিপির বিষয়বস্তু।

সর্বাত্মক পরিচয় লিপিতে শুধু বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল লেখা থাকবে না,

১। C. M. Flemming: The record card is not intended to increase the school's control over the life history of the pupils. It is planned to render more skilful advice which teaches by virtue of their office, find themselves invited to give to pupils or their parents and the dividing of the ways when crucial decisions require to be made.

থাকবে শিক্ষার্থীর যাবতীয় পরিচয়। আগ্রহ, ঔৎসুক্য, প্রতিন্যাস, প্রবণতা, রুচি, সৌখিনতা, খেয়াল, নৈতিক মান, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ সবই সর্বাত্মক পরিচয় লিপিতে লিপিবদ্ধ থাকবে।

ব্যক্তিগত বৈষম্যকে গুরুত্ব দিয়ে এবং স্বীকার করে যদি আমরা শিক্ষার্থীর বিকাশে সাহায্য করতে অগ্রসর হই, তাহলে শিক্ষার্থীর সকল রকমের পরিচয়, তার উন্নতি অবনতির হিসাব,—সব এই সর্বাত্মক পরিচয় লিপিতে থাকতে হবে। সর্বাত্মক পরিচয় লিখিতে থাকবে—

(ক) **পারিবারিক পরিচয়**—এতে থাকবে শিক্ষার্থীর নাম, বয়স জন্ম তারিখ, বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার তারিখ। তারপর থাকবে অভিভাবকদের পরিচয়, তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি।

(খ) **স্বাস্থ্যের পরিচয়**—শিক্ষার্থীর দৈহিক ওজন, উচ্চতা, কোন অসুখে ভুগেছে কিনা ইত্যাদি ও সাধারণ স্বাস্থ্যের ইতিবৃত্ত পরিচয় লিপিতে থাকবে।

(গ) **পাঠোন্নতির বিবরণ**—বিভিন্ন অন্তঃস্থ পরীক্ষায় শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছে, তা লেখা থাকবে।

(ঘ) **সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের বিবরণ**—সভা, সম্মেলন, কৃষ্টিমূলক কাজ, সামাজিক ও বিনোদনমূলক কাজ, যৌথ উদ্যোগ, সমাজ সেবামূলক কার্যাবলী, বিদ্যালয় স্বায়ত্বশাসনে অংশগ্রহণ, খেলাধূলা, শরীরচর্চা ইত্যাদির বিবরণী সর্বাত্মক পরিচয় লিপিতে সংরক্ষিত থাকবে।

(ঙ) **কারু ও চারুশিল্প প্রবণতার পরিচয়**—শিক্ষার্থীর কাজে হাতে-কলমে দক্ষতা, চারুশিল্পের প্রতি আগ্রহ ও প্রবণতা সবই পরিচয় লিপিতে থাকবে।

(চ) **ব্যক্তিত্বের পরিচয়**—শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কাজে উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রবণতা, প্রক্ষোভ, নেতৃত্ব ইত্যাদির পরিচয়ও পরিচয় লিপিতে থাকবে।

সর্বাত্মক পরিচয় লিপির নমুনা।

(১) **পারিবারিক পরিচয়।**

শিক্ষার্থীর নাম.......................... বয়স..............................

পিতার নাম.......................... অভিভাবকের নাম.......

স্থায়ী ঠিকানা.......................

পিতামাতার কোন্ সন্তান.......

পারিবারিক ইতিহাস...............

বিদ্যালয় পরিবর্তনের তারিখ....

(২) স্বাস্থ্যের পরিচয়।

ওজন............................ উচ্চতা......................

বক্ষ স্ফীত............................ বক্ষ সঙ্কুচিত..................

কোন অসুখে ভুগেছে কিনা তার

ইতিহাস............................

বেশি রোগগ্রস্ত হয় কিনা........

চিকিৎসকের মন্তব্য........

(৩) পাঠোন্নতির বিবরণ।

বিভিন্ন বিষয়	১৯........		
	১ম টার্ম,	২য় টার্ম,	৩য় টার্ম
... ...	....	...	....
....	....	....	... .

(৪) সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর বিবরণ।

সভা, সম্মেলন ইত্যাদি	মন্তব্য
কৃষ্টিমূলক কাজ	,,
সামাজিক ও বিনোদনমূলক কাজ	,,
যৌথ উদ্যোগ	,,
বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনে অংশগ্রহণ	,,
খেলাধূলা, শরীরচর্চা ইত্যাদি	,,

(৫) কারু ও চারুশিল্পে প্রবণতা।

কারু শিল্পে ঃ

কোন্ জাতীয় কারুশিল্পে প্রবণতা আছে..........

কর্ম নৈপুণ্য কিরূপ.........

চারুশিল্পে ঃ

চিত্রকলা ....

সঙ্গীত...............

নৃত্য.................

বাদন................

অন্যান্য চারুশিল্প ....

(৬) ব্যক্তিত্বের পরিচয়।

পরিশ্রম…………

দায়িত্ববোধ…………

উৎসাহ…………

আত্মবিশ্বাস…………

আত্মমর্যাদাবোধ…………

(৭) সাধারণ মন্তব্য।

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	শ্রেণীশিক্ষকের স্বাক্ষর
তারিখ…………………	তারিখ…………………

পঞ্চদশ অধ্যায়
শিক্ষার্থীদের প্রগতি ও উচ্চশ্রেণীতে উন্নীতকরণ
(Pupil Progress and Promotion)

শিক্ষায় প্রগতির স্বরূপ।

শিক্ষার্থীরা বৎসরের প্রারম্ভে একটি শ্রেণীতে থাকে। তারা সারা বৎসর ধরে সেই শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। বিভিন্ন শিক্ষণপদ্ধতি অবলম্বন করে তাদের শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষার্থীরা শুধু শ্রেণীতে নয়, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থেকেও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে এবং সারা বৎসরে তারা নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম শেষ করে।

আমরা বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনাকালে দেখেছি যে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু উপলব্ধির জন্য নানা উপায় শিক্ষকেরা অবলম্বন করেন। শ্রেণীশিক্ষণের কাজে অসুবিধা দেখা যায়, ফলে ব্যক্তিবৈষম্যের নীতিকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তিমুখী শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়। সমগ্র শিক্ষার্থী সম্প্রদায়কে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিক্ষকের প্রচেষ্টার অন্ত থাকে না। কিন্তু তারা সকলেই বৎসরান্তে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হয় না।

উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত না হওয়ার কারণ একাধিক। শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু গ্রহণে পরাঙ্মুখ এই দোষারোপ দিলে শিক্ষকের দায়িত্ব শেষ হয় বটে, কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বলতে হয় যে, শিক্ষার্থীরাই যে এ বিষয়ে একান্ত দায়ী যে কথা বললে ভুল করা হবে।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় প্রগতি ব্যাহত হয় নানাভাবে।

১। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিবৈষম্য নীতির উপর নির্ভর করে শ্রেণী সংগঠন এবং সেই অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হলেও, প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে নূতনভাবে শ্রেণী সংগঠিত হয় না। বিশেষ করে যেখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা কম সেখানে নূতন করে শ্রেণী সংগঠনের কোন প্রশ্নই আসে না।

২। শ্রেণীতে তিন শ্রেণীর শিক্ষার্থী থাকে—সাধারণ, উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ও অনগ্রসর। তিন স্তরের দিকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাদান করতে পারেন এমন শিক্ষক খুবই কম। তাই গতানুগতিকভাবে শিক্ষকগণ সাধারণের দিকে দৃষ্টি দিয়ে

শিক্ষাদান করে থাকেন, ফলে উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ও অনগ্রসর শিক্ষার্থী সম্প্রদায় অবহেলিত হয়ে থাকে। এইভাবে শিক্ষার প্রগতি কিছু সংখ্যা শিক্ষার্থীর পক্ষে ব্যাহত হয়।

৩। বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে অব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের প্রগতি আরও পেছন দিকে সরিয়ে দিচ্ছে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে পড়বার বিশেষ সুযোগ পায় না, কারণ পরিবেশগত উচ্ছৃঙ্খলতা।

৪। শিক্ষকগণের উদাসীনতা শিক্ষায় প্রগতিকে আরও ব্যাহত করছে। শিক্ষকগণ বর্তমান যুগস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে আছেন, অনেক সময় তাঁরা শ্রেণীর পাঠ্যসূচী শেষ করতে পারেন না। ফলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

৫। তত্ত্বগতভাবে শিক্ষকদের পদ্ধতিজ্ঞান আছে স্বীকার করে নিলেও প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশেও বহু শিক্ষক শিক্ষণপ্রাপ্ত নন। ফলে যে উপায় অবলম্বন করে শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হতে পারে সে প্রক্রিয়া তাঁদের জানা নেই। ইচ্ছা থাকলেও তাঁরা শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারেন না। ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

৬। কর্মকেন্দ্রিকতার অভাব আমাদের শিক্ষাকে আরও পঙ্গু করে রেখেছে। বিদ্যালয়ে শুধু তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়, হাতে-কলমে রূপায়িত করে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, সমাজায়িত শিক্ষারও ব্যবস্থা নেই। ফলে আনন্দ সঞ্চারী শিক্ষার অভাবে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ শিক্ষাক্ষেত্রে স্তিমিত হয়ে আসে।

এসব বিভিন্ন কারণের ফলে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা শিক্ষায় উন্নতির পথে যাচ্ছে না, যাচ্ছে অবনতির পথে। আমাদের দেশের শিক্ষার মান নিতান্তই নেমে গিয়েছে।

শ্রেণীতে উন্নীতকরণ বা প্রমোশনের প্রচলিত ব্যবস্থা।

বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীরা এক বৎসরকাল একটি শ্রেণীতে অতিবাহিত করে। বৎসরের শেষে তাদের পরীক্ষায় বসতে হয় এবং পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করেই শিক্ষার্থীকে হয় উচ্চশ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হয় বা সেই শ্রেণীতেই রাখা হয়।

বৎসরে আরও দুটি টার্মিনাল পরীক্ষার ব্যবস্থা কোন কোন বিদ্যালয়ে থাকে, কিন্তু প্রমোশনের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় বাৎসরিক শেষ

পরীক্ষার উপর। কোন শিক্ষার্থী যদি বাৎসরিক শেষ পরীক্ষা না দিতে পারে, তবে অবশ্য টার্মিনাল পরীক্ষার নম্বরসমূহ বিবেচনা করে দেখা হয়।

পরীক্ষাগুলিতে বিষয়গত পাশের মান নির্দিষ্ট থাকে এবং পরীক্ষায় পাশ করে প্রমোশন পেতে হলে সেই মান অনুযায়ী নম্বর পেতে হয়। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে শতকরা ৩৬ পেলে পাশ এবং অন্যান্য বিষয়ে শতকরা ৩০ পেলে পাশ। এর ব্যতিক্রমও আছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে শতকরা ৪৫ পেলে পাশ। অনেক বিদ্যালয়ে উচ্চশ্রেণীতে প্রমোশন পেতে হলে তাকে প্রত্যেকটি বিষয়ে পাশ করতে হয়। আবার কোন কোন বিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ, যথা—ইংরেজি সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য ও গণিত এই তিনটি বিষয়ে পাশ করলেই তাকে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীতকরণের কথা বিচার করে দেখা হয়।

কিন্তু প্রমোশনের এসব ব্যবস্থা আদর্শ ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা চলে না।

প্রমোশনের জন্য আদর্শ ব্যবস্থা।

আমরা জানি শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। তাই যদি হয় তাহলে শিক্ষার্থীর শ্রেণী উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে আমরা শুধু বৌদ্ধিক বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করব কেন? বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থী যে সব শিক্ষা পাচ্ছে তার সবেরই মূল্যায়ন করে দেখে তবে শিক্ষার্থী উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হতে পারবে কিনা তা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম পাঠ্যক্রম রচনার কথা উল্লেখ করেছি। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে, নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার 'ড্রাফট সিলেবাস' বের হয়। সেই সিলেবাসের ভূমিকায় শারীরিক সুস্থতা এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছিল যদি কোন শিক্ষার্থী বিষয়গত পরীক্ষায় খুব বেশী নম্বর পায় অথচ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি নেই, তাকে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করা হবে না। 'ড্রাফট সিলেবাসের' পরে প্রমোশন নীতির সেই কথার উল্লেখ আর দেখা যায় নি। কিন্তু কথাটার সত্যতা একেবারে ঝেড়ে ফেলা যায় না। যদি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশই আমাদের কাম্য হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর বিকাশের প্রত্যেকটি দিক, যথা—শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি দিকগুলিতে শিক্ষার্থী উপযুক্ত পারদর্শিতা লাভ করছে কিনা, তা আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে।

তাছাড়া সারা বৎসর ধরে শিক্ষার্থীর বিকাশ ভারসাম্য রক্ষা করে চলছে কিনা তাও শিক্ষককে দেখতে হবে। এই কারণেই শিক্ষার্থী সম্বন্ধে সর্বাত্মক পরিচয় লিপি সংরক্ষণ প্রয়োজন। ত্রুটিহীন সর্বাত্মক পরিচয় লিপি সংরক্ষিত হলে বিদ্যালয়ের অন্তঃপরীক্ষাও কমিয়ে আনা যেতে পারে।

বৌদ্ধিক বিকাশের মূল্যায়নের জন্য শুধু বাৎসরিক শেষ পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দিলে চলবে না। টার্মিনাল পরীক্ষা উঠিয়ে দিয়ে মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। এতে পরীক্ষার বিষয়, সময়, ইত্যাদি পূর্ব নির্ধারিত থাকবে না। থাকবে শুধু একটি নীতি—প্রতিমাসে একবার সব বিষয়গুলির মূল্যায়ন করে নিতে হবে। শ্রেণী শিক্ষণকালে শিক্ষক/শিক্ষিকা সেই বিষয়গত প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের লিখতে দিতে পারেন। পরীক্ষার প্রস্তুতি ও তৎজনিত পরীক্ষার ভীতি আর তাতে থাকবে না। শিক্ষার্থীরা যা পড়েছে তার উপরেই লিখতে সক্ষম হবে। এতে শিক্ষার্থীদের অমনোযোগী থেকে বিষয়বস্তু পরে শেখার অজুহাতে সরিয়ে রাখার আর সুবিধা থাকবে না।

ছুটিছাটা বাদ দিয়ে বৎসরে প্রায় ৬টি/৭টি এরূপ পরীক্ষা চলতে পারে। পরীক্ষার নম্বরগুলিকে ৫০ এর মধ্যে রূপান্তরিত করে রাখা চলবে। আর বাকী ৫০ এর উপর শিক্ষার্থীরা বাৎসরিক শেষ পরীক্ষায় উত্তর লিখবে। পাশ ফেল নির্ণীত হবে মাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষার সমন্বয়ে।

বলা বাহুল্য মাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ শুধু রচনাধর্মী বা নৈর্ব্যক্তিক হবে না। উভয়ের সংমিশ্রণে রচিত হবে। প্রশ্নগুলি যেন সারা পাঠ্যসূচীকে ভালভাবে প্রতিনিধিত্ব করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সর্বাত্মক পরিচয় লিপি এবং মাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের প্রমোশন দিলে, প্রমোশন বেশি নির্ভরযোগ্য হবে।

———

ষোড়শ অধ্যায়

শিক্ষাদান পারদর্শিতার মূল্যায়ন

(Measurement of Teaching Efficiency)

শিক্ষক শ্রেণীতে শিক্ষাদান করেন, কিন্তু সেই শিক্ষাদান সত্যি সত্যি শিক্ষার্থীদের পক্ষে সুফলপ্রসূ হল কিনা তা বোঝা যাবে কেমন করে? কোন শিক্ষক হয়ত সুন্দর ভাষায়, সুললিত কণ্ঠে, বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশন করে গেলেন। শিক্ষকের বলার ভঙ্গী হয়ত শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করল, তারা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকের কথা শুনল। এতেই কি বোঝা গেল, শিক্ষক উপযুক্তভাবে শিক্ষাদান করেছেন? না নিশ্চয়ই নয়।

"Taste of pudding is in its eating", পিঠের স্বাদ সেটি খাওয়ার উপরই নির্ভর করে। অর্থাৎ পিঠে খেয়ে তৃপ্তি পাওয়া গেলেই পিঠেটি ভাল বলতে হবে। শিক্ষাদান ক্ষেত্রেও তাই। যদি শিক্ষাদান শিক্ষার্থীদের কাছে সত্যিকার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলাভের সহায়ক হয় তাহলেই পাঠদান ভাল হয়েছে বলা যেতে পারে। শিক্ষকের শুধু ভাষায় চাকচিক্য, সুরেলা কণ্ঠ, মধুর ব্যবহার শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে আকর্ষণ করতে পারে সত্য, কিন্তু যদি শিক্ষা উদ্দেশ্যহীন হয়, বিষয়বস্তুর একপেশে বিশ্লেষণ হয়, শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি হল কিনা তা যাচাই করবার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে পাঠদান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, একথা বলতে পারা যায় না।

পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠদান কৌশল সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। কিভাবে তা রূপায়িত হবে তাও আমরা জেনেছি। অতএব তারই ভিত্তিতে আমরা পাঠদান পারদর্শিতার একটি ছক কাটতে পারি।

প্রথমেই আমরা মোটামুটিভাবে পাঠদানকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে নিতে পারি—(১) জ্ঞানমূলক পাঠ, (২) নৈপুণ্যমূলক পাঠ ও (৩) রসানুভূতি-মূলক পাঠ।

এই তিন জাতীয় পাঠের মূল্যায়ন তিন ধরণের হবে।

জ্ঞানমূলক পাঠের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদিগকে জ্ঞানলাভে সহায়তা করা। নৈপুণ্যমূলক পাঠে শিক্ষার্থীদিগকে নৈপুণ্য অর্জনে সাহায্য করা এবং রসানুভূতিমূলক পাঠে শিক্ষার্থীদের রসের অনুভূতি লাভে সাহায্য করা।

এই তিন ধরণের পাঠটীকার ছক আমরা পূর্বেই জেনেছি। ঐ ছক অনুযায়ী যদি পাঠদান হয় তাহলে বলতে পারা যায় যে শিক্ষক পাঠদানে সাফল্যলাভ করেছেন এবং সেই সূত্রে শিক্ষকের পাঠদানের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে পাঠদানের মূল্যায়নও করা যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ আমরা জ্ঞানমূলক পাঠের সাহায্য গ্রহণ করে বিষয়বস্তুটি আরও পরিষ্কার করে উপস্থাপিত করতে পারি।

জ্ঞানমূলক পাঠে, পাঠের পরিকল্পনার সময় পাঠের একক যেমন লিখতে হয়, তেমনি সেই পাঠের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্যও জানা দরকার। এটি পাঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাঠের যদি উদ্দেশ্য স্পষ্ট না থাকে, তাহলে শিক্ষক পাঠদান করতে গিয়ে পাঠের কেন্দ্রবিন্দু হতে সরে যেতে পারেন।

পাঠদান সুরু করবার সময় শিক্ষক, প্রেষণা নীতির, সাহায্য নিচ্ছেন কিনা তা দেখতে হবে। শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়বস্তু গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্দীপিত হলেই তা তারা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষককে কতকগুলি প্রস্তুতিমূলক বা পূর্বজ্ঞান পরীক্ষামূলক প্রশ্ন করতে হয়। প্রশ্নগুলি সঠিক এবং যথার্থভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়নের সময় দেখা প্রয়োজন।

তারপর পাঠ-ঘোষণা, পাঠ-ঘোষণার পর শিক্ষক বিভিন্ন শীর্ষভাগ করে কিভাবে পড়াচ্ছেন তা দেখতে হবে। একঘেয়ে বর্ণনা কিংবা বর্ণনার সাথে সাথে দর্শননির্ভর শিক্ষোপকরণ প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধিতে সাহায্য করা হচ্ছে কিনা, শ্রেণীবিশেষে শীর্ষশেষে বা বর্ণনার মধ্যেই পরীক্ষামূলক প্রশ্ন (Testing Questions) করা হচ্ছে কিনা, কিংবা বিকাশমূলক প্রশ্ন (Developmental Questions) করা হচ্ছে কিনা তাও দেখতে হবে। প্রশ্নের বা উত্তরের কোন ত্রুটি আছে কিনা তা লক্ষ্য করে দেখা অপরিহার্য। বোর্ডের কাজ উপযুক্তভাবে হচ্ছে কিনা, বোর্ডের লেখা কিরূপ, ইত্যাদিও লক্ষ্যণীয়। শিক্ষকভেদে এসবের মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটে এবং মূল্যায়নের মধ্যেও বিভেদ ঘটে।

প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন (Recapitulatory Questions) করে শিক্ষক সমগ্র পাঠটির উপর ধারাবাহিক আলোচনা করছেন কিনা, শ্রেণীভেদে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় শিক্ষক বোর্ডে পাঠের সংক্ষিপ্তসার লিখছেন কিনা এবং শিক্ষার্থীদের তা লিখে নিতে নির্দেশ দিচ্ছেন কিনা তাও দেখতে হবে।

এরূপ অবস্থায় পাঠদান পারদর্শিতার মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত ছকে নম্বর দানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শিক্ষকের নাম—

(ক) শিক্ষকের ব্যক্তিতা	—	১০
(খ) পাঠটীকা	—	১০
(গ) পাঠদান কার্য	—	৫০
(ঘ) দর্শননির্ভর শিক্ষোপকরণ	—	১০
(ঙ) পাঠদানের ফলাফল	—	২০

শিক্ষকের পাঠদানের মূল্যায়ন যদি সংখ্যায় নিরূপণ করতে হয় তাহলে উপরে লিখিত নম্বর বিভাগ অনুযায়ী নূতন শিক্ষাব্রতীকে নম্বর দেওয়া চলে। আবার প্রয়োজন হলে চিহ্নবাচক মূল্যায়ন বা A, B, C, D, E দ্বারা মূল্যায়নও চলতে পারে।

শিক্ষাদান কার্যে নূতন শিক্ষাব্রতীর ব্যক্তিতা নিরূপণ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণের অবশ্য করণীয় কাজ। তার জন্য থাকবে ১০ নম্বর। শিক্ষকের চলা, বলার ভঙ্গী, সাহস, সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার মত দক্ষতা, স্থৈর্য, সহনশীলতা ইত্যাদি শিক্ষকের ব্যক্তিতার পরিচায়ক। পরিদর্শক, প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূতন শিক্ষাব্রতীকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার ব্যক্তিতার মূল্যায়ন করবেন।

সুষ্ঠু পাঠদানের আর একটি সহায়ক হচ্ছে পাঠটীকা। পাঠদান উপযুক্ত-ভাবে পরিকল্পিত হচ্ছে কিনা, উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে তা রচিত হয়েছে কিনা, তা দেখা পরিদর্শকের একান্ত কর্তব্য। এক্ষেত্রে নম্বর থাকবে ১০। পরিদর্শক বা প্রধান শিক্ষক বা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক, যিনি পাঠ পরিদর্শন করবেন তিনি ১০ নম্বরের মধ্যে নম্বর দেবেন বা চিহ্নসূচক নম্বরও দিতে পারেন।

পরের প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে পাঠদান কার্য। এর মধ্যে শিক্ষকের প্রেষণানীতি অবলম্বনে বর্ণনা, প্রশ্ন, দর্শননির্ভর শিক্ষোপকরণ দেখান ও বোর্ডের কাজ পড়বে। নম্বর থাকবে ৫০। পরিদর্শক নম্বর বিভাগ করে নৈর্ব্যক্তিকভাবে শিক্ষাব্রতীকে নম্বর দান করবেন।

দর্শননির্ভর শিক্ষোপকরণ পাঠদান কার্যে বিশেষ সহায়ক। এই শিক্ষোপকরণের মান নির্ণয় করে পরিদর্শক শিক্ষাব্রতীকে নম্বর দেবেন। এর নম্বর হচ্ছে ১০।

পূর্বেই বলা হয়েছে পাঠদানের সাফল্য নির্ভর করছে শিক্ষার্থীরা কতটা গ্রহণ করেছে তার উপর। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে হাত উঠান, বলার ভঙ্গী ইত্যাদি দেখেই বুঝতে পারা যাবে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে কিনা।

নৈপুণ্যমূলক পাঠদান ও রসানুভূতিমূলক পাঠদানের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও পরিদর্শক পূর্ববর্তী ছক অনুযায়ী ছক তৈরি করে নিতে পারেন। বলা বাহুল্য, বিশেষ পাঠের শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে ছক তৈরি করাই সঙ্গত।

শিক্ষাব্রতীদের আত্ম-মূল্যায়ন (Self Evaluation by the Teachers)।*

শিক্ষাব্রতী নিজের পাঠদানের নিজের মূল্যায়ন নিজে করবেন, আত্মসমালোচনা করবেন, তাহলেই পাঠদানগত পারদর্শিতা শিক্ষাব্রতীদের বৃদ্ধি পাবে।

নিম্নলিখিত প্রশ্নপত্র (Questionnaire) তৈরি করে শিক্ষাব্রতীরা আত্মমূল্যায়ন করতে পারেন।

(১) আমি কি পাঠের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে স্থির করে নিয়েছি?

(২) আমি কি প্রেষণানীতি গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদিগকে উদ্বুদ্ধ করেছি?

(৩) আমি কি নূতন পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সঞ্চার করতে পেরেছি?

(৪) আমি কি শিক্ষার্থীদের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন?

(৫) আমি কি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুন্দর নৈতিক অবস্থা প্রবর্তন করতে পেরেছি?

(৬) আমার নিজস্ব ব্যবহার কি গনতন্ত্রসম্মত এবং আমি কি গনতান্ত্রিক নীতি আমার শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থাপন করতে সচেষ্ট?

(৭) আমি কি উপযুক্ত ধরনের প্রশ্ন করেছি?

(৮) আমি কি শিক্ষার্থীদের উত্তর গ্রহণে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছি?

(৯) আমি কি উপযুক্ত দর্শননির্ভর ও শ্রুতিনির্ভর শিক্ষোপকরণ শিক্ষাদান কার্য শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করেছি?

(১০) আমি কি পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন করে বিষয়বস্তুটির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করেছি?

(১১) আমি কি শিক্ষার্থীদের প্রতি সুসম ব্যবহার করি?

(১২) আমি কি শিক্ষার্থীদের চাহিদা জেনে তাদের সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছি?

---

* Q. How would you evaluate a lesson? In this connection, state the process of self-evaluation.

সপ্তদশ অধ্যায়

গৃহকাজ

(Home work)*

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পাঠদানের শেষে গৃহকাজ করে আনতে দেওয়া হয়। যেমন গণিতের ক্লাশের শেষে শিক্ষার্থীদিগকে বাড়ী থেকে কয়েকটি অঙ্ক কষে আনতে বলা হয়। English Language-এর ক্লাশের পর শিক্ষক সেদিনকার পাঠ-বিষয়ক কোন প্রশ্ন দিয়ে শিক্ষার্থীদিগকে বাড়ী থেকে সেই প্রশ্নের উত্তর লিখে আনতে বলেন। বাংলা-সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠদানের শেষেও তাই।

কিন্তু গৃহকাজের ব্যবস্থা অত্যন্ত বিতর্কমূলক। সকল শিক্ষাবিদ গৃহকাজ সম্পর্কে একমত নন। তাঁরা এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। শিক্ষাবিদ ব্রে (Bray) গৃহকাজের বিরোধিতা করে লিখেছেন যে, সাধারণ অবস্থায়, দিনের শেষে, শিশু দিনের কাজ যুক্তিগতভাবে সম্পন্ন করেছে এবং তারপরে তাকে গৃহকাজ দিলে তার মঙ্গলের চাইতে অমঙ্গলই করা হয়।[১]

কিন্তু অনেক শিক্ষাবিদ আছেন, যাঁরা গৃহকাজকে শিক্ষার্থীদের পক্ষে একটি মঙ্গলজনক অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন।

রাইবার্ণ (Ryburn) বলেছেন যে, গৃহকাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃক কোন না কোন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই অবলম্বিত হবে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণ সকলে মিলে প্রথমে একমত হবেন কতটা সময় প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা গৃহকাজের জন্য দিতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্বন্ধে সময় বিভাজন হবে অথবা যে বিষয়গুলি প্রতিদিন পড়ান হয়, সেগুলি সম্বন্ধেই গৃহকাজের সময় বণ্টিত হবে।[২]

---

* Q. What is the attitude of the differant educationists towards home work? What are the principles of giving home work to the students?

১। Bray : Under normal conditions, a reasonahle day's work for a child has been done at the close of the afternoon session and home work, as it is generally organised, does more harm than good as a rule in this country.

২। Ryburn : There should be some method adopted in a school for regulating the home work set. Head master and staff should agree first of all on the amount of time that each class is expected to spend on home work and how that time is to be divided up amongst different subjects, or at least, the time to be devoted to those subjects which come everyday.

Ryburn যেমন গৃহকাজের উপযোগিতা বুঝেছেন, তেমনি বুঝেছেন শিক্ষাবিদ P. C. Wren। তিনি বলেছেন যে, গৃহকাজ শরীর ও মনের পক্ষে মঙ্গলজনক।[১] তিনি আরও বলেছেন, গৃহকাজ হবে ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য, স্বয়ংশিক্ষার জন্য, পরীক্ষার জন্য নয়।[২]

যেসব শিক্ষাবিদ গৃহকাজের সুপারিশ করেন তাঁরা দুটি উদ্দেশ্যদ্বারা প্রণোদিত হয়ে গৃহকাজকে সমর্থন করেছেন। তাঁরা বলেন, গৃহকাজদ্বারা বিদ্যালয়ে যে বিষয় জ্ঞানলাভ হল, তার উপলব্ধির সহায়ক হচ্ছে গৃহকাজ, আর তাছাড়া গৃহকাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থী আরও বেশি তথ্য জানবার সুযোগ পেয়ে থাকে। এই কারণেই তাঁরা গৃহকাজের জন্য সুপারিশ করেন।

কিন্তু দুই দলের শিক্ষাবিদরাই ভ্রান্তীয় ধারণা পোষণ করেন। বিদ্যালয়ের সকলের ক্ষেত্রেই গৃহকাজ সমর্থনযোগ্য নয়। বিশেষ করে নীচু শ্রেণীর শিশুদের গৃহকাজ দেওয়া উচিত নয়। বিদ্যালয়ে পাঠদানকালে শিক্ষক তাদের পুরোপুরি শিখিয়ে দেবেন। যদি কিছু লিখতে দেবার প্রয়োজন থাকে, তবে শ্রেণীকক্ষেই শিশুরা যাতে সে কাজটুকু করে নিতে পারে, সে সুযোগ শিক্ষককে করে দিতে হবে। তবে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য গৃহকাজের প্রয়োজন আছে বই কি? উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রম ব্যাপকতর এবং তাদের পক্ষে গৃহকাজ বিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্রেণীর শিক্ষার অনুপূরক হচ্ছে গৃহকাজ। Duckworth উচ্চশ্রেণীতে গৃহকাজের কথা সুপারিশ করতে গিয়ে বলেছেন যে গৃহকাজের ব্যবহার এমনি হবে যে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় থেকে গৃহে চলে যাওয়ার কালে এমন ক্ষমতা অর্জন করে যাবে যাতে তারা গৃহে গিয়ে বই ব্যবহার করে জ্ঞান অর্জন করবার সুযোগ পায়।[৩]

গৃহকাজের সুবিধা।

(১) গৃহকাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ পায়।

১। P. C. Wren : It (home work) is actually beneficial to mind and body.

২। P. C, Wren : Home work should be for individuality and self-teaching, not for examination.

৩। Duckworth : Homework should be used to enable a pupil leave the school with the ability to use books as a means of obtaining knowledge.

(২) শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ও কাজ করতে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি লাভ হয়।

(৩) গৃহকাজ করতে গেলে শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ সম্বন্ধে একীভূত ধারণা হয়।

(৪) শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়।

(৫) গৃহকাজ করতে গেলে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্যান্য সাহায্যকারী পুস্তক পড়বার জন্য শিক্ষার্থী প্রেরণা লাভ করে।

(৬) শিক্ষার্থীরা সুবিন্যস্তভাবে স্বীয় কাজ করতে শেখে।

(৭) গ্রন্থাগারের উপযুক্ত ব্যবহার করতে শিক্ষার্থীরা শেখে।

(৮) অবসর বিনোদনের উৎকৃষ্ট উপায়।

(৯) শিক্ষক-অভিভাবক সংযোগরক্ষাকারী হচ্ছে গৃহকাজ। অভিভাবক গৃহকাজ দেখেই বুঝতে পারেন কিভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিচালনা হচ্ছে।

গৃহকাজের অসুবিধা।

(১) শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব শিক্ষালাভ করা ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনের তাগিদ অনুযায়ী কাজ করতে পারে না। তারা খেলাধূলা বা অবসর বিনোদনের জন্য কিছু করতে সক্ষম হয় না।

(২) গৃহকাজ, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাপনের বাধাস্বরূপ। কারণ গৃহকাজের চাপে শিক্ষার্থীরা কোনও রকম সামাজিক বা পারিবারিক কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে না।

(৩) শিক্ষার্থীরা গৃহকাজের চাপে, কোনরূপ সৃজনাত্মক কাজ করতে পারে না।

(৪) বর্তমান যুগে গৃহকোণ জনাকীর্ণ এবং গৃহকাজের জন্য অসুবিধাজনক, ফলে গৃহকাজ করতে শিক্ষার্থীর বেশ অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

(৫) গৃহকাজের চাপ শিক্ষার্থীদের মনে অবসাদ সৃষ্টি করে।

(৬) শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তির উপর গৃহকাজ চাপ সৃষ্টি করে থাকে।

(৭) যদি গৃহকাজ শিক্ষকদ্বারা ভালভাবে সংশোধিত না হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ কাজে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করবে।

গৃহকাজের সুবিধা ও অসুবিধা দুই দিকই বিবেচনা করে একটি সিদ্ধান্তে

আসা যেতে পারে। উচ্চশ্রেণীতে কিছু গৃহকাজ থাকবেই, কিন্তু তা যেন শিক্ষার্থীর দেহ ও মনে কোন চাপ সৃষ্টি না করে তা দেখতে হবে।

গৃহকাজ দেবার নীতি (Principles of Assigning Home work)।

(১) গৃহকাজ এমনি হবে যাতে গৃহশিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন না হয়।

(২) গৃহকাজ শুধু যান্ত্রিক ধরণের হবে না। চিন্তার অনুশীলনের প্রয়োজন যাতে হয়, তা দেখতে হবে।

(৩) বয়স ও শ্রেণী উপযোগী গৃহকাজ হবে, তাছাড়া শ্রেণীর প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একই রূপ গৃহকাজ থাকবে না। কারণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একইরূপ কর্মক্ষমতা নেই।

(৪) পুনরালোচনামূলক গৃহকাজ—গৃহকাজ দেখার সময় শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন যে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যা পড়েছে, তার পুনরালোচনার জন্য সমস্যামূলক প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয়। তাতে শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞানের পুনরালোচনা যেরূপ হবে, তেমনি হবে কল্পনাশক্তির বিকাশ।

(৫) ব্যক্তিগত অসুবিধা—অনেক শিক্ষার্থীরই আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। তাদের পিতামাতা অভিভাবককে নানাভাবে সাহায্য করতে হয়। শরীরের খাটুনি দিয়ে ত বটেই, অবসর সময়ে অর্থোপার্জন করেও। তাই সেই অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে গৃহকাজ দেবেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ক্রম অনুযায়ী নিজে শেখো

(Programmed Instruction)*

শ্রেণী শিক্ষণের অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে নানা শিক্ষাদান পদ্ধতির উদ্ভাবনের কথা আমরা আলোচনা করেছি। ডালটন ও উইনেট্কা পরিকল্পনায় ব্যক্তিমুখী শিক্ষণপদ্ধতির মধ্যে শিক্ষার্থী কিভাবে নিজ নিজ সামর্থ্য, আগ্রহ, ঔৎসুক্য, প্রতিন্যাস ইত্যাদিকে ভিত্তি করে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হয় তাও দেখা গিয়েছে। সেখানেও 'নিজে শেখো' এরূপ একটি ভাবধারা শিক্ষণপদ্ধতির মধ্যে বর্তমান ছিল।

এখানে আরও একটি প্রগতিশীল শিক্ষণপদ্ধতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। এটি হচ্ছে 'ক্রম অনুযায়ী নিজে শেখো' বা Programmed Instruction।

Programmed Instruction কি ?

'ক্রম অনুযায়ী নিজে শেখো' বা Programmed Instruction হচ্ছে একটি স্বয়ংক্রিয় শিক্ষণপদ্ধতি (Auto Instructional method) এবং এ ব্যবস্থা শ্রেণী-শিক্ষকের ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করতে বদ্ধপরিকর। Programmed Instruction-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে James Michael Lee বলেছেন যে, ক্রম অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে এমনভাবে সুপরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে দিতে হবে যে শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বস্তু শিখতে পারে এবং সার্থকভাবে তা শিখেছে কিনা তা পরীক্ষা করেও দেখতে পারে।[১]

শিক্ষাক্ষেত্রে 'শিক্ষার স্বয়ংক্রিয়তা' এমন কিছু অভিনব নয়। কারণ সত্যিকার উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এই নীতি যে অনুসরণ করা হয় নি এমন নয়। তবে পূর্বে শিক্ষণপদ্ধতির মধ্যে শিক্ষার্থীর স্বয়ংক্রিয়তা থাকলেও,

---

* Q. What is programmed Instruction ? Discuss the feasibility of its introduction in our country.

১। James Micheal Lee: Programmed Instruction refers to presenting material to be learned in such a manner that the student is required to go through carefully pre-planned specific processes of learning the material and finally of reinforcing those specific learnings more or less immediately.

তা নিয়ন্ত্রিত হত শিক্ষকের দ্বারা। কিন্তু এখানে শিক্ষকের ভূমিকা নগণ্য। তাহলেও Programmed Instruction-এ শিক্ষকের ভূমিকা একান্তভাবে অকিঞ্চিৎকর নয়। তাঁকে Programmed Instruction-এর সমস্ত ধরণের কার্যক্রম শিখে ফেলতে হবে, তবেই তিনি শিক্ষার্থীদের স্বয়ংক্রিয় শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিচালনা করতে পারবেন। তাঁকে জানতে হবে 'ক্রম অনুযায়ী নিজে শেখো' পদ্ধতির প্রকৃতি, নির্বাচিত বিষয়বস্তু, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাযন্ত্র, শিক্ষাক্রম লিখন, শ্রেণী-শিক্ষকের নূতন ভূমিকা এবং 'নিজে শেখো' বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষণব্যবস্থা।

মূল Programmed Instruction-কে মূলতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—শিক্ষাশ্রয়ী যন্ত্র বা Teaching machine এবং ক্রমানুযায়ী 'নিজে শেখো' পাঠ্যপুস্তক বা Programmed Text-book।

Programmed Instruction-এর উৎস ও ব্যাপ্তি এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তি।

Programmed Instruction-এর বিভিন্ন শাখা, প্রশাখা সম্বন্ধে জানবার পূর্বে এর উৎস ও ব্যাপ্তি এবং মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি আমাদের জানা প্রয়োজন। Programmed Instruction পদ্ধতি সর্বাধুনিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া যা ভারতে বর্তমানে প্রচলিত হবার উপক্রম। The National Institute of Education এই 'নিজে শেখো'বা Programmed Instructionটির বহুল প্রচারে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে National Institute of Education-এর অধীন Indian Association for Programmed Learning নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়েছে এবং তারপর থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এর উপসমিতি গড়ে উঠেছে। দিল্লীতে এবং বিভিন্ন Regional Collegeএ এজাতীয় শিক্ষার জন্য শিক্ষণব্যবস্থা হচ্ছে।

শিক্ষাদান সংক্রান্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এমন একটি শিক্ষাদান কৌশল যা শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু প্রদান করে এবং শিক্ষার্থী সেই বিষয়বস্তু যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে তা পরীক্ষা করে দেখে এবং যদি শিক্ষার্থী ভুল করে তাহলে তা শুধরে দেবার জন্য ব্যবস্থা থাকে।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাবিদ Sidney L. Pressy এই যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং এই শিক্ষাযন্ত্রের সামরিক প্রশাসনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে প্রয়োগ

করা হলেও ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই প্রক্রিয়া জনস্বীকৃতি লাভ করে নি। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাবিদ Skinner যন্ত্রটিকে আরও সংস্কার করে এই যান্ত্রিক শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

মনোবিজ্ঞানবিদ B. F. Skinner শিক্ষাযন্ত্র আবিষ্কার সম্পর্কে যে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি অবলম্বন করেছিলেন, তা বর্তমানেও প্রচলিত। মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ হচ্ছে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব (Stimulus-Response Theory) এবং পুনরুপস্থাপনের সূত্র (TheLaw of Reinforcement)।

Skinner-এর পরে N. A. Crowder, Programmed Instruction-এর একটি তত্ত্ব ও প্রয়োগ ব্যবস্থার আবিষ্কার করেন, যার সাথে Skinner-এর মতানৈক্য রয়েছে। প্রথমতঃ, Crowder বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার্থী ভুল করতে করতে শেখে। দ্বিতীয়তঃ, Crowder-এর মতানুযায়ী সূক্ষ্ম ক্রমবিশিষ্ট পাঠস্তর উচ্চশিক্ষায় প্রয়োজনীয়। তৃতীয়তঃ, Crowder বলেন যে, কোন লেখকই এমন কোন Programmed পরিকল্পনা করতে পারেন না, যা সকল শিক্ষার্থীর পক্ষেই উৎকৃষ্ট। পাঠের বিভিন্ন স্তর এমন স্বাভাবিকভাবে পর পর সজ্জিত থাকবে যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী স্বীয় ব্যক্তিত্বের গঠন ও সামর্থ্য অনুযায়ী অগ্রসর হতে পারে।

শিক্ষালাভের এই নূতন পদ্ধতি আমেরিকাতে সুরু হয় এবং বর্তমান যুগের পক্ষে এ-ব্যবস্থা অত্যন্ত সুফলপ্রসূ হবে বলে Programmed Instruction-এর নীতি ইংলণ্ড, জাপান, রাশিয়া জার্মাণী প্রভৃতি দেশ গ্রহণ করে। আমাদের দেশও এই শিক্ষণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে, তবে ব্যাপকভাবে এখনও চালু হয় নি। এজন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

প্রয়োগের ক্ষেত্রে একক পাঠের পরিকল্পনা (Unit Plan) এবং ক্রমানুযায়ী 'নিজে শেখো' বা Programmed Instruction-এর পরিকল্পনা দুইই বিপরীত প্রক্রিয়ামূলক। একক পাঠ পরিকল্পনায় বা Unit Plan-এ 'সমগ্র' হিসাবে পাঠের বিষয়বস্তু ধার্য হয় কিন্তু Programmed Instruction পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র 'অংশের' উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি।

শিক্ষাপ্রদানমূলক যন্ত্র (Teaching Machines)।*

শিক্ষাপ্রদানমূলক যন্ত্রগুলি সাধারণভাবের বাক্সের মত পরিকল্পিত এবং

* Q. What is Teaching Machine? How can teaching be made effective through teaching machine? What are its advantages and disadvantages?

Electronic Computors-এর মত হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য সরল বা জটিল দুই ধরণের শিক্ষাপ্রদানমূলক যন্ত্রই স্বয়ংক্রিয়। শিক্ষাপ্রদানমূলক যন্ত্র (Teaching Machine) সত্যিকার রক্তমাংসের শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষাদানে বেশি কৌশলী এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের পূর্ণ পরিবর্ত হিসাবে Teaching Machine-কে ধরা যায়।

শিক্ষাদানমূলক যন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। শিক্ষাপ্রদানকারী যন্ত্রের কলকব্জাগুলি এবং 'ক্রম অনুযায়ী নিজে শেখো বিষয়বস্তু, সমস্যা ইত্যাদি' অর্থাৎ Programmed Materialsগুলি এমনিভাবে সাজান যে শিক্ষার্থী একস্তরে শিক্ষা সমাপন না করলে, অন্যস্তরের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না।

একটি শিক্ষাপ্রদানমূলক যন্ত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রম অনুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পাঠ বিভক্ত থাকে। সাধারণ সরল যন্ত্রে শুধু ছাপা জিনিস নিয়ে কাজ চলে। কিন্তু জটিল যন্ত্রাদিতে নক্শা, চিত্র, চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রের ফালি এবং অন্যান্য শিক্ষোপকরণের ব্যবহার হয়। পাঠের ক্ষুদ্র অংশকে বলা হয় কাঠামো বা Frame। মাত্র একটি frame এক সময়ে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করা হয়। প্রতারণা এই যন্ত্রে অসম্ভব, কারণ শিক্ষার্থীর সঠিক উত্তরদানের পরই যন্ত্র থেকে সঠিক উত্তর বের হয়ে আসবে।

শিক্ষাপ্রদানকারী যন্ত্রের সুবিধা (Advantages)।

প্রথমতঃ, যন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষা অত্যন্ত সক্রিয় পদ্ধতি। শিক্ষার্থী প্রতি স্তরে সক্রিয় হয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে, কারণ প্রতি স্তরে শিক্ষার্থী কাজ শেষ করে পরের স্তরের কাজটুকু করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার নিজের শিক্ষার গতি অনুযায়ী শিখতে সাহায্য করে। তৃতীয়তঃ, কাজগুলি যদি ক্রম অনুযায়ী সন্নিবেশিত হয় তাহলে নানা ধরণের শিক্ষায় তা কার্যকরী হবে, যেমন শিক্ষার্থী মুখস্থ করতে, সমস্যা সমাধান করতে, বিমূর্ত চিন্তা করতে, ইত্যাদি। চতুর্থতঃ, এর পরিপ্রেক্ষিত স্পষ্ট করেই বলা যায় যে, সে জ্ঞানের স্তরটি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। বলা বাহুল্য সাধারণ শ্রেণী-শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব আমরা জোর গলায় স্থাপন করতে পারি না। পঞ্চমতঃ, শিক্ষাপ্রদানমূলক যন্ত্র কার্যশেষে শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করে বা শাস্তি প্রদানও করে থাকে। অর্থাৎ যদি উত্তর সঠিক হয়

তাহলে শিক্ষার্থীকে পরের স্তরে যেতে দেওয়া হয়। আর সে ভুল করলে তাকে পুনরায় সেই সমস্যাটিরই সমাধান করতে হয়। (পুনরুপস্থাপনের সূত্র অনুযায়ী (Law of Reinforcement) এখানে কাজ চলে। ষষ্ঠতঃ, শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার্থীর ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে অবহিত হতে সাহায্য করে এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীর ত্রুটিসমূহ অপসারণ করতে অগ্রসর হতে পারেন। সপ্তমতঃ, এ ব্যবস্থা প্রতারণা নিরোধক, কারণ শিক্ষার্থীকে প্রথমে Programmed Material পড়তে হয় এবং তার উপরই কাজ করতে হয়। কাজ হয়ে গেলে পরই সে উত্তর দেখতে পারে, নকল করায় আর তার কোন সুযোগ থাকে না।

অসুবিধা (Disadvantages)।

শিক্ষাপ্রদানকারী যন্ত্রের কিছু অসুবিধাও আছে। প্রথমতঃ, স্বয়ংক্রিয়-মূলক যন্ত্র শিক্ষাপ্রদানমূলক হলে কি হবে, এটা যন্ত্র ত বটেই এবং জীবন্ত শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থী যে রূপ শিক্ষালাভ করতে পারে যন্ত্রের কাছ থেকে তা আশা করা যায় না। উত্তর শুদ্ধ হলে পরবর্তী স্তর অর্থাৎ পুরস্কার, আর উত্তর সঠিক না হলে পুনরায় তা করা। কিন্তু শিক্ষকের কাছে, উত্তর সঠিক ও বেঠিক যাই হোক না কেন, শিক্ষার্থী যে আচরণ লাভ করে, তাতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ, সাধারণ শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থী কাজ করতে যে উৎসাহ বোধ করে, সে উৎসাহবোধ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কাছে শিক্ষার্থী লাভ করে না। চতুর্থতঃ, যন্ত্র শিক্ষার্থীর সৃজনাত্মক সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি ত করতেই পারে না, বরং খর্ব করে থাকে। পঞ্চমতঃ, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষার ফলে সমগ্র অঞ্চলে, এমন কি সমগ্র দেশেই একই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হবে, এবং আঞ্চলিক বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তি-বৈষম্যের প্রকাশ পাবার সুবিধা এখানে হবে না। ষষ্ঠতঃ, প্রয়োগের পর উত্তর সঠিক কিংবা বেঠিক হল তা জানা যেতে পারে, কিন্তু কেন শিক্ষার্থীর উত্তর ভুল হল তার কোন ব্যাখ্যা সেখানে নেই।

ক্রম অনুযায়ী নিজে শেখো পাঠ্যপুস্তক (Programmed Text-book)।

Programmed Text-book বা নিজে শেখো পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষণের আবশ্যকীয় স্তরগুলি হচ্ছে তিনটি—(১) উপস্থাপন (Presentation), (২) প্রতিক্রিয়া (Response) এবং (৩) পুনরুপস্থাপনের

সূত্র (The law of Reinforcement)। একটি নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষার্থী প্রথম স্তরের কাজ করবে; একটি Work book বা স্বয়ংক্রিয় অনুশীলনী হতে শিক্ষার্থী প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের কাজ করতে পারে, কিন্তু একটি Programmed Text-book বা নিজে শেখো পাঠ্যপুস্তক হতে শিক্ষার্থী তিনটি স্তরেরই কাজ করতে সক্ষম। এখানেই Programmed Text-book-এর বৈশিষ্ট্য।

Programmed Text-book এর সাহায্যে ব্যক্তিগত শিক্ষণ শ্রেণীতে সম্ভব এবং শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে ক্রম অনুযায়ী নিজে শেখো পাঠ্যপুস্তকের উপযুক্ত বিষয়বস্তু। এই নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে। শিক্ষার্থীর দুজন শিক্ষক—একজন হচ্ছে Programmed পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যজন হচ্ছেন শ্রেণী-শিক্ষক। প্রথম শিক্ষক শিক্ষা দেয় শিক্ষায় মূল বিষয়বস্তু এবং দ্বিতীয় শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করেন।

শ্রেণী শিক্ষকের ভূমিকা

Programmed Instruction-এ শিক্ষকের ভূমিকা একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়। কারণ প্রথমেই বলা হয়েছে শিক্ষককে Programmed Instruction-এর বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। কিন্তু যান্ত্রিকতা এক জিনিস আর প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানে সাহায্য অন্য জিনিস। Programmed Text-book অনুসরণকালে শিক্ষকের কিছুটা সাহায্য নিতে হলেও শিক্ষাপ্রদানমূলক যন্ত্রে যখন শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করতে বসে তখন শিক্ষকের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই।

আমরা Teaching machine-এর অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যে সম্পর্ক তা যান্ত্রিকতার মধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। অতএব শিক্ষাও হচ্ছে যন্ত্রাশ্রয়ী। কিন্তু জনশিক্ষা (Mass education)-এর চাপে আমরা যতই যান্ত্রিকতার জন্য চাৎকার করি না কেন, শিক্ষাদানমূলক যন্ত্র কখনও রক্তমাংসের শিক্ষকের পরিবর্ত হতে পারবে না।

সমালোচনা

Programmed Instruction নিয়ে খুবই কম পরীক্ষা-নিরীক্ষা

হয়েছে। এটি এখনও শিশুস্তরেই আছে বলতে হবে। এর সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা সময়-সাপেক্ষ।

প্রথমতঃ, Programmed Instruction-কে যত সহজ মনে করা হচ্ছে ততটা সহজ নয়, কারণ এর প্রস্তুতির জন্য প্রচুর সময় প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সঠিকভাবে সাজান এবং সঠিক উত্তর নির্দেশনা সহজসাধ্য নয়। তবুও আশার বিষয়, এর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং Indian Association of Programmed Learning N. C. E. R. T.-র সাহায্য নিয়ে অনেক ক্রমানুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু (Programmed materials) তৈরি করেছেন।

———

পদ্ধতি, পরিচালনা ও স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে

দ্বিতীয় ভাগ

পরিচালনা

প্রথম অধ্যায়

বিদ্যালয় গৃহ—আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম

(School Plant-Building & Equipments)

মানব সভ্যতার প্রথম অবস্থায় শিক্ষাদানের কোনও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা ছিল না। ঐ সময়ে পরোক্ষ উপায়ে শিক্ষাদান করা হত, অর্থাৎ গৃহ, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, লোক-উৎসব, মেলা এবং নানা ধরণের সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লোকেরা শিক্ষালাভ করত। তবে গুরুগৃহে সামান্য সংখ্যক শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ বর্তমান ছিল। এ ছাড়া আদিযুগে প্রত্যক্ষ শিক্ষার জন্য কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না।

ধীরে ধীরে সমাজ জীবনে জটিলতা প্রবেশ করল। পরোক্ষ শিক্ষার দ্বারা সমাজ জীবন পুরোপুরি সার্থকভাবে চলল না। প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। ফলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল, এবং বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থাও করা গেল। বিদ্যালয় হল, কিন্তু বিদ্যালয় গৃহের অভাব। শিক্ষাদানের কাজ চলল, মন্দিরে, চণ্ডীমণ্ডপে, মসজিদে, পোড়োবাড়ীতে, জমিদারের কাছারীবাড়ীতে, গাছতলায় ইত্যাদিতে। বহুদিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চলে এসেছিল, এমন কি, উনবিংশ শতাব্দীর এ্যাডামস রিপোর্ট এই জাতীয় বিদ্যালয়েরই আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বহুদিন ধরে এ ব্যবস্থা চলে এলেও এর পরিবর্তন নানাদিক থেকে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল। ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, ঠাণ্ডা, ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণ ত ছিলই, তাছাড়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য উপরোক্ত স্থানসমূহে শিক্ষাদান কার্য ভালভাবে চলছিল না। ফলে বিদ্যালয় গৃহ তৈরি করবার জন্য সমাজ থেকেই চাপের সৃষ্টি হল। কিন্তু বিদ্যালয় গৃহ যে শিক্ষার অনুকূল করে গড়ে তোলা যায়, সেদিকে তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। ফলে অস্বাস্থ্যকর আলোবাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে, নীচু স্থানে, যেমন-তেমন স্থানে একটি ঘর বা কয়েকটি ঘর তৈরি করে তাকেই নাম দেওয়া হল বিদ্যালয়। ঐরূপ বিদ্যালয়ের সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্র খুবই সামান্য ছিল। ব্ল্যাকবোর্ড, চক ও কয়েকটি মানচিত্র ছাড়া শিক্ষোপকরণ ছিল না বললেই চলে। তাই দিয়েই সব কাজ চলত, কারণ তখন শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু ছিল খুব সরল ও সহজ।

কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজ জীবনের ক্রমোন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষণপদ্ধতি ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই পরিবর্তন এসে গেল। শিক্ষার লক্ষ্য আর সঙ্কীর্ণ ও সীমিত রইল না, শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ উন্নতি সাধন। শিক্ষা ও জীবন হল সমধর্মী। ফলে শিক্ষার বিষয়বস্তুও সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমিত রইল না, শিক্ষার বিষয়বস্তু হল ব্যাপক। পূর্বে শিক্ষণপদ্ধতি ছিল মামুলি ও গতানুগতিক, শিক্ষক চেঁচিয়ে পড়তেন, ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন, আর শিক্ষার্থীরা শুনে শুনে লিখত। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষণপদ্ধতি হয়েছে সক্রিয়, সমাজায়িত ও আলোচনাভিত্তিক। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও তজ্জনিত কাজও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বিদ্যালয় হয়েছে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। বৃহৎ সমাজের সমস্ত কার্যক্রম ও জাতীয় আদর্শ, ঐতিহ্য, চিন্তাধারা সমস্তই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে প্রতিফলিত হবে, কারণ শিক্ষার্থীদের সে সব বিষয়ে দক্ষতালাভ করার মধ্য দিয়েই তাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সম্ভাবনা। অতএব কৃষ্টিগত উত্তরাধিকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়াই বর্তমানে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব। অতএব এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ রূপের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, অর্থাৎ আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গড়ে তুলতে হবে। আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক স্তরে চাই আদর্শ অবস্থান, আদর্শ বিদ্যালয় গৃহ, খেলার মাঠ, বিভিন্ন ধরণের আসবাবপত্র ও শিক্ষোপকরণ এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম।

বিদ্যালয় গৃহের পরিকল্পনা (Planning of School Building)। *

আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির পরিকল্পনা বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রকের কর্মকর্তাগণ করে দিচ্ছেন বটে, কিন্তু বহু পুরাতন বিদ্যালয় রয়েছে, যেগুলি কোনরূপ পরিকল্পনা করে তৈরি হয় নি। অথচ বিদ্যালয় গৃহ ও পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলির নির্মাণ পরিকল্পনায় যে Central Advisory Board of Education-এর School Building Committee যে সুপারিশ করেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

* Q. Give in brief, the essentials of a good school building. By what consideration will you be guided while fixing upon area for a Higher Secondary School building ?

শুধু শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণের জন্য স্থান হিসাবেই বিদ্যালয় গৃহ গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ সুস্থ জীবনের জন্য প্রস্তুত করাই বিদ্যালয় গৃহের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

বিদ্যালয় তৈরির বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে School Buildings Committee নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছেন।

(ক) বিদ্যালয় গৃহটি গঠন, প্যাটার্ণ, রং ইত্যাদির দিক থেকে রুচিজ্ঞানের পরিচায়ক হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা সৌন্দর্যের মর্ম সব সময় উপলব্ধি করতে পারে। এতে তাদের সৌন্দর্যবোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হবে।

(খ) বিদ্যালয়ে কক্ষগুলির মধ্যে সহজভাবে চলাচলের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। দোতালা বাড়ীর সিঁড়িগুলি হবে যথেষ্ট চওড়া যাতে শিক্ষার্থীদের নামা-ওঠার মধ্যে কোনও ধাক্কাধাক্কি না হয়। উভয়তলের বারান্দাগুলিও হবে যথেষ্ট চওড়া, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই চলাফেরা করতে পারে।

(গ) প্রস্রাবাগার, শৌচাগার প্রয়োজনমত যথেষ্ট সংখ্যক হবে ও সুবিধাজনক স্থানে স্থাপিত হবে, যাতে সকলের পক্ষে যাতায়াতের সুবিধা হয়। অবশ্য দেখতে হবে ঐগুলির অবস্থান যেন দৃষ্টিকটু না হয় এবং দুর্গন্ধ বের হয়ে সকলের স্বাস্থ্যহানি না ঘটায় এবং অসুবিধার সৃষ্টি করে।

(ঘ) যদি প্রচুর স্থান পাওয়া যায়, তাহলে একতলা বাড়ীই বিদ্যালয়ের পক্ষে ভাল। তবে এতে খরচ অনেক বেশি পড়ে যায়। একতলা বাড়ীর সুবিধা এই যে প্রধান শিক্ষকের পক্ষে সমগ্র পরিবেশটি নিজ আয়ত্তের মধ্যে থাকে। তাছাড়া সিঁড়ি দিয়ে বার বার ওঠানামা করলে ছাত্রছাত্রীরা সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও অযথা শক্তি ক্ষয় হয়।

(ঙ) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত বারান্দা থাকবে। কক্ষগুলির উভয় দিকে বারান্দা থাকলে নানান দিক থেকে সুবিধা হয়।

(চ) বিদ্যালয় গৃহ যে প্ল্যানেই তৈরি করা হোক না কেন, ভবিষ্যৎ প্রসারণের যেন সুযোগ থাকে তা দেখে করা উচিত।

(ছ) শ্রেণীকক্ষগুলি শ্রেণীর সুবিধা অনুযায়ী কিছুটা পরিবর্তন করে নেওয়া যেতে পারে।

(জ) নির্দিষ্ট মাপের শ্রেণীকক্ষ (২০′ × ২০′ × ১৫′) তৈরি করাই বাঞ্ছনীয়। তাতে মিতব্যয়িতা হবে। আর যদি বেশী শিক্ষার্থী আসে তখন ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই চলবে। যেখানে ঘরের মধ্যে কাঠের ব্যবধান দেওয়া হয়

যেখানে শব্দ-নিরোধক ব্যবধান ব্যবহার করাই ভাল, তাতে এক শ্রেণীর গোলমাল অন্য শ্রেণীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারবে না।

বিদ্যালয় নির্মাণের স্থান (Site for the School Building)।

বিদ্যালয়ের পরিবেশের কথা বলতে গিয়ে Yeager William লিখেছেন যে, সমস্ত শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে বিদ্যালয়ের আকর্ষণীয় ও উত্তম পরিবেশের চাইতে এমন কিছু নেই যা শিক্ষার্থীদের সহযোগিতামূলক মনোবৃত্তির সহায়ক হয় ও বিদ্যালয়ের প্রতি ভালবাসার উদ্রেক করে।[১] একটি স্বাস্থ্য-সম্মত, সুন্দর ও সতেজ পরিবেশ শিক্ষার্থীর চোখ ও হৃদয়কে আনন্দে ভরিয়ে তোলে। বিদ্যালয় গৃহে শিক্ষার্থী দিনের বহু সময় কাটিয়ে থাকে, অতএব বিদ্যালয় ও তার পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব তার উপর খুব বেশী। এই কারণেই বিদ্যালয় যেখানে সেখানে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বিদ্যালয়ের স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (Central Advisory Board of Education)-এর School Building Committee যে সুপারিশ করেছেন তা নিয়ে বিবৃত হল।

(ক) বিদ্যালয়ের স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কত ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ শেষ পর্যন্ত হতে পারে সে দিকে লক্ষ্য করে এবং সম্প্রসারণের সুযোগ থাকবে কিনা, সেদিকে লক্ষ্য করে বিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্ণয় করা কর্তব্য।

(খ) বর্তমান প্রগতিশীল বিদ্যালয়ের জন্য অধিক স্থান প্রয়োজন। কারণ নানারকমের সক্রিয়তাভিত্তিক কর্মের ব্যবস্থা এই জাতীয় বিদ্যালয়ে হয়ে থাকে এবং তার জন্য প্রচুর স্থানের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(গ) বিদ্যালয় গৃহকে যথাসম্ভব ধূলাবালি, গোলমাল ইত্যাদি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। রাইবার্ণ (Ryburn) বলেছেন যে সম্ভব হলে বিদ্যালয়কে শহরের বাইরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য বড় বড় শহরে, নগরে এরূপ কাজ সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতের অনেক শহরেই, শহরের উপকণ্ঠে বিদ্যালয় স্থাপন করলে ভাল হয়। এতে সুবিধা এই যে শিক্ষার্থীরা উন্মুক্ত প্রান্তরে, বিশুদ্ধ বাতাসের সংস্পর্শে এসে পড়াশুনা করতে পারবে, তাতে

১। Yeager William : Nothing in the whole educational programme is more conducive to cooperative attitude among the pupils and a love of school than an attractive and wholesome environment.

শরীর ও মন দুইই ভাল থাকবে ও ছাত্রছাত্রীরা সানন্দে পাঠ গ্রহণ করবে। এছাড়া খেলাধূলার স্থানও প্রচুর থাকবে।[১]

শহরাঞ্চলে বিদ্যালয়টি ঠিক বড় রাস্তার উপর স্থাপিত না হলেই ভাল। বড় রাস্তা হতে একটি আলাদা রাস্তা গিয়ে যাতে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন ব্যবস্থা থাকলেই ভাল হয়। তাতে বড় রাস্তার ধূলাবালি বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। রাইবার্ণও ঠিক একই কথা বলেছেন।[২] তাছাড়া গাড়ীঘোড়ার ঘন ঘন যাতায়াতের শব্দ থেকে বিদ্যালয় পরিবেশকে মুক্ত রাখাই বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) বিদ্যালয় গৃহটি সমতল ভূমিতে, উপযুক্ত উঁচু শুকনো জায়গায় অবস্থিত হবে।

(ঙ) বিদ্যালয় গৃহটিকে রেলষ্টেশন, কলকারখানা থেকে দূরে থাকতে হবে, কারণ রেল ও কারখানার ধোঁয়া শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর হতে পারে। তা ছাড়া ঐগুলির নৈকট্যের ফলে যানবাহনের আধিক্য থাকবে এবং শিক্ষার্থীরা যানবাহনজনিত আকস্মিক দুর্ঘটনায় গিয়ে পড়তে পারে।

(চ) বিদ্যালয় বস্তীর কাছে অবস্থিত থাকা উচিত নয়। কারণ বস্তী অঞ্চলে বহু নিম্নশ্রেণীর লোক বাস করে এবং তাদের চালচলনে, কথাবার্তায় অশালীন আচরণ ও ভাষা প্রয়োগ করতে দেখা যায়। এদের প্রভাব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর পড়তে পারে।

(ছ) বিদ্যালয়ের স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের চারিদিকে খুব উঁচু বাড়ী বা উঁচু দেওয়াল যাতে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্মশান ঘাট ও সমাধিভূমি থেকেও বিদ্যালয় দূরে থাকবে।

বিদ্যালয়ের স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের পরিব্যাপ্তি নির্ভর করবে, কি জাতীয় বিদ্যালয়ে হবে এবং কতসংখ্যক শিক্ষার্থী সেখানে পড়বার সম্ভাবনা

১। Ryburn : It is better, if at all possible, to securre a site for the school outside the town. This, of course is not possible in the cities, but in large number of towns and villages in India, it is possible to have the school, if not at a short distance from the town, at least on the outside of the town area. In such a position, there is more fresh air, there is better chance of getting adequate playing grounds near the school...".

২। Ryburn : The site should be near a road, yet back from the road as far as can be arranged to escape as much dust as possible.

থাকবে তার উপর। School Building Committee শিক্ষার্থী সংখ্যা-ভেদে বিদ্যালয়ের জমি সম্পর্কে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছেন।

১৬০ জন শিক্ষার্থী	— $\frac{২}{৩}$ একর
৩২০ " "	— ১ "
৪৮০ " "	—১$\frac{১}{৩}$ "

নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য ২ একর জমি প্রয়োজন।

বিদ্যালয় গৃহের বিভিন্ন গঠন (Types of School Building)।

ভারতের মত বিরাট দেশে, যেখানে প্রাকৃতিক বৈষম্য এত বেশী, সেখানে বিদ্যালয় গঠনের জন্য একটি ঢালাও নক্‌শা সুপারিশ করা অসম্ভব। তবে বিদ্যালয় গৃহে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী যাতে যথেষ্ট পরিমাণে আলো-বাতাস পেতে পারে, চলাফেরায় কোনরূপ বাধা না পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করা সম্ভব।

School Buildings Committee সাধারণতঃ E, L, I, T, H অক্ষরের আকৃতিবিশিষ্ট বিদ্যালয় গৃহ শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযুক্ত বলে বলেছেন। এদের মধ্যে L এবং E টাইপের বিদ্যালয় গৃহ সবচাইতে ভাল বলে মনে হয়, কারণ L টাইপের গৃহের প্রান্তভাগের যে কোনও একটি কক্ষে বসে সারা বিদ্যালয়ের উপর দৃষ্টি রাখতে পারেন। E টাইপের বিদ্যালয় গৃহের মধ্যের অংশের শেষ প্রান্ত ভাগে যদি প্রধান শিক্ষকের কক্ষ হয়, তাহলেও তাঁর পক্ষে সমগ্র বিদ্যালয়ের উপর দৃষ্টি রাখা সম্ভব। তাছাড়া এই দুই টাইপের বিদ্যালয় গৃহে আলো বাতাসের প্রাচুর্য থাকবে। I টাইপের বিদ্যালয় গৃহেও আলো বাতাসের ছড়াছড়ি এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই কিন্তু একটানা লম্বা বিদ্যালয় গৃহে জায়গা লাগবে বেশী, আর তা ছাড়া প্রধান শিক্ষকের পক্ষে সামগ্রিক দৃষ্টিদানও অসুবিধাজনক। তবে যে কয়টি টাইপের বিদ্যালয় গৃহের কথা School Building Committee সুপারিশ করেছেন, তার মোটামুটি সবগুলিই আলো-বাতাসের দিক থেকে শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযুক্ত। দোতলা বা তিনতলা বিদ্যালয় গৃহ থাকলে সেখানে কেন্দ্রিয় দৃষ্টি রাখা সব সময় সম্ভব হয় না, ফলে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা অনেকাংশে ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা।

শহরাঞ্চলে যেখানে উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা অপ্রতুল, সেখানে বিদ্যালয় গৃহ

দোতলা বা তিনতলা করতেই হয়। কিন্তু টাইপ, উল্লেখিত যে কোনটিকে অবলম্বন করেই হবে।

বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষগুলি একদিকে বা দুইদিকে কিছু অংশ নিয়ে পর পর সাজান থাকবে। দু' দিকের কোণে প্রধান শিক্ষকের ঘর, অফিস, রেকর্ড রুম থাকলে অবশ্য আপত্তির কিছু নেই।

বিদ্যালয়ে মঞ্চসহ একটি বড় হলঘর থাকবে। এই হলঘরে যাতে বিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রী একত্রিত হতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। এই হলঘরে বিদ্যার্থী পরিষদ, বিতর্ক সভা, উৎসব, নাটক ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হবে।

বিদ্যালয় গৃহে বড় হলঘরের পরই কয়েকটি বিষয়কক্ষ, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য লেবরেটরী ইত্যাদি। সঙ্গীত শিক্ষার ঘর বিদ্যালয়ের এক প্রান্তে করা উচিত, যাতে নীরব পরিবেশে শিক্ষার্থীরা সঙ্গীত অনুশীলন করতে পারে। চারুকলার (Art) জন্য একটি নির্দিষ্ট কক্ষ থাকবে। কক্ষটি হবে বড় এবং সেখানে চিত্রাঙ্কনের সব উপকরণাদি থাকবে।

N. C. C. সম্পর্কিত শিক্ষণের ব্যবস্থা অনেক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আছে। সেইরূপ বিদ্যালয়ে একটি কক্ষ N. C. C.-র উপকরণাদির জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।

আবার বিদ্যালয়ের অন্য প্রান্তে কিংবা বিদ্যালয় গৃহ থেকে অদূরে একটি টিন শেডে বা এ্যাসবেস্টস্ শেডে কারিগরী বিদ্যার ওয়ার্কশপ (Workshop) বা কর্মশালা ও শিল্পঘর (Craft room) স্থাপন করা যায়। কারণ মূল বিদ্যালয় গৃহের একাংশে ওয়ার্কশপ ও শিল্পঘর স্থাপন করলে, সেখানকার নানারকম শব্দ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

শিক্ষকদের জন্য একটি বড় ঘর নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ার, ডেস্ক ও কাবার্ড (Cupboard) থাকবে। শিক্ষকদের ঘরের সাথে ও প্রধান শিক্ষকের ঘরের সংলগ্ন আলো-হাওয়াযুক্ত শৌচাগার থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

প্রধান শিক্ষকের সাথে মিলিত হবার জন্য যে সব অভিভাবক আসবেন, তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট কক্ষ থাকা প্রয়োজন। যেখানে তাঁরা এসে বসতে পারেন। এই কক্ষের সাথেও শৌচাগার থাকা উচিত।

বিদ্যালয়ে মূল গৃহের বাইরে টিফিন খাবার ঘর অথবা Canteen এর জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট থাকবে। তারই সংলগ্ন একটি কক্ষে স্বাস্থ্য পরীক্ষার যাবতীয় সরঞ্জামসহ একটি নির্দিষ্ট কক্ষ থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রতি বিদ্যালয়ে একটি করে গুদামঘর বা Store room থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত আসবাবপত্র, বাগানের কাজ করবার যন্ত্রপাতি, ঝাঁটা ও সাফাইয়ের নানা উপকরণ ইত্যাদি সবই গুদাম ঘরে থাকবে।

বিদ্যালয়ে একটি সুন্দর খেলার মাঠ থাকা বাঞ্ছনীয় এবং তার একপাশে থাকবে ব্যায়ামাগার। ব্যায়ামাগারের একটি অংশে একটি ছোট ঘরে খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম থাকবে। তাছাড়া বিদ্যালয়ে একটি সুপরিকল্পিত ফুলের ও সজীর বাগান থাকা প্রয়োজন। ফুলের বাগান শিক্ষার্থীদের সৌন্দর্যজ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক এবং সজীর বাগান থেকে শিক্ষার্থীরা সজী উৎপাদন করে দ্বিপ্রাহরিক টিফিনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত সংখ্যক শৌচাগার থাকবে এবং তা প্রচুর জল ও ফিনাইল ইত্যাদি দিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিদ্যালয়ের মূল গৃহ এবং আশেপাশের গৃহগুলি পরিস্কার রাখা বাঞ্ছনীয়। পরিস্কার রাখা সব সময় জমাদার দ্বারা সম্ভব হয় না। একাজে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিক্ষকেরা যদি একাজে পরিকল্পনা অনুযায়ী সাফাই কাজে হাত লাগান, তাহলে দেখা যাবে শিক্ষার্থীরাও সাফাই কাজ করতে এগিয়ে আসবে।

৪৮০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি বিদ্যালয় পরিকল্পনা

কক্ষের বিবরণ		দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ (ফুট)
১২টি শ্রেণীকক্ষ		২০'×২০'
ইতিহাস, ভূগোল ও সমাজবিদ্যার কক্ষ	প্রত্যেকটি	২০'×২০'
চারুকলার কক্ষ		৪০'×২০'
বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য লেবরেটরী		৪০'×২০'
পাঠাগার		৪০'×২০'
প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকের জন্য কক্ষ	প্রত্যেকটি	২০'×২০'
অভিভাবকদের জন্য কক্ষ		১০'×১০'
অফিসঘর		২০'×২০'

কক্ষের বিবরণ		দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ (ফুট)
N. C. C. কক্ষ		১৬′ × ১২′
হলঘর		৬০′ × ৪০′
শিল্প ঘর ও যন্ত্র ঘর	প্রত্যেকটি	৪০′ × ২০′
স্বাস্থ্য পরীক্ষা গৃহ ও সাধারণ ঔষধ বিতরণ কক্ষ	প্রত্যেকটি	১৬′ × ১২′
মূল বিদ্যালয়ের বাইরে শেড—ব্যায়ামাগার		৬০′ × ৪০′

বিদ্যালয় গৃহ সম্বন্ধে ১৯৬৪-৬৬ সনের শিক্ষা কমিশনের মতামত।*

বিদ্যালয় গৃহ সম্বন্ধে ১৯৬৪-৬৬ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা কমিশন বলেছেন যে বর্তমানে বিদ্যালয় গৃহের অবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। শতকরা ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহের অবস্থা মোটামুটি ভাল। মাধ্যমিক স্তরের জন্য শতকরা ৫০টি বিদ্যালয় মোটামুটি সন্তোষজনক। এ থেকেই বুঝতে পারা যায়, কতসংখ্যক বিদ্যালয় গৃহ এখনও নির্মিত হয় নি এবং সেগুলি অদূর ভবিষ্যতে তৈরি করে ফেলতে হবে।[১] এ ছাড়া সম্ভাব্য নূতন শিক্ষার্থীদের ভর্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় গৃহের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এই সমস্যার তিনটি দিক বর্তমান; (১) প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যবস্থা, (২) বিদ্যালয় নির্মাণ খরচ কমিয়ে আনা এবং (৩) এমন একটি সংস্থা স্থাপন যেটি অতি সত্বর এবং অল্প ব্যয়ে এই বিষয়গুলির সহজ সমাধান করতে পারে।

বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য অর্থ ভাণ্ডার।

শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) বলেন যে কেন্দ্রে ও রাজ্যে বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দে (budget) বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য অর্থ বণ্টনব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে হবে।

* Q. The Education Commission of 1964-66 has made certain valuable recommendations regarding school building. How far, do you think, that these recommendations are likely to solve school building problem.

১। Education Commission 1964-66: The provision of School buildings is extremely unsatisfactory at present. At the primary stage, only about 30 per cent of the schools are stated to have been housed in satisfactory buildings. The corresponding proportion at the Secondary stage is stated to be about 50. This shows the great back log of unconstructed school buildings which has to be cleared during the next few years.

বিদ্যালয় নির্মাণ ব্যাপারে স্থানীয় সমাজকে অর্ধেক ব্যয়ভার গ্রহণ করতে হবে।

কম মূল্যমানের বিদ্যালয় গৃহ।

শিক্ষা কমিশন বলেন যে অস্থায়ী পাকা বিদ্যালয় গৃহ এবং খড় বা বেড়ার চালের বিদ্যালয় বাড়ীর প্রতি যে বিদ্বেষভাব বর্তমান, তা ন্যায়সঙ্গত নয়। উঁচু পাকা মেঝে, বড় বড় দরজা ও জানালা, আলোবাতাস যুক্ত, বাঁশ এ্যাসবেষ্টস দ্বারা তৈরি বিদ্যালয় গৃহ বিদ্যালয়ের জন্য যথার্থই উপযুক্ত। শিক্ষা কমিশনের বক্তব্য হচ্ছে পাকা বাড়ী ছাড়াও সুপরিকল্পিত কাঁচা বাড়ী আমাদের বিদ্যালয় গৃহের আদর্শরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং জাঁকজমকের চাইতে সরলতার দিকে ঝুঁকে পড়াই আমাদের দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বাঞ্ছনীয়।

শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় গৃহ।

শিক্ষা কমিশন দুই স্থানের বিদ্যালয় নির্মাণের ভিন্ন ভাবে আলোচনা করেছেন। শহরাঞ্চলে জমির অভাব এবং জমির দামও অতিরিক্ত। শহরাঞ্চলে Pre-fabricated জিনিসপত্র দ্বারা বিদ্যালয় ভবন তৈরি করা যেতে পারে। Central Building Research Institute এবং অন্যান্য গৃহ গবেষণাগারের সুপারিশ অনুযায়ী বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করলে খরচ কম পড়বে। শহরাঞ্চলে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্থা, যথা পৌরপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সাহায্য পেতে হবে, তাতে বিদ্যালয় নির্মাণের খরচ কম পড়বে। পৌরপ্রতিষ্ঠানের অধীনে বিভিন্ন শিল্পকাজে দক্ষ লোকের অভাব নেই। তাঁরা গিয়ে বিদ্যালয়ভবন অনায়াসে নির্মাণ করে দিতে পারেন।

গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় নির্মাণের ক্ষেত্রে শিক্ষা কমিশন স্থানীয় উদ্যোগের উপর বিশেষ নির্ভর করেন। স্থানীয় প্রচেষ্টা, অর্থ, কায়িক পরিশ্রম, ও জিনিসপত্র—সবই বিদ্যালয় নির্মাণে প্রয়োগ করতে হবে। স্থানীয় লোকেরাই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন থেকে শুরু করে দেওয়াল পর্যন্ত গেঁথে দেবে। এতে অর্থ ব্যয়ও কম হবে এবং স্থানীয় লোকেরা নিজেদের সন্তানদের জন্য কাজ করে দিয়েছে বলে কাজটি ভালই হবে ও বিদ্যালয়ের প্রতি স্বাভাবিকভাবে দরদ বাড়বে।

বিদ্যালয় উন্নয়ন বিধানকারী সংস্থা।

রাজ্যের বিদ্যালয়সমূহ, শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে যাতে একটি মোটামুটি নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে ওঠে তার জন্য রাজ্যে বিদ্যালয় উন্নয়নবিধানকারী সংস্থা গঠন করা দরকার। এই সংস্থাটি গঠিত হবে P. W. D. বা Public Works Department-এর মধ্যেই, কিন্তু এঁরা কাজ করবেন শিক্ষাবিভাগের সহযোগিতায়। এই সংস্থার মধ্যে স্থপিতি, ভাস্কর ও শিক্ষাবিদ সকলেরই সমাবেশ থাকবে। এই সংস্থার কাজ হবে বিভিন্নস্থানে—শহরাঞ্চলে ও গ্রামে বিদ্যালয় নির্মাণের ক্ষেত্রে নক্সা স্থির করে দেওয়া, সস্তায় উত্তম জিনিস দিয়ে বিদ্যালয়-নির্মাণ পরামর্শ দেওয়া, স্থানীয় মালমসলা ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া, এক কথায় সব কাজে সহযোগিতা করা। কেন্দ্রেও অনুরূপ একটি সংস্থা থাকবে, তার কাজ হবে রাজ্যের বিদ্যালয় উন্নয়ন বিধানকারী সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।

শ্রেণীকক্ষ (Class room)।*

শ্রেণীকক্ষের আয়তন।

শ্রেণীকক্ষ তৈরি করার সময়, তার আয়তন সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। আয়তন নির্ভর করবে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা, বয়স সীমার উপরেও।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬+ থেকে ১১+ বয়সসীমার শিশুদের জন্য ১০ বর্গফুট করে স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। পক্ষান্তরে ১১ বৎসরের বেশী বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য ১২ বর্গফুট স্থান থাকা প্রয়োজন। মুদালিয়র কমিশন অবশ্য প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য গড়ে ১০ বর্গফুট স্থানের কথা সুপারিশ করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় বা নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিশুদের সংখ্যা ৩০ থেকে ৩৫ জন হবে। তার বেশী হবে না। প্রথমে ঐ বয়সসীমার শিশুরা কর্মচঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির। তাদের জন্য কর্মের ব্যবস্থা করা এবং ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ করা শিক্ষকের কর্তব্য। এই কারণে একটি শ্রেণীতে বেশী শিশু থাকা অসুবিধাজনক। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীতে ৪০ জন পর্যন্ত শিক্ষার্থী থাকতে পারে।

মুদালিয়র কমিশন প্রত্যেকটি শ্রেণীকক্ষের জন্য ৪০০ বর্গফুট স্থানের জন্য

* Q. Describe the requirements of a class room in respect of area, ventilation, lighting and equipments.

সুপারিশ করেছেন। কমিশন বলেছেন, শ্রেণীকক্ষগুলি বর্গক্ষেত্রাকার (Square) হবে না, হবে আয়তক্ষেত্রাকার (Rectangular)। ২০'×২০' এর স্থলে ২২'×১৮' করলে আয়তন মাত্র ৪ বর্গফুট কমবে, কিন্তু শ্রেণীকক্ষ দেখতে ভাল হবে এবং কার্যকরী হবে বেশী। বেশী লম্বা শ্রেণীকক্ষ হওয়া উচিত নয়, কারণ যেসব শিক্ষার্থীরা পেছনের বেঞ্চিতে বসবে, তাদের পক্ষে বোর্ডের কাজ দেখা এবং অন্যান্য দর্শন ও শ্রবণমূলক শিক্ষোপকরণ দেখা এবং শোনা অসুবিধাজনক। পেছনের শিক্ষার্থীরা প্রদীপনের সুবিধা লাভের জন্য পেছন থেকে এগিয়ে সম্মুখভাগে আসতে চাইবে। এরূপ অবস্থায় শ্রেণীতে বিশৃঙ্খলা দেখা যেতে পারে।

শ্রেণীকক্ষ প্রস্থেও বেশী হবে না। তাহলে শিক্ষক সমগ্র শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের উপর দৃষ্টি রাখতে পারবেন না।

শ্রেণীর উচ্চতা হবে ১৫'-১৬' ফুট। এর বেশী হলে অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই হবে না। শ্রেণীর উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম হলে শ্রেণীকক্ষ অন্ধকার থাকবে এবং শিক্ষকের কথাও শেষ প্রান্তে ভালভাবে শোনা যাবে না।

আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা।

শ্রেণীকক্ষের অনেকগুলি জানালা থাকা বাঞ্ছনীয়। দরজা থাকবে মাত্র একটি। জানালাগুলি দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়—অর্থাৎ আলো-বাতাস উভয়ের সুযোগ সুবিধাই শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে পেয়ে থাকে। সমগ্র শ্রেণীকক্ষের মেঝের আয়তনের এক-পঞ্চমাংশ স্থান জানালা অধিকার করে থাকবে। জানালার ফ্রেমের নীচের কাঠটি অন্ততঃপক্ষে মেঝে থেকে ৩½" ৪' উঁচুতে স্থাপিত হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা বেঞ্চিতে বসে জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকার সুযোগ না পায়।

জানালাগুলি এমন ভাবে স্থাপিত হবে যে মূল আলো বাম দিক থেকে আসে যাতে লেখা বা পড়ার সময় বিষয়বস্তুর উপর ছায়া এসে না পড়ে। পিছন থেকে আলো এসে সমস্ত কাজের উপরই ছায়া পড়বে। সম্মুখ থেকে আলো এলে চোখ ঝলসে যাবে এবং ডান দিক থেকে এলে আলো খুব খারাপ নয়। তবে লেখা ও পড়ার বিষয়বস্তুর উপর ছায়াপাত করে।[১]

১। Ryburn: The main light should come from the left side in order that there may be no shadows thrown on the work that is being done. Light from behind throws a shadow on the whole work, light from the front is dazzling, light from the right side is not so bad, but some shadow is cast.

কেবল দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা করলেই চলবে না, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে সেদিকেও শ্রেণীকক্ষের পরিবেশটি গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের রুচিজ্ঞান ও সৌন্দর্যজ্ঞান যাতে পরিপুষ্টি লাভ করতে পারে, তার জন্য শ্রেণীকক্ষটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালের রঙ কখনও সাদা রাখা উচিৎ নয়। তার কারণ অনেকক্ষণ পর্যন্ত সাদার দিকে তাকিয়ে থাকলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাছাড়া সাদা রঙে তাড়াতাড়ি ময়লা দেখাতে থাকে। শ্রেণীকক্ষের রঙ হালকা সবুজ হওয়াই উচিত। কারণ প্রথমতঃ সবুজ চোখের পক্ষে ভাল, দ্বিতীয়তঃ সবুজ রঙ আলো শোষণ করে থাকে। তাছাড়া শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালে মণীষীদের ছবি, সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বলিত ছবি, কবিতার অনুলেখন, মণীষীদের বাণী ইত্যাদি শিক্ষার্থীর দেহ-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিদ্যালয়ের একঘেয়ে জীবনের মধ্যে সৌন্দর্যানুভূতি শিক্ষার্থীর বিকল মনকে সরল করে তোলে।

আসবাবপত্র (Furniture)।

বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রের গুরুত্ব খুব বেশী। শিশুরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে। এ সময় দেহ ও মন উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় শিশুকে যদি এমন আসবাবপত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হয়, যাতে তার শারীরিক অসাচ্ছন্দ্য ঘটে, তাহলে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি বিকলীভূত হবে। অতএব শিশু বসে, লিখে, পড়ে যাতে আরাম পায় দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য যাতে ভোগ না করে সেদিকে কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য রাখতে হবে। বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী শ্রেণীর আসবাবপত্র নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কারণ একই উচ্চতা-বিশিষ্ট বেঞ্চে, চেয়ারে সমস্ত বয়সের শিক্ষার্থী আরাম করে বসতে পারে না। আবার একই উচ্চতার ডেস্কে সকল বয়সের শিক্ষার্থী লিখতেও সমান সুবিধা ভোগ করবে না। এটা পরীক্ষিত সত্য যে শিক্ষার্থী বসবার সুবিধা না পেলে পড়ায় যথার্থ মনোযোগ দিতে পারে না।

শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্র ওজনে হাল্কা ধরণের হলে ভাল হয়। তাহলে আসবাবপত্রাদি প্রয়োজন অনুযায়ী সহজে স্থানান্তরিত করা চলবে। হাল্কা আসবাব বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু আসবাবপত্র যদি মজবুত না হয়, তাহলে

বার বার স্থানান্তরিত করলে আসবাবপত্র ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা। তাছাড়া আসবাবপত্র স্থানান্তরিতকরণের জন্য বাইরের লোকদের তো ডাকা হবে না। শ্রেণীর শিশুরা বা শিক্ষার্থীরাই তা সরাবে। বিশেষ করে নীচু শ্রেণীতে আসবাবপত্রের বার বার সরান প্রয়োজন হয়। নীচু শ্রেণীতে কর্মের ব্যবস্থা থাকে বেশী। সে ক্ষেত্রে শিশুরা মেঝেতে বসে দলগত কর্ম সম্পাদন করতে বেশী সুবিধা পাবে। এই কারণেই আসবাবপত্র সরান দরকার এবং সে কাজ করবে শিশুরাই। সুতরাং আসবাবপত্রগুলি ওজনে হালকা অথচ মজবুত হওয়া প্রয়োজন, আসবাবপত্রগুলির রঙ খুব উজ্জ্বল ও ঝকঝকে হওয়া উচিত নয়। কারণ তা চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক।

(১) **ডেস্ক ও বেঞ্চ** (Desks and Benches)।

আসবাবপত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শিক্ষাবিদ P. C. Wren ডেস্কের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে ডেস্ক যদি অনুপযুক্ত হয়, ডেস্কের পরিবর্তে যদি বেঞ্চ ব্যবহৃত হয়, তাহলে তার ফলে শিক্ষার্থীর শারীরিক ক্ষতি হবে, তার মেরুদণ্ড হবে বাঁকা, বুকের সংকোচন হবে, কাঁধ হবে গোলাকার, দেহ পড়বে ঝুঁকে এবং বিশৃঙ্খল মনোভাব, উত্তেজনা, অসন্তোষ ও অস্বাচ্ছন্দ্য নৈতিক ক্ষতি হিসাবে দেখা যাবে। তাছাড়া এসব ক্ষতি ও দৈহিক অস্বস্তির ফলে মনঃসংযোগ সংরক্ষণের অক্ষমতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দৃষ্ট হবে।[১]

শিশুকে বিদ্যালয়ে ডেস্কের কাছে বসে বহুক্ষণ সময় কাটাতে হয়। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে উপযুক্ত দেহের ভঙ্গিমা রক্ষা করে চলতে হলে বসবার উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন। দেহের খারাপ ভঙ্গিমা (Posture) ধাতস্থ হয়ে গেলে দেহের স্থায়ী ক্ষতিসাধন করা হবে। বলা বাহুল্য, যে শিক্ষার্থী ভালভাবে, দেহের অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করে বসতে পারে, সে স্বভাবতঃই বসবার ক্ষেত্রে অন্যান্য অসুবিধাগ্রস্ত শিক্ষার্থী থেকে পাঠে বা কাজে বেশী মনঃসংযোগ করতে পারে। আসন বা ডেস্ক শিশুদের উপযোগী করে ব্যবস্থা করতে হবে, অর্থাৎ আগে শিশু, পরে তার উপযোগী আসন ও ডেস্ক। আগে

১। P. C. Wren: If the desk be of the wrong kind, or if the benches be used instead of desks, curvature of the spine, contraction of the chest, roundness of the shoulders and a confirmed stoop may result as physical injury; bad discipline, irritation, discontent and discomfort may result as moral injury; and inability to sustain attention and concentration owing to lack of bodily ease may result injury.

আসন ও ডেস্ক পরে শিশুকে সেখানে খাপ খাওয়ান নয়। অনুপযুক্ত আসনে উপবেশন করতে দিলে এবং অনুপযুক্ত ডেস্কে শিশুকে লিখতে পড়তে দিলে, তার যে সব শারীরিক ও নৈতিক ক্ষতি হতে পারে তা Wren সাহেব ভালভাবেই বিবৃত করেছেন।

J. Mace Andress নামে এক শিক্ষাবিদ বলেছেন যে শিশুকে উপযুক্তভাবে বসাতে হলে, তার পায়ের তলা ঠিক মেঝেতে পৌছে যাবে মাত্র, অর্থাৎ সে আরামের সঙ্গে বসবে, এবং হাঁটুর নীচের রক্তবহা শিরা, উপশিরা, ধমনী ইত্যাদির উপর চাপ সৃষ্টি হবে না। আসন এমনি হবে যাতে উপবেশনকারী তার বস্তিদেশ চেয়ারের শেষাংশের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে। চেয়ার ও ডেস্কের মধ্যে উপযুক্ত দূরত্ব থাকবে, এবং ডেস্কের উচ্চতা ও ঢালু জায়গা এমনি হবে যাতে শিক্ষার্থীর সম্মুখের দিকে নুইয়ে পড়ার অবকাশ না থাকে।[১]

বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়সমূহে নানা ধরণের ডেস্ক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ একজন শিক্ষার্থী একাকী কাজ করতে পারে এরূপ একক বা Single ডেস্ক, দুজনে পাশাপাশি বসে কাজ করতে পারে এমন যুগ্ম ডেস্ক এবং ৫,৬ জন শিক্ষার্থী পাশাপাশি বসে পড়াশুনা ও লেখার কাজ করতে পারে, এমন দীর্ঘ ডেস্ক। এরূপ দীর্ঘ ডেস্কই এদেশের বিদ্যালয়সমূহে বেশী প্রচলিত। বিভিন্ন ধরণের ডেস্কের মধ্যে একক বা Single ডেস্কই সব চাইতে ভাল। কারণ শিক্ষার্থী স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে ডেস্কের ব্যবহার করে লেখাপড়া শিক্ষা করতে পারে। যদি দীর্ঘ ডেস্কে একসাথে পড়াশুনা করে, তাহলে তাদের মধ্যে নানা অসুবিধা দেখা যায়। প্রথমতঃ, দেখা যায় লিখবার অসুবিধা। দ্বিতীয়তঃ, একত্র বসার ফলে, তারা পড়ার বাইরের নানাবিষয় নিয়ে আলোচনা করে অমনোযোগী হয়ে যেতে পারে। তৃতীয়তঃ, ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসার ফলে বসার দিক থেকেও অস্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে। সর্বোপরি একসাথে থাকা অস্বাস্থ্যকরও বটে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগলে অন্যের মধ্যে সহজে সে রোগ সংক্রামিত করতে

১। J. Mace Andress: If a child is properly seated, he should be able to rest his feet comfortably on the floor without pressing on the nerves and blood vessels under the knee, the seat should be so shaped as to encourage the sitter to sit with the pelvis well back in the chair, the distance of the chair from the desk, its height and slants should be such that bending forward will not be encouraged.

পারে। যেমন কারও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, তার হাঁচি, কাশি ইত্যাদির দ্বারা তার বেঞ্চির সকলকেই সহজে রোগাক্রান্ত করতে পারে। আবার হয়ত কোন শিক্ষার্থীর দাদ, পাঁচড়া বা চুলকানি হয়েছে, সে অন্যকে সংক্রামিত করতে পারে। এইসব কারণেই দীর্ঘ ডেস্ক ও দীর্ঘ বেঞ্চ বিদ্যালয়ে অবাঞ্ছনীয়।

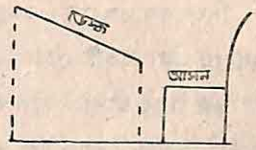
তাছাড়া আরও একটি ত্রুটি দীর্ঘ ও যুগ্ম ডেস্কে পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষক যখনই কোন কাজ দেন বা বোর্ডে কিছু লিখে দেন, তাঁর কর্তব্য দাঁড়ায় শিক্ষার্থীরা ঠিকমত লিখেছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা বা প্রয়োজন-বোধে ব্যক্তিগত সাহায্য করা। সেক্ষেত্রে দীর্ঘ ডেস্কে সব চাইতে অসুবিধা দেখা যায়, তারপর দেখা যায় যুগ্ম ডেস্কের ক্ষেত্রে। অতএব একক ডেস্কই হচ্ছে সব চাইতে ভাল বলে বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের মত। কিন্তু একক ডেস্ক ও চেয়ার অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ, এত খরচ সাধারণ বিদ্যালয়গুলি করবে কেমন করে? এও একটা সমস্যা বটে। কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের আদর্শের দিকে অগ্রসর হতে হবে, এক জায়গায় স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না।

একক ডেস্কের ব্যবস্থা কোনক্রমেই না করা গেলে যুগ্ম ডেস্ক, অর্থাৎ দুজনে বসে পড়াশুনা করবার মত ডেস্ক ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত ভাল। ডেস্কের উপরিভাগ একটু ঢালু থাকবে। একক ডেস্কের পরিসর হবে ১৫″ থেকে ১৮″ পর্যন্ত। ডেস্কের উপরের অংশে পুস্তক ও দোয়াত রাখবার জন্য ৩″ বা ৪″ ইঞ্চি সমতল স্থান থাকা প্রয়োজন। লেখার জন্য বাকী অংশ অর্থাৎ ১২″—১৪″ ইঞ্চি স্থান ঢালু থাকবে। ঢালুর কোণের পরিমাণ যদি ১৫° হয় তাহলে লিখবার সুবিধা হবে।

যুগ্ম ডেস্কের একটি সুবিধাও আছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে নীচু শ্রেণীতে আসবাবপত্র সরিয়ে রেখে শ্রেণীকক্ষে শিশুদের সক্রিয়তার জন্য উপযুক্ত করা হয়। উঁচু শ্রেণীতেও কর্মের ব্যবস্থা আছে, দলীয় কাজেরও ব্যবস্থা আছে। ৪ জন শিক্ষার্থী যদি দুটি যুগ্ম ডেস্ককে বিপরীতভাবে সাজায় তাহলে দুটি ডেস্কের উপরিভাগে ৬০″ × ৩৬″ ইঞ্চি প্রায় জায়গা হবে এবং শিক্ষার্থীরা সহজে সেখানে ৪ জনে মিলে দলীয় কাজ করতে পারবে।

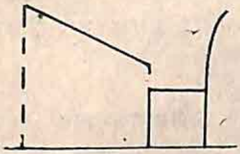
ডেস্কগুলি আসনের সাথে একেবারে জুড়ে দেওয়া থাকবে না। ডেস্ক আসনের মধ্যে দূরত্বও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Ryb附এর মতে ডেস্ক থেকে চেয়ারের দূরত্ব লিখবার ও পড়বার সময় ভিন্নরূপ হবে। ডেস্ক ও চেয়ারের মধ্যে দূরত্ব নিয়ে তিন রকমের অবস্থানের কথা উল্লেখে দেখা যায়,

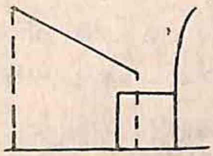
যথা—যুক্ত টাইপ (Plus type), বিযুক্ত টাইপ (Minus type) এবং শূন্য টাইপ (Zero type)। Ryburn বলেন যে, পড়া এবং দাঁড়াবার জন্য যুক্ত টাইপ বা Plus type উপযুক্ত, বিযুক্ত টাইপ বা Minus type উপযুক্ত হচ্ছে লেখার জন্য।[১]



যোগ টাইপ

আসনের বা চেয়ারের পিছনে শিক্ষার্থীর কাঁধের উচ্চতা সমান একটা খাড়া পিঠ (back) সংলগ্ন থাকা প্রয়োজন।[২] এরূপ থাকলে শিক্ষার্থীকে খাড়া হয়ে বসতে হবে এবং তার মেরুদণ্ড আর তাহলে বেঁকে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না।


শূন্য টাইপ


বিযুক্ত টাইপ

শিক্ষার্থীর উচ্চতা অনুযায়ী আসনের উচ্চতা ও পরিসর

(ফুট)

শিক্ষার্থীর উচ্চতা	আসনের উচ্চতা	আসনের পরিসর	আসন হতে ডেস্কের উচ্চতা
৪′	১৩″	১০″	৮″
৪½′	১৪½″	১১″	৯″
৫′	১৬½″	১২″	১০″
৫½′	১৮″	১৩″	১১″

১। Ryburn : The plus position is best for reading and standing, the minus position is for writing.

২। Dressler : If the back of the school benches or chairs be just a little lower than the shoulder blades of the pupil when sitting properly, the best results, other things being equal, may be obtained.

২। শিক্ষকের আসন ও টেব্‌ল।

শিক্ষকের বসবার জন্য একটি আসন বা চেয়ার ও পুঁথিপত্র বা কাগজপত্র রাখবার জন্য একটি টেব্‌ল-এর প্রয়োজন। এগুলি ১' ফুট উচ্চ একটি বেদী বা চৌকির উপর রাখলে ভাল হয়। উচ্চ বেদীর উপর চেয়ারে বসতে পারলে শিক্ষক শ্রেণীর শেষ পর্যন্ত দেখতে পারেন। শিক্ষকের চেয়ার হবে হাতল-বিহীন, কারণ তাঁকে বারে বারে চেয়ার থেকে উঠে বোর্ডের কাজে এবং ব্যক্তিগত সাহায্য করবার জন্য শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর মাঝে ঘুরে বেড়াতে হয়।

শিক্ষকের পক্ষে দাঁড়িয়ে পড়ানই বাঞ্ছনীয়। বর্তমান সময়ে অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কলেজের অধ্যাপকদের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ান। সেক্ষেত্রে একটি টেব্‌ল থাকলেই যথেষ্ট।

৩। ব্ল্যাকবোর্ড (Black Board)।

শ্রেণী শিক্ষণের জন্য ব্ল্যাকবোর্ড একটি অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ। শিক্ষাদানকে আনন্দময় ও উপলব্ধিমূলক করতে হলে ব্ল্যাকবোর্ড অত্যাবশ্যক। যে শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার করেন না, তিনি সত্যিকার শিক্ষকের নামের অনুপযুক্ত। ব্ল্যাকবোর্ডকে শিক্ষকের সত্যিকার বন্ধু বলা যেতে পারে।

ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ ছাড়া শ্রেণী শিক্ষণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। শিক্ষক নানা বিষয় বোর্ডে লিখে, ছবি, নক্সা, মানচিত্র বোর্ডে এঁকে শিক্ষাদানকে উপলব্ধিমূলক করে তোলেন। পাঠের শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখে দেন। গল্প বলার সময় তিনি বোর্ডে ছবি এঁকে আনন্দময় পরিবেশে তৈরি করতে সমর্থ হন। অতএব বোর্ডের উপযোগিতা খুবই বেশী।

ব্ল্যাকবোর্ড সম্বন্ধে চারটি অতি প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ রাখতে হবে।

(১) অবস্থান—ব্ল্যাকবোর্ড এমন এক স্থানে অবস্থিত থাকবে যেখানে থাকলে বোর্ডের লেখা শ্রেণীর সব জায়গা থেকে সমানভাবে ও পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে। দুটি জানালার মাঝে ব্ল্যাকবোর্ড অবস্থিত থাকবে না। ব্ল্যাকবোর্ডের পেছন দিক থেকেও আলো আসবে না, এলে ব্ল্যাকবোর্ডের সম্মুখভাগ থাকবে অন্ধকারে, ফলে শিক্ষার্থীরা বোর্ডের লেখা দেখতে গেলে তাদের দেখার অসুবিধা হবে।

(২) **উচ্চতা**—মেঝে থেকে ব্ল্যাকবোর্ডের উচ্চতা হবে শিক্ষার্থীদের উচ্চতার পরিপ্রেক্ষিতে ২৬″ থেকে ৩১″ ইঞ্চি পর্যন্ত।

(৩) রঙ—ব্ল্যাকবোর্ডের রঙ সাধারণতঃ শ্লেটের মত কালো হয়। তবে বর্তমান সময়ে প্রগতিশীল শিক্ষাবিদদের মতে গাঢ় সবুজ রঙও (olive green) দেওয়া হয়ে থাকে। শ্লেটের মত কালো বা গাঢ় সবুজ রঙের বোর্ডে সাদা ও রঙিন চক দিয়ে লিখলে লেখা, নক্সা, ছবি ইত্যাদি খুবই স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

(৪) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা—ব্ল্যাকবোর্ড সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখতে হবে। ভেজা ডাষ্টার ব্ল্যাকবোর্ড পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা উচিত। শুকনো ডাষ্টার ব্যবহার করলে চকের ধূলো উড়বে এবং সেই ধূলো শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।

বিভিন্ন ধরণের ব্ল্যাকবোর্ড।

ব্ল্যাকবোর্ড নানা ধরণের হয়ে থাকে। তার মধ্যে দেওয়ালে টাঙান ব্ল্যাকবোর্ড, ইজেল ব্ল্যাকবোর্ড ও রোলার ব্ল্যাক বোর্ডই প্রধান।

প্রথমতঃ, দেওয়ালে টাঙান ব্ল্যাকবোর্ড বর্তমানে বিদ্যালয়ে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। কোন কোন সময়ে শ্রেণীকক্ষে ২টি/৩টি ব্ল্যাকবোর্ডও ঝুলান অবস্থায় থাকে। তাছাড়া এই পর্যায়ে পড়ে দেওয়ালের গায়ে সিমেন্ট করা ব্ল্যাকবোর্ড।

দ্বিতীয়তঃ আছে, ইজেল ব্ল্যাকবোর্ড। ইজেলে রক্ষিত বোর্ড শ্রেণীকক্ষে স্থান পরিবর্তন করে বসান চলে। এই বোর্ডের দুপিঠেই লেখা যায়। এই পর্যায়ভুক্ত আর এক রকমের বোর্ড আছে যেগুলি কাঠের ফ্রেমের মধ্যেই থাকে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্রেমের মধ্যেই ঘুরিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা চলে।

তৃতীয়তঃ, রোলার বোর্ড হচ্ছে আর এক ধরণের বোর্ড। এই বোর্ডগুলি রাবারের বা রেক্সিনের তৈরি। এগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রোল করে উপরে উঠিয়ে নেওয়া যায়।

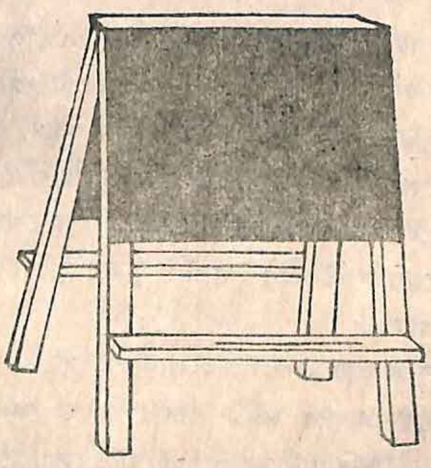
এই পর্যায়ভুক্ত আর একরকমের ব্ল্যাকবোর্ড আছে। এই ব্ল্যাকবোর্ড দুই পাল্লাযুক্ত। প্রয়োজনবোধে একটি পাল্লার বোর্ডে লেখা হয়ে গেলে, সেই পাল্লাকে উপরে ঠেলে দিয়ে নীচের পাল্লার বোর্ডে লেখা চলে।

দেওয়ালে টাঙান বোর্ডে সব চাইতে খরচ কম, কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে

এর দুদিকে লেখা চলে না। তাছাড়া পাঠের সারাংশ লিখবার সময় কিছুটা লিখবার পরই বোর্ডের স্থান ফুরিয়ে যায়। তখন উপরের অংশ মুছে নিয়ে সেইস্থানে শিক্ষককে লিখতে হয়। কিন্তু অনেক শিক্ষার্থী থাকে যারা দ্রুত লিখনক্ষম নয়, ফলে তারা যথাযথভাবে লিখে উঠতে পারে না।

দ্বিতীয় ধরণের বোর্ড, অর্থাৎ ইজেল বোর্ড এবং ফ্রেমে ঘোরে এমন বোর্ড অপেক্ষাকৃত ভাল। একদিকে লেখা হয়ে গেলে অন্যদিকে লেখা চলে এবং লেখায় অনগ্রসর শিক্ষার্থীরা অবসর সময় সেই লেখা টুকে নিতে পারে।

রোলার বোর্ডের (Roller Board) ব্যবহার বর্তমানে অনেক বিদ্যালয়ে দেখা যায়। এই বোর্ডের সুবিধা অনেক। সাধারণভাবে শিক্ষক বোর্ডে লিখে যেতে পারেন এবং না মুছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রোল করে নীচের অংশকে উপরে তুলতে পারেন। অনগ্রসর শিক্ষার্থীরা টিফিনের সময় বা অবসরকালে আবার ঘুরিয়ে নিয়ে শিক্ষকের লেখা লিখে নিতে পারে। তাছাড়া এই বোর্ডে কাজ করলে সময়েরও অনেক সাশ্রয় হয়। শিক্ষক যদি চান তাহলে তিনি রোলার বোর্ডে, ছবি, নক্সা, মানচিত্র, তুলনামূলক টেব্‌ল ইত্যাদি পূর্বে লিখে রাখতে পারেন এবং শ্রেণীতে সেগুলি সরাসরি দেখাতে পারেন। এতে সময় নষ্ট কম হয়। ট্রেনিং কলেজের শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীরা পাঠদান অভ্যাসের সময় রোলার বোর্ড বেশী ব্যবহার করে, কারণ পূর্বাহ্নেই তাঁদের বোর্ডে অনেক সময় কিছু কিছু লিখে রাখতে হয়।



প্রথম শ্রেণীর শিশুদের জন্য এক ধরণের বোর্ড বিশেষ প্রয়োজন। ২৪"×১৬" দুটি প্লি-প্লাইউডের টুকরো দুদিকের ফ্রেমে আটকে দিতে

হবে। মেঝে হতে ১৮″ ইঞ্চি উপরে ফ্রেমে বোর্ড থাকবে। প্লাইউডের টুকরো দুটো ব্ল্যাকবোর্ড পেইণ্টদ্বারা রঙ করে নিতে হবে। ফ্রেম এমনি হবে যে দু'দিকের বোর্ডই প্রসারণ করা যায়। এর সুবিধা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর শিশুরা বোর্ডের দুদিকে দুটি অর্ধচন্দ্রাকৃতির আকারে বসবে এবং এক একদিকের বোর্ডে যা লেখা আছে, তার প্যাটার্ণ দেখে অনুকরণ করে লিখতে শিখবে। একটি শ্রেণীতে এরূপ দুটি বোর্ড থাকতে পারে।

এখানে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। মাঝে মাঝে শ্রেণীকক্ষের বাইরেও ক্লাশ নেবার প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষের সিমেণ্টের বোর্ড বা অন্য কোন স্থির (fixed) বোর্ড শ্রেণীর কোনও কাজে লাগবে না। সেক্ষেত্রে ইজেল বোর্ড বা রোলার বোর্ড বিশেষ কার্যকরী হবে। কারণ ঐগুলি স্থানান্তরিত করা সম্ভব। স্থির ব্ল্যাকবোর্ডগুলি আঁকার কক্ষ (drawing-rooms) এবং শিশুশ্রেণীর জন্য উপযুক্ত বলে Ryburn মতামত প্রকাশ করেছেন।

এছাড়া জ্যামিতির জন্য স্কোয়ার বোর্ড, ভূগোলের জন্য সীমারেখ মানচিত্রের রোল বোর্ড প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলোর গুরুত্বও শ্রেণীকক্ষে কম নয়।

ঝাড়ন বা ডাষ্টার (Duster)।

বোর্ড মুছে দেবার জন্য ডাষ্টার ব্যবহৃত হয়। প্রথমেই আমরা সাবধানবাণী উচ্চারণ করে উল্লেখ করেছি যে, শুকনো ডাষ্টার ব্যবহার না করে ভিজে কাপড় ব্যবহার ভাল। ফেল্ট ডাষ্টার চকের গুঁড়ো বেশী উড়ে এবং তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

মানচিত্র সংরক্ষণ মঞ্চ (Map Stand)।

শ্রেণীকক্ষের সরঞ্জামের মধ্যে মানচিত্র সংরক্ষণ মঞ্চ বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার জন্য উপরিউক্ত মঞ্চের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এই সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় মানচিত্র, চার্ট ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শনের জন্য। এই মঞ্চ শ্রেণীকক্ষের যে কোন স্থানে রেখে দেওয়া যায়।

তাকযুক্ত আলমারি (Cupboards)।

শ্রেণীকক্ষে তাকযুক্ত আলমারি (Cupboards) বিশেষ প্রয়োজনীয়। Ryburn-এর মতে প্রতি শ্রেণীকক্ষে একটি বা দুটি কাবার্ড থাকতে পারে যেখানে ডাষ্টার, চক, রেজিষ্টার, সাহায্যকারী পুস্তক এবং অন্যান্য জিনিস রক্ষা করা সম্ভব। সবচেয়ে সস্তা কাবার্ড হচ্ছে সেগুলি, যেগুলি বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ-কালে দেওয়ালে আলমারি তৈরি করা হয়। কাবার্ডে অবস্থিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উই-এর হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করার জন্য যত্ন নিতে হবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে শ্রেণীকক্ষে খোলা শেলফের বা তাকের বন্দোবস্ত থাকবে সেখানে থাকবে অভিধান, বিশ্বকোষ (Encyclopaedia), ছবির বই, মানচিত্রাবলী ইত্যাদি। বিজ্ঞানকক্ষে অনেক বেশী কাবার্ড থাকবে।[১]

গবেষণাগার ও তার সাজসরঞ্জাম (Laboratory and equipments)।*

যেখানে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে থাকে, তাকেই বলা হয় গবেষণাগার। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষা অপরিহার্য বলে পরিগণিত হয়েছে। অতএব বিজ্ঞান পরীক্ষাগার বা গবেষণাগার বিদ্যালয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিজ্ঞান পরীক্ষাগার ব্যতীত অন্যান্য ঘরও বিজ্ঞান পাঠদানের জন্য দরকার। যেমন, বিজ্ঞানের জিনিষপত্র রাখার ঘর, বক্তৃতা ঘর ইত্যাদি।

(২) বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের পরিকল্পনা।

ইঞ্জিনিয়ার ও পরিকল্পনাবিদদের সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষকেরও পরীক্ষা-গারের পরিকল্পনা ও সজ্জা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য কয়েকটি নীতির কথা মনে রাখা উচিত।

১। Ryburn: Every room should have one or two cupboards in which dusters, chalks, registers, books of reference, and other things may be kept. The cheapest cupboards are those which are built into the wall when the buildings are being put up. Care has to be taken to prevent white ants from demolishing the contents. If possible, there should also be open shelves in the room for dictionaries, encyclopaedias, picture books, atlases and so on. A science room will have a large number of cupboards.

* Q. Write a note on the science laboratory and its equipments.

(ক) বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে শিক্ষার্থী শিক্ষাগত বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ নীতি উপলব্ধি লাভে সাহায্য করবে।

(খ) শিক্ষার্থী বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত সমস্ত পাঠ্যবিষয় অধিগত করবে।

(গ) বিজ্ঞান পরীক্ষাগার কক্ষে বিভিন্ন সাজসজ্জা, যেমন টেব্‌ল, বেঞ্চ প্রভৃতি প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন রূপে সাজিয়ে রাখবার ব্যবস্থা থাকবে।

(ঘ) বিভিন্ন ধরণের সমস্যা সমাধানের পরিবেশ এবং উপাদান বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে থাকবে।

(ঙ) প্রতি শিক্ষার্থী পরীক্ষাগারে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পাবে।

(চ) বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে শিক্ষকের পরীক্ষা প্রদর্শনের সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে থাকবে।

(ছ) বিজ্ঞান পরীক্ষাগার নির্মাণ ও সাজসরঞ্জামের পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

(১) বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের আয়তন।

বিজ্ঞান পরীক্ষাগার কক্ষের নির্দিষ্ট কোন আয়তন নেই। শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী গবেষণাগারের আয়তনও বিভিন্ন হবে। সাধারণতঃ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয় পক্ষের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে পরীক্ষাগারে বা গবেষণাগারে ২৫ জনের বেশী শিক্ষার্থী একসঙ্গে কাজ করতে দেওয়া উচিত নয়। পঁচিশ থেকে ত্রিশ বর্গফুট স্থান প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য গবেষণাগারে নির্দিষ্ট রাখলে শিক্ষার্থীদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

(ক) পরীক্ষাগারের সাজসরঞ্জাম—বিজ্ঞান পরীক্ষাগার বা গবেষণাগারের জন্য দুটি কক্ষ থাকলে ভাল হয়। একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে পদার্থ ও জীববিদ্যার এবং অপরটিতে হবে রসায়নবিদ্যার পরীক্ষা। রসায়নবিদ্যার পরীক্ষাগারটি এমনিভাবে অবস্থিত থাকবে যাতে বাতাসে ঐ ঘরের কাজের কোন অসুবিধা না ঘটায়। পরীক্ষাগারের দেওয়ালে বড় বড় তাক থাকবে, সেখানে পরীক্ষা কাজের জন্য নির্দিষ্ট সরঞ্জামগুলি সাজান থাকবে।

পরীক্ষাগারের পাশের বারান্দায় দেওয়াল সংলগ্ন কয়েকটি বড় বড় তাক থাকা উচিত ; পরীক্ষা সমাপ্তির পর অনাবশ্যক ও পরীক্ষা-সমাপ্ত দ্রব্যাদি ঐ তাকগুলিতে সজ্জিত থাকবে।

(খ) জানালা—পরীক্ষাগারের দু'পাশের দেওয়ালে জানালা থাকবে। পরীক্ষাগারের একটি দিকে কাবার্ড, বড় বোর্ড, বড় বেঞ্চ, ইত্যাদি রাখতে হবে এবং দেওয়ালে ছবি টাঙাবার ব্যবস্থা থাকবে। একদিকের দেওয়ালে বড় বড় জানালা বসিয়ে কক্ষে প্রচুর আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এক দিকের দেওয়ালে জানালা হবে ছোট এবং সংখ্যায় হবে বেশী। এই জানালা-গুলিকে অন্ততঃপক্ষে, মেঝে থেকে ৫½' ফুট উঁচুতে বসাতে হবে। যে দিকে বড় বোর্ড থাকবে সেদিকে জানালা না থাকলেই ভাল, কারণ জানালা থেকে আলো এসে বোর্ডের পেছন দিক আলোকিত করবে এবং বোর্ডের সম্মুখভাগ পড়বে অন্ধকারে।

(গ) বায়ু চলাচল ঃ—পরীক্ষাগৃহে যাতে গুমোটভাবের সৃষ্টি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। পরীক্ষাগারে নানা কাজের মধ্যে অক্সিজেন কমে যায়। তাই দরজা জানালা দিয়ে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে অবিশুদ্ধ বায়ুকে যাতে ঠেলে বের করে দিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

(ঘ) জল সরবরাহ ও জল নিষ্কাশন—বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে নানা কাজে জলের প্রয়োজন হয়। পরীক্ষাগারের জন্য বাইরে একটি চৌবাচ্চা তৈরি করে তাতে এক হাজার গ্যালন জল সরবরাহ করা উচিত। জল পাইপ-যোগে পরীক্ষাগারে যাবে। ব্যবহৃত জল আবার পাইপযোগে বের করে দেবার ব্যবস্থা থাকবে।

(ঙ) তাপ সরবরাহ—আমাদের দেশে বর্তমানে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এত চাপ সৃষ্টি হয়েছে যে শুধু স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে পরীক্ষা কার্য পরিচালনা অসুবিধাজনক। অনেক বিদ্যালয়ে গ্যাসের প্রচলন হয়েছে এবং কোন কোন স্থানে বৈদ্যুতিক উত্তাপের ব্যবস্থা দেখা যায়।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান বিভাগ থাকে। প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা পরীক্ষাগার থাকলে ভাল হয়, তবে পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার জন্য একটি পরীক্ষাগার ও রসায়নবিদ্যার জন্য পৃথক পরীক্ষাগার থাকলে চলতে পারে। সে যাহোক প্রত্যেক পরীক্ষাগারে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(১) পরীক্ষাগৃহের প্রস্থের দিকে ১২′×৪′ ফুট আয়তনযুক্ত একটি দেওয়াল বোর্ড থাকবে।

(২) বোর্ডের সম্মুখ দিকে একটি প্রদর্শনী টেব্‌ল থাকবে। টেব্‌লটির আয়তন হবে ৮′×২½′ ফুট এবং উচ্চতা হবে ৩′ ফুট। টেব্‌লটি হবে বড় বড় ড্রয়ারযুক্ত।

(৩) প্রদর্শনী টেব্‌লের বাম দিকে দেওয়ালে আলমারী থাকবে, তাতে থাকবে বই।

(৪) শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাকার্য করার জন্য দুই স্তম্ভে এবং তিন সারিতে ছয়টি টেব্‌ল থাকবে। টেব্‌লের আয়তন হবে ৬′×৩½′ ফুট এবং উচ্চতা হবে ৩′ ফুট। চারজন করে শিক্ষার্থী প্রতি টেব্‌লে কাজ করতে পারবে।

(৫) কক্ষের দৈর্ঘ্যের একদিকে দেওয়ালের দিকে সুদৃঢ় তাকের উপর কতকগুলি নিক্তি সাজান অবস্থায় থাকবে।

(৬) এই দেওয়ালের বিপরীত দিকের দেওয়ালের নিকট গ্যাস নল-যুক্ত একটি বড় টেব্‌ল থাকবে, সেখানে তাপ পরীক্ষা করা হবে।

(৭) বোর্ডের উল্টো দিকের দেওয়ালে দুটি কোণে দুটি আলমারি থাকবে।

(৮) আলমারি দুটির মধ্যে জলের বেসিন থাকবে।

(৯) বড় ও ছোট এই দুই ধরণের টুলই কাজের টেব্‌লের কাছে থাকবে।

(১০) বিশেষ করে রসায়ন পরীক্ষাগারে শিক্ষার্থীদের কাজ করবার জন্য গ্যাস ও জল সংযুক্ত এবং এসিড প্রমাণিত ১২′×৪½′ ফুট আয়তনবিশিষ্ট টেব্‌ল থাকবে, টেব্‌লের উচ্চতা হবে ৩′ ফুট। প্রত্যেকটি টেব্‌লের মধ্যে ৪½′ ফুট ব্যবধান থাকবে। আটজন করে প্রতি টেব্‌ল-এ কাজ করবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার সমস্যা।

আমাদের দেশে বিদ্যালয় গৃহের সমস্যা শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, গ্রামে বিজ্ঞানের ছাত্রসংখ্যা খুব বেশি থাকে না। অতএব সেখানে প্রতি বিষয়ের জন্য পরীক্ষাগার তৈরি করা অর্থের অপচয় মাত্র। এই সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বার্থসাধক পরীক্ষাগার ও সম্মিলিত বক্তৃতাগৃহ তৈরি করাই বিধেয়।

(ক) **সর্বার্থসাধক পরীক্ষাগার ও সম্মিলিত বক্তৃতাগৃহ**—এরূপ পরীক্ষাগারের আয়তন শিক্ষার্থীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। ২৪ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৪১½´×২২´ ফুট পরিমাপের কক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্বার্থসাধক বিজ্ঞানকক্ষের বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম এমনিভাবে থাকবে যাতে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়, যথা—পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েরই বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাদান কার্য, অর্থাৎ বক্তৃতা, পরীক্ষা প্রদর্শন, পরীক্ষার কাজ সব কিছুই চলতে পারে।

এরূপ কক্ষের প্রস্থের একটি দিকে থাকবে দেওয়াল বোর্ড। তার সম্মুখভাগে থাকবে তিন ফুট ব্যবধানে এসিড প্রমাণিত ও গ্যাসের নল ও জলের নল সংযুক্ত প্রদর্শনী টেব্‌ল। এর আয়তন হবে ৮´×২½´ ফুট পরিমাণবিশিষ্ট এবং উচ্চতা হবে ৩´ ফুট। ঘরের মাঝখানে অর্থাৎ প্রদর্শনী টেবিলের সম্মুখের দিকে ৬ ×২½´ ফুট পরিমাণবিশিষ্ট পরীক্ষা টেব্‌ল থাকবে। এগুলি থাকবে ছয় সারিতে ও দুই স্তম্ভে। এই টেব্‌লগুলি ইচ্ছামত সরান যেতে পারবে। টেব্‌লের উপর লেখা পরীক্ষণ—এই দুই কাজই চলবে। কক্ষের দু'পাশে জানালার উচ্চতায় জল ও গ্যাসের নলসংযুক্ত স্থায়ী বেঞ্চ থাকবে। এদের মাঝখানে থাকবে কিছু টেব্‌ল। টেব্‌লগুলির তলাগুলিতে তাক তৈরি করে সেখানে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সাজিয়ে রাখা যেতে পারে।

সর্বার্থসাধক পরীক্ষাগার ও বক্তৃতাগৃহ সংলগ্ন একটি প্রস্তুতি ও ভাণ্ডার গৃহ থাকবে। সেখানে বড় টেব্‌ল এবং আলমারি থাকবে ও যন্ত্রপাতি রাখার জন্য বিভিন্ন তাকের ব্যবস্থা থাকবে।

খরচের দিক থেকে বিবেচনা করে দেখলে সম্মিলিত বক্তৃতাগৃহ ও পরীক্ষাগার খুবই সুবিধাজনক। এরকম গৃহ তৈরি অনেক কম খরচে সম্পন্ন হয়। এরূপ সম্মিলিত গৃহের পরিকল্পনা তৎকালীন লাহোর সেণ্ট্রাল ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আর. এইচ. হোয়াটিহাউস দিয়েছেন (Dr. R. H. Whitehouse)।

এরূপ কক্ষের সুবিধা হচ্ছে :

(১) কম ব্যয়সাপেক্ষ ;

(২) একই ঘরে বিজ্ঞান পঠন ও পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয় বলে বিজ্ঞানের একটি পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

(৩) কাজের যেমন সুবিধা, তেমনি এই কক্ষে লেখার সুবিধাও আছে।

(৪) শৃঙ্খলাস্থাপন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এরূপ কক্ষ বেশি উপযোগী।

(৫) গ্যালারি বর্জন সম্ভব।

কারিগরি শিক্ষার কর্মশালা (Work Shop)।

কর্মশালা কথাটি বর্তমান সময়ে ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ—এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। কর্মশালায় কর্ম বলতে বাস্তব হস্তচালিত কর্মকেও যেমন বোঝায়, আবার তেমনি বর্তমান সময় মানসিক কার্যকারিতার ক্ষেত্রে intellectual workshop বা বৌদ্ধিক কর্মশালা হিসেবেও বোঝায়। বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে এই কর্মশালা পদ্ধতি বর্তমান সময়ে, বিদ্যালয় ক্ষেত্রে, মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ও বাণিজ্যিক বিষয়ক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হচ্ছে।

সঙ্কীর্ণ অর্থে কর্মশালা বলতে কামারশাল, দারুশিল্পশালা, মৃত্তিকাশিল্পশালা, বাঁশ-বেত্রশিল্পশালা ইত্যাদি অনেক কিছুকেই বোঝায়। বুনিয়াদী শিক্ষায় বিভিন্ন শিল্পকাজের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব সেই সব শিল্পও কর্মশালায় শিক্ষা দেওয়া হয়।

আমরা পূর্বে ব্যক্তিবৈষম্যের নীতির কথা অনেক আলোচনা করেছি। ব্যক্তিবৈষম্য আছে বলেই শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের মানসিক রুচি, পছন্দ, শক্তি ইত্যাদি। এই কারণেই অপরিবর্তনীয় পাঠ্যক্রম সকলের পক্ষে সমানভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে না।

এই তত্ত্ব ও যুক্তি থেকেই মুদালিয়র কমিশন বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সুপারিশ করেছেন। সাতটি পাঠধারা উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম স্থান পেয়েছে। সেগুলি হচ্ছে, (১) মানব বিজ্ঞান, (২) সাধারণ বিজ্ঞান, (৩) কৃষি, (৪) কলা, (৫) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, (৬) বাণিজ্য ও (৭) কারিগরি শিক্ষা।

শিক্ষার্থী তার রুচি, প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে এই সাতটি পাঠধারা হতে যে কোনও একটি বিশেষ পাঠধারা বেছে নিতে পারে।

যে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে কারিগরি পাঠধারা আছে এবং যে শিক্ষার্থীরা ঐ কারিগরি পাঠধারা নেবে তাদের জন্য ওয়ার্কশপ বা কর্মশালা তৈরি করতে হবে। কারিগরি পাঠধারা পাঠ্যসূচীতে ব্যবহারিক (Practical) দিকও আছে। কারিগরি পাঠধারায় একজন শিক্ষার্থীকে পাঁচটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয় হতে তিনটি বিষয় বেছে নিতে হয়।

প্রত্যেকটি বিষয়ে ব্যবহারিক দিক আছে এবং শিক্ষার্থীকে জ্যামিতিক

যন্ত্রপাতির বাক্স, করাত, হাতুড়ি, জোড় দেওয়ার যন্ত্রপাতি, (Welding instruments), কামারের নেহাই ও হাপর ইত্যাদি প্রায় সকল কিছু নিয়েই কাজ করতে হয়।

কর্মশালা বা ওয়ার্কশপটি সাধারণতঃ বিদ্যালয় সংলগ্ন খোলা মাঠের একাংশে স্থাপিত হয়। ওয়ার্কশপ শেডের উচ্চতা ১৫′ থেকে ১৮′ ফুট পর্যন্ত হবে। কর্মশালার ছাদ ঢেউ-খেলান এ্যাসবেশটোস শিট কিংবা টিনের দ্বারা তৈরি হওয়া উচিত। শেডের এককোণে কামারশালার হাপর বা অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে ছাদের উপর দিয়ে একটি চিমনি বসাতে হবে যাতে ধোঁয়া বের হয়ে যেতে পারে। ভারী যন্ত্র, যথা, 'লেথ' (Lathe) জমান সিমেন্টের উপর ভাল করে বসান প্রয়োজন। হয় দেওয়ালের বিভিন্ন তাকে যন্ত্রপাতি রাখতে হবে, না হয় যন্ত্রপাতির বাক্সে (Tool box) যন্ত্রগুলি রাখা যেতে পারে। কর্মশালার বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

স্বাধীনোত্তর ভারতে দক্ষ শিল্পী ও স্বল্প দক্ষতাসম্পন্ন শিল্পীর চাহিদা বেড়ে গেছে। তাই কারিগরি শিক্ষার চাহিদাও অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সব শিক্ষার্থী বিদ্যালয় থেকে কারিগরি শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে বের হয়েছে, এবং তারা আরও উচ্চ শিক্ষণের দিকে যাচ্ছে না, তারা অনায়াসে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায় কারিগরি শিক্ষণলাভের পর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজ পেতে পারে।

প্রদর্শনশালা (Museum)। *

মামুলি শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি এই শিক্ষা একান্তই পুস্তকভিত্তিক ও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু বর্তমান যুগের শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে বাস্তবভিত্তিক শিক্ষাদান। শিক্ষাকে যদি বাস্তবধর্মী করতে হয় তাহলে বিভিন্ন জিনিসের সমাবেশ প্রয়োজন। বিভিন্ন বিভিন্ন জিনিস শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ করে আনন্দ পাবে, তাদের জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। তারা নূতনকে জানবার জন্য তীব্র আগ্রহ অনুভব করবে। আগ্রহ-সঞ্চারকারী জ্ঞানস্পৃহা-বর্ধনকারী বিভিন্ন জিনিসের সমাবেশ করা যায় বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় বা প্রদর্শনশালায়। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন জিনিসের সমাবেশ এই প্রদর্শনশালায় থাকবে।

* Q. How would you organise a school museum ?

প্রদর্শনশালায় যাতে জিনিসগুলি সুষ্ঠুভাবে ও পাঠক্রম অনুযায়ী সজ্জিত থাকতে পারে তার জন্য যে সমস্ত আসবাবপত্র প্রয়োজন তা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কিনে দিবেন। শ্রেণীকক্ষে বিষয়শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষক প্রদর্শনশালা থেকে জিনিসগুলি নিয়ে যেতে পারেন, এবং পরে আবার সেই জিনিসগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে রাখবেন।

বিদ্যালয়ের প্রদর্শনশালায় বিভিন্ন বিভাগ থাকবে, এবং জিনিসগুলি শিক্ষার্থী-শিক্ষক সহযোগিতায় সংগৃহীত হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলি কিনতে ও তৈরি করতেও পারা যায়। নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভাগ হলে ভাল হয়।

(ক) বিভিন্ন পাথরের নমুনা, প্রস্তরীভূত গাছপালা, কঙ্কালাদি, জীবাশ্ম ইত্যাদি।

(খ) বিভিন্ন ধরণের মাটি,—জেলাবিশেষে।

(গ) বিভিন্ন ধরণের শস্যের নমুনা।

(ঘ) পাট, মেস্তা, শণ প্রভৃতির আঁশ।

(ঙ) কাঠের নমুনা—স্থানীয় কাঠ ও আমদানী করা কাঠ। কাঠের ছোট ছোট টুকরো থাকবে। গাছের গুঁড়ির আড়াআড়ি কাটা অংশ, যাতে গোল দাগগুলি দেখা যায়।

(চ) স্থানীয় তৈরি বিভিন্ন জিনিসের নমুনা; মাটির তৈরি, বাঁশের তৈরি, বেতের তৈরি, মাদুর কাঠির তৈরি, তালপাতার তৈরি, লোহার তৈরি জিনিস ইত্যাদি।

(ছ) প্রাচীন মুদ্রা বা তার নকল, প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ হতে সংগৃহীত ইট, প্রাচীন যুগের মূর্তি, ইত্যাদি।

(জ) স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কিত ছবি, যেমন মন্দির, মসজিদ, পোড়ো বাড়ী প্রভৃতির ছবি, নকশা ইত্যাদি, এবং স্থানীয় অন্যান্য প্রাচীন জিনিসের নমুনা বা ছবি।

(ঝ) স্থানীয় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য—স্থানীয় পর্যায়ে ও জেলা পর্যায়ে, ছবি, মডেল, নক্শা ইত্যাদি।

(ঞ) বিজ্ঞানবিষয়ক নানা ছবি, মডেল ইত্যাদি।

(ট) স্থানীয়, জেলা পর্যায়ে ও রাজ্য পর্যায়ে বিভিন্ন প্রখ্যাত মনীষীদের ছবি, বড় বড় ইমারৎ ইত্যাদির আদর্শ ও ছবি।

(ঠ) সর্বভারতীয় পর্যায়ে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অট্টালিকা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সমাধি, পুল, প্রভৃতির ফটো ইত্যাদি।

(ড) বিভিন্ন মনোরম দৃশ্যের ছবি—নদী, সমুদ্র, পর্বতমালার।

(ঢ) বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শিল্পবিভাগে বা কর্মশালায় তৈরি নানা জিনিস।

(ণ) বিদ্যালয়ের কর্মব্যস্ততার ছবি।

(ত) প্রাণীবিদ্যাবিষয়ক বিভিন্ন জিনিস। পাখীর ডিম, পাখীর বাসা ইত্যাদি।

(থ) পরিসংখ্যানবিষয়ক কাজ।

উপরে প্রদর্শনশালায় রক্ষার জন্য কয়েক ধরণের জিনিসের কথা উল্লেখ করা গেল। এছাড়াও শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্প্রদায় যদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে পারেন তবে ত ভালই। একদিনেই বিদ্যালয়ের প্রদর্শনাগার গড়ে উঠবে না, দীর্ঘকালীন সমবেত প্রচেষ্টায় প্রদর্শনাগারটি গড়ে উঠবে।

আমরা ভূমিকায় প্রদর্শনাগারটি কিভাবে ব্যবহৃত হবে তার কথা বলেছি। এখানে প্রদর্শনাগারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা জানব। প্রদর্শনাগারের উদ্দেশ্য হল :

(১) শিক্ষার্থীর জীবনে নানাদিকে আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের বিকাশ সাধন।

(২) শিক্ষার্থীর সাংগঠনিক শক্তির বিকাশ সাধন।

(৩) শিক্ষার্থীর সংগ্রহ প্রবৃত্তির বিকাশ সাধন।

(৪) শিক্ষার্থীদিগকে সযত্নে বস্তু সংরক্ষণের জন্য অভ্যাস গঠনে সাহায্য করা।

(৫) শিক্ষার্থীদিগকে সৃজনীশক্তির আনন্দ উপভোগ করতে শিক্ষা দেওয়া।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বিদ্যালয়ের প্রদর্শনাগার সম্বন্ধে বলেছেন যে, বিদ্যালয়ের প্রদর্শনাগার শিশুদের ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে আছে, কারণ প্রদর্শনাগারে বক্তৃতার চেয়ে বেশী উৎসাহবর্ধক যেহেতু তা বিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে বর্তমান ও অতীত যুগের আবিষ্কার ও উন্নতিমূলক বিকাশ বেশি স্পষ্ট করে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরতে পারে।[১]

১। Mudaliar Commission : Museums play a great part in the education of school children as they bring home to them much more vividly than any prosaic lectures, the discoveries of the past and the various developments, that have taken place in many sided fields of of science and technology.

বিষয়কক্ষ (Subject rooms)। *

শ্রেণীকক্ষ ছাড়াও আরও কতকগুলি বিশেষ কক্ষ থাকবে, সেগুলি হবে বিষয়কক্ষ। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করার সময় বিভিন্ন শিক্ষোপকরণের প্রয়োজন হয়। শিক্ষোপকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদিগের জন্ম শিক্ষাদান আকর্ষণীয় করে তোলা। শুধু মৌখিক বক্তৃতাদানের মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হতে পারে না, সেই স্থলে বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় করবার জন্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলিকে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। আমরা প্রথম বিভাগে শিক্ষোপকরণের কথা আলোচনা করেছি। শিক্ষোপকরণ বিশেষভাবে শিক্ষা সহায়ক তাও জানা গিয়েছে। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানকালে বিভিন্ন শিক্ষককে অফিস গৃহ, লাইব্রেরী ইত্যাদি হতে শিক্ষোপকরণের আনা-নেওয়া করতে হয়। এরূপ আনা-নেওয়ার ফলে শিক্ষোপকরণগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, আর তাছাড়া সময়েরও যথেষ্ট অপব্যবহার হয়। এ কারণে কতকগুলি বিষয় যা পাঠদানকালে শিক্ষোপকরণের প্রয়োজন বেশি, সেই সমস্ত বিষয় শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণীকক্ষের পরিবর্তে যদি বিষয়কক্ষ পাওয়া যায় তাহলে ভাল। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান, হস্তশিল্প প্রভৃতির জন্য বিষয়কক্ষ থাকা প্রয়োজন।

বিষয়কক্ষে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্ম যত রকম শিক্ষোপকরণ সম্ভব শ্রেণীতে সাজিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট শিক্ষোপকরণ শ্রেণীর সম্মুখভাবে আনা যেতে পারে।

আমরা এখানে ইতিহাসের বিষয়কক্ষ নিয়ে আলোচনা করব। অন্যান্য বিষয়কক্ষ একই ধারায় সজ্জিত থাকবে।

ইতিহাসের বিষয়কক্ষের গুরুত্ব।

(১) বিষয়কক্ষের মধ্যে ইতিহাসের এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করা যাতে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তির উৎসাহবর্ধক হয়।

(২) বিষয়কক্ষে শিক্ষোপকরণ সজ্জিত থাকলে এগুলিকে অন্য কক্ষ থেকে নিয়ে আসার পরিশ্রম ও সময়-সংক্ষেপ করা চলে।

(৩) আনা-নেওয়ায় শিক্ষোপকরণগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

---

* Q. For what subjects would you have special rooms? What is the importance of a subject rooms? Describe the equipments of any one?

(৪) বিষয়কক্ষ একটি কর্মশালায় পরিবর্তিত হয় এবং শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক কাজে প্রবৃত্ত হতে পারে।

শিক্ষোপকরণ।

(১) বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশের কৃষ্টিসূচক ছবি।

(২) ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিভিন্ন রাজা, মহারাজা, সম্রাটের প্রতিকৃতি।

(৩) ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি।

(৪) সময়-রেখা—বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের।

(৫) পৃথিবীর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সময় রেখা।

(৬) বিভিন্ন রাজাদের বা রাণীর রাজত্বকাল।

(৭) প্রতিপক্ষ শক্তিসমূহের বিবরণমূলক চার্ট, গ্রাফ ইত্যাদি।

(৮) যুদ্ধ ইত্যাদির ছবি ও আদর্শ; ঐতিহাসিক পথের ছবি, নক্শা ইত্যাদি।

(৯) একটি প্রদর্শনাগার—তাতে থাকবে মূলতঃ স্থানীয় ইতিহাসের তথ্য, বিভিন্ন যুগের মুদ্রা ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে যেসব জিনিসের কথা উল্লেখ করা হল, তার প্রত্যেকটিই যে ইতিহাসকক্ষে রাখতে হবে, এমন কিছু কথা নেই, তবে যথাসম্ভব রাখলে ভাল। তাছাড়া সুবিন্যস্তভাবে ইতিহাসকক্ষে জিনিসগুলি সজ্জিত থাকবে, তাই হচ্ছে বড় কথা। বিভিন্ন জিনিস ধীরে ধীরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় সংগৃহীত হবে।

ইতিহাসকক্ষের মতই ভূগোলকক্ষ এবং সমাজ-বিদ্যার কক্ষ, বিভিন্ন দর্শন-শ্রবণ সহায়ক জিনিসদ্বারা সুবিন্যস্তভাবে সাজান থাকবে। এই কক্ষগুলির উপকরণের বিবরণ এখানে আর বলা হল না। শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিসপত্র সংগ্রহ করবেন এবং শিক্ষার্থীদিগকে সংগ্রহ করতে বলবেন।

খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার (Play ground and Gymnasium)। *

খেলার মাঠ সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাবার পূর্বে খেলার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা কর্তব্য।

---

* Q. What is the importance of play ground and Gymnasium in a school?

পূর্বে অনেক পণ্ডিতই খেলাতে সময় নষ্ট হয় বলতেন। তাঁরা বলতেন যে খেলাদ্বারা কোন মঙ্গল সাধিত হয় না। তাঁদের মতে খেলা যেহেতু উদ্দেশ্যহীন ও অর্থহীন, সেইহেতু তা থেকে কোন সুফল পাওয়া যাবে না।

বর্তমান যুগের লেখক ও পণ্ডিতগণের দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য বিভিন্ন। তাঁদের মতে খেলা ও কাজ দুটি পৃথক বিষয় নয়। মূল কথা হচ্ছে মনের দৃষ্টিভঙ্গী। কোনও কর্মকে খেলায় রূপান্তরিত করতে হলে, সেই কর্মকে সুখপ্রদ করে তুলতে হবে।

স্বাধীনতাই হচ্ছে খেলার মূল সূত্র। যখন কোনও কর্মের প্রতি শিশুর মনোভাব থাকে সহজ, সরল ও স্বাধীন, তখন সেই কর্ম খেলার রূপ নিয়ে থাকে। আনন্দ ও স্বাধীনতা যে সমস্ত কর্মের মধ্যে থাকে, তাকেই আমরা সাধারণতঃ খেলা বলি।

বর্তমান যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে খেলার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে নানা ধরণের খেলার বন্দোবস্ত থাকবে এবং সেখানে খেলার একটি মাঠ থাকা প্রয়োজন।

একটি খেলার মাঠ বললে, বর্তমান যুগে খেলার প্রচলিত রূপটি মনে করে শুধু একটি ফুটবল খেলার মাঠ থাকলেই বিদ্যালয়ের চলবে না। বিদ্যালয়ে থাকবে বিরাট একটি খেলার মাঠ। তাতে থাকবে ফুটবল, ক্রিকেট ও হকির জন্য নির্দিষ্ট মাঠ, আয়তন ১৩০ গজ × ১০০ গজ (সবচেয়ে বড়) আর ১০০ × ৮০ গজ (সবচেয়ে ছোট)। তার চারদিকে বাস্কেটবল, ভলিবল, টেনিকয়েট, কাবাডি, খো খো, হিন্দুস্থান বল, ব্যাটমিণ্টন, হাডু-ডু, দাড়িয়াবাঁধা, গোল্লাছুট ইত্যাদি খেলার জন্য স্থান নির্দিষ্ট থাকবে। বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা কম করে যদি ২৪০ জন ধরা যায়, তাহলে ফুটবল বা হকি বা ক্রিকেট মোটে ২২ জন খেলবে। এই কারণে যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক ছাত্রের খেলার ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। মেয়েদের জন্য ফুটবল, ক্রিকেট বা হকি খেলার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে রাখার প্রয়োজন নেই। ব্যাটমিণ্টন, ভলিবল, টেনিকয়েট ইত্যাদি খেলার প্রত্যেকটির জন্য ৩।৪টি কোর্ট কেটে রাখলে ভাল হয়।

খেলার মাঠ সম্বন্ধে নানা উক্তি প্রচলিত আছে। একে কেউ কেউ

বলেন "The play-ground is an uncovered school" অর্থাৎ খেলার মাঠ হচ্ছে উন্মুক্ত আকাশের তলায় বিদ্যালয়।* বিদ্যালয়ের কাজ কি? শিক্ষাদান। বিদ্যালয় যেমন শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে সাহায্য করে, তেমনি খেলার মাঠও শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভে সাহায্য করে থাকে।

খেলার মাঠ হচ্ছে গণতন্ত্রের লীলাভূমি। বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলা সাধারণ মানুষকে আদর্শ নাগরিক তৈরি করে তোলে।

(১) **সহযোগিতা শিক্ষার সহায়ক**—খেলার মাঠে দলীয় খেলা হয় এবং দলীয় খেলাকেই কেন্দ্রবিন্দু করে খেলার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যদি খেলোয়াড়েরা দলীয় স্বার্থ বজায় না রেখে ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে শুধু খেলা করতে যায়, তাহলে সেই খেলা সার্থক খেলায় পরিণতি লাভ করবে না। খেলাধূলাতে খেলোয়াড়েরা দলীয় সম্মানের জন্য খেলা করে এবং বিশ্বস্ততা ও সহযোগিতা শিক্ষালাভ করে।

(২) **জীবনের জন্য প্রস্তুতি**—নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে খেলোয়াড়দের খেলতে হয়। সেখানে আদর্শ, ধৈর্য, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহের অভ্যাস করতে হয়। এগুলি শিক্ষার্থীর উত্তর জীবনে গিয়ে প্রতিফলিত হয়।

(৩) **নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ**—খেলাধূলায় নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ থাকে। দলীয় নেতার দূরদৃষ্টি, আত্মবিশ্বাস, ইত্যাদি থাকলেই সে অপরকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

(৪) **বিভিন্ন ইন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ**—William Gowers বলেছেন, বিদ্যালয়ের খেলাধুলা নানা ধরণের সক্রিয়তার সঙ্গে বিজড়িত। প্রায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকরী রূপ এখানে প্রকাশ পায়। তুলনাকরণ ও বিচার এস্থলে বিশেষ প্রয়োজনীয়।[১]

(৫) **শারীরিক বিকাশ**—খেলাধূলা শারীরিক সুস্থতার সহায়ক এবং অর্থের চাইতেও স্বাস্থ্য বেশি মূল্যবহ।

(৬) **উদ্যমের উপর বেশি গুরুত্ব**—সাফল্যের চাইতে উদ্যমের উপর খেলাধূলায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। Baron de Combertin বলেছেন,

---

* **Q. "The play ground is an uncovered school"—Discuss**

১। William Gowers : School games involve a wide range of activity. Most of the senses are called into action. Comparison and judgment are needed.

খেলাধূলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, জয় করা নয়, খেলায় অংশ গ্রহণ করা। জীবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, জয়ী হওয়া নয়, উদ্যমী হওয়া, ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজ কর্তব্য সুসম্পন্ন করা।[১]

(৭) **অবসর সময়ের উপযুক্ত ব্যয়**—অবসর সময়ে চুপ করে বসে থাকলে মনে অলস চিন্তার উদয় হয় এবং তা ব্যক্তি স্বাস্থ্যমানসের পক্ষে ক্ষতিকর। সেক্ষেত্রে মাঠে খেলাধূলা করলে, অবসর সময় উপযুক্তভাবে ব্যয়িত হতে পারে।

(৮) **চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্র**—সর্বশেষ বলতে পারা যায়, খেলার মাঠ শিক্ষার্থীদের সুচরিত্র সৃষ্টির একটি ক্ষেত্র। খেলার মাঠে খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষার্থী আত্মসংযম, সাহস, স্থিরবুদ্ধি, অধ্যবসায়, আনুগত্য, নীতিজ্ঞান, মহত্ব ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে। এতগুলি গুণের অধিকারী যদি শিক্ষার্থী হয় তাহলে তাকে চরিত্রবান নিশ্চয়ই বলতে হবে। শেষ পর্যন্ত Aldous Huxley-র একটি উদ্ধৃতি দিয়ে খেলার মাঠের প্রভাবের কথা শেষ করব। তিনি বলেছেন যে, মানুষের মঙ্গল ও অমঙ্গল বিধায়ক যে সব কর্মপন্থা সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে খেলাধূলাও একই ধাচে তৈরি। যদি খেলাধূলার উপযুক্ত প্রয়োগ হয়, তাহলে তা শিক্ষার্থীকে সহনশীলতা, সাহস, নিরপেক্ষতা আইনকানুনের প্রতি শ্রদ্ধা, সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা এবং দলীয় স্বার্থের কাছে স্বীয় স্বার্থের নতি স্বীকার ইত্যাদি শিক্ষা দেয়। আর খারাপ ভাবে ব্যবহার করলে খেলাধূলা ব্যক্তিগত দেমাক, দলীয় অহংকার, জয়ের জন্য লোভ, প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা, ইত্যাদি সৃষ্টি করে।[২]

খেলার মাঠ সম্বন্ধে আরও একটি সুন্দর কথা আছে, "The battle of Waterloo was fought in the playing field of Eton"। এর অর্থ

১। Baron de Combertin: The important thing in sports is not to win, but to take part. The important thing in life is not to the triumph, but the struggle. The essential thing is not to have conquered but to have fought well. To spread these precepts is to build up a stronger and more scrupulous and more generous humanity.

২। Aldous Huxley: Like every other instrument that man has invented, sports can be used either for good or for evil purpose. Used well, it can teach endurance, and courage, a sease of fair play and a respect for rules, cordinated effort and the subordination of personal interest to those of the group. Used badly if can encourage personal vanity, group vanity, greedy desire for victory and hatred for rivals.

হচ্ছে Etonএর খেলার মাঠেই ওয়াটারলুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ওয়াটারলুর যুদ্ধ হয়েছিল ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন ও ইংরেজ সমরাধিনায়ক ডিউক অব ওয়েলিংটনের সাথে। ডিউক অব ওয়েলিংটন ইটনে পড়তেন এবং খেলাধূলার মাধ্যমে নিখুঁত ভাবে পরিকল্পনা করা, সাহসিকতা, স্থৈর্য, অধ্যবসায়, নেতৃত্ব ইত্যাদি গুণাবলীর অধিকারী হন, যার ফলে তিনি ওয়াটারলুর যুদ্ধে সেই গুণাবলীর প্রয়োগ করে যুদ্ধে জয়ী হন। অতএব বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খেলার মাঠ সংরক্ষণ।

খেলার মাঠের গুরুত্ব কতখানি তা আমরা দেখলাম। এটি এত শিক্ষাপ্রদ বলেই এর সংরক্ষণও বিশেষ প্রয়োজনীয়। যা থেকে শিক্ষার্থীরা নানাগুণের অধিকারী হয় সেই ক্ষেত্রকে যথাসম্ভব যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করাই কর্তব্য। নিম্নলিখিত উপায়ে খেলার মাঠের সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

(ক) খেলার মাঠে গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে জল দেওয়া, (খ) আগাছা উৎপাটন, (গ) খেলার মাঠকে ইটপাথর মুক্ত রাখা, (ঘ) বর্ষার পর মাঝে মাঝে খেলার মাঠের গর্ত মাটি চাপা দিয়ে তার উপর ঘাসের চাপড়া দেওয়া, (ঙ) মাঝে মাঝে ঘাস কাটার যন্ত্র (Lawn mower) দিয়ে খেলার মাঠের ঘাস কাটা, (চ) রোলার চালিয়ে খেলার মাঠকে সমতল করা, (ছ) মাঠের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, (জ) চূণের দাগ দিয়ে খেলার মাঠের বিশেষ বিশেষ স্থান চিহ্নিতকরণ, (ঝ) কিছু কাঠের গুঁড়ো রাখা যা প্রয়োজনবোধে মাঠে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ব্যায়ামাগার (Gymnasium)।

খেলার মাঠের মত ব্যায়ামাগার বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজনীয় গৃহ। আমাদের দেশে ব্যায়ামাগারের সংখ্যা খুব কম। অপেক্ষাকৃত পুরাতন সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা শহরের প্রসিদ্ধ বেসরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যায়ামাগার দেখা যায়। Gymnasium বা ব্যায়ামাগারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ব্যায়ামাগার হচ্ছে একটি স্থান, কক্ষ বা গৃহ, যেখানে ব্যায়ামশিক্ষার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যায়ামের অনুশীলনের জন্য রক্ষিত হয়।

ব্যায়ামাগারটির ছাদ হবে যথেষ্ট উঁচু। মেঝেটি পাকা হবার কোন প্রয়োজন নেই। গৃহের চারদিকে দেওয়াল না থাকলেও চলে, তবে কোণে একটি ঘেরা ঘর থাকবে, যেখানে খেলার বিভিন্ন জিনিস রাখতে হতে পারে। ব্যায়ামাগারে বিভিন্ন ধরণের ব্যায়াম সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির মধ্যে প্যারালাল বার (Parallel bars) ভার উত্তোলনের বিভিন্ন ওজন, গদা, চেষ্ট এক্সপাণ্ডার (Chest expander) ইত্যাদি থাকবে।

ব্যায়ামাগারে শরীর সঞ্চালনের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যতীত, দেশী ও বিলাতী বিভিন্ন ছবি যাতে শরীরের মাংসপেশীগুলির উপযুক্ত বিকাশের ছবি আছে তা ব্যায়ামাগারে থাকবে। কোন কোনও শরীর সঞ্চালনে মুখের বিকৃতি হতে পারে। সেদিকে সাবধানতার জন্ম ব্যায়ামাগারে বড় আয়না থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থী আয়নায় নিজের মুখ দেখে সংযত হতে পারবে।

আমাদের দেশ মৌসুমী বায়ুর দেশ। অনেক সময়েই শারীর শিক্ষণের জন্ম নির্দিষ্ট পিরিয়ডে বৃষ্টি হয়। তখন শারীর শিক্ষণ ব্যায়ামাগারে চলতে পারে।

বিভালয়ের পাঠাগার (School Library)।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কমিশন পাঠাগার সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কমিশন বলেছেন যে, উত্তম শিক্ষাদানের ও গবেষণার ক্ষেত্রের গুরুত্বের দিক থেকে পাঠাগারের ভূমিকা শিক্ষকদের পরেই।[১] কবি Robert Southey বলেছেন, অতীত যুগের শক্তিশালী মনের পরিচয় পাই পাঠাগারের বইয়ের মাধ্যমে।

শিক্ষার্থীর পক্ষে পাঠাগার প্রয়োজন তার জ্ঞানের ক্ষুধা মেটাবার জন্ম। আর শিক্ষকের পক্ষে পাঠাগারের প্রয়োজন নূতন নূতন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্ম, যাতে করে তিনি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানপিপাসা মেটাতে সক্ষম হন।

মুদালিয়র কমিশন (মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন) বলেছেন, পাঠাগার হচ্ছে বিভালয়ের বৌদ্ধিক ও সাহিত্যিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র এবং এর ভূমিকা হচ্ছে

১। President Trueman Commission on higher Education: The library is second only to the instructional staff in its importance for high quality of instruction and research.

বিজ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে পরীক্ষাগারের যে সম্পর্ক, কিংবা কারিগরি বিষয়ের সঙ্গে কর্মশালার যে সম্পর্ক সেই রকম।[১]

সমস্ত প্রগতিশীল দেশে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠাগারের গুরুত্ব ভাল করেই অনুভব করা যাচ্ছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার প্রাণসূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদ্যালয়ের পাঠাগার।

বর্তমানে শিক্ষাবিদেরা প্রায় সকলেই একমত যে, শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই বেশি শিক্ষা লাভ করে এবং এজন্যই পাঠাগারের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেছেন যে ব্যক্তিগত কাজ, দলীয় কার্যসমস্যা পদ্ধতির বিভিন্ন শখ বা hobby সম্পর্কিত অনুসরণ এবং বিভিন্ন সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী একটি উত্তম এবং সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের অবস্থিতিই প্রকাশ করে।

জ্ঞানলাভের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা যায় না। অতএব আজকার যে শিক্ষার্থী সে সারাজীবনই শিক্ষার্থী থেকে যেতে পারে যদি সে গ্রন্থাগারের সুবিধাটুকু লাভ করতে পারে। অতএব গ্রন্থাগারের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার (School library and Public library)।*

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগারের মধ্যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য আছে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য। অতএব বিদ্যালয়ে যেসব বিষয়ের পঠন পাঠন হয়, শুধু সেই জাতীয় বই এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বই বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে থাকবে। তাছাড়া শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমাজ উভয়ের প্রয়োজনে আসে এমন সমস্ত পুস্তকাদিই সেখানে থাকবে। তাহলে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহকে দু'টি সাধারণ ভাগে বিভক্ত করা বলে। প্রথমটি হচ্ছে, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য

১। Mudaliar Commission : The library will be hub and the centre of the intellectual and literary life of the recognised school and play the same part visa-vis all the other subjects as the laboratory plays for science subjects or the workshop for technical subjects.

* Q. What are the differences between a school library and a public library?

পুস্তক আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, শিক্ষকদের প্রয়োজনে শিক্ষাদানে সাহায্যকারী পুস্তক। মাসিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকাও এই দুই শ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত।

কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য যে গ্রন্থাগার তা হবে অন্যরকমের। সর্বসাধারণের পাঠাগারে বিভিন্ন রুচির পাঠকেরা এসে থাকেন এবং গ্রন্থাগারে তাঁদের সকলের রুচি ও চাহিদা মেটাতে পারে এমন পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা থাকবে। অবশ্য এমন পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা আসবে না, যেগুলি নীতিগতভাবে এবং দেশীয় আদর্শের পরিপন্থী বলে বিবেচিত। সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার বেশি গুরুত্বলাভ করেছে স্বাধীনোত্তর যুগে। ঐ সময় রাজ্যসরকারের আনুকূল্যে জেলা গ্রন্থাগার (District Library) এবং জেলার অন্যান্যস্থানে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (Area Library) স্থাপিত হয়। জেলা গ্রন্থাগারের প্রচুর পুস্তকের সমাবেশ, এবং এখানে গবেষকরাও গবেষণা করতে সক্ষম হন। কিন্তু আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের পুস্তকের সংখ্যা অনেক কম, সেখানে গল্প, সাহিত্য, উপন্যাস প্রভৃতি পুস্তকের আধিক্য।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কাজ।*

একটি সুপরিচালিত বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার হতে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায়:

(১) গ্রন্থাগার প্রগতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতির সহায়ক, কারণ শিক্ষার্থীরা সেখানে ব্যক্তিগতভাবে স্বীয় প্রচেষ্টায় শিক্ষালাভ করতে পারে।

(২) শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজনীয় মূল্যবান পুস্তক ক্রয় করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীকে সকল প্রকারের গ্রন্থ সরবরাহ করতে সক্ষম।

(৩) শিক্ষার্থীদের চোখের সম্মুখে অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার খুলে রেখে গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীদের মনকে উদার ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী করে তুলতে পারে।

(৪) গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীকে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী অনুসরণ করতে সাহায্য করে থাকে। শিক্ষার্থীকে বিতর্ক-সভার জন্য মালমশলা সরবরাহ, বক্তৃতাদানের জন্য তথ্য সঙ্কলন, বিদ্যালয়ের পত্র-পত্রিকায় লিখবার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ, ইত্যাদির জন্য গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীকে তৈরি করতে সহায়তা করে।

---

* Q. What are the functions of a school library?

(৫) শিক্ষার্থীর অবসর সময় উদযাপনের জন্য গ্রন্থাগারই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বন্ধু।

(৬) গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীকে এমন সব পুস্তক সরবরাহ করে থাকে, যা তার চরিত্র গঠনের পক্ষে সহায়ক।

(৭) গ্রন্থাগারে পুস্তক সংরক্ষণের শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীকে পুস্তক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়।

(৮) গ্রন্থাগারে পাঠ করার সময় নীরবে পাঠ করতে হয়। সরব পঠনে যেমন স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, তেমনি অপরের মনোযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে হানিকর। গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থী নীরব পঠনে অভ্যস্ত হলে, সে অন্যান্য সময়ে একই রূপ আচরণ করবে।

(৯) বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা বিধায়ক হচ্ছে গ্রন্থাগার, কারণ শিক্ষার্থী গ্রন্থাগারে গেলে সে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা নষ্ট করার কোন সুযোগ পাবে না।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার শুধু বৌদ্ধিক জ্ঞানই সরবরাহ করে না। গ্রন্থাগার হচ্ছে, বিদ্যালয়রূপ দেহের আত্মা। শুধু শিক্ষার্থীকুল নয়, শিক্ষক সম্প্রদায়ও গ্রন্থাগার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হন। তাঁরা পাঠ্যপুস্তকের বহির্ভূত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবহিত হন, এবং শ্রেণীশিক্ষণকে নূতন তথ্য সম্বলিত করে পাঠদান প্রাণস্পর্শী করতে পারেন।

গ্রন্থাগারের কার্যকারিতা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ এড্‌মনসন (Edmonson) সংক্ষেপে বলেছেন যে, বর্তমান বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার একটি বিশেষ সেবাকেন্দ্র বলে বিবেচিত। আগ্রহের বিকাশ এবং সম্প্রসারণের জন্য গ্রন্থাগার মালমশলা সরবরাহ করে থাকে। গ্রন্থাগারের সাহায্যকারী পুস্তক, সূচীপত্র, গ্রন্থপঞ্জী, পুস্তক-তালিকা ইত্যাদির মাধ্যমে সমগ্র জ্ঞান-ভাণ্ডারকে আলোড়ন করা চলে। গ্রন্থাগার শিক্ষাদানের অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করে চলে এবং শিক্ষার্থীকে গ্রন্থাগারের পুস্তকের উপযুক্ত ব্যবহার করতে, উপযুক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে এবং পাঠ করতে শেখায়। গ্রন্থাগার তার ইস্তাহার, পুস্তক প্রদর্শনী, প্রাচীরপত্র এবং পরিবেশদ্বারা পরোক্ষভাবে শিক্ষাদান করে থাকে।[১]

১। Edmonson: The modern school library is conceived as a genuine service unit. It supplies materials for developing and expanding interests. Through its reference tools, indexes, bibliographies and catalogues. the realms of knowledge may be explored. The library co-operates with other agencies of instruction in helping students to use books and libraries to find information and to study. By its bulletin exhibits, posters and atmosphere, the library teaches informally.

প্রচলিত গ্রন্থাগারের ত্রুটি। *

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সখেদে বলেছেন যে, আমাদের গ্রন্থাগারগুলি আশানুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। গ্রন্থাগারগুলি বস্তুতঃ তাদের নামের উপযুক্ত নয় কারণ তারা শিক্ষার্থীদিগকে পুস্তকাদি ভালভাবে পড়তে এবং পড়ার অভ্যাস গঠন করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে না। গ্রন্থাগারের ত্রুটি সমূহ নিম্নে সন্নিবেশিত হল।

১। গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন ব্যবস্থা এমনই ত্রুটিপূর্ণ যে এতে না হচ্ছে শিক্ষার্থীর উপকার, না হচ্ছে শিক্ষকের উপকার। যেহেতু পরিচালনায় অব্যবস্থা, সেইহেতু এগুলির জীবনীশক্তিও প্রকৃতপক্ষে হ্রাস পাচ্ছে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অভাব। গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিষয়-শিক্ষকের উপরেই ন্যস্ত বলে শিক্ষকগণ এবিষয়ে সত্যিকার আগ্রহ দেখাতে সক্ষম হন না।

২। গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহ শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত নয়, কারণ পুস্তকগুলি সাধারণতঃ পুরাতন এবং শিক্ষার্থীর মানসিক স্তরের পক্ষে অনুপযুক্ত।

৩। শিশুদের উপযোগী পুস্তকের অভাব। শুধু উঁচু শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু পুস্তক শেলফে সাজান থাকে মাত্র।

৪। গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক কেনার টাকা পাওয়া গেলে শুধু শিক্ষকদের উপযুক্ত পুস্তক ক্রয় করা হয়। এই পুস্তকসমূহ শিক্ষার্থীদের বোধগম্য হয় না।

৫। বিদ্যালয় গৃহের মধ্যে মাত্র একটি কক্ষ গ্রন্থাগার হিসাবে নির্দিষ্ট থাকে। গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত আয়তনবিশিষ্ট একাধিক কক্ষ চাই।

৬। গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র অনেক বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীদের বসে শান্তভাবে পড়বার উপযুক্ত নয়। কোন কোন গ্রন্থাগারে স্থানের এত অপ্রতুলতা যে শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়ে থেকে বই পড়তে হয়।

গ্রন্থাগারের ত্রুটিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনা ব্যবস্থা কিরূপ হবে, তা আমরা বিচার করে দেখতে পারি।

একটি উত্তম গ্রন্থাগারের সংগঠন ও পরিচালনা (Organisation of a good library)। **

একটি উত্তম গ্রন্থাগারের সংগঠন ও পরিচালনার জন্য নানা দিক বিচার করে দেখা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

* Q. What are the defects of a traditional library ?
** Q. How would you organise a good library ?

(১) পুস্তকাদি, (২) গ্রন্থাগার ও তার আসবাবপত্র, (৩) গ্রন্থাগারিক, (৪) গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নিয়মকানুন, (৫) পুস্তক তালিকাভুক্তকরণ ও (৬) প্রচার।

(১) পুস্তকাদি।

মাধ্যমিক কমিশনের মতানুযায়ী গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক নির্বাচন নীতি শিক্ষকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না, শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক ও মনস্তত্ত্বসম্মত মনোভাব অনুযায়ী পুস্তক নির্বাচিত হবে।

চার ধরণের পুস্তক গ্রন্থাগারে থাকতে পারে।

(ক) ছোট শিশুদের জন্য পুস্তক—নানা গল্প ও সুন্দর সুন্দর রঙীন ছবি সম্বলিত পুস্তক।

(খ) অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য পুস্তক—

১। ভ্রমণ কাহিনী, আবিষ্কারের কাহিনী, দুঃসাহসিক কাহিনী ইত্যাদি।

২। বিখ্যাত পুরুষ ও মহিলার জীবনচরিত।

৩। হাস্যরসযুক্ত উপন্যাস।

৪। পাঠ্যপুস্তকের সমান্তরাল পুস্তক।

৫। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত পুস্তক।

৬। উৎস পুস্তক ও সাহায্যকারী পুস্তক।

৭। নানা ধরণের অভিধান।

(গ) শিক্ষকদের জন্য পুস্তক—সকল বিষয়-সম্পর্কিত শিক্ষকগণ এক সভায় মিলিত হবেন এবং সেখানে গ্রন্থাগারিকও উপস্থিত থাকবেন। বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের যেসব সাহায্যকারী পুস্তকের প্রয়োজন হবে তা কেনার সুপারিশ করবেন বিষয়-শিক্ষকগণ। আলোচনান্তে সেই তালিকা গৃহীত হবে এবং সেই পুস্তকসমূহ স্থান পাবে গ্রন্থাগারে।

(ঘ) বয়স্কদের জন্য পুস্তক—বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের যোগাযোগ সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত। সমাজের সভ্যগণ অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে আনাগোনা সর্বদাই চলছে। তাঁদের জ্ঞানপিপাসা মেটাবার জন্য কিছু পুস্তক গ্রন্থাগারে রাখা উচিত।

(২) গ্রন্থাগার ও তার আসবাবপত্র।

গ্রন্থাগারে থাকবে সুন্দর ভাবে তৈরি আসবাবপত্র, থাকবে বসবার উপযুক্ত ব্যবস্থা। তাছাড়া বইয়ের জন্য থাকবে উন্মুক্ত তাক (open shelves) যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বই সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারে বসে পড়তে পারে।

(৩) গ্রন্থগারিক।

পূর্বে উল্লেখ করা গিয়েছে যে বিদ্যালয়ে স্থায়ী গ্রন্থগারিকের পরিবর্তে শিক্ষকগণই নিজ নিজ সুবিধা ও অবসর অনুযায়ী গ্রন্থগারিকের কাজ করে থাকেন। শিক্ষকদের কাজ হচ্ছে মুখ্যত শিক্ষাদান। তিনি যদি দুই নৌকায় পা দেন, তাহলে কোন কাজই তিনি সঠিকভাবে করতে পারবেন না। তাছাড়া শিক্ষক অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্যই গ্রন্থাগারে উপস্থিত থাকতে পারেন। এই কারণেই বিদ্যালয়ে সব সময়ের জন্য স্থায়ী গ্রন্থগারিক প্রয়োজন। গ্রন্থগারিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বন্ধু-ভাবাপন্ন হবেন এবং তিনি ছাত্রদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য কোথায় গিয়ে পর্যবসিত হয় সে সম্বন্ধে অবহিত থাকবেন। গ্রন্থগারিক হবেন শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং তিনি গ্রন্থগারিকের সকল কার্যাদি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে সম্পন্ন করবেন।

(৪) গ্রন্থাগারের নিয়ম-কানুন।

(ক) গ্রন্থাগারে পঠনের জন্য সময়কাল নির্দিষ্ট থাকবে।

(খ) বই আদান-প্রদানের জন্যও সময়কাল নির্দিষ্ট থাকবে।

(গ) প্রত্যেক শিক্ষার্থী যে গ্রন্থাগার হতে পুস্তক নিয়েছে তাকে পুস্তক সম্বন্ধে একটি ডায়েরী রাখতে বলা হবে। ডায়েরীতে তারিখ, পুস্তকের নাম, পঠনকাল এবং পুস্তক সম্বন্ধে মন্তব্য শিক্ষার্থী রাখবে।

(৫) পুস্তক তালিকাভুক্তকরণ।

পুস্তক তালিকাভুক্ত করার জন্য একটি রেজিষ্ট্রী বই থাকবে। এর নাম Accession Register। এই রেজিষ্টারটি মোটা কাগজে ও চামড়ার বাঁধাই হবে। রেজিষ্টারে নিম্নলিখিতভাবে পুস্তক তালিকাভুক্ত করা হবে।

১। বইসংগ্রহের তারিখ, (২) পুস্তকের ক্রমিক সংখ্যা, (৩) পুস্তকের নাম, (৪) লেখকের নাম, (৫) পুস্তক বিক্রীর সংস্থা, (৬) কোন তারিখে ও বিল নম্বরে

টাকা দেওয়া হয়েছে, (৭) কোন আলমারীতে পুস্তক রাখা হল ও (৮) গ্রন্থাগারিকের সই।

ক্যাটালগ বা তালিকা বই কিন্তু Accession Register হতে ভিন্ন। ক্যাটালগে বইগুলি বিষয় অনুযায়ী শ্রেণীভুক্ত করা হবে।

(৬) প্রচার।

(ক) শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার ও পুস্তক পঠনের জন্য কিছু নম্বর পৃথক করে রাখা যেতে পারে।

(খ) গ্রন্থাগারের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণের জন্য শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা লাভ করা একান্তই কর্তব্য। এতে পরোক্ষভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

(গ) মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যথাসম্ভব খোলা তাকের (open shelves) ব্যবস্থা গ্রন্থাগারে রাখতে হবে।

(ঘ) বুলেটিন বোর্ডে নূতন বইয়ের মলাটের বহিরঙ্গ বা ফ্লাপ আটকে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়।

(ঙ) খবরের কাগজ হতে ছবি এবং উদ্ধৃতি বুলেটিন বোর্ডে সুন্দরভাবে লাগিয়ে গ্রন্থাগারের বারান্দায় তা প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের বিভিন্ন অংশ।*

বিদ্যালয়ে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার একটি বড় হলঘরে অবস্থিত হওয়া উচিত। সেখানে শিক্ষার্থীদের বসে পড়বার ব্যবস্থাও থাকবে, আর থাকবে শিক্ষকদের পড়বার জন্য একটি নির্দিষ্ট কোণ। গ্রন্থাগারে শিক্ষকদের পাঠ করা দেখে শিক্ষার্থীরা দু'ভাবে উপকৃত হতে পারে। প্রথমতঃ, শিক্ষকের উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা থেকে বিরত রাখবে, আর দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষককে মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করতে দেখে শিক্ষার্থীরাও গ্রন্থাগারে পাঠ করতে অনুপ্রাণিত বোধ করবে।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকবে। একটি হচ্ছে সাহায্যকারী পুস্তক (Reference books Section) এর অংশ এবং অপরটি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের বই ধার দেবার অংশ (Lending Section)।

* Q. What are the different parts of a Library?

সাহায্যকারী পুস্তকের (Reference Section) বিভাগে অভিধান, বিশ্বকোষ, সর্ববিদ্যাসংগ্রহ অর্থাৎ Encyclopaedia থাকবে আর থাকবে অত্যুৎকৃষ্ট দুর্লভ পুস্তকাদি। বইগুলির উপর লেখা থাকবে 'Not to be removed from the library', অর্থাৎ বই বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না। প্রয়োজন হলে বইগুলি হতে শিক্ষার্থী বা শিক্ষক প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারে।

গ্রন্থাগারে আর থাকবে বই ধার দেবার বিভাগ। এখানে থাকবে বহু ধরণের বই এবং যে সব পুস্তকের চাহিদা বেশি সে সব পুস্তক একাধিক সংখ্যায় থাকবে। এই সব পুস্তকগুলি পাঠ্যপুস্তকেরই সমান্তরাল। অতএব বেশি তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষার্থীরা এসব পুস্তকের সাহায্য নিতে আগ্রহ বোধ করতে পারে।

এ দু'টি বিভাগ ব্যতীত শিশুবিভাগ ও বিষয়-সম্পর্কিত বিভাগও থাকবে। এই দুটি বিভাগের কথা পূর্বে সংক্ষেপে আলোচনা করা গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যতীত প্রত্যেক শ্রেণীতে একটি করে শ্রেণী-গ্রন্থাগার থাকা উচিত। মুদালিয়র কমিশন এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, শ্রেণী-গ্রন্থাগার বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একটি অত্যাবশ্যকীয় সংযুক্ত অংশ। এরূপ শ্রেণী-গ্রন্থাগার সহজেই সংগঠিত হতে পারে এবং কল্পনাপ্রবণ শিক্ষকের হাতে এ-জিনিস নিজ সীমিত অবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মতই ভাল কাজ করতে পারে।[১]

১। Mudaliar Commission: The class library is an important and essential adjunct to the central school library. It can be easily organised and in the hands of a teacher of imagination it can do within its own limitations as much good work as the central library.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা

(General Organisation & Administration)

মানুষকে তার বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য শিক্ষার উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করতে হয়। তাই মানুষের জীবনে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা জন লকের ভাষায় বলতে পারি—'Plants are developed by cultivation and men by education।' কাজেই শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সচেতনতা থাকা উচিত। শিক্ষাকার্য পরিচালনার ব্যাপারে পূর্ব-পরিকল্পনা, সম্যক দূরদর্শিতা, গভীর নিষ্ঠা, ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা থাকলে তবেই বোধ হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে শিক্ষাকার্য ঠিক পথে প্রবাহিত করা যায়।

বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গেলে বিদ্যালয় সংগঠনের প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক-ভাবে এসে পড়ে। বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা 'একই মুদ্রার দুইপিঠ'। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির চিন্তা অর্থহীন। বিদ্যালয় পরিচালনা বলতে কেবলমাত্র বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ, কর্মীনিয়োগ, পাঠক্রম রচনা, সময়-পত্র রচনাই বোঝায় না, এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু এগুলির অন্তরালে রয়ে গেছে। এগুলি তো গেল নিতান্তই বহিঃরঙ্গের ব্যাপার। শিক্ষা পরিচালনার অন্তরঙ্গের দিক যদি আমরা চিন্তা করি তবে দেখতে পাব যে বিদ্যালয় পরিচালনার মধ্যে জীবন্ত মানুষদের নিয়ে কাজ করার ইঙ্গিত আছে, শিক্ষার আদর্শকে সামনে রেখে ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান করাই বিদ্যালয় পরিচালনার মূল কথা।

অনেকে অবশ্য প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, শিক্ষার আদর্শকে রূপায়িত করতে হলে বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা একান্ত অপরিহার্য কি না। অবশ্য সংগঠনের যে বিপদ নেই একথা বলা যায় না। বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আমরা যদি লাভবান হই তবে আমরা ঝুঁকি নেওয়ার জন্যে তৈরি হব না কেন? অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষার আদর্শের চেয়ে বিদ্যালয় সংগঠনটাই বড় হয়ে ওঠে। যে আদর্শকে রূপায়ণের জন্য বিদ্যালয়ের সংগঠন ও পরিচালনা গড়ে ওঠে তা যায় গৌণ হয়ে; সেখানেই বিপদ। অনেকেই মনে

করেন চিন্তা স্বাধীন ও অনন্ত ; তাকে বিধি-নিষেধের নিগড়ে বাঁধলে গতিহীন হয়ে জড়ত্বপ্রাপ্ত হবে। বিদ্যালয় সংগঠনের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও ধ্যানধারণা অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়বে। এই সব দিক চিন্তা করে বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। বিদ্যালয় সংগঠন সম্বন্ধে H. G. Stead বলেছেন—'Organisation, like fire, is a good servant but a very good master"। সামান্যতম অসাবধান হলেই দেখা গেছে এই সংগঠন ও পরিচালনাই এনে দিয়েছে দ্বন্দ্ব, বিবাদ, মনোমালিন্য। সংগঠনের জন্মলগ্নে কোন অসুবিধা থাকে না, কিন্তু এই সংগঠনকে প্রতিপালন করা অর্থাৎ ঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হল সমস্যা।

তবে বিদ্যালয় সংগঠন সম্বন্ধে চরম মত পোষণ করার কোনই হেতু নেই। বিদ্যালয় সংগঠন একেবারে অপ্রয়োজনীয়, আবার বিদ্যালয় সংগঠনই একমাত্র মূল্যবান বস্তু, একথা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এটা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে বিদ্যালয় সংগঠন অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার পন্থামাত্র, এখানেই এর শেষ নয়। আমাদের সর্বদা তীক্ষ্ণ সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে সংগঠনকে বিচার করতে হবে। কারণ মানুষের ধ্যান-ধারণা সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে, সাথে সাথে শিক্ষার আদর্শও পরিবর্তিত হচ্ছে ; এই পরিবর্তনের সাথে তাল রাখতে গিয়ে সংগঠনকে হতে হবে প্রাণবন্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তা না হলে শিক্ষার আদর্শের সাথে বাস্তবের সংঘর্ষ হবে, মানুষের জীবনছন্দের তাল ভঙ্গ হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের যথাযোগ্য মনোভাব তৈরি করা ও ছাত্রছাত্রী শিক্ষকের সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে বিদ্যালয় সংগঠনের প্রধান কাজ। সংগঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে একথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিক্ষার আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কই শিক্ষাকে উন্নত ধারায় প্রবাহিত করতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সংগঠনের প্রয়োজন আছে একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সরকারী শিক্ষা সংগঠনের ক্ষেত্রে পরিচালনার কঠিন কাঠামো অনেক সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে সংগঠন ও পরিচালনা গুরুত্বলাভ করে, শিক্ষা হয় অবহেলিত ; আমলাতন্ত্রের 'লাল ফিতা'র চাপে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটি ব্যাহত হয়। Stead সাহেবের একটি গল্প আমাদের সংগঠনের প্রতি

অত্যধিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগায়—গল্পটি হোল যে, কোন একজন শিক্ষা অধিকর্তা মাঝে মাঝে বেল টিপে অধীনস্থ কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করতেন যে তখন তাঁর অধীনে বিদ্যালয়গুলিতে কত জন ছাত্রছাত্রী টাকায় গুণ অঙ্ক কষছে। জবাবও মিলত। শিক্ষা সংগঠন ও পরিচালনা নিখুঁত ও উৎসাহ-ব্যঞ্জক সন্দেহ নেই কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে এই সংগঠন শিক্ষার উদ্দেশ্য রূপায়ণে কতখানি সার্থক।

বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। যদি বিদ্যালয় সব দিক দিয়ে সমবায় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে ওঠে তবে শিক্ষা সার্থকভাবে রূপ পেতে পারে। প্রধান শিক্ষক ও সহশিক্ষকদের মধ্যে সহযোগিতা, শিক্ষকদের মধ্যে সহযোগিতা, শিক্ষক-ছাত্র সহযোগিতা, ছাত্র-ছাত্র সহযোগিতা, কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবক সহযোগিতার উপর বিদ্যালয়ের সুপরিচালনা নির্ভর করে। বিদ্যালয়ের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হল ছাত্রছাত্রী, তাদের কল্যাণসাধনই হবে বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য।[১] তাই ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মঙ্গল চিন্তা না করে বাইরের সাজসজ্জার দিকে যদি বেশি নজর দেওয়া হয় তবে শিক্ষার আদর্শ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে যাব। সার্থক সংগঠন ও সুস্থ পরিচালনা করতে হলে বিদ্যালয় সংক্রান্ত সকলের মধ্যে একটা আত্মিক যোগসূত্র স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন; তাহলে পরিচালনার ব্যাপারে সমস্যা-গুলি খুব বেশি করে দেখা দেবে না।

আমরা জানি ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক বিকাশই শিক্ষা পরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্য। সার্বিক বিকাশ বলতে শারীরিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক, সামাজিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশকেই বুঝি। বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনার মধ্য দিয়ে এর মধ্যে কোনটিই যদি ব্যাহত হয়, তবে সেই সংগঠন ও পরিচালনা মোটেই কাম্য হওয়া উচিত নয়।

বিদ্যালয় পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীদের, শিক্ষকশিক্ষিকাদের ও কর্তৃপক্ষের যুগপৎ যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকবে, তা না হলে স্বাধীন চিন্তা বিধিনিষেধের

১। Unesco: The function of the ducational institution is to help men and women to live fuller and happier lives in adjustment with their changing environment to develop the best elements in their own culture and to achieve the social and economic progress which will enable them to take their place in the modern world and to live together in peace.

বেড়াজালে হাঁপিয়ে মরবে। বিদ্যালয়ের মূল্যবান জীবনের মধ্যে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি স্বাধীনতার আস্বাদ না পায় তবে স্বাধীন নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে কি করে?

সংগঠন ও পরিচালনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়ে গেছে। সেটা হল, যখনই সমাজের আদর্শের পরিবর্তন হয় তখনই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। ইতিহাসের খুব অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টালেই আমরা দেখতে পাব পরাধীন ভারতের শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের শিক্ষার আদর্শের কত পার্থক্য। সামাজিক আদর্শকে রূপ দেওয়া হয় শিক্ষার মাধ্যমে; কাজেই সামাজিক আদর্শের পটভূমির যে পরিবর্তন হয়েছে এতো সহজেই অনুমেয়। পরাধীন ভারতে কোনরকমে লিখতে-পড়তে শিখিয়ে সাক্ষর নামধারী মানুষ তৈরি করা হত, কিন্তু স্বাধীনতার পর সে শিক্ষার অসারতা ধরা পড়ে তাই শিক্ষার সব ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ফলে বিদ্যালয় গৃহ নূতন কলেবরে রূপ পরিগ্রহ করেছে, শিক্ষা-পদ্ধতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে, পাঠ্যক্রমের বিস্তার বৃদ্ধি পেয়েছে, বিদ্যালয় পরিচালনা ও সংগঠনের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, শিক্ষকশিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়েছে। পূর্বপরিকল্পিত সংগঠন ও পরিচালনা যদি এযুগেও কার্যকর থাকত তবে শিক্ষাবিস্তারের পথে তা অন্তরায় সৃষ্টি করত। নতুন যুগের সমাজের আদর্শের সঙ্গে শিক্ষার আদর্শের পরিচয় ঘটাবে এই সংগঠন ও পরিচালনা। তাই এই সংগঠন ও পরিচালনা স্থিতিশীল হলে চলবে না, গতিশীল হতে হবে।

চিন্তাধারা সব সময়ই সংগঠনের পূর্বে দানা বাঁধে। এই কারণেই পরিচালনা সব সময় নমনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সংগঠনের কাজ সহজে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণ অবশ্য শিক্ষার আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে একথা বলাই বাহুল্য।

কাজেই আমরা দেখছি শিক্ষাক্ষেত্রে সংগঠন ও পরিচালনার মাধ্যমেই কোন উন্নয়নমূলক কাজ সম্ভব। পরিচালনা ও সংগঠনের মধ্যে যদি অতীতের কিছু ভাল চিন্তাধারা সঞ্চিত থাকে, তাহলে তার উপর নির্ভর করেই সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে। তাছাড়াও শিক্ষা ও সংগঠনের ক্ষেত্রে যদি কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয় তবে পুরাতন সঞ্চয় একান্ত আবশ্যক। শিক্ষাবিদ Nunnও বিদ্যালয় সংগঠন সম্বন্ধে বলেছেন, "বিদ্যালয়ই হচ্ছে

জাতির প্রাণশক্তির কেন্দ্র, যার প্রকৃত কাজ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শক্তি দৃঢ় করা, ঐতিহাসিক ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখা, অতীতের গৌরবকে বাঁচিয়ে রাখা এবং ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্খাকে জিইয়ে রাখা।[১]

আমরা দেখছি বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনাকে যুগপৎ দুটি উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়—সংগঠনের উপর নির্ভর করে বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার কাজ চালাতে হয় আবার নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়ার প্রেরণা যোগাতে হয়।

গণতান্ত্রিক পরিচালনা (Democratic Administration)।

শিক্ষাক্ষেত্রে সংগঠন ও পরিচালনার প্রয়োজন আছে একথা অনস্বীকার্য। 'The Fundamentals of School Administration' বইতে বলা হয়েছে যে "Every business, whether public or private, must be properly administered if it is to pay dividends in money or in service"। এর পরই অবশ্য বলা হয়েছে পরিচালনাটা সঠিক (Proper) হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা না হলে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণই বেশী হবে।[২] শিক্ষাকে ঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হল পরিচালনার কাজ। ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে তাদের পাঠদান ও শিখন যাতে উন্নত হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয় পরিচালনার কাজ চলবে।

বিদ্যালয় পরিচালনার স্বরূপ।

এখন প্রশ্ন হোল এই পরিচালনার স্বরূপ কেমন হবে? অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর একবার বলেছিলেন—'যদি আমাদের গণতান্ত্রিক ধারায় সার্থকভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয় তবে আমাদের শিশুদের গণতন্ত্রের ব্যবহার ও গণতন্ত্রের আদবকায়দার সাথে সম্যক পরিচয় ঘটান প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক পরিচালনাব্যবস্থা একনায়কতন্ত্রী পরিচালনা ব্যবস্থার থেকে সম্পূর্ণ

১। Nunn: A Nation's School...are an organ of its life, whose special function is to consolidate its spiritual strength, to maintain its historic continuity, to secure its past achievements, to guarantee its future.

২। Cf. School administration which does not facilitate education is a parasite and a debauchery of public funds.

ভিন্নতর। এখানে একজনের শাসন নেই, উচ্চনীচ ভেদাভেদ নেই, এখানে সবাই সমান, দলীয় ইচ্ছাই সকলের অগ্রগণ্য।

কেন এই গণতান্ত্রিক পরিচালনা?

প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষার সকল প্রতিষ্ঠানই গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয় এখন কেবলমাত্র বিদ্যাবিতরণের জন্য নির্দিষ্ট নয়, গণতান্ত্রিক নীতি, উদ্দেশ্যগুলি কিভাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কাজে লাগে তা জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে বিদ্যালয়কে। এই কথাটির স্বাভাবিক অর্থ হল এই যে বিদ্যালয় পরিচালনা এমনভাবে করা উচিত যাতে যে উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপিত তা সবাই যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। বিদ্যালয় পরিচালনা করার সময় গণতান্ত্রিক আদর্শের মূলনীতিগুলির গভীর তাৎপর্য জানতে হবে এবং গণতান্ত্রিকতার অন্তরালে যে গভীর দর্শন আছে তাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। বিদ্যালয় পরিকল্পনার সাথে যে শিক্ষার আদর্শের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে একথা মুদালিয়ার কমিশনেও খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।[১] বিদ্যালয় পরিচালনা যদি ঠিকভাবে করা যায় তবে এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসবে। কমিশন বলেছেন, "Education system makes its contribution to the development of habits, attitudes and qualities of character which will enable its citizens to bear worthily the responsibilities of democratic citizenship…"। শিক্ষা পরিচালনার ভার যাদের হাতে থাকে তাদের এই সব প্রয়োজনীয় কথাগুলি মনে রেখে, পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে বিদ্যালয় পরিচালনাকে গণতান্ত্রিক আদর্শের নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজাবার দিকে গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিত।

গণতান্ত্রিক পরিচালনার মূলনীতি।

এখন দেখা যাক কি কি নীতি অনুসরণ করে বিদ্যালয় পরিচালনা করলে তাকে আমরা গণতান্ত্রিক পরিচালনা বলব।

১। Mudaliar Commission : There is a close relationship between school administration and objectives of education in a community; and between social and political objectives of a community and its educational objectives.

(১) দায়িত্ব বিভাগের নীতি (Principle of Sharing Responsibility)—গণতান্ত্রিক পরিচালকের সব সময় মনে রাখতে হবে যে তিনিই কেবলমাত্র শাসন করার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি তাঁর সহকর্মীদের এমন কি ছাত্রছাত্রীদেরও বিদ্যালয় পরিচালনার আংশিক দায়িত্ব দেবেন। দায়িত্ব না দিলে দায়িত্ববোধ জন্মাবে না। তিনি সর্বময় কর্তা না হয়ে সকলের দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

(২) সাম্যের নীতি (Principle of Equality)—গণতান্ত্রিক পরিচালক সকলকে সামাজিক দিক থেকে তাঁর সমান মনে করবেন। তিনি যে নিয়ম-কানুন রচনা করবেন, তা তিনি যদি ঠিকভাবে পালন করেন তবে আর সকলকে নিয়ম পালন করতে বাধ্য করতে পারবেন। তাঁর নিজের কোন বিশেষ সুযোগ নেওয়া চলবে না। তাঁকে 'আমি সকলের প্রভু' (Bossing tendencies) এই মনোভাব ত্যাগ করতে হবে; কেউই তাঁর পদানত নয়, সবাই তাঁর সহকর্মী এই কথা মনে রাখতে হবে।

(৩) স্বাধীনতার নীতি (Principle of Freedom)—মানুষকে যখন স্বাধীনতা দেওয়া হয় তখনই সে নিজের শক্তি, সামর্থ্যের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে। অথবা যদি কারুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় তাহলে তার কর্মোদ্যম নিস্প্রভ হয়ে পড়বে। বিদ্যালয়ের যে কোন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের সহশিক্ষকদের ও এমন কি ছাত্রছাত্রীদেরও বেশ খানিকটা পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে হবে।[১]

(৪) সহযোগিতার নীতি (Principle of Co-operation)—কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিপূরক এই কথা মনে রেখে গণতান্ত্রিক পরিচালক কাজে নামবেন; পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য আগ্রহী হবেন। পরবর্তীকালে যদি সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে হয় তবে তা বিদ্যালয়-জীবন থেকেই সুরু করতে হবে। Ryburn বলেছেন—"The pupils of the school, if they are to develop the characteristics of co-operativeness, must live when in School as in

১। Cf. Wiles: Responsibility and self-direction cannot develop unless teachers and pupils are free to assume them.

a Society..........." জন ডিউইর উক্তিতেও এই কথার সমর্থন মেলে।[১]

(৫) সমবিচারের নীতি (Principle of Justice)—গণতান্ত্রিক পরিচালক সকলের প্রতি সমান মনোভাব পোষণ করবেন; তাঁর কোন আচরণ যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হয়। শিক্ষক-ছাত্র সবাই যেন উপলব্ধি করেন যে তাঁদের পরিচালক সমবিচারের একটি মূর্তিমান বিগ্রহ।

(৬) ব্যক্তিগত যোগ্যতার যথাযথ মর্যাদা ও মূল্যায়নের নীতি (Principle of Recognition of the Individual worth)—পরিচালকের কারুর প্রতি তুচ্ছ মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে কাজের তারিফ করতে পরিচালক ভুলবেন না। Ryburn বলেছেন, "Nothing will more encourage a man or a woman, a boy or a girl to gerater effort, than an encouraging recognition of good work done........"।

(৭) নেতৃত্বের নীতি (Principle of Leadership)—প্রত্যেক ব্যক্তি যতদিন না নিজের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে, যতদিন না দায়িত্ব পালনের জন্য যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে অর্থাৎ শৃঙ্খলা আয়ত্ত করবে ও নেতৃত্বে দীক্ষা নেবে, ততদিন গণতন্ত্র কার্যকরী পন্থায় অগ্রসর হতে পারবে না। প্রতি পদেই গণতন্ত্র ব্যাহত হবে। এগিয়ে এসে কাজ করার ক্ষমতা সকলের থাকে না। যাদের থাকে না, তাদের নেতা তৈরি করতে হলে দায়িত্ব ও স্বাধীনতা দিতে হবে, তার পরিমাণ যতই সীমিত হোক। তা না হলে তারা দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইবে। তাই অনেক সময় কৃত্রিম সমস্যা সৃষ্টি করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে নেতা তৈরি করার প্রচেষ্টা অনেকে করে থাকেন; তাতে ফল অবশ্য ভালই হয়, কারণ হাতে-কলমে কাজ করে অনেকটা অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছে নেতা।

গণতান্ত্রিক পরিচালনার সুবিধা।

এখন দেখা যাক, গণতান্ত্রিক পরিচালনার সুবিধা কি কি। গণতান্ত্রিক

১। John Dewey: A society which makes provision for participation in the good of all its members on equal terms and which secures flexible readjustment of its institutions through interaction of the different forms of associated life is in so far democratic....

উপায়ে বিদ্যালয় পরিচালিত হলে বিদ্যালয় সংক্রান্ত সকলের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার গড়ে উঠবে ; সকলের মধ্যে একটা আত্মিক যোগ স্থাপিত হবে। পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গী যদি গণতান্ত্রিক হয়, তবে শিক্ষক-ছাত্র উভয়েরই মানসিক বৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ হবে। গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় সানন্দে কাজ করে, বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থী কিছু না কিছু অবদান রেখে যাবে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ শিক্ষক-ছাত্রের নৈতিক মান উন্নয়নে সহায়তা করে। গণতান্ত্রিক পরিচালনা সমাজের আরও দশজনের অকৃপণ সহযোগিতাকে সাদর আমন্ত্রণ জানায়। এইসব দিক থেকে বিবেচনা করলে গণতান্ত্রিক পরিচালনার সাথে একনায়কতান্ত্রিক পরিচালনার কোন তুলনাই করা যায় না।

কোন কোন বিষয়ের উপর গণতান্ত্রিক পরিচালনা নির্ভরশীল।

কিন্তু গণতান্ত্রিক উপায়ে বিদ্যালয় পরিচালনার আগে আমাদের দেখা উচিত যে, গণতান্ত্রিক পরিচালনা কোন কোন বিষয়ের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। যেমন ধরা যেতে পারে, (১) গণতান্ত্রিক পরিচালনার মূলনীতিগুলি প্রথমে নির্ধারণ করা দরকার।[১] (২) এ-বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নানান তথ্য সংগ্রহ করা। (৩) বিদ্যালয় যন্ত্রটির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার। (৪) বিদ্যালয়ের জন্য সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যয়, (৫) মাঝে মাঝে লক্ষ্যে কতখানি পৌঁছতে পারছি তা যাচাই করে দেখা, (৬) বিদ্যালয় পরিচালনার মধ্যে "নমনীয় নীতি" (flexibility) থাকবে।

প্রধান শিক্ষক ও তাঁর গুণাবলী (The Head master and his qualities)।

'প্রধান শিক্ষক' এই নামটিই তাঁর দায়িত্ব ও গুণাবলীর কিছুটা ইঙ্গিত বহন করে। শিক্ষকদের মধ্যে তিনিই প্রধান, কাজেই সাধারণ শিক্ষক অপেক্ষা তাঁর দায়িত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এবং সকল শিক্ষক অপেক্ষা তাঁকে অধিক

১। Cf. Frustration results when authority does not go with responsibility, and the acceptance of further responsibility is avoided. No one can do his best when he does not know how soon he will come to the limit of his authority......Supervision for Better Schools, Kimball Wiles.

গুণসম্পন্ন হতে হবে। নইলে প্রধান হওয়ার যোগ্যতা তিনি অর্জন করবেন কেমন করে?

W. M. Ryburn বলেছেন, প্রধান শিক্ষক জাহাজের ক্যাপ্টেনের মত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত থেকে বহু বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করে, সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে তিনি তাঁর বিদ্যালয় তরণীকে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন।[১] তাঁর উপরই নির্ভর করে সমগ্র বিদ্যালয়ের জীবনধারা আবর্তিত হবে। এইজন্যে প্রধান শিক্ষক কেবল চরিত্রবান হলেই চলবে না, তাঁকে সকলের আস্থাভাজন হতে হবে। তাঁর নিজের অবশ্য শিক্ষকতা বৃত্তিতে আস্থা থাকবে, ছাত্রছাত্রীদের উপর বিশ্বাস থাকবে, মানব চরিত্রের উপর মমত্ববোধ থাকবে আর থাকবে তাঁর সহকর্মীদের কর্মক্ষমতার গভীর আস্থা। এছাড়াও প্রধান শিক্ষকের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ হল তাঁর অনুপ্রেরণা জাগানোর ক্ষমতা ও উৎসাহ জোগানোর বিপুল চেষ্টা। যদি তিনি শিশুমনে জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা জাগাতে পারেন তবে শিশুমনের ঘুমন্ত পাপড়িগুলি নিশ্চয়ই বিকশিত হয়ে উঠবে, তবেই তিনি শিশুমনের সাতমহল দরজার দ্বারোদ্ঘাটন করে অজস্র মণিমাণিক্য বার করে আনতে পারবেন এবং তাদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগাতে পারবেন। তাঁর উপদেশ ও সদিচ্ছা ছাত্রদের জীবনে যেমনি কার্যকরী হবে, তেমনি তিনি তাঁর সহকর্মীদেরও কর্মে অনুপ্রেরণা জোগাবেন, সদিচ্ছা বিনিময় করবেন এবং তাঁদের যোগ্য নেতা বলে নিজেকে মনে করে আত্মবিশ্বাসে নিজেকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

এই আত্মবিশ্বাসই তাঁকে বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সাফল্যের জয়মাল্য এনে দেবে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, এই আত্মবিশ্বাসের অভাবেই প্রধান শিক্ষক অন্য শিক্ষকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাতে পারেন নি, ফলে বিদ্যালয় জীবনে নানা বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে। প্রধান শিক্ষক যুদ্ধের অর্ধেক বিজয় সম্পন্ন করবেন যদি তিনি আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে অনুপ্রেরণা জাগাতে পারেন, আর বাকি অর্ধেক তাঁকে যুদ্ধ করেই জয়লাভ করতে হবে—অর্থাৎ সংকর্মের দ্বারা, কঠোর পরিশ্রমদ্বারা তাঁকে গৌরব অর্জন করতে হবে।

প্রথমতঃ, প্রধান শিক্ষক যে কল্পনার জাল বুনবেন তাতে যেন সহকর্মী ও

১। Cf. P. C. Wren : What the main spring is to the watch, the flywheel to the machine or the engine to the steamship, the headmaster to the school.

ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতির গ্রন্থি থাকে নচেৎ সব আলগা হয়ে যাবে। তাঁর সহকর্মীদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি সবই হবে বিভিন্ন রকমের, কাজেই প্রধান শিক্ষককে সবটাই বুঝতে হবে কারণ তাঁকে সামঞ্জস্য বিধানের কাজ হাতে তুলে নিতে হবে, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রধান শিক্ষক দেখবেন যে সমগ্র বিদ্যালয় পরিচালনার মধ্য দিয়ে একটা সহযোগিতার আবহাওয়া বয়ে চলেছে। প্রধান শিক্ষক নিজেকে সহকর্মীদের প্রভু মনে করবেন না; মনে করবেন সহকর্মীদের নেতা। সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া কিন্তু বিরল জিনিস, কারণ কোন প্রধান শিক্ষক সহযোগিতা পাওয়ার আশায় যদি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার নিয়ে এগিয়ে যান তাহলে সহকর্মীরা তাঁর ব্যবহারকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন। সহকর্মীরা প্রধান শিক্ষকের স্বৈরতন্ত্রকে এত ভয় পান যে কোন বিষয়ে তাঁদের স্বাধীন মতামত জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা মতামত প্রকাশ করতে শঙ্কিত হন। অনেকে অবশ্য মনে করেন, সহশিক্ষকদের মতামতের কোন দাম নেই। অনেক শিক্ষাবিদ আবার অপরের মঙ্গল কামনায় এতই মগ্ন ও অপরের মতামতের উপর এরকম নির্ভরশীল যে নিজেদের মতামতের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন হয়ে পড়েন। উভয়েরই সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ের কোন ব্যাপারে যদি প্রধান শিক্ষককে সংস্কারের কাজে নামতে হয় তবে হয়তো বিভিন্ন দিক থেকে প্রথমে আপত্তি উঠবে। কিন্তু ধৈর্য ধরে তিনি যদি বেশ অনেক সময় নিয়ে অদলবদলের কাজে হাত দেন তবে মনে হয় সমস্ত বিরূপ মনোভাবকে তিনি সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হবেন।

আগেই বলেছি, প্রধান শিক্ষকের ব্যবহার হবে বন্ধুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সহকর্মীদের কর্মে অবহেলা, বিশৃঙ্খল আচরণ, অসতর্কতা ইত্যাদি তিনি অম্লানবদনে অগ্রাহ্য করবেন; কোন দুর্বলতা প্রকাশ না করে তাঁর এগুলি মোকাবিলা করা উচিত।[১]

অবশ্য প্রধান শিক্ষকের নেতা হওয়ার মত উপযুক্ত গুণাবলী থাকা উচিত। তিনি যদি অন্ধদের অন্ধনেতা না হন, তবে নিশ্চয়ই আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকবেন। কি কি মনোবিজ্ঞানের নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে

১। W. M. Ryburn: The headmaster's duty is to keep his staff up to the mark and if he finds slacking, carelessness, irregularities and questionable practices, he must set his face against them without any shadow of weakness.

সার্থকভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, কেবলমাত্র ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও শিক্ষার যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে তারও খোঁজ-খবর রাখবেন। প্রত্যেক প্রধান শিক্ষক মাঝে মাঝে অন্ততঃ এমন বই কিনবেন যা তাঁকে কর্মে প্রেরণাদান করবে। প্রধান শিক্ষক মাঝে মাঝে ভাল ভাল বিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখার চেষ্টা করবেন যাতে অপরের কোন ভাল জিনিস গ্রহণ করতে পারেন। তাঁর বাচনভঙ্গী ভাল হওয়া বাঞ্ছনীয়, মানবচরিত্র থাকবে তার নখদর্পণে। Ryburn বলছেন, "In a word he must be alive and on his toes, filled with enthusiasm for his work and his school"।

প্রধান শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের সঙ্গেও অমায়িক ব্যবহার করবেন। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ভালভাবে জানার চেষ্টা করবেন, তাদের কাজকর্মের উপর বিশ্বাস রাখবেন। প্রধান শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সাথে এমন ব্যবহার করবেন যাতে তারা তাঁকে অযথা ভয়ও পাবে না, আবার কোন সমস্যা সমাধানে তাঁর সাহায্য চাইতে বা উপদেশ নিতে আসতে ইতস্ততঃও করবে না। তাঁর যদি প্রত্যেক ছাত্রের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকে, তবে তিনি পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে সহজে আয়ত্বে আনতে সক্ষম হবেন। প্রধান শিক্ষকের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হোল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ককে মধুর করে সমস্ত বিরুদ্ধ মনোভাব দূর করা। বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে কিছু কিছু উঁচু ক্লাসের ছাত্রের সক্রিয় সহযোগিতা তিনি নিতে পারেন, কোন কোন ব্যাপারে তাদের কাছে পরামর্শ নিয়ে তাদের মর্যাদা দিতে পারেন ; তবেই হয়তো পরিচালনায় ক্ষেত্রে সকলের তরফ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পেয়ে তাঁর প্রধান শিক্ষক নাম সার্থক করতে পারেন।

এখন দেখা যাক আদর্শ প্রধান শিক্ষক হতে হলে তাঁর কি কি গুণ থাকা উচিত।

(১) নেতা—আদর্শ প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের নেতার ভূমিকা গ্রহণ করবেন ; শুধু তাই নয়, তিনি সমাজেরও নেতা। সমাজের অনেক সমস্যাই তাঁকে সমাধান করতে হবে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি সমাজকে নব নব রূপ দিতে পারেন।[১]

১। Mickleson and Hansen : The leader in any enterprise is a person who has not only a 'position' but who has a definite 'contribution' to make, toward the objectives of the group with which he works.

(২) সুপরিচালক ও সুসংগঠক—বিদ্যালয়ের প্রধান নেতা হিসাবে তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের পরিকল্পনা করবেন। সমানভাবে কর্ম বণ্টন করবেন ও সমাজের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(৩) বন্ধুভাবাপন্ন ও সংবেদনশীল মনোভাব—বিদ্যালয় সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষক কতকগুলি নীতি নিশ্চয়ই প্রণয়ন করবেন; কিন্তু তা কার্যকরী করার জন্য সংবেদনশীল মন নিয়ে অগ্রসর হবেন। জোর করে আইন প্রয়োগ করলে অনেক সময় ফল খারাপ হতে পারে। তাঁকে শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকের সাথে যুগপৎ সম্বন্ধ রাখতে হবে; কাজেই দরদী মন নিয়ে সকলের সুবিধা-অসুবিধা তাঁকে বুঝতে হবে।[১]

(৪) বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানতৃষ্ণা—প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাঁর শিক্ষাগত মান উচ্চ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাঁর জ্ঞানস্পৃহা থাকবে প্রচুর, না হলে তিনি অপরের মধ্যে জ্ঞানপিপাসা জাগাতে অক্ষম হবেন। তাছাড়া আধুনিক শিক্ষাজগতের খবর তাঁকে রাখতে হবে; অন্যান্য শিক্ষককে কোনও বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁকে অর্জন করতে হবে।

(৫) গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী—ভারত গণতান্ত্রিক দেশ, কাজেই বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়ে সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠার একটা প্রচেষ্টা থাকবে। জন ডিউইর ভাষায় শিক্ষা হবে 'গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা' তাই বিদ্যালয়কে হতে হবে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। প্রধান শিক্ষকই হবেন গণতন্ত্রের প্রধান পথপ্রদর্শক, তিনি ছাত্রসমাজকে বিদ্যালয় পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করবেন। প্রধান শিক্ষক জোর করে শিক্ষার্থীদের উপর কিছু চাপিয়ে দেবেন না। গণতান্ত্রিক নীতিবোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রধান শিক্ষক যদি জাগ্রত করতে পারেন তাহলে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাসমস্যা বড় হয়ে উঠবে না।[২]

১। Cf. Ryburn : He (the Headmaster) must try to understand their (students) social background, their educational background and personal history, so that he may be able sympathetically to understand their difficulties and their reactions to life and its various situations.

২। Cf. Sheniakov and Fritzrede : Discipline is not coercion through force—discipline is a spirit, and a spirit cannot be ordered or provided into or regimented—for true discipline is based on willing co-operation which springs from knowledge idealism and a sense of duty.

(৬) সুবক্তা—নেতার আসন যদি প্রধান শিক্ষককে নিতে হয় তবে তাঁর বাচনভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গী উত্তম হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাঁকে সর্বদা বিদ্যালয়ের কর্মপন্থা, শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের কাছে তুলে ধরতে হবে সুন্দরভাবে, তা না হলে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য আসবে না।

(৭) আদর্শ চরিত্র—প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষক সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। অবশ্য তার জন্য তাঁর চরিত্রে এমন কতকগুলি নৈতিক গুণের সমাবেশ হওয়া প্রয়োজন, যাতে অতি সহজে শ্রদ্ধায় সকলের মস্তক অবনত হয়। প্রধান শিক্ষক আদর্শ চরিত্রবান না হলে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হবেন তিনি কি করে? 'Simple living and High thinking' অর্থাৎ সহজ সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তা হবে প্রধান শিক্ষকের জীবনের আদর্শ।

(৮) নিরপেক্ষতা ও সুবিচার—বিচারক যেমন নিজের আসনে যখন বসেন তখন তাঁর দৃষ্টি একেবারে পক্ষপাতশূন্য হয় তেমনি প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠান করে, তাঁর মতামত ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কোন পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন না।

(৯) আত্মবিশ্বাস ও আত্মসংযম—প্রধান শিক্ষককে নানাপ্রকার দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়, তাই সামান্য কারণে তাঁকে উত্তেজিত হলে চলবে না। উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে পড়লে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁচতে পারবেন না। তাছাড়া কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করতে হলে তাঁকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। আত্মসংযম ও আত্মবিশ্বাস একই মুদ্রার দুই পিঠ—একটি অপরটির পরিপূরক।[১]

(১০) কর্তব্যবোধ—প্রধান শিক্ষককে আপন কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে তবেই তিনি শিক্ষক ও ছাত্র সকলকেই আপন আপন কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করাতে পারবেন।

(১১) সময়ানুবর্তিতা—প্রধান শিক্ষক একান্তভাবে সময়ানুবর্তী হবেন। প্রত্যেকটি মুহূর্তের মূল্য আছে এটা তিনি নিজের আচরণ দিয়ে প্রমাণ করবেন; তাঁকে দেখে সবারই সময়ের মূল্যবোধ জন্মাবে।

(১২) প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব—প্রধান শিক্ষকের পক্ষে প্রত্যেককে

১। Cf. Ryburn: This confidence (self-confidence) in the Headmaster is the most necessary element in any school which wishes to have any claim to be successful.

প্রত্যেক জিনিস শেখান হয়তো সম্ভব হয়ে উঠবে না, কিন্তু তিনি যদি মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন তবে তাঁর প্রভাব অনেকের উপর এমনভাবে পড়বে যাতে তারা নিজেদের অজান্তে বহু জিনিস শিখে ফেলবে ও তাদের আচার আচরণের যথেষ্ট পরিবর্তন হবে। Professor R. A. Lamb এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "The perfect head of the school·······needed······a quality which is undefinable and which resides in the personalities of the individual.·······"।

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রধান শিক্ষককে নানান কাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। তাঁকে একাধারে হতে হয় উত্তম শিক্ষক, দক্ষ পরিচালক. সুযোগ্য নেতা, নিয়মনিষ্ঠ অথচ সংবেদনশীল পরিদর্শক এবং জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী।

প্রধান শিক্ষকের কাজ হিসাবে আমরা দেখছি, (১) শিক্ষাদান, (২) পরিদর্শন, (৩) শিক্ষক ও ছাত্রের সঙ্গে কাজ, (৪) বহির্বিষয়ক কাজ ও (৫) বিভিন্ন বিষয় তদারক ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন। খুব কম লোকেরই একসঙ্গে এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়। প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সঙ্গে বহির্বিষয়ক যোগাযোগ রক্ষাকারীর ভূমিকা নিতে হয়।[১]

শিক্ষাদাতার ভূমিকায় প্রধান শিক্ষক—শিক্ষক হিসাবে প্রধান শিক্ষককে অনেকদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন, শ্রেণীতে পাঠদান করতে হয়, পাঠ্যক্রম-এর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হয়, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করতে হয়, এছাড়াও সহপাঠ্যক্রমিক যাবতীয় বিষয়ের পরিচালনা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হতে হয়। যদিও প্রধান শিক্ষকের অনেক কাজ, কিন্তু শিক্ষাদান কাজ থেকে মুক্তি নেই। ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য অন্ততঃ প্রতি শ্রেণীতে সপ্তাহে অন্ততঃ একটি করে পিরিয়ড থাকলে ভাল হয়।

প্রধান শিক্ষকের বিদ্যালয় পরিদর্শন—পরিদর্শক হিসাবেও প্রধান শিক্ষককে নানাবিধ কাজ পরিদর্শন করতে হয়। কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের

১। Dr. S. N. Mukherjee in 'Secondary School Administration.' "He has the duties that are related to the State department of Education, the High School Examination Board, the School Secretary, the Local Community (including parents), the School staff and finally the Children attending the school."

শিক্ষাব্যবস্থাই নয়, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজ, খেলাধূলা, ছাত্রদের জীবনযাপন, গৃহকাজ ইত্যাদির দিকে মনোযোগ দিতে হয়। তাছাড়াও টাকাপয়সার হিসাব, রেকর্ডপত্র, রেজিষ্টার ইত্যাদি সমস্তই প্রধান শিক্ষক পরিদর্শন করবেন।

শিক্ষাদান পরিদর্শন—প্রধান শিক্ষকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শিক্ষকদের পাঠদান পরিদর্শন। শিক্ষকগণ নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সচেতন, কিন্তু তবুও পরিদর্শন প্রয়োজন এই কারণে তাঁরা যে পদ্ধতিতে পাঠদান করে থাকেন তার মধ্যে ত্রুটি থাকতে পারে অথবা ছাত্রছাত্রীদের পাঠে অংশগ্রহণ করতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কি করলে সে অসুবিধা দূর করা যায়, এই আলোচনা করতে হলেও শিক্ষকদের পাঠদান পরিদর্শন প্রয়োজন।

গৃহকাজ পরিদর্শন—সাধারণতঃ শিক্ষকগণ গৃহকাজ পরিদর্শন করে থাকেন। অনেক গৃহকাজ দেখতে গেলে ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আবার সব শিক্ষক সমান গুরুত্ব দিয়ে হয়তো গৃহকাজ দেখেন না তাই মাঝে মাঝে প্রধান শিক্ষক গৃহকাজের খাতাগুলি উল্টেপাল্টে দেখতে পারেন।

পরীক্ষাব্যবস্থার পরিদর্শন—পরীক্ষাব্যবস্থার ভার অনেক সময় সহশিক্ষকদের মধ্যেই বণ্টন করে দেওয়া হয়। পরীক্ষা, বিদ্যালয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, কাজেই এই ব্যাপারটি সুসম্পন্ন করার জন্য প্রধান শিক্ষক সচেষ্ট হবেন।

আমাদের দেশে রচনাধর্মী পরীক্ষার এখনও বহুল প্রচার আছে। এতে শিক্ষার উদ্দেশ্য খানিকটা ব্যাহত হয় একথা সর্বজনবিদিত। তাই পরীক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটিগুলি দূর করে প্রধান শিক্ষক পরীক্ষাকে কার্যকরীপন্থায় রূপ দেওয়ার যদি চেষ্টা করেন তবে ভাল হয়। এছাড়াও তিনি শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন অগ্রগতির ধারাবাহিক সর্বাত্মক লিপি (Cumulative Record Card) সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে পারেন।

নানান কাজের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখলাম প্রধান শিক্ষককে সমন্বয়-সাধনের ভূমিকা নিতে হয়। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন দলের লোক নিয়ে প্রধান শিক্ষককে কাজ চালাতে হয়, যেমন ছাত্রদল, শিক্ষকদল, অভিভাবকদল, পরিচালকদল ও সাধারণ জনসমাজ।

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ দেখা যায়; প্রধান শিক্ষক সমন্বয় সাধন করে একটি সুসংহত শিক্ষার্থীসমাজ গড়ে তুলবেন।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক যাতে প্রীতিপূর্ণ হয় তা দেখাও প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য। অনেক সময় শিক্ষকদের মধ্যেও দলাদলি দেখা দেয়, তার ফলে ছাত্রছাত্রীরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কাজেই এই দলীয় সংঘাত না সৃষ্টি হয় সেদিকে প্রধান শিক্ষককে প্রথম থেকেই নজর রাখতে হবে।

শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালকদের মধ্যেও নানা কারণে মতদ্বৈধ দেখা যায়; তাতে বিদ্যালয়ের উন্নতি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিক্ষকদের প্রয়োজন মেটাতে প্রধান শিক্ষক নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন তবে বিদ্যালয়ের অবনতির বিনিময়ে নয়।

শিক্ষাকার্যে যদি অভিভাবকদের পূর্ণ সহযোগিতা না পাওয়া যায় তবে শিক্ষার কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রসর হতে পারে না। তাই শিক্ষাকার্যে অভিভাবকদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। এই সহযোগিতার বনিয়াদ প্রধান শিক্ষককেই গড়ে তুলতে হবে। প্রধান শিক্ষক স্থানীয় অন্যান্য বিদ্যালয়-গুলির সাথেও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

বিদ্যালয় পরিচালনার সমস্যা।*

এখন আমরা দেখব বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষককে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

বর্তমানে বিদ্যালয় আর কেবলমাত্র বিদ্যাবিতরণের কেন্দ্র নয়—তার কাজ গিয়েছে অনেক বেড়ে। জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার যাবতীয় রসদ তাকে সরবরাহ করতে হবে। শিক্ষাকে করতে হবে একান্তভাবে জীবনকেন্দ্রিক—হাতে-কলমে কাজের দীক্ষা দিতে হবে বিদ্যালয়কে। বিদ্যালয় আজ বিদ্যার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহ ও চাহিদার সাথে সঙ্গতিবিধান করে চলতে হচ্ছে। জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, পাঠদানপদ্ধতি, পরীক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক দেশের আদর্শ নাগরিক তৈরির সঙ্কল্প বিদ্যালয়কেই গ্রহণ করতে হবে। তাই বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে এই গণতান্ত্রিক মনোভাব থাকা উচিত।

বিদ্যালয় সাম্রাজ্যের গণতান্ত্রিক অধীশ্বর হলেন প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয় পরিচালনার সমস্ত দায়িত্বই প্রধান শিক্ষকের। প্রধান শিক্ষক যদি বাঞ্ছিত

* Q. Describe the major problems of School Administration that a modern Headmaster has to face. (B.T. 1966)

সামাজিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হন তবে বিদ্যালয় পরিশাসনে ছন্দ-পতন ঘটবেই।

আমরা জানি প্রধান শিক্ষকের প্রধান কাজ হল শিক্ষাকার্যের সুষ্ঠু পরিচালনা করা। সহকারী শিক্ষকদের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া এই পরিচালনা দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ শিক্ষকরা প্রত্যেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী তাই ভিন্ন মনোভাব, চিন্তাধারা ও যোগ্যতাসম্পন্ন; ফলে প্রধান শিক্ষকের পক্ষে সকলের কাছ থেকে সমান সহযোগিতা পাওয়া কঠিন সমস্যা হয়ে পড়ে। সহশিক্ষকদের শ্রদ্ধাভাজন হতে হলে প্রধান শিক্ষকের বিশেষ যোগ্যতা থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। এই জন্য তাঁকে ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসরণ করতে হবে।

বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন শিক্ষাদানের ব্যাপারে প্রতিটি শিক্ষককে যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত করতে বলা হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষক অনুপস্থিতির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে অনেক সময় যোগ্যতার কথা ভুলে যেতে হয়। এক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা পাওয়া একান্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শ্রেণীকক্ষের স্থান সঙ্কুলান ইত্যাদি সমস্যা বটে কিন্তু তার চেয়েও অধিক সমস্যা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্য, সামাজিক পার্থক্য ও তাদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য। আদর্শ নেতৃত্ব দিয়ে সুপরিচালনার পথেই এইসব জটিলতার গ্রন্থি মোচন করা যায়। এর জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক জীবনকে যথেষ্ট ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। কিন্তু পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের কিছুই বক্তব্য থাকে না। কারণ ভারতে পাঠ্যক্রম রচনা করেন অন্য একটি কমিটি যেখানে এক-আধজন প্রধান শিক্ষক উপস্থিত থাকেন কেবলমাত্র সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য—নিজেদের বক্তব্য তাঁদের অত্যন্ত গৌণ।

সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়গুলি বহিঃপরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত থাকে না বলে ছাত্রছাত্রীরা এগুলির উপর গুরুত্ব দিতে চায় না। তাছাড়া ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত বেশি হলে এগুলি ঠিকভাবে পরিচালনা করাও যায় না।

পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রধান শিক্ষকের স্বাধীনতা সীমিত। টেক্সট-বুক কমিটি দ্বারা অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক বিদ্যালয়ে পড়ান হয়ে থাকে।

বর্তমানে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা প্রধান শিক্ষকের সামনে এক মস্ত বড়

সমস্যা। এখানেও ছাত্র সংখ্যা মূলতঃ দায়ী। প্রধান শিক্ষকের পক্ষে বিশাল জনসমুদ্রের সাথে আত্মিক যোগসূত্র রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠছে না। ফলে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের ব্যক্তিগত প্রভাব ছাত্রদের উপর পড়ছে না। প্রত্যেকের মনের খবর নেবার সময় ও সুযোগ কোথায়? কাজেই আমরা দেখছি বিক্ষুব্ধ মনের বিফল আস্ফালন। একেবারে বিফল আস্ফালন অবশ্য বলা যায় না। ছাত্রসমাজের অশান্ত আচরণ প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে ভাবিয়ে তুলেছে। বিদ্যালয় পরিচালনায় ছাত্রদের কিছু দায়িত্ব বণ্টন হয়তো এ ব্যাপারে কিছুটা সুফলপ্রসূ হতে পারে। তাছাড়া শিক্ষকদের বর্ধিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে ও স্বমহিমায় আবার তাঁদের প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করা প্রধান শিক্ষকের পক্ষে আর একটা সমস্যা। প্রধান শিক্ষকের পক্ষে অন্যান্য শিক্ষকদের স্বার্থ ও দাবী পরিচালকমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরা যেমন কর্তব্য, আবার বিদ্যালয়ের মঙ্গল দেখা তাঁর তেমনি সমান কর্তব্য। এই দুই-এর মাঝখানে পড়ে প্রধান শিক্ষক অনেক সময় কারুর আস্থাভাজন হতে পারেন না। তাছাড়া আর্থিক দায়-দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের উপর অনেকটাই ন্যস্ত থাকে। এক্ষেত্রেও তিনি যদি যথেষ্ট সাবধান না হন তবে বিদ্যালয়কে অনিবার্যভাবে আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়তে হয়।

প্রত্যেক অভিভাবক নিজেদের ছেলেমেয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকেন না। প্রধান শিক্ষক বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা পান না। কিন্তু কোন কারণে ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় মনোমত ফললাভ না করতে পারলে অভিভাবক শ্রেণী অনায়াসেই প্রধান শিক্ষককে দায়ী করেন।

এছাড়াও সমাজের জনসমষ্টি বিদ্যালয়কে ঠিক নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলে এখনও ভাবতে পারেন না। সামাজিক প্রতিষ্ঠান যদি সমাজের প্রাণরসে সঞ্জীবিত না হয় তবে অকালে সাজান বাগান শুকিয়ে যাবে এ তো সহজেই অনুমেয়।

সহশিক্ষক।

জাতীয় ইতিহাস রচনায় শিক্ষকদের স্থান অতি উচ্চে। শিক্ষক যদি ছাত্রদের জীবন সুগঠিত করেন তবে বিনিময়ে ছাত্ররাও জাতীয় জীবন

সুসংবদ্ধ করবে এত সহজেই অনুমেয়। কিন্তু জাতীয় জীবনকে সুগঠিত করতে হলে প্রথমেই শিক্ষকদের কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে। মুদালিয়ার কমিশন বলেছেন, শিক্ষকদের কতকগুলি ব্যক্তিগত গুণাবলী তো থাকবেই আর থাকবে তাঁর শিক্ষাগত পারদর্শিতা, তাঁর শিক্ষালাভ করবার ও সমাজসেবার মনোভাব। বিদ্যালয়ের সুনাম ও সমাজের উপর বিদ্যালয়ের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে বিদ্যালয়ের সুশিক্ষকের উপর।

স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—"তিনিই হইতেছেন সুশিক্ষক যিনি ছাত্রদের স্তরে নামিয়া আসিতে পারেন এবং তাঁহার নিজের আত্মার বাণী ছাত্রদের মর্মস্থলে পৌছাইয়া দিতে পারেন।"

শিক্ষকদের জাতীয়-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে H. G. Wells বলেছেন, "শিক্ষকই হচ্ছেন সত্যিকারের ইতিহাসের স্রষ্টা (The teacher is the real mother of history)। John Adams শিক্ষককে প্রকৃত "মানুষ-স্রষ্টা" হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। শিক্ষকই শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। মুদালিয়র কমিশনের এই বিষয় সম্পর্কিত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।[১]

এ সম্পর্কে আরও একটি প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ রাখতে হবে। এক অযোগ্য চিকিৎসক যেমন সমাজের স্বাস্থ্যকে বিঘ্নিত করে তেমনি তার চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক হচ্ছেন অযোগ্য শিক্ষক। তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে তার বিকাশকে পঙ্গু করেন এবং জাতীয়-জীবনকে পক্ষপাতগ্রস্ত করেন। এ প্রসঙ্গে Wanrine Walther-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।[২]

১। Mudaliar Commission: We are convinced that the most important fact in the contemplated educational reconstrution is the teacher—his personal qualities, his educational qualifications, his professional training and the place that he occupies in the school as well as in the community. The reputation of school and its influence on the life of the community invariably depend on the kind of teacher working in it.

২। Wanrine Walther: Good teachers cost more but poor teachers most.

শিক্ষকদের গুণাবলী।

মোটামুটিভাবে শিক্ষকদের কি কি গুণাবলী থাকা একান্ত আবশ্যক সে সম্বন্ধে জানা যেতে পারে।

(১) শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান—বর্তমানকালে শিশুর ইচ্ছা, আগ্রহ ও মানসিক ক্ষমতার উপর শিক্ষার গুরুত্ব নির্ভর করে। এইজন্য শিশু মনস্তত্ব জানা শিক্ষকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।[১] শিক্ষাদানের আগে শিক্ষক শিশুকে জানবেন তা না হলে তাঁর সব আয়োজন ব্যর্থ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে মুদালিয়র কমিশনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।[১]

(২) শিক্ষণ—জন্মগতভাবে শিক্ষকতা করার অধিকার সকলের থাকে না; তাই শিক্ষককে অনেকক্ষেত্রে শিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি হয়ে নিতে হয়। কি ভাবে পাঠদানে অগ্রসর হলে ছাত্ররা বেশি আনন্দ পায় ও শিক্ষাদান ফলপ্রসূ হয় তা শিক্ষককে জানতে হলে শিক্ষণের মাধ্যমে জানতে হবে। শিক্ষককে শিক্ষা জগতের নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কেও জানতে হবে। সুযোগ পাওয়া গেলে তিনি Inservice Training ও ঝালাই পাঠে (Refreshers course) যোগদান করবেন।

(৩) শিক্ষাদানে আগ্রহ ও উৎসাহ—বর্তমান যুগে দেখা যায় বহু ব্যক্তিই জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিফল মনোরথ হয়ে অবশেষে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে শিক্ষাদানে তাঁদের আগ্রহ স্তিমিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে শিক্ষার্থীর যেমন আগ্রহ প্রয়োজন, শিক্ষককেও কম আগ্রহী চলবে না। দাতা ও গ্রহীতার সমান উৎসাহ থাকলে তবেই শিক্ষা প্রবাহের গতি সচ্ছন্দ হবে।

(৪) সজীবতা—শিক্ষক নিজেই যদি শারীরিক বা মানসিক কারণে নিস্তেজ হয়ে পড়েন তবে ছাত্ররা আরও ঝিমিয়ে পড়বে। ইংরাজিতে একটি উক্তি আছে—যদি শিক্ষক দৌড়ান তবে ছাত্র হাঁটে, শিক্ষক যদি হাঁটেন তবে ছাত্র দাঁড়ায়, শিক্ষক যদি দাঁড়ান তবে ছাত্র বসে, শিক্ষক যদি বসেন তবে ছাত্র শুয়ে পড়ে, শিক্ষক যদি শুয়ে পড়েন তবে ছাত্র নিদ্রা যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে শিক্ষককে ছাত্রদের চেয়ে অনেক বেশি সজীব ও কর্মঠ হতে হবে তবে তিনি তাঁর সজীবতা কিছুটা ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারবেন।

১। Mudaliar Commission: Good methods which are Psychological and socially sound may raise the whole quality of their life, and bad methods may debase it.

(৫) মানসিক ভারসাম্য—ছাত্রদের আবেগজনিত বিকাশ শিক্ষকদের উপর অনেকখানি নির্ভর করে; কাজেই শিক্ষকদের যদি আবেগজনিত ভারসাম্য না থাকে তবে তিনি ছাত্রদের আবেগজনিত বিকাশ সাধনে অক্ষম হবেন।

(৬) গতিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব—শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব সমানুপাতে গতিসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা না হলে ছাত্ররা সময় ও পরিবেশের সদ্ব্যবহার করতে পারবে না।

(৭) বৌদ্ধিক ক্ষমতা—শিক্ষাদানকার্য ও বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে মনে করা হয়। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিক্ষককে বুঝতে হবে ও ভালভাবে পরিবেশন করতে হবে।

(৮) সংবেদনশীল মন—শিক্ষক তাঁর সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ছাত্রদের শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাগুলি দেখবেন ও তার সমাধান করতে এগিয়ে আসবেন।

(৯) আশাবাদী মন—শিক্ষক সব সময় আশা রাখবেন যে তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে।

(১০) নেতাসুলভ গুণ—শিক্ষক ছাত্রদের সব কাজে পরিচালনা করবেন, সমাজের নানা কাজে অংশ গ্রহণ করবেন। কাজেই শিক্ষকের নেতাসুলভ গুণ থাকা একান্ত ভাবে দরকার।

(১১) সমদর্শিতা—শিক্ষকদের নিকট সকল ছাত্র সমান, তাই তাঁদের ব্যবহার পক্ষপাতদুষ্ট হলে চলবে না। তাঁদের সমস্ত কাজে যদি তাঁরা পক্ষপাতশূন্য ও সমদর্শী হন তবে তাঁরা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবেন।

(১২) বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও জ্ঞানতৃষ্ণা—শিক্ষক যদি যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী না হন ও তাঁর জ্ঞানপিপাসা না থাকে তবে তিনি ছাত্রসমাজকে জ্ঞানান্বেষণে অনুপ্রাণিত করতে পারবেন না। প্রফেসার হুমায়ুন কবির বলেছেন,—"যে শিক্ষকের জ্ঞান স্বল্প, তিনি কখনও শিক্ষার্থীর মনকে জাগ্রত করতে পারবেন না।"....

এছাড়াও শিক্ষকের ধৈর্য, শক্তি, সহনশীলতা, সময়ানুবর্তিতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মসমালোচনা, মৌলিক কাজের স্পৃহা, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী, ছাত্রদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব, দেশপ্রেম, পেশাগত বিশ্বস্ততা ও অন্যান্য গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। দৈহিক সুশ্রীতা, স্বাস্থ্য, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ইত্যাদির উপর পাঠদানের সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে।

শিক্ষকদের কর্তব্য।*

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্থান সর্বাগ্রে। ফলে শিক্ষকের কাজ অনেক গুণ বেড়ে গেছে। আধুনিক শিক্ষকের কাজ কেবল তত্ত্বমূলক জ্ঞানার্জনে ছাত্রকে সহায়তা করা নয়, তার চেয়ে অনেক ব্যাপক ও বহুমুখী কাজে তাঁকে নামতে হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক সুদূরপ্রসারী।

(১) **বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা**—শিক্ষার্থী যাতে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করে তার প্রচেষ্টা চালাতে হবে শিক্ষককে।

(২) **শিক্ষার পরিকল্পনা**—শিক্ষাকে যদি স্থির লক্ষ্যে পৌছতে হয় তবে শিক্ষার পরিকল্পনা করার দক্ষতা শিক্ষককে অর্জন করতে হবে।

(৩) **ব্যক্তিসত্তার বিকাশসাধন**—বিদ্যালয়ের সমাজধর্মী পরিবেশে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশসাধনে সাহায্য করবেন শিক্ষক।

(৪) **শিক্ষার্থীর গৃহের সাথে সংযোগসাধন**—বর্তমান শিক্ষায় শিশুকে জানতে বলা হয় সর্বাগ্রে। শিশুকে জানতে বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তাকে অনেক সময় ভালভাবে জানা যায় না, তাই গৃহপরিবেশে যখন শিশু একান্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে থাকে তখন তাকে জানতে চেষ্টা করলে ভাল হয়। এই সব কারণেই শিক্ষককে শিশুর গৃহপরিবেশের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে বলা হয়।

(৫) **জীবনদর্শন গঠন**—শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যেকার দূরত্ব আজ অনেকখানি কমে এসেছে। ব্যক্তিগত প্রভাব ও আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মন জয় করতে পারেন। শিক্ষার্থীর জীবনদর্শন গড়তে সাহায্য করতে পারেন শিক্ষক।

(৬) **সুপরিকল্পনা ও সুমন্ত্রণা**—শিক্ষকের থাকে উন্নততর অভিজ্ঞতা ও নিপুণ কর্মদক্ষতা। এই সঞ্চয় নিয়েই শিক্ষক শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবন প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন ও সুষ্ঠু পরিণতির জন্য পরামর্শ দিতে পারেন।

(৭) **গণতান্ত্রিক শিক্ষাদান**—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভাবী নাগরিক তৈরির

* Q. "Teacher" is essentially another name for 'influence'. Show that the function of the teacher is to influence the child to personalise the impersonal experiences which constitute the course of study.

(B. T. 1958)

দায়িত্ব শিক্ষকদের। তাই গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার সাথে শিক্ষার্থীর বাস্তব পরিচিতি ঘটাবেন শিক্ষক।

(৮) **পরিশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী**—বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষককে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হয়। সহযোগিতার ভিত্তিতে চললে কাজ ভাল ভাবে সংঘটিত হয়।

আধুনিক শিক্ষকের দায়িত্ব তাই কেবলমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবনদর্শনে অংশ গ্রহণ করতে হবে শিক্ষককে।

বিভিন্ন শিক্ষকের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন।

বিদ্যালয়ের কর্মধারা বহুমুখী, শিক্ষকদের কর্মক্ষমতাও বিচিত্র ধরণের। প্রধান শিক্ষক এই দুটি বিষয়ে চিন্তা করে যাঁকে যে কাজের উপযুক্ত মনে বলে করবেন তাঁকে সেই কাজের ভার দেবেন। এক্ষেত্রে সহ-শিক্ষকদের সহযোগিতার মনোভাব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সহযোগিতার মনোভাব না থাকলে প্রধান শিক্ষকের একার পক্ষে পাঠদান, শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হবে না।

সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পাঠদানের জন্য অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের ও উচ্চশ্রেণীতে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু নিম্নশ্রেণীতে শিশুরা নূতন আসে, নূতন পরিবেশে শিশু যাতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে তার জন্য ধৈর্যশীল ও স্নেহপরায়ণ শিক্ষক প্রয়োজন।

উচ্চশ্রেণীতে কৌশলী ও বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক প্রয়োজন। মাঝামাঝি শ্রেণীতে অপেক্ষাকৃত ধৈর্যশীল শিক্ষক ও বন্ধুভাবাপন্ন শিক্ষক বেশী উপযুক্ত। কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষকদের সাহাচর্য দান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যদি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বা সমাজগত কোন দোষত্রুটি দেখা যায় তাহলে শিক্ষকের সাহচর্যের ফলে সেই দোষত্রুটি এই সময় সংশোধন করা চলে।

অনেক সময় বিষয় শিক্ষকের উপরে সমগ্র বিদ্যালয়ের কোন কোন বিষয়ের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়।

আবার অনেক সময় শ্রেণীশিক্ষক নিম্নশ্রেণীর সমস্ত বিষয় পড়ানোর দায়িত্ব নেন; উচ্চশ্রেণীতে শ্রেণীশিক্ষক সেই শ্রেণীর দায়িত্ব নেন বটে কিন্তু

বিষয়-শিক্ষকগণ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করেন। বর্তমানকালে বিশেষীকরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়া বিষয়ের বৈচিত্র্য এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে একজনের পক্ষে বহু বিষয় আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাই বিষয় শিক্ষকগণ বিশেষ বিষয়ে পাঠদান করলে পাঠদান সুষ্ঠু হয়। এছাড়াও সুবিধা হল এই যে একজন শিক্ষক যদি প্রতি শ্রেণীতে একই বিষয় পড়ান তাহলে ছাত্রছাত্রীদের স্তর অনুযায়ী কোথাও অসুবিধা থাকলে সহজে তিনি বুঝতে পারেন ও তার প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা করতে পারেন।

এর একটি অসুবিধা আছে শিক্ষকের দিক থেকে। একই বিষয় সব শ্রেণীতে স্তর অনুযায়ী পড়াতে গিয়ে তাঁর একঘেয়েমি আসে। তবে বিষয় সম্বন্ধে তাঁর দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এও ঠিক।

কিন্তু শ্রেণীশিক্ষকের কি তবে কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই? আছে। নিম্নশ্রেণীতে শ্রেণীশিক্ষক যদি সব বিষয়গুলি পড়ান তবে অবিভাজ্য পাঠ্যক্রমের প্রতি খানিকটা সুবিচার করা হয়। শ্রেণীশিক্ষক একটি শ্রেণীর সমস্ত শিশুকে ভাল করে জানার সুযোগ পান, ফলে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি ও বিকাশে সাহায্য করতে পারেন।

দুইভাবেই শিক্ষকদিগের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা যায়। নিম্নশ্রেণীতে শ্রেণীশিক্ষকদের উপর দায়িত্ব দিয়ে উচ্চশ্রেণীতে বিষয় শিক্ষকের উপর পঠন-পাঠনার ভার দিলে ভাল ফল পাওয়ার আশা রাখা যায়। তাই অনেকে মনে করেন ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীশিক্ষক খুব কার্যকরী পদ্ধতিতে পাঠদান করতে পারেন। সপ্তম শ্রেণী থেকে বিশেষীকরণের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। কাজেই তখন থেকে বিষয় শিক্ষকের উপর পাঠদানের দায়িত্ব অর্পণ করলে শিক্ষার কাজ সুফলপ্রদ হবে আশা করা যায়।

শিক্ষক-সভা (Teacher's Council)।

শিক্ষকগণ যখন শিক্ষকতা কাজে অংশগ্রহণ করেন তখন অনেকেই এক্ষেত্রে নতুন থাকেন। অত্যন্ত স্বল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে শিক্ষা কাজে অগ্রসর হতে হয়। তারপর নানাপ্রকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষকদেরও বিকাশ হয়। এই বিকশিত হওয়ার মূলে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের প্রয়োজন। সমস্যা সমাধান ও অভিজ্ঞতার দ্বারাই দলীয় কাজ সম্ভব

হয় এবং এর ফলেই সন্তোষজনক স্থির লক্ষ্যে পৌছানোর পথ খুলে যায়।[১]

বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব প্রধানতঃ প্রধান শিক্ষকের হলেও এটা সমবেত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি, তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাছাড়া গণতান্ত্রিক পরিচালনার ক্ষেত্রে সবারই দায়িত্ব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেইজন্য সমবেত আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করলে তবেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছান যাবে।[২]

কিন্তু সমবেত আলোচনা হবে কিভাবে? তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষক-সভার। শিক্ষক-সভা মাঝে মাঝে ডাকা প্রয়োজন। খুব ঘন ঘন শিক্ষক-সভা ডাকলে সভার গুরুত্ব কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তাই মাসে একবার শিক্ষক-সভার অধিবেশন হলেই যথেষ্ট। অবশ্য তাছাড়াও কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার জন্য যে কোন সময়ে শিক্ষক-সভার অধিবেশন হতে পারে। তবে দীর্ঘ সময় ধরে এই সভার কাজ চলতে দেওয়া ঠিক নয়। এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে আলোচনা শেষ করার চেষ্টা থাকবে।

শিক্ষক-সভায় প্রত্যেক শিক্ষকের তাঁর সমস্যাবলী সম্বন্ধে বলার পূর্ণ অধিকার থাকবে। Briggs সাহেব বলেছেন যে শিক্ষক-সভার মাধ্যমে (১) শিক্ষকরা তাঁদের সমস্যাবলী সমাধানে সাহায্য পাবেন। (২) শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকদের দৃষ্টি প্রসারিত হবে। (৩) সবার সঙ্গে মিলিত হয়ে আত্ম-তৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন প্রত্যেক শিক্ষক। (৪) শিক্ষক-সভার মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষকের যোগ্যতার মর্যাদা দেওয়া হবে; দোষত্রুটি ধরা হবে এই সভার গৌণ কাজ। যিনি এই সভার প্রধান থাকবেন তিনি সকলের সমস্যাগুলি ভাল করে অনুধাবন করতে চেষ্টিত হবেন এবং সকলের পরামর্শ

১। The development of the staff into a working group is a long term project. It brought about through many experiences in which the members of the staff and group work a satisfying and effective means of achieving desired results. 'Supervision for Better Sehools'.

—Kimball Wiles.

২। Cf. Reavis: No matter what his (headmaster's) personal characheristies are, he will not be successful unless he is able to inspire his associates and callaborators with the desire to work cooperativly for the goals for which the schools stand.

নিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ একটা বাতলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তাঁর সর্বতো চেষ্টা হবে প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁর কাজে সাহায্য করা। এখানে শিক্ষাবিদ Wiles-এর মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

তবে শিক্ষক-সভার অধিবেশন হওয়ার আগে প্রধান শিক্ষক কি কি বিষয় আলোচনা করা উচিত তা প্রত্যেক শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন। তারপর আলোচ্য বিষয়গুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করে সকলকে দেখার সুযোগ দেবেন। ফলে প্রত্যেকে তাহলে আলোচ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে আগে থেকে কিছুটা চিন্তা ভাবনা করে রাখার সুযোগ পাবেন। অবশ্য এই সভায় প্রত্যেক শিক্ষকের উপস্থিতি একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষক-সভার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়গুলির প্রগতির বিবরণ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এরজন্য প্রত্যেক বিষয় শিক্ষকগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটি বিবরণী তৈরি করে রাখলে শিক্ষক-সভার কাজ ত্বরান্বিত হবে ও সময়ের অপচয় কম হবে।

প্রধান শিক্ষক সাধারণতঃ শিক্ষক-সভা পরিচালনা করেন, তবে তিনি পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শিক্ষকদের এই সভার আহ্বায়ক করে দায়িত্ব কিছু বণ্টন করে দিতে পারেন।

শিক্ষক-সভার মাধ্যমে আরও কি কি কাজ হতে পারে এই প্রসঙ্গে Ryburn বলেছেন—"Such an orgainsation of the staff, with faculties and meetings and full staff meetings, will give ample opportunity for consideration and discussion of work that is being done, for planning of experiments, for directing progress in the work of the school, for

---

১। Wiles : The official leader must accept the responsibilities for building up high morale among the members of the staff. Morale consists of many things. It involves a feeling that members of the administrative staff are concerned about the Problems and points of view of individual staff members. For the supervisor, it means providing the best possible working conditions and having the staff know that their welfare is important, it means that the individual teaeher must know that his opinion is given consideration in the formation of Purposes and Procedures ; it means the creation of working conditions in which people have an opporturity to know each other and like each other as individuals.

correlation of work, for organisation, for discussion of new methods, for consideration of difficult pupils, for ventilation of grievances or difficulties among members of the staff themselves or which they come across among the pupils of the school and will contribute very greatly to a healthy and vigorous atmosphere in the school"।

এখন দেখা যেতে পারে শিক্ষক-সভার অধিবেশনকলে প্রধান শিক্ষক ও সভাপরিচালকের কাজ কি হবে ও অংশগ্রহণকারীরাই বা কিভাবে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবে।

প্রধান শিক্ষকের প্রথম কাজ হবে শিক্ষক-সভার অধিবেশন সুরু হওয়ার সাথে সাথেই এমন পরিবেশ তৈরি করা যাতে সবাই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন ও খুশীমনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ; কোন সমস্যামূলক বিষয় উত্থাপিত হলে প্রধান শিক্ষক সকলকে মতামত প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করবেন।

সভা পরিচালকের দ্বিতীয় কাজ হোল, আলোচনার ধারা অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হওয়ার জন্যে পথ প্রদর্শন করা। তৃতীয় কাজ হোল, সভায় যদি কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তবে তা সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে সকলকে বুঝতে সাহায্য করা। চতুর্থ কাজটি হোল, আলোচনা চলতে চলতে অংশ-গ্রহণকারীরা অনেক সময় আলোচনার মূল বক্তব্য থেকে দূরে সরে যান, তাই সভাপতির কাজ হবে সকলকে মূল বক্তব্যে ফিরিয়ে আনা। সভাপতির সর্বশেষ কর্তব্য হোল, সেদিনকার অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলিকে সুসংহত করে সংক্ষিপ্ত আকারে সকলের সামনে তুলে ধরা। সভাপতিকে সমস্ত আলোচনায় নেতার ভূমিকা নিতে হবে।

শিক্ষক-সভার আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আলোচনায় প্রত্যেকের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে, কাজেই আগে থেকে প্রত্যেককে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করে রাখতে হবে। প্রত্যেকে মনে করবেন যে তাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণকারী কাজেই নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিলে চলবে না ; শিক্ষক-সভায় প্রত্যেকে মনে করবেন কোন সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর দান অনবদ্য।[১] প্রত্যেক শিক্ষক চেষ্টা

১। "Each participant must assume that everyone in the group has something unique to contribute to the solution of the problem.
—Kimball Wiles.

করবেন সভার আলোচনা যাতে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে সভার কাজ শেষ হওয়া উচিৎ নয়। Kimball Wiles বলেছেন—"Meeting should not close without reaching conclusions.

শিক্ষক-সভার একটি সামাজিক মূল্য ও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিক্ষকদের সামাজিকরণে এই সভা বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে। সবাই অন্ততঃ মাসে একদিন একত্র মিলিত হয়ে চিন্তা বিনিময়ে অংশগ্রহণ করছেন এর মূল্যও কম নয়। তা ছাড়াও সভাশেষে থাকে হাল্কা জলযোগের ব্যবস্থা। এর মধ্যে দিয়েও সবার মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং আনন্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

শিক্ষক-সভায় শুধু বিদ্যালয় সম্পর্কিত আলোচনাতেই সভার কাজ নিবদ্ধ থাকবে না। এর একটি দ্বিতীয় দিকও থাকবে। এর দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, শিক্ষকদের পেশাগত সমৃদ্ধি। নানাভাবে একাজ চলতে পারে। যথা—(১) বর্তমান শিক্ষার ধারা ও গুরুত্বমূলক শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা। একটি Topic আগে স্থির করা যায়। সে বিষয়ে সকলেই কিছু কিছু পড়াশুনা করে আসতে পারেন। একটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। 'বর্তমান পরীক্ষাব্যবস্থায় দুর্নীতি'। এ বিষয়ে একজন সমস্যার সূত্রপাত করবেন। পরে তার উপর আলোচনা চলতে পারে। (২) শিক্ষাসম্বন্ধীয় কোন সমস্যামূলক প্রবন্ধ শিক্ষক-সভার একজন সভ্য কর্তৃক-পাঠ; তার উপর আলোচনা। উদাহরণস্বরূপ, Programmed Instruction বা ক্রম অনুযায়ী নিজে শেখো পাঠ। (৩) শিক্ষাবিভাগের সহযোগিতায় কিভাবে শিক্ষক-সভার সভ্যগণ বিভিন্ন শিক্ষা কর্মশালায় পাঠচক্রে যোগদান করতে পারেন তার আলোচনা। (৪) শিক্ষা কর্মশালা বা পাঠচক্র প্রত্যাগত শিক্ষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পাঠ ও তার উপর আলোচনা। (৫) বিভিন্ন বিদ্যালয় সম্বন্ধে কারও অভিজ্ঞতা থাকলে তা শোনা ও তা নিয়ে আলোচনা।

এরূপভাবে শিক্ষক-সভা পরিচালিত হয় তাহলে শিক্ষকগণ সমৃদ্ধ হবেন বই কি?

এইসব দিক বিবেচনা করে আমরা একথা বলতে পারি যে, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে এবং সাফল্যের সাথে বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে এই শিক্ষক-সভা একান্ত অপরিহার্য। শিক্ষাকার্যকে অপ্রতিহত গতিতে

প্রবাহিত করার মানসে শিক্ষক-সভার অবদান উপেক্ষা করলে চলবে না। শিক্ষক-সভার যথাযথ মূল্যায়নই শিক্ষায় সাফল্য এনে দেবে।

সময়-পত্রিকা (Time Table)।*

বর্তমানকালে বিদ্যালয় পরিচালনায় ক্ষেত্রে সময়-পত্রিকা একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কাজ হল নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠ পরিচালনা করা। পাঠ্যক্রমে বিবিধ বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে নানা সময়ে পরিবেশন করাই হবে সময়-পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সুষ্ঠু পরিবেশনের পক্ষে পূর্ব পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। পাঠ পরিচালনার জন্য যে এই পূর্ব পরিকল্পনা, তারই নাম দেওয়া হয় সময়-পত্রিকা। "The schedule is the plug of the school which sets into motion its various activities and programmes।" বিদ্যালয় পরিচালনা করতে হলে যেমন একটি ঘড়ি একান্ত অপরিহার্য তেমনি সময়-পত্রিকা রচনাও একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ। অনেকে সময়-পত্রিকাকে দ্বিতীয় ঘড়ি বলেন।[১] বাস্তবিকই সময়-পত্রিকাই একটি বিদ্যালয়ের দর্পণ যার মধ্যে বিদ্যালয়ের সবকিছুরই প্রতিফলন পড়ে। বিদ্যালয়ের কর্মপ্রবাহ, বিদ্যালয়ের যা কিছু বৈশিষ্ট্য, বিদ্যালয়ের যা কিছু অভিনবত্ব তা ধরা পড়ে এই সময়-পত্রিকার মাধ্যমে। বিদ্যালয়ের প্রকৃত গৌরবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত করে একটি সময়-পত্রিকা। বিদ্যালয়ের সাফল্য নির্ভর করবে সীমিত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের সাফল্যমণ্ডিত সুবণ্টনের উপর। সুপরিকল্পিত সময়-পত্রিকার মাধ্যমেই এই সুবণ্টন সম্ভব।

সময়-পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা।

সময়-পত্রিকা যে আমাদের বিদ্যালয় জীবনে কতখানি প্রয়োজন তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখা চলতে পারে। যেমন.

(১) সময়-পত্রিকার সাহায্যে আমাদের শক্তি ও সময়ের অপচয়

* Q. Indicate and illustrate the Principles that should guide us in framing a school time table.

১। Time Table said to be the second school clock which indicates all activities undertaken in a school. It shows thc hours of work, kind of work or subjects, ths teachers at work and at rest, the rooms being used in a certain period, recreational Time etc......

বাঁচে। শিক্ষকদের মধ্যে সুষম কর্ম বণ্টনের ফলে ও সময়ের সুষম বিভাজনের ফলে সময়ের অপচয় বাঁচে। অধ্যাপক B. C. Rai-এর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[১]

(২) প্রত্যেক বিষয় ও প্রত্যেক কাজের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া যায় সময়-পত্রিকার মাধ্যমে। প্রত্যেক বিষয়টির প্রতি কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হবে তার নির্দেশ পাওয়া যাবে সময়-পত্রিকার সাহায্যে। যদি সময়-পত্রিকা না থাকে তবে বিদ্যার্থীরা তাদের ভাললাগা অনুসারে কোন কোন বিষয় কেবলমাত্র পড়বে, বাকি বিষয়গুলির গুরুত্ব অনেক কমে যাবে।

(৩) সময়-পত্রিকার সাহায্যে নৈতিকমান উন্নত হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নীতিশিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এই সময়-পত্রিকার মাধ্যমে; নিয়মানুবর্তিতা, কর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। এছাড়াও যথাসময়ে সম্পন্ন করতে, কাজ ও নিয়মকানুন সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে শিক্ষার্থীরা শেখে; এর ফলে নৈতিক উন্নয়ন তাদের সম্ভবপর হয়।

(৪) বিদ্যালয় জীবনে একটি ছন্দ এনে দেয় এই সময়-পত্রিকা। সময়-পত্রিকা শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়কেই যুগপৎ কর্মব্যস্ত রাখে। ফলে পরোক্ষভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলারক্ষায় সাহায্য করতে পারে সময়-পত্রিকা।

(৫) সময়-পত্রিকা স্থির উন্নতির দিকে নিয়ে যায় ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শিক্ষক ছাত্র যুগপৎ কাজ করে, ফলে কর্ম অত্যন্ত সহজ হয়। নিয়মিত কর্মপ্রবাহের মধ্যে শিক্ষক ছাত্র উভয়ই যে কোন সমস্যার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়। তাঁরা সমস্যার কেন্দ্রস্থলে আঘাত হানতে পারেন—They readily grasp the pin-point।

(৬) মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন—সময়-পত্রিকার মনস্তাত্ত্বিক মূল্যও কম নয়। সময়-পত্রিকা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ক্লান্তি দূর করে, আবার নতুন কর্মোদ্যমে উদ্বুদ্ধ করে। ক্রমাগত বিষয় পরিবর্তনের মাধ্যমে পাঠদানের ও শিক্ষণের একঘেয়েমি দূর করে।

এছাড়াও সময়-পত্রিকার উপযোগিতা হল সময়-পত্রিকার সাহায্যে পাঠ্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যায়। সময়-পত্রিকাটি জানা থাকার ফলে শিক্ষকদের পাঠদানের সুবিধা হয়, কারণ আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে

১। B. C. Rai: Proper distribution of work directs the teacher's energy to one thing at a time and at the proper time.

আসার ফলে শিক্ষকদের সময় ও শক্তির অপচয় হয় না। সময়-পত্রিকা জানা থাকলে ছাত্রদেরও সুবিধা হয়; কখন কি পড়ান হবে জানলে সেইভাবে তারা পাঠ প্রস্তুত করতে পারে। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়-পত্রিকা একটি মূল্যবান হাতিয়ার। বিভিন্ন বিষয়কে ঠিকভাবে পরিবেশন করা যায় সময়-পত্রিকার মাধ্যমে।

সময়-পত্রিকা রচনার মূলনীতি।*

সময়-পত্রিকা রচনা একটি সময় সাপেক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সময়-পত্রিকা রচনাকালে বিভিন্ন বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়। কাজেই এরূপ রচনা, রচনাকারীর প্রতিভা ও দক্ষতার উপর অনেকটা নির্ভর করে। যে সকল নীতির উপর নির্ভর করে সময়-পত্রিকাটি রচনা করা উচিত সেগুলি হল:

(১) কি ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—সময়-পত্রিকা রচনার সময় 'work according to need' এই হবে মূলমন্ত্র। বালকদের একরকম প্রয়োজন, বালিকাদের একরকম প্রয়োজন, গ্রামে একরকম, সহরে আর একরকম, যে বিদ্যালয়ে সকাল দুপুর, রাতে ক্লাস হয় সেখানে ভিন্ন রকম, যেখানে সহ-শিক্ষা সেখানে অন্য রকম প্রয়োজন থাকতে পারে। সুতরাং প্রয়োজনের কথা সর্বাগ্রে চিন্তা করতে হবে।

(২) বিভিন্ন বিষয়ের ক্লান্তিমূল্য—পাঠ্যতালিকায় এমন কতকগুলি বিষয় থাকে যেগুলি কঠিন আবার কতকগুলি থাকে সহজ। কঠিন বিষয়গুলিকে আয়ত্বে আনতে হলে অধিক মনোযোগ দিতে হয়। যে বিষয়গুলিতে অধিক মনোযোগ লাগে সেগুলি সহজেই মানসিক ক্লান্তি এনে দেয়। এই ক্লান্তিমূল্য হিসাবেই বিষয়গুলিকে সময়-পত্রিকায় সন্নিবেশিত করা হয়। যেমন, বিদেশী ভাষা, অঙ্ক ইত্যাদি অধিক মনোযোগ সাপেক্ষ; তাই বিষয় হিসাবে প্রথমে ইংরাজী, গণিত, সংস্কৃত, মাতৃভাষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, লিখন, অঙ্কন, শিল্পকাজ, খেলা ইত্যাদি পরপর থাকলে ভাল হয়।

বিষয়ের ক্লান্তিমূল্যের সাথে সাথে সময়ের ক্লান্তিমূল্যও বিচার করা প্রয়োজন। পাঠের সুরুতে মন যে পরিমাণে ধীর স্থির থাকে, সারাদিনের শেষে

---

* Q. Is the time table essential in a school ? What factors should be kept in view in preparing the time table ? What should be included in it ? (Call T. 1967)

তা আর থাকে না। কাজেই কঠিন বিষয়গুলি দিনের প্রথম দিকে দিলে ভাল হয়। তবে মনঃসংযোগের দিক থেকে প্রথম ঘণ্টা অপেক্ষা দ্বিতীয় ঘণ্টা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ঘণ্টায় ছাত্রছাত্রীরা সবেমাত্র বাড়ী থেকে আসে, বাইরের প্রভাব তখনও তাদের মনে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। দ্বিতীয় ঘণ্টায় তাই মনোযোগের মাত্রা বাড়ে, তারপর আস্তে আস্তে কমতে থাকে। সপ্তাহকে ভাগ করে দেখলেও একইভাবে দেখা যায় সোমবারটা প্রথম পিরিয়াডের মত চঞ্চলতায় পূর্ণ, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতিবার মনস্থির থাকে, আবার শুক্র, শনিবার মনটা ঝিমিয়ে পড়ে। তবে সময়-পত্রিকা রচনাকালে মাঝে মাঝে বিরতি থাকলে ঝিমিয়ে পড়া মনকে আবার খানিকটা চাঙ্গা করে নেওয়া যায়। অনেকে তাই ২য় বা ৩য় পিরিয়াডের পরে স্বল্পবিরতি (১০মি.) ও ৪র্থ ও ৫ম পিরিয়াডের পরে দীর্ঘ বিরতিদানের (৩০ মি.) পক্ষপাতী। এতে ফল অবশ্য খুব ভাল হয়।

(৩) **প্রত্যেক পিরিয়াডের ব্যাপ্তিকাল** (Duration of Period)—সময়-পত্রিকা রচনাকালে চিন্তা করে নিতে হবে যে প্রত্যেকটি পিরিয়াড কতক্ষণ ধরে চলবে। পিরিয়াডের ব্যাপ্তিকাল আবার (ক) বিষয়ের ক্লান্তিমূল্য, (খ) পিরিয়াডের ক্লান্তিমূল্য, (গ) শিক্ষার্থীর বয়স ও (ঘ) ঋতুর উপর নির্ভর করে।

(ক) যে বিষয়গুলিতে অধিক মনোযোগ প্রয়োজন হয়, সেই বিষয়গুলির পিরিয়াড ছোট হলেই ভাল হয়। কারণ অনেকক্ষণ গভীর মনোযোগ দিলে মনটা সহজে অবসন্ন হয়ে পড়ে। কাজেই কঠিন বিষয়গুলি একসঙ্গে অনেকক্ষণ না পড়িয়ে বারে বারে পড়ালে ফল ভাল হয়।

(খ) পিরিয়াডে ক্লান্তিমূল্য হিসাবে বলা যায় দিনের প্রথম দিকের পিরিয়াডগুলি বড় হলেও ছাত্ররা মনোযোগ দিতে পারে, তাই প্রথমদিকে ৪০।৪৫ মিঃ এবং শেষের দিকে ৩০।৩৫ মিঃ পিরিয়াড হলে ভাল হয়।

(গ) শিক্ষার্থীর বয়স হিসাবেও পিরিয়াড ছোটবড় হবে। ছোট শিশুরা বেশীক্ষণ একনাগাড়ে মনোযোগ দিতে পারে না। সেই ছোট ক্লাসের পাঠ্য বিষয়গুলির পিরিয়াড ২৫-৩০ মিঃ হলেই চলে। তবে হাতের কাজ, খেলা ইত্যাদি একসঙ্গে দু' পিরিয়াড করা চলে।

(ঘ) ঋতু হিসাবে পিরিয়াড ছোটবড় হয়। গ্রীষ্মকালে সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সবাই, তাই পিরিয়াড ছোট হয়। কিন্তু তখন আবার দিন বড়, কাজেই

লম্বা সময় নানাভাবে ব্যয় করা যায়। শীতকালে পরিশ্রম করার ক্ষমতা বাড়ে, কিন্তু দিন ছোট হয়ে যায়, সব কাজে ঠিক যথেষ্ট সময় দেওয়া যায় না।

(৪) শিক্ষকের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করে—সময়-পত্রিকা রচনা করা কর্তব্য ও প্রত্যেক শিক্ষকের মধ্যে কাজ সমবণ্টন করা উচিত। প্রত্যেক শিক্ষককে দুই পিরিয়াড বিরতি দিলে ভাল হয়, একটি বিশ্রামের জন্য —অপরটি খাতাপত্র দেখার জন্য। শিক্ষকের কাজে যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিষয়-শিক্ষক হলে এই বৈচিত্র্যে নীতি প্রয়োগ করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

(৫) বৈচিত্র্যের নীতির উপর—সময়-পত্রিকা অনেকখানি নির্ভর করবে। একটি বিষয় একইভাবে প্রত্যহ পরিবেশিত হলে ছাত্রদের মধ্যে শেখার আগ্রহ কমে যেতে পারে। কতকগুলি বিষয় আছে যা প্রত্যহ না অভ্যাস করলে পাঠে যথেষ্ট অগ্রসর হওয়া যায় না, সেগুলি অবশ্য প্রত্যহ না রেখে উপায় থাকে না। যেমন ইংরাজী. অঙ্ক, মাতৃভাষা ইত্যাদি। কিন্তু ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও অন্যান্য সহপাঠ্যক্রমিক বিষয় প্রত্যহ পরিবেশিত না হলে কিছু অসুবিধা হবে না, কাজেই বিষয়গুলিকে প্রত্যহ Block পদ্ধতিতে না পড়িয়ে Spiral পদ্ধতিতে দু'দিন একদিন বাদ দিয়ে দিয়ে পরিবেশন করলে ভাল হয়।

(৬) গৃহকাজের নীতি—একদিনে যাতে গৃহকাজের চাপ বেশি না থাকে তা দেখতে হবে। গৃহকাজ সপ্তাহের প্রত্যেক দিনের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। তবে সাধারণতঃ ছুটির পরদিনের জন্য একটু গৃহকাজের বেশি চাপ থাকে। সেটা ছাত্রছাত্রীদের করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

(৭) নমনীয়তা—সময়-পত্রিকা কোন অপরিবর্তনীয় নীতির উপর স্থাপিত হবে না। পাঠের গতি অনুসারে পরিবর্তন-সাপেক্ষ হবে। সময়-পত্রিকাতে কেবলমাত্র মূল বিষয়গুলির উল্লেখ থাকবে; প্রত্যেক বিষয় শিক্ষক ঠিক করবেন কোনদিন কি নেবেন। কোনদিন কোন বিষয়ের কি কি পড়াবেন তা বিষয়-শিক্ষকই ঠিক করবেন।

(৮) বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও স্থান সঙ্কুলানের—কথা চিন্তা করে

---

* Q. Show that time table is the bringing together of the pupil, teacher, curriculum and to some extent the building in a harmoniously working whole. Discuss in this cannection the sound principles of time table construction. (B. T. 1969)

অনেক সময় সময়-পত্রিকা রচনা করতে হয়। অনেক সময় ঐচ্ছিক বিষয়গুলি (Optional subjects) স্থানাভাবে ঠিকভাবে পড়ান যায় না।

(৯) প্রত্যেক দিনের কার্য-তালিকায় যাতে আনন্দমূলক—কোন কাজ, শিল্পকাজ ও খেলাধূলা স্থান পায় তার দিকে নজর রাখতে হবে। সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়গুলির প্রতি প্রবণতা এই সময়-পত্রিকার মাধ্যমেই গড়ে উঠবে।

(১০) সময়-পত্রিকার বিভিন্নতা—সময়-পত্রিকা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, সে কথা মনে রেখে সময়-পত্রিকা রচনা করতে হবে। যেমন, (ক) সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য একটি সময়-পত্রিকা (খ) শ্রেণী অনুসারে সময়-পত্রিকা, (গ) শিক্ষক অনুসারে সময়-পত্রিকা, (ঘ) অনুপস্থিত শিক্ষকদের জন্য সাময়িক সময়-পত্রিকা।

অনেকে অবশ্য মনে করেন সময়-পত্রিকার প্রয়োজন নেই। তাঁদের আপত্তির কারণ হল সময়-পত্রিকার দ্বারা সময় নির্দিষ্ট হওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ ও মনোযোগ অনুসারে পাঠ পরিচালনা করা যাচ্ছে না। তাছাড়া সকলের মেধা সমান নয়; নির্দিষ্ট সময় সকলে একটি বিষয় আয়ত্তে আনতে সক্ষম হতে নাও পারে। ছোটদের বেলায় মনযোগ একটা বিষয় থেকে অন্যটায় খুব চটপট পরিবর্তন করা নাও যেতে পারে সবসময়। আগের বিষয়টি অনেকক্ষণ মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদগণ ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের পক্ষ সমর্থন করে থাকেন।

সমস্ত বিষয় বিবেচনা করলে কিন্তু দেখা যাবে সময়-পত্রিকার অসুবিধার থেকে সুবিধার মাত্রা অনেক বেশী। সময়-পত্রিকা রচনা করা কঠিন কাজ হলেও কঠিন কাজটি করার প্রতি আমাদের চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি যেন না থাকে। Ryburn বলেছেন, Some attempt to adhere to right principles can always be made, no matter how difficult the local circumstances may be."

বিদ্যালয় পরিদর্শন (Supervision and Inspection)।

পরিদর্শন কথাটি Supervision Inspectionকে বোঝায় বটে কিন্তু Supervision কথাটি Inspection-এর থেকে অনেক ব্যাপক। পূর্বে বিদ্যালয় পরিদর্শন বলতে Inspection-কেই বোঝাত কিন্তু বর্তমানে

পরিদর্শনের কাজ অনেক বেড়ে গেছে তাই আর Inspection না বলে Supervision বলাই বিধেয়।[১]

পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা।

বিদ্যালয় সমাজ কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। সমাজের মানুষ আদর্শ নাগরিক তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচুর অর্থব্যয় করে চলেছে আর এই কাজের দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর। সে দায়িত্ব কতখানি সুষ্ঠুভাবে পালিত হচ্ছে তা জানতে উৎসুক থাকেন অভিভাবক শ্রেণী। তাছাড়া বর্তমান যুগে সামাজিক উন্নয়নের দায়িত্বও রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রও বিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন এই কাজের জন্য। কাজেই অতি সঙ্গতভাবে এই অর্থের সদ্ব্যবহার কতখানি হচ্ছে ও কিভাবে হচ্ছে তা জানার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এই সব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে শিক্ষার সাথে শিক্ষা পরিদর্শনও সমান্তরাল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বর্তমানে পারিদর্শক কেবলমাত্র শিক্ষকদের দোষত্রুটি দেখার জন্য বিদ্যালয়ে আসেন না, শিক্ষকদের প্রকৃত উন্নয়ন করাই পরিদর্শকের প্রধান কাজ। পরিদর্শক মহাশয় বিদ্যালয়ের ভালমন্দ সুবিধা-অসুবিধা দেখবেন ও সমস্যাবলী আলোচনা করে সমাধানের পথে অগ্রসর হবেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয় পরিদর্শনের উদ্দেশ্যও অনেক বিস্তৃত হয়েছে।

পরিদর্শনের উদ্দেশ্য।

পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হল—

(১) শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তা শিক্ষকদিগকে ভাল করে বুঝতে সাহায্য করা। সেই উদ্দেশ্য বিদ্যালয় কতখানি সাধন করতে পেরেছে তার মূল্যায়ন করে শিক্ষকদিগকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর সাবিক বিকাশ; শিশুর কতখানি সাবিক বিকাশ হচ্ছে তা পরিদর্শক শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করতে পারেন।

(২) শিশুর চাহিদা অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি পরিবেশন করার জন্য পরিদর্শক মহাশয় শিক্ষকদিগকে উৎসাহিত করবেন। শিশুর ক্রমবিকাশের

১। আমাদের দেশে জাকির হোসেন কমিটি রিপোর্টে Inspector-এর পরিবর্তে Supervisor কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে Supervisor-এর গুণাবলীরও বর্ণনা হয়েছে।

বিভিন্ন স্তরে শিশুর চাহিদা কি, সে সম্বন্ধে শিক্ষকদের বিশেষভাবে অবহিত করবেন পরিদর্শক মহাশয়।

(৩) গণতান্ত্রিক উপায়ে যাতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কর্মধারা আবর্তিত হয় তা দেখাও বিদ্যালয় পরিদর্শকের কর্তব্য; এই কর্মপদ্ধতির মাধ্যমেই শিক্ষকদের গ্রহণ করতে হবে নেতৃত্বের দীক্ষা ও সহযোগিতার মনোভাব।

(৪) প্রত্যেক শিক্ষকের গুণগুলি পরিদর্শক মহাশয় খুঁজে বার করবেন ও গুণের যথাযথঃ মর্যাদা দেবেন।

(৫) আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষকগণ যাতে রপ্ত হতে পারেন তার জন্য পরিদর্শক মহাশয় চেষ্টা করবেন। মাঝে মাঝে আলোচনা-চক্র ইত্যাদিতে শিক্ষকদিগকে যোগদান করতে অনুপ্রাণিত করবেন।

(৬) পরিদর্শক মহাশয় শিশুর সার্বিক বিকাশের পথে শিক্ষকদের প্রচেষ্টারও মূল্যায়ন করবেন।

(৭) বিদ্যালয়ের অনগ্রসর শিশুরাও পরিদর্শক মহাশয়ের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে না। তিনি তাদের শিক্ষাদানের বিশেষ কৌশলগুলির কথা শিক্ষকদের বলবেন।

(৮) বিদ্যালয়ের কর্মপন্থাটি পরিদর্শক মহাশয় সমাজের মানুষের সামনে শিক্ষকদের মাধ্যমে তুলে ধরবেন।

(৯) পরিদর্শক মহাশয় শিক্ষকদের আত্মবিশ্বাস জাগাবেন।[১] এই সব দিক থেকে পরিদর্শনকে যথার্থই শিক্ষার মেরুদণ্ড বলা হয়।

পরিদর্শনের শ্রেণী বিভাগ।

পরিদর্শন বিভিন্ন প্রকারের হ'তে পারে। যেমন—

(১) সংশোধনমূলক (Corrective type) পরিদর্শন—পরিদর্শনকালে বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত ভুলভ্রান্তি ও শিক্ষকদের শিক্ষাপদ্ধতি সংক্রান্ত ভুলভ্রান্তি দেখে তার সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এই জাতীয় পরিদর্শনের মাধ্যমে।[২]

Dr. M. Siddalingaiya :

১। The best type of inspection is that which aims at liberating the teacher from set procedures and making leaders self-reliant and enthusiastic in his work."

২। "The faults he should try to remove and excellences, be should praise"………

(২) প্রতিবিধানমূলক (Preventive type) পরিদর্শন—এই প্রকার পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষকগণ দূরদর্শী হ'তে পারেন ; ফলে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে ও সেগুলি সমাধান করতে তাঁরা সক্ষম হন। শিক্ষকগণ নিজেদের শিক্ষাগত সমস্যা সম্বন্ধে পরিদর্শককে জানাতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ শিক্ষকগণ পরিদর্শকের কাছে জানতে চাইতে পারেন, কিভাবে শ্রেণীতে প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ হবে, কিভাবে সময়-পত্রিকার বিন্যাস হবে, কিভাবে বিদ্যালয়ে বাগানের কাজ করবার ব্যবস্থা করা যাবে ইত্যাদি। পরিদর্শক শিক্ষকদের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করে আসবেন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে একত্র মিলিত হয়ে বসে কি প্রসঙ্গে কতটুকু কাজ কিভাবে করা যাবে, কিভাবে তার পরিকল্পনা করা হবে ইত্যাদি আলোচনা করবেন। এস্থলে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থী হিসাবে পরিদর্শকের কাছে পথ প্রদর্শনের ইঙ্গিত দেবার কথা বলবেন। এরূপ সহযোগিতামূলক কাজে বিদ্যালয়ে সাফল্য আসবে বেশি।

(৩) সৃজনমূলক (Creative type) পরিদর্শন—সৃজনমূলক পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষকগণ সৃজনমূলক কাজে মেতে উঠেন। শিক্ষকগণ আত্মবিশ্বাসী হয়ে নানান কাজে নিজেদের স্বাধীন হস্ত প্রসারিত করেন। পরিদর্শক বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে আলোচনা সভায় বসে, তাঁদের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের উন্নতির সম্ভাবনামূলক প্রস্তাব আহ্বান করতে পারেন এবং প্রস্তাবের উপর আলোচনা করে বিদ্যালয়ের সমৃদ্ধির কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সাহায্য করতে পারেন।

পরিদর্শনের জন্য পরিকল্পনা।

পরিদর্শনে যাওয়ার আগে পরিদর্শক মহাশয় খানিকটা পরিকল্পনা করে নেবেন। পরিকল্পনা সৃজনাত্মক ব্যাপক হবে। পরিকল্পনা হবে সহযোগিতা-মূলক এবং পরীক্ষামূলক।

পরিদর্শন পরিকল্পনাটি অবশ্য কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

(১) পরিদর্শন সংক্রান্ত পরিকল্পনা রচনার মূল কথা হল শিক্ষার ভবিষ্যৎ

১। Write notes on : School Inpection—how it should be reformed ? (B. T. 1966).

২। What should be the role of a School Inspector ? Discuss the recommendations of Education Commission (1966) in this respects.

কি হবে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা। শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা যতই স্পষ্ট এবং ব্যাপক হবে পরিদর্শন ততই সুষ্ঠু হবে।

২) উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে পরিদর্শকের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পরিদর্শককে প্রথমতঃ একজন শিক্ষক হ'তে হবে। তিনি যদি উত্তম শিক্ষাদানের মূলকথাগুলি না জানেন তাহলে তিনি পরিদর্শকের পদের যোগ্যতালাভ করতে পারেন না।

(৩) পরিদর্শকের ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের জানার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। তাই পরিদর্শক মহাশয় শিক্ষকদের সাহায্যে এবং সর্বাত্মক লিপির সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের জেনে পরিদর্শনের পরিকল্পনা রচনা করবেন।

(৪) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্বন্ধে জ্ঞান—পরিদর্শক মহাশয়, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিশেষ গুণাবলী, শিক্ষকতার প্রতি তাঁদের মনোভাব, শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব ইত্যাদি জানবেন তারপর তিনি পরিকল্পনা রচনা করবেন।

(৫) প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান—বিদ্যালয় যদি ভালভাবে পরিচালনা করতে হয় তবে বিদ্যালয় গৃহ, কর্মশালা, পরীক্ষাগার, বিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি জেনে তবে পরিদর্শন পরিকল্পনা করলে ভাল হয়।

(৬) পরিদর্শন পরিকল্পনা করার সময় পরিদর্শককে সমাজের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

(৭) পরিদর্শন পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে পরিদর্শক চিন্তা করবেন কোন শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি বিদ্যালয়ে অনুপ্রবেশ করাতে কতটা সময় লাগতে পারে।

(৮) পরিদর্শনের কোন কার্যক্রমই সম্পূর্ণ হবে না যদি না পরিদর্শনের মাধ্যমে কোনরূপ মূল্যায়নের ব্যবস্থা না থাকে।

এতো গেল পরিকল্পনার কথা, কিন্তু কি কি নীতি অনুসারে বিদ্যালয় পরিদর্শন করা উচিত তা আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের নীতি ঃ নেতিবাচক নীতি।

পরিদর্শকের স্বেচ্ছাচারী ও প্রভুত্বপূর্ণ ব্যবহার হবে না। যখন তখন যে কোন নীতি পরিদর্শক প্রবর্তন করবেন না।

পদমর্যাদার অধিকারে পরিদর্শক বিদ্যালয় পরিদর্শন করছেন একথা যেন কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা মনে না করেন। যদি তা কেউ মনে করেন তবে পরিদর্শনের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। যদি পরিদর্শক বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার নিয়ে বিদ্যালয়ের কোন পরিস্থিতি আলোচনা করেন তবে হয়তো সকলে তা গ্রহণ করবে সানন্দে।

পরিদর্শন শিক্ষার আদর্শকে উপেক্ষা করবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য। কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিদর্শক তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করবেন।

পরিদর্শকের মন্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত হলে ভাল হয় কারণ এই কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। কাজেই পরিদর্শকের ইঙ্গিত পেয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষাসম্বন্ধীয় উন্নতি বিধান করবেন।

পরিদর্শনের মন্তব্য কেবল বর্তমানের মধ্যেই সীমিত থাকবে না; এই মন্তব্যের কাজ হবে সুদূর প্রসারী।

পরিদর্শকের লক্ষ্য থাকবে যেন পরিদর্শনের দ্বারা কেউ বিরক্ত বোধ না করেন। সেইজন্য প্রথমে পরিদর্শক মহাশয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠদানের ভাল দিকগুলি সম্বন্ধে প্রশংসা করবেন। পরে যদি কোন ত্রুটি থাকে তবে তার গঠনমূলক সমালোচনা করবেন।

পরিদর্শক অবশ্য তাঁর মন্তব্যের ফলাফল সম্বন্ধে খুব অসহিষ্ণু হবেন না। যে কোন উন্নয়নমূলক পরিবর্তন রাতারাতি হওয়া কঠিন। কাজেই তাঁর মন্তব্য অনুসারে কোন পরিবর্তন করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট সময় দিতে হবে।

ইতিবাচক নীতি।

ইতিবাচক নীতি বলতে বোঝায় পরিদর্শন হবে গঠনমূলক অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যে গঠনমূলক বুদ্ধি ও কল্পনা আছে তা কেমন করে কাজে লাগানো যায় তা দেখাবেন পরিদর্শক।

পরিদর্শন গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী হবে। গণতন্ত্রের প্রথম কথাই হোল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করা। তা করতে পরিদর্শক কেবলমাত্র নির্দেশ দেবেন না, যা করবেন তা হবে সমবেত চিন্তাভাবনার ফল।

পরিদর্শনের মুখ্য নীতি হল শিক্ষার্থীদিগকে সমাজের উপযুক্ত করে সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্য করা।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ গুণাবলীর সমৃদ্ধি সাধনও পরিদর্শনের অপর একটি নীতি।

এ প্রসঙ্গে ধর্মসংস্কারক কনফুসিয়াসের উপদেশ উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন যে অন্যের জীবনে যা ভাল তা আরও ভাল করতে চেষ্টা করাই হচ্ছে গুরুর কাজ। খারাপকে ভাল করা নয়। এই নীতি অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রত্যেক পরিদর্শকেরই তা গ্রহণ করা উচিত। তিনি শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে যতটুকু ভাল আছে, তাকে আরও ভাল করবেন আরও উন্নতিসাধন করবেন। এর ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যতটুকু ত্রুটি আছে তাও ভালর প্রভাবে ধীরে ধীরে কমে যাবে।

পরিদর্শনের পরিধি।

এখন আমরা দেখব যে পরিদর্শক মহাশয় কি কি জিনিস পরিদর্শন করবেন।

প্রথমতঃ—পরিদর্শক মহাশয় পাঠদান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিদর্শন করবেন। কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি সেই শ্রেণীর উপযুক্ত হয়েছে কি না, কোনো দৃশ্য-শ্রাব্য শিক্ষাসরঞ্জাম ব্যবহার করেছে কি না, সময়-পত্রিকা, শিক্ষকদের মধ্যে কর্ম বণ্টন, পাঠ্যক্রম ইত্যাদি পরিদর্শক মহাশয় বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখবেন।

দ্বিতীয়তঃ—একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত মান কেবলমাত্র পাঠ্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়গুলিরও শিক্ষাগত মূল্য নিতান্ত কম নয়। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, প্রদর্শনী কক্ষ, প্রাচীর পত্র-পত্রিকা, ছাত্র-সংসদ, খেলাধূলা, শখ (hobbies) ইত্যাদি পরিদর্শনের আওতায় আসা উচিত।

তৃতীয়তঃ—বিদ্যালয় পরিবেশটি কেমন তা দেখতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ ছাত্রছাত্রীদের অভ্যাসগঠনে, শৃঙ্খলারক্ষায় কতখানি সাহায্য করে তা দেখা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের ক্যান্টিন আছে কিনা, পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে কি না, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা হয় কি না, তাদের বাথরুম, পায়খানা যথেষ্ট সংখ্যক আছে কিনা তাও দেখা উচিত। তাছাড়া

বিদ্যালয়টির সৌন্দর্য সাধন করার কিভাবে চেষ্টা করা হয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে।

চতুর্থতঃ—পরিদর্শক দেখবেন বিদ্যালয় সংক্রান্ত সংগৃহীত অর্থ কতখানি কোন কাজে ব্যয় করা হয়েছে ; এইজন্য বিদ্যালয়ের যাবতীয় খাতাপত্র তাঁকে দেখতে হবে।

পঞ্চমতঃ—বিদ্যালয়ের কোন উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা আছে কি না তা দেখবেন পরিদর্শক মহাশয়।

বর্তমানে দেখা যায় তিনি যদি কোন সুদক্ষ পরিদর্শক হন তবে তাঁর কর্তব্য কেবলমাত্র এগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন না, আরও শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্য বহুক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত করেন। যেমন—

(১) পথপ্রদর্শন (Guidance)—সাধারণভাবে শিক্ষাগত মান উন্নয়ন করতে হলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের Guidance Service চালু করার কথা বলা হয়েছে। একাজে অগ্রসর হতে গেলে পরীক্ষা নিতে হয়, পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করতে হয়, আরও কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, কর্মশালা (workshop) ইত্যাদি পরিচালনা করতে হয়। এই সমস্ত কাজে শিক্ষক-গণকে সাহায্য করবেন পরিদর্শক মহাশয়।

(২) বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাঠদানের কোন অসুবিধা আছে কি না জানার জন্য পরিদর্শক মহাশয় শিক্ষকদের সাথে আলোচনা সভায় মিলিত হবেন ; তাছাড়া প্রত্যেক শিক্ষকের সাথে তিনি ব্যক্তিগতভাবেও কথা বলতে পারেন।

(৩) পরিশেষে বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে পরিদর্শক মহাশয় প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে নেবেন। এইভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শনের ক্ষেত্রটি প্রসারিত করলে ও পরিদর্শনের নীতি সম্বন্ধে পরিদর্শক মহাশয় উদার মনোভাব দেখালে তবেই শিক্ষাক্ষেত্রে পরিদর্শনের যথাযথঃ মূল্য স্বীকৃত হবে।

পরিদর্শকের গুণাবলী।

পরিদর্শকের গুণাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে ও তাঁর কাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে গিয়ে Brilley বলেছেন, পরিদর্শকের কাজের এরকম উদ্দেশ্য হবে না যে—"Check your teachers, frighten your teachers,

weaken your teachers and examine them", কিন্তু এর পরিবর্তে হতে হবে—"Train your teachers, insprie your teachers, encourage your teachers and trust them."

এই সব কাজে যদি পরিদর্শককে দক্ষ হতে হয় তবে তাঁর কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন। যেমন—

(ক) **শিক্ষা সম্বন্ধে সম্যক দৃষ্টি**—পরিদর্শক মহাশয় নিজে শিক্ষিত হলেই যথেষ্ট হবে না, শিক্ষার বর্তমান গতি, প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার।

(খ) **ধৈর্যশীল হতে হবে**—কোন সংস্কারের কাজ তাড়াহুড়া করে হয় না, শিক্ষাতো নয়ই। কাজেই ধৈর্যের সাথে প্রত্যেক কাজে পরিদর্শককে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(গ) **মনের নমনীয়তা**—মনের নমনীয়তা থাকলে তবেই পরিদর্শক মহাশয় শিক্ষা-বিষয়ক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবেন ও আরও দশজনকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিতে পারবেন।

(ঘ) **পরিদর্শক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হবেন**—না হলে তিনি ভাল পরিকল্পনা করতে সক্ষম হবেন না।

(ঙ) **সহানুভূতিশীল মনের অধিকারী হবেন বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয়।** সহানুভূতিশীল মন নিয়ে পরিদর্শনের কাজ সুরু করলে তবেই তিনি শিক্ষকদের শিক্ষাদানে উৎসাহ ও প্রেরণা জাগাতে পারবেন।

(চ) **সংগঠনী মনোবৃত্তি**—পরিদর্শকের গঠনমূলক কাজের প্রতি আগ্রহ থাকবে। তবেই তিনি শিক্ষা-সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধান করে শিক্ষাকে স্থির উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারবেন।

(ছ) **পরিচালনা ক্ষমতা**—পরিদর্শক যেহেতু শিক্ষকের শিক্ষক, কাজেই তাঁকে কর্মশালা, আলোচনাচক্র ইত্যাদি পরিচালনা শিক্ষকদের নিয়েই করতে ও তা সুষ্ঠুভাবে করতে হবে।

(জ) **নানা বিষয়ে দক্ষতা**—নানা বিষয়ে দক্ষ হতে হবে পরিদর্শককে; কারণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে নানাভাবে নানা কাজে সাহায্য করতে হলে তাঁর নিজের সেগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট দক্ষতা থাকতে হবে।

(ঝ) **সংযোগরক্ষাকারী ও সমন্বয়সাধক হবেন পরিদর্শক।** শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা অধিকর্তা, বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী, শিক্ষক, ছাত্র ও

অভিভাবকশ্রেণীর মধ্যে যদি সুমধুর সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় তবেই শিক্ষা অপ্রতিহত গতিতে চলতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই গুরু দায়িত্ব বহন করতে হবে বিদ্যালয়ের পরিদর্শককে।

বিদ্যালয় পরিদর্শক নির্বাচন করার জন্য মুদালিয়ার কমিশনে বলা হয়েছে যে পরিদর্শকের মাষ্টার ডিগ্রী বা অনার্স ডিগ্রী থাকবে। (১) শিক্ষক হিসাবে দশ বছরের অভিজ্ঞতা থাকবে (২) উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে থেকে পরিদর্শক নির্বাচিত হতে পারেন, (৩) শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে থেকেও পরিদর্শক হ'তে পারেন।

এই প্রসঙ্গে কোঠারী কমিশনের নির্দেশগুলিও আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষা বিভাগের পুনর্গঠন করতে হবে। শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব হবে—

(১) বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য উৎকৃষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা ও সেগুলিকে রূপ দান করা। (২) বিদ্যালয়ের মাননির্ণয় করে তা রূপায়ন করা। (৩) শিক্ষক-শিক্ষণের মাধ্যমে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক তৈরী করা। (৪) পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করতে হবে এই শিক্ষাবিভাগকে। (৫) শিক্ষার মান পরিমাপ করার জন্য State Evaluation Organisation নামক প্রতিষ্ঠানের কাজ সুরু করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গুণগত মানোন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গঠন করতে হবে। (৭) State Institute of Education স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাবার চেষ্টা করতে হবে। (৮) বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

জেলাস্তরেও শিক্ষাবিভাগের অনেক কাজ আছে।

জেলাস্তরের সমস্ত কাজের কর্তৃত্ব ভার জেলাস্তরের কর্মচারীদের দিতে হবে। পরিদর্শকদের বেতনহারের উন্নতি করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। পরিদর্শকদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। মহিলাদের শিক্ষা প্রসারের জন্য মহিলা পরিদর্শক নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।

খুব সাবধানতার সাথে বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে। প্রধান শিক্ষককে অবশ্যই শিক্ষণ প্রাপ্ত হ'তে হবে।

নূতন বিদ্যালয় পরিদর্শনের ক্ষেত্রে স্কুল কমপ্লেক্সের ভূমিকা :— (Role of the School Complex in the new supervision)।

৩।৪ টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১০।১২ টি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের

একটি School Complex গড়ে তোলার জন্ম শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেছেন।

এই কমপ্লেক্সটি কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কাজের জন্ম তৈরী থাকবে। জেলা-শিক্ষাকর্মচারিগণ প্রতিটি স্কুল কমপ্লেক্সের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রাখবেন। উন্নততর শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন, শিক্ষাক্ষেত্রে সমসুযোগ, In service Training, নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদি হবে School Complex এর কাজ।

এই School Complex এর পরিকল্পনাটি পরীক্ষামূলকভাবে প্রতি রাষ্ট্রের কতকগুলি নির্দিষ্ট জেলায় চালু করতে হবে, তার পর এইগুলিই পথপ্রদর্শন করবে অন্যান্য Complex গুলিকে।

School Complex সংঘবদ্ধ কর্ম প্রচেষ্টাকেই কেবল রূপ দেবে না ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকেও উৎসাহ দেবে।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজটিকে সক্রিয় করে তুলতে হলে—

(১) বিদ্যালয় পরিচালনা ও পরিদর্শনকে সম্পূর্ণ পৃথক করে তুলতে হবে। সেইজন্য District School Board পরিচালনার কাজ করবেন ও District Education Officer পরিদর্শনের ভার নেবেন। দুইটি কাজেই সহযোগিতার মনোভাব থাকবে।

(২) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পরিদর্শন চালু করতে হবে।

(৩) প্রত্যেক বিদ্যালয়কে অনুমোদনলাভ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

(৪) State Institute of Education এবং Staff College for Educational Administrators ইত্যাদির কাজ হবে শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় পরিচালনা ও পরিদর্শনের জন্ম চাকুরীরত অবস্থায় শিক্ষণের (Inservice Training) ব্যবস্থা করা।

তৃতীয় অধ্যায়

অভিভাবক-শিক্ষক সহযোগিতা

(Parent-Teacher Co-operation)

প্রাচীনকালে শিক্ষার পরিধি ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, তাই সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব পিতামাতাই নিতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের জীবনে নানা জটিল আবর্ত দেখা দিল ফলে শিক্ষার বহুমুখী চাহিদা অনুভূত হোল। এই বহুমুখী চাহিদা মেটানো পিতামাতার পক্ষে সম্ভব হোল না কারণ তাঁদের জ্ঞানের পরিধিও সীমাবদ্ধ ও শিক্ষা দেওয়ার মত সময়ের একান্ত অভাব বোধ করলেন তাঁরা। ফলে তাঁদের সন্তান-সন্ততীর শিক্ষার ভার 'শিক্ষক' নামধারী একদল মানুষকে নিতে হোল, প্রতিষ্ঠিত হোল বিদ্যালয়। পিতামাতা তাঁদের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়েই তাঁদের নিজেদের দায়িত্ব শেষ করতেন ; আবার শিক্ষকরাও শিশুর পিতামাতার সাথে কোন সূত্র রক্ষা করা প্রয়োজন একথা কখনও উপলব্ধি করতেন না। ফলে শিক্ষক ও অভিভাবক একই উদ্দেশ্যে ব্রতী হলেও দুজনের মধ্যে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল।

এই ব্যবধানের অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। শিক্ষকদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য অভিভাবকশ্রেণী তাঁদের এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করতেন। তাছাড়া শিক্ষকদের যোগ্যতায় তাঁদের এমনই আস্থা ছিল যে, তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবর নেওয়াকে নিজেদের ঔদ্ধত্য বলে মনে করতেন।

শিক্ষকরাও নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে এমনই অধিক সচেতন থাকতেন যে, শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকদের কোন মতামত থাকতে পারে একথা তাঁরা ভাবতে পারতেন না।

তাছাড়াও বিদ্যালয়গুলিও সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বীপের মত অবস্থান করত।

এযুগে কিন্তু শিক্ষার স্বরূপ গেছে বদলে। নিছক জ্ঞানমূলক শিক্ষাকে আর শিক্ষা বলা হয় না। তাই শিশুর কেবল পুস্তকমুখী জ্ঞানতৃষ্ণা মেটানোর প্রচেষ্টাকে শিক্ষাদান বলা হয় না। শিক্ষাকে শিশুমনের উপযুক্ত করে তার মনের দরজায় হাজির করার দায়িত্ব আজ শিক্ষকদের। সেইজন্য শিক্ষার গোড়ার কথাই

হবে শিশুকে জানা। শিশুকে জানতে হলে অভিভাবকদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন[১]। শিশু তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করে। এখানে শিশুর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় না। তাই শিশুকে জানতে হলে জানতে হবে তার গৃহপরিবেশকে, তার পরিজনবর্গকে ও তার পিতামাতাকে[২]।

শিক্ষক-অভিভাবক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা।

শিক্ষক-অভিভাবক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা আজ সবদিক থেকে অনুভূত হচ্ছে। শিক্ষকদের দিক থেকে অভিভাবকদের সহযোগিতা নানা কারণে একান্তভাবে কাম্য। যেমন (ক) শিশু সম্বন্ধে অনেক সঠিক খবর পাওয়া যাবে অভিভাবকদের সহায়তায়। (খ) শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়াতে অভিভাবকের সহযোগিতা প্রয়োজন(গ) বাড়ীতে শিক্ষার্থীরা কি ধরনের গৃহকাজ করে তার বিবরণ অভিভাবকদের কাছ থেকে শিক্ষক পেতে পারেন। (ঘ) অভিভাবকদের সহযোগিতায় শিশুর প্রয়োজন অনুসারে তাকে নানাপ্রকার নির্দেশ ঠিকসময়ে শিক্ষক দিতে সক্ষম হন। (ঙ) বিদ্যালয়ের অর্থ সংগ্রহও গৃহের আর্থিক অবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভর করবে। (চ) সামাজিক শিক্ষা বিদ্যালয়ে দেওয়া হলেও অভ্যাস করতে হয় গৃহে।

আবার অভিভাবকদের দিক থেকেও শিক্ষক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাঁদেরও প্রয়োজন, তাঁদের শিশুদের কতখানি শিক্ষাগত উন্নতি হচ্ছে তা জানার। শিশুদের কোন সমস্যা থাকলে তাও অভিভাবকশ্রেণী শিক্ষকদের মাধ্যমে অবগত হতে পারেন। শিক্ষকদের উপদেশ ও পরামর্শ শিশুর জীবনে সুফলপ্রসূ হবে একথা অভিভাবক মনে করবেন।

অনেক সময় দেখা যায় গৃহপরিবেশে পরিবারের নানাজনের প্রভাব

১। S. Bala Krishna Joshi : Close Co-operation between the parent who is the first teacher and the teacher, who is the second parent, is the very foundation on which rests the fruitfulness of the training imported in our institutions.

২। Mr. George Tomlinson : Let us fashion our homes and organise our schools with the well-being of children always in mind. In particular remember that any clash between the parents and teachers must always be harmfull to the child. Harmonious working together can alone bring us the result we want.

শিশুর উপর পড়ে, তার ফলে শিশুর মধ্যে বহু প্রক্ষোভমূলক সমস্যা দেখা দেয়। শিশুর প্রক্ষোভমূলক সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য শিক্ষক ও পিতামাতার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশুর নৈতিক শিক্ষার জন্যও শিক্ষক ও পিতামাতার যৌথ প্রচেষ্টা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এই সব কারণে শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যেকার ব্যবধান দূর করতে বলা হয়েছে এবং তারজন্য উপায়ও উদ্ভাবন করা হয়েছে; উপায় হিসাবে বলা হয়েছে যে অভিভাবকদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে তা পালন করা যায়, আর শিক্ষক-অভিভাবক সমিতিও গড়ে তোলা যায়।

অভিভাবক দিবস (Parents Day)।

আধুনিককালে প্রত্যেক পিতামাতা তাঁদের শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। তাই শিশুরা বিদ্যালয়ে কিভাবে শিক্ষালাভ করছে তা তাঁরা অনেকে জানতে উৎসাহবোধ করেন। এইসব কারণে বিদ্যালয়ে অভিভাবক দিবস নামে একটি বা দুটি দিন পালনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

বৎসরের মধ্যে যে কোন একটি বা দুটি দিন এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট হয়; ঐদিনগুলিতে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিশুর অভিভাবককে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করতে হবে। অভিভাবকরা সেদিন এসে দেখবেন বিদ্যালয়ের কাজকর্ম কিভাবে চলছে; কিভাবে নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ হচ্ছে। অভিভাবক দিবসটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে ঐদিনের জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। ঐদিনের যাবতীয় কর্মপরিচালনার ভার ছাত্রদের হাতে তুলে দিতে হবে। অবশ্য সকল কাজেই শিক্ষক থাকবেন প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে। প্রধান শিক্ষক সমস্ত অভিভাবকদের সাথে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত থাকবেন।

অভিভাবক দিবসের কর্মসূচীর মধ্যে থাকবে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, যার মধ্যে ছেলেমেয়েদের হাতে তৈরি জিনিসগুলি প্রাধান্য পাবে। শিক্ষার্থীদের নিজেদের হাতে তৈরি নানান রকম শিল্পকাজ, চার্ট, ছবি, মানচিত্র ইত্যাদি প্রদর্শনীতে থাকবে। তাছাড়া থাকবে প্রাচীরপত্র, ম্যাগাজিন ইত্যাদি; এগুলির শিক্ষামূলক তাৎপর্য অভিভাবকরা উপলব্ধি করবেন।

বিদ্যালয় গৃহটিকে বিশেষভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলতে, সেই দিনটির জন্য ছাত্রদের আঁকা ছবি দেওয়ালে শোভা পেতে পারে, মেঝেতে আল্পনা দিয়েও ছাত্ররা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে।

ছাত্রদের মধ্যেই কর্ম বণ্টন করা থাকবে। কেউ কেউ নিমন্ত্রণের ভার নেবে, কেউ বা অভ্যর্থনা করবে, কেউ ঘুরে ঘুরে সব জিনিস দেখাবে ও ব্যাখ্যা করবে; ছাত্ররা প্রত্যেক শিক্ষকের সাথে অভিভাবকদের আলাপ করিয়ে দেবে, কেউ খাদ্যপানীয় পরিবেশন করবে, কেউ সাজাবে, কেউ খেলাধূলা পরিচালনা করবে ইত্যাদি।

বিদ্যালয়টির সব কক্ষ দেখা হলে নির্দিষ্ট সময়ে সকলকে জলযোগের জন্য ডাকা হবে। এরপর শিক্ষক-অভিভাবকদের আলোচনার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। বিকালের দিকে বিচিত্রানুষ্ঠান ও খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখা যায়। বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্যে নৃত্য, গীত, আবৃত্তি, নাটক, কৌতুক নাটক ইত্যাদি থাকবে; অভিভাবকদের মধ্যে থেকেও কাউকে কাউকে এতে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা যায়; তাঁরা সেদিন অন্ততঃ যেন মনে করতে পারেন যে বিদ্যালয় তাঁদেরই কাজে নিয়োজিত তাঁদেরই একটি প্রতিষ্ঠান।

খেলাধূলা দেখেও অভিভাবকশ্রেণী অনুভব করবেন যে তাঁদের ছেলে-মেয়েরা কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই শিখছে না, নানাবিষয়ে দক্ষতা অর্জন করছে।

কি কি পদ্ধতিতে ক্লাস নেওয়া হয় তারও নমুনা অভিভাবকশ্রেণীকে দেখান যেতে পারে। নিম্নশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কার্যসমস্যা পদ্ধতিতে ও কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে ক্লাস নেওয়া যেতে পারে।

এতসব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও হয়তো দেখা যাবে অভিভাবকদের মধ্যে থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এই সাড়া নিতান্তই ক্ষীণ। কোন জরুরী কাজে তাঁদের ডেকে পাঠিয়েও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের দর্শন পাওয়া যায় না। অভিভাবকদের মধ্যে আবার অনেকে বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ নিয়ে আসেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু অভিভাবক-শিক্ষক সহযোগিতার জন্য যে দিবসটি পালন করার কথা বলা হয়েছিল তার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার পরিবর্তে তিক্ততারই সৃষ্টি হবে।

আবার শিক্ষকদের দিক থেকেও বলা যায় যে তাঁদের ব্যবহারও সকল অভিভাবকের প্রতি সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। মর্যাদা, জাতি, ধর্ম অনুসারে শিক্ষকদের ব্যবহারের যেন তারতম্য না হয়। কোন অভিযোগ যদি কোন অভিভাবক এনেই থাকেন তবে শিক্ষকের উচিত হবে সব অভিযোগই ধৈর্য

সহকারে শোনা ও যথাসম্ভব সদুত্তর দেওয়া। শান্তভাবে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তাঁদের ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করবেন শিক্ষক।

এই অভিভাবক দিবসকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে এই কথা ভেবে এই দিনটি পালন করা থেকে বিরত থাকলে চলবে না। নানান অসুবিধা আছে জেনেও যদি আমরা এই দিনটি পালন ঠিকমত করতে পারি তবে এর ফল যে শুভময় হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

অভিভাবক-শিক্ষক সঙ্ঘ (Parent-Teacher Association)।*

অভিভাবক দিবসের একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মূলবান কার্যসূচী হল অভিভাবক-শিক্ষক সঙ্ঘের অধিবেশন। এই সভায় শিক্ষক ও অভিভাবকগণ মিলিত হয়ে বিদ্যালয়ের পরিচালনা, আয়ব্যয় ইত্যাদি নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন ও সমাধানের পথ বাতলানোর চেষ্টা করবেন। কিন্তু সব অভিভাবক যদি তাঁদের মতামত দেওয়ার চেষ্টা করেন তবে কোন সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। তাই অভিভাবকদের মধ্যে থেকে দায়িত্বশীল দেখে কয়েক-জনকে নির্বাচিত করে নিয়ে তাঁদের নিয়ে, শিক্ষকদের সহযোগিতায় একটি স্থায়ী অভিভাবক-সমিতি গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রতি দুই মাসে একবার করে এই সমিতির অধিবেশন বসবে ও নানাপ্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করবে। এই নির্বাচিত সদস্যদের নিকট অবশ্য প্রত্যেক অভিভাবক তাঁর মতামত জানাবেন।

সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে এই সমিতি বহুবিধ আলোচনা করতে পারেন, এর ফলে শিক্ষকদের প্রতিদিনের কাজে হয়তো কিছুটা সুবিধা হতে পারে। শিক্ষাসংক্রান্ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলও এখানে আলোচনা হতে পারে। এতে রক্ষণশীল অভিভাবকগণ যাঁরা সহজে কোন পরিবর্তন চান না তাঁদের মনোভাবের পরিবর্তন হ'তে পারে। নূতন জিনিস গ্রহণ করার জন্য তাঁরা তৈরি হবেন, ফলে শিশুও নূতন জিনিস গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করবে।

অভিভাবক-শিক্ষক সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের নানা দিকের মঙ্গল বিধান করা সম্ভব।

১। Discuss the value of Co-operation between parent and teacher in education. Draw up a scheme for the formation of Parent Teacher Association for the mutual benefit of the School and the Community. (B. T. 1968)

২। Write notes on : Parent-Teacher Co-operation. (B. T. 1065)

বিদ্যালয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য শিক্ষকগণ যেমন দায়ী, অভিভাবকদের দায়িত্বও সেখানে কম নয়।

উদাহরণস্বরূপ দুই একটি দিকের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

হয়ত দেখা গেল বিদ্যালয় গৃহের একটি অংশ ঝড়ের ফলে শ্রেণী পাঠনের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। অথচ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের পক্ষে আশু টাকা সংগ্রহ করা সহজ নয়। তাহলে কি শিক্ষার্থীরা কবে সরকারী আনুকূল্যে বিদ্যালয় গৃহ সংস্কৃত হবে তার জন্য বসে থাকবে? এজন্য অভিভাবকবর্গ কি করতে পারেন তা অভিভাবক সমিতি ভেবে দেখতে পারেন। সমাজের প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়। অতএব অভিভাবকগণ অর্থ সাহায্য দিয়ে, শ্রমদান করে, প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে, বিদ্যালয় গৃহের সংস্কার সাধন করতে পারে।

অন্য একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। অথচ একজন সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত করার মত সুবিধা বিদ্যালয়ের নেই। স্থানীয় সমাজের কেউ যদি সঙ্গীতে অভিজ্ঞ থেকে থাকেন, তবে তিনি অভিভাবক-শিক্ষক সঙ্ঘের অনুরোধে অনায়াসে বিনা পয়সায় শ্রমদান করে উৎসাহী শিক্ষার্থীদের সঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারেন।

আর একটি উদাহরণের সাহায্য নিতে পারা যায়। স্থানীয় সমাজে হয়ত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আছেন। অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির আবেদনে তিনি হয়ত তাঁর সুবিধা অনুযায়ী মাঝে মাঝে 'সাধারণ বিজ্ঞান ও জীবনে তার প্রয়োগ' সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের কাছে বক্তৃতা দিতে পারেন। এরূপভাবে অভিভাবক-শিক্ষক সঙ্ঘের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের নানারকমের সাংস্কৃতিক উন্নতিসাধন করা যায়।

অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির আলোচনার মাধ্যমে প্রাচীনপন্থী অভিভাবকগণ নানা বিষয়ে উদারমত পোষণ করতে শিখবেন। যেমন, খেলাধূলার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক অভিভাবক সন্দিহান। মানসিক উন্নতি ও শারীরিক উন্নতি যে পাশাপাশি চলে একথা তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে। পিতামাতার খেলাধূলার উপকারিতার প্রতি বিশ্বাস জন্মালে তবেই শিশুদের খেলাধূলায় মিলবে অবাধ ছুটি; ফলে শিক্ষার ফল হবে সুদূরপ্রসারী।

অভিভাবক-শিক্ষক সঙ্ঘের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে শিশুর সামাজিকরণ শিক্ষা এগিয়ে চলবে। শিশুর জীবনে বিদ্যালয়, গৃহ ও সমাজের প্রভাব সমান

গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির চিন্তা বিনিময় ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে এই তিনটি একসূত্রে গ্রথিত হবে এবং শিশুর জীবনে বহন করে আনবে মূর্তিমান কল্যাণের একটি জীবন্ত বিগ্রহ। এই অভিভাবক-শিক্ষক সঙ্ঘের গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে Thring লিখেছেন—"The ordinary machinery for good school life is a thing of calculation and measurement but all discussion is in vain unless parents are interested....". অভিভাবকদের আগ্রহ ও মনোযোগ শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ; এই আগ্রহ ও মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে অভিভাবক-শিক্ষক সঙ্ঘের মাধ্যমে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক (Pupil-Teacher relationship)।

আমরা জানি পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে আমাদের যে আচরণ ধারার পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ, তাই শিক্ষা। শিক্ষার সাহায্যেই মানুষ তার জীবনযুদ্ধে এগিয়ে চলেছে, পশ্চাতে ফেলেছে সমস্ত মনুষ্যেতর প্রাণীকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে শিক্ষা মানুষের জীবনে অপরিহার্য। কিন্তু এই শিক্ষার কাজ চালাতে গিয়ে মানুষকে সামাঞ্জস্য বিধানের কথা চিন্তা করতে ও তার জন্য নিরলস সাধনা চালিয়ে যেতে হয়। এমনি করে সারা জীবনব্যাপী চলে মানুষের শিক্ষা। জন ডিউইর ভাষায় তাই শুনতে পাই শিক্ষা ও জীবন সমান্তরালগামী,—Education is not a preparation for life, rather it is living। ডিউইর এই কথার সমর্থন শিক্ষাবিদ রেমণ্টের কথায় মেলে। তিনি বলেছেন, শিক্ষা হোল এমন একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া যার জন্য শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মানুষকে তার শারীরিক, সামাজিক ও আ্যাধ্যাত্মিক জগতের সাথে সার্থক অভিযোজন করে চলতে হয়।[১]

এই উন্নয়নের কথা বল্লেই প্রথমেই কতকগুলি জিনিসের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। মানুষের বেলায় এই প্রাথমিক অস্তিত্ব হোল কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির। এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে পরিমার্জিত করে সমাজানুমোদিত ব্যক্তিত্ব-

১। Raymant : Education means the process of development in which consits the passage of a human being from intancy to maturity the process whereby he gradually adapts himself in various ways to his physical, Social and Spiritual environment.

পথে প্রবাহিত করে শিক্ষা ; শিক্ষা কার সাহায্যে এই কাজ করবে ? শিক্ষক ; শিক্ষক শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। শিক্ষাবিদ অ্যাডাম শিক্ষাকে তাই দ্বিমুখী প্রক্রিয়া (bipolar process) বলেছেন। তাঁর মতে—"Education is a bipolar process in which one personality acts upon another in order to modify the development of the other." জগতের সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার শিশুর মধ্যে সুপ্ত আছে এবং শিক্ষক তার কেবলমাত্র দ্বারোদ্ঘাটন করবেন, তাহলেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যাবে না। শিক্ষকেরও কিছু বলবার থাকবে, শেখাবার থাকবে ; শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যৌথ প্রচেষ্টাতেই সার্থক শিক্ষা সম্ভব। বিদ্যালয়কে তাই Ryburn বলেছেন—'A school first and foremost be a co-operative society." শিক্ষক-শিক্ষার্থী ছাড়াও এই co-operative society-র কর্মী ও সদস্য আরও অনেকে আছেন তবুও এটা অস্বীকার করা যায় না যে শিক্ষাযজ্ঞের প্রধান হোতা হলেন শিক্ষক ও তন্ত্রধার হলেন শিক্ষার্থী। কাজেই শিক্ষাযজ্ঞের সাফল্য নির্ভর করবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কের উপর। আধুনিক শিক্ষার পটভূমিকায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক আলোচনা করার আগে আমাদের জানতে হবে প্রাচীনকাল থেকেই এই শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক কিভাবে আবর্তিত হচ্ছে।

যে কোন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা থাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তা প্রায় দেশকাল নিরপেক্ষ বলা চলে। শিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া শিক্ষা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভবই হোতো না। প্রাচীনকালের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকই অধিকাংশ স্থান অধিকার করে আছেন। শিক্ষার্থীর স্থান ছিল নিতান্ত গৌণ। শিক্ষক অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত থেকে উপদেশামৃত বর্ষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথের মতে আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি ফুলের কুঁড়ির উপর নির্মমভাবে নিক্ষিপ্ত হলে ফুলের কুঁড়ির যেরূপ ক্ষতবিক্ষত অবস্থা হয়, শিক্ষকদের উপদেশও সেইভাবে কোমলমতি শিশুদের উপর বর্ষিত হয়ে তাদের ক্ষতবিক্ষত করে দিত। তাদের বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা বিকৃত করে দিত। শিক্ষার্থী ছিল সেখানে অসহায়। শিক্ষক দাতা, শিক্ষার্থী গ্রহিতা মাত্র। শিক্ষার্থীর মন থাকত শূন্য ; এই শূন্য কুম্ভ (শিক্ষার্থী) অমৃত কুম্ভের (শিক্ষক) সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে উঠত। ফলে শিক্ষার্থী কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার

মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত, শিক্ষকের মাধ্যমে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজেকে ধন্য মনে করত। শিক্ষক অভিজ্ঞতার সারবস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশন করতেন আর শিক্ষার্থী তা গলাধঃকরণ করে হৃষ্টচিত্তে সন্তুষ্ট থাকত।

কিন্তু অনেক অনেক আগে, শিক্ষা ও সভ্যতার প্রদোষকালে আমরা দেখেছি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে কোন সম্পর্কের বেড়াজাল তৈরি হয় নি। ভারতের শিক্ষার শৈশব, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আশ্রমিক জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে গুরু-শিষ্য একই আচ্ছাদনের নীচে বাস করতেন। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। বিদ্যা বিতরণ চলত একান্ত স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দভাবে; সেখানে আশ্রমবাসীরা সকলে মিলে অখণ্ড সমাজ রচনা করতে সক্ষম হতেন ও মিলিত প্রচেষ্টায় সকল প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জন করতেন। জ্ঞানের দিক থেকে গুরু, শিষ্যের থেকে অনেক উন্নত হলেও পারস্পরিক আদান-প্রদান ছিল সহজ সরল, ভাব বিনিময়ে কোন সঙ্কোচ থাকত না।

গ্রীসদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালেও এরূপ নজীর মিলবে; গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক সেখানে নিবিড়; গুরু-শিষ্যের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের উপরই সক্রেটিসের প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। প্লেটোর শিষ্যরা ছিলেন তাঁর বন্ধু ও সহচর; শিক্ষাও চলত স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষার্থীর এই স্বাভাবিক সম্পর্ক হারিয়ে গিয়েছিল তখন থেকেই, যখন থেকে শিক্ষা স্বরু হয়েছিল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল; বিদ্যার্থীদের জন্য তৈরি হল নির্দিষ্ট ভবন ও নানাপ্রকার আরামপ্রদ আসবাবপত্র। এর ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থীর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিন্ন করে উঠে গেলেন উচ্চাসনে (platform-এর উপর); রচিত হল অপরিচিতির গণ্ডী। এই অবাস্তব গণ্ডীর দূরত্বের ফলে যে শিক্ষাকার্য ব্যাহত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানের ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা ও ছাত্র-অসন্তোষ আমাদের একথা আরও বেশী করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হিসাবে বহু শিক্ষাবিদ শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ককে অতি সঙ্গতভাবেই দায়ী করেছেন।

আধুনিক শিক্ষাজগতে বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে; শিক্ষার স্বরূপ গেছে বদলে; শিক্ষার অর্থ কেবল অর্থহীন তথ্য সংগ্রহ নয়—তাই কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষ উদ্‌যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে।

........যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ, তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত, তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।" Edward Thring বলেছেন, "Mere knowledge is not education"। জ্ঞান ছাড়াও শিক্ষককে অন্য কিছু পরিবেশন করতে হবে। ব্যক্তিগত সাহচর্যের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভাবজীবনকে সমৃদ্ধ করবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কে ব্যবধান যত কমে আসবে ততই মঙ্গল হবে। আধুনিক শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনে তাই ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় হয়।

শিক্ষককে শিক্ষার্থীর পাশে থেকে সর্বদা তাকে সাহায্য করতে হবে। কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষে নয়, খেলার মাঠে, পাঠাগারে, বিজ্ঞানাগারে, ভ্রমণকালে সর্বত্রই আজ শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহচর; শিক্ষার্থীর স্থান শিক্ষকের পাশে। রবীন্দ্রনাথও বোধহয় শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক শিক্ষার পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে এই শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন। গান্ধীজীও শিক্ষার ক্ষেত্রে সামুদায়িক জীবনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, বোধকরি একই কারণে।

উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী আজ আর দুই মেরুতে অবস্থান করেন না। দুই মেরুতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অবস্থান করলে সম্পর্কের দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে; তাই একই মেরুতে তাঁদের সহাবস্থানের উপক্রম হচ্ছে। তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টাই শিক্ষাকার্য ত্বরান্বিত করবে।

ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধকে অনেক শিক্ষাবিদ পথিক ও পথ-নির্দেশকের সম্বন্ধ বলে অভিহিত করেছেন। শিক্ষার পথে শিক্ষক হলেন প্রবীণ ও শিক্ষার্থী হল নবীন পথিক; প্রবীণ পথিক পথ-নির্দেশকের ভূমিকা নিয়ে নবীন পথিককে এগিয়ে নিয়ে চলবেন। পথিক কিন্তু পথনির্দেশকের উপর যেন একান্তভাবে নির্ভরশীল না হয়, তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে; অতিরিক্ত পরমুখাপেক্ষী হলে শিক্ষার্থী তার স্বতঃস্ফূর্ততা হারাবে ও তার আত্মবিকাশের পথ বিঘ্নিত হবে। শিক্ষকের সাহায্য হবে পরোক্ষ কিন্তু নিষ্ক্রিয় নয়; ছাত্রদের সমস্যা সমাধানে শিক্ষক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন। এদিক থেকে শিক্ষক সত্যিই হবে Friend, philosopher and guide। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ভালবাসা ও সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। শিক্ষা বলতে আমরা বুঝব, শিশুর আচরণ সঙ্গতির মধ্যে দিয়ে বিরামহীন বিকাশ। একাজে শিক্ষক হবেন তাঁর নিত্য সহচর ও প্রধান সহায়। শিক্ষক, শিক্ষার্থীর মঙ্গল কামনায়

নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন ; শিক্ষার্থীর হিতসাধন হবে তাঁর একমাত্র স্বপ্ন। তাহলেই দেখা যাবে শিক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যাও অন্ধকারে আত্মগোপন করবে ; শৃঙ্খলাবোধ একান্ত স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসবে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং তার সুদূরপ্রসারী ফল শুভময় হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিত্তালয়ে স্বায়ত্ব-শাসন (Self-government in Schools)।*

আদিম, অসভ্য, বর্বর যুগ অতিক্রম করে মানুষ যত সভ্যতার দিকে পা বাড়াতে লাগল ততই গড়ে উঠল দল, রাষ্ট্র ও সমাজ। নিজেদের প্রয়োজনেই মানুষ দলবদ্ধ জীবন পছন্দ করল ; এরূপ জীবনে শৃঙ্খলা মেনে চলা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ল ; শৃঙ্খলা মানিয়ে চলবার দায়িত্ব অর্পিত হল দলপতি বা শাসকের উপর। শাসক অনেক সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করতেন ; কিন্তু বহুর উপর একের কর্তৃত্ব মানুষ বেশিদিন সহ্য করতে চাইল না। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। এমনি করে রাজশক্তির পরিবর্তে জন্ম নিল জনশক্তি। এতো গেল সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস।

এবার সমাজেরই উদ্দেশ্য সাধনের ব্রতী আর একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করা যাক। বিত্তালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ, একথা একবাক্যে সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে সমাজের থেকে বিত্তালয়ের দায়িত্ব অনেক অনেক গুণ বেশি। মানুষ গড়ার কাজে প্রথম হাতেখড়ি হচ্ছে বিত্তালয়ে ; মানুষের প্রথম গঠনের সময়টা তাকে অতিবাহিত করতে হচ্ছে বিত্তালয়ে ; বিত্তালয়কে একটি পরিপূর্ণ মানুষ তৈরির দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু একটি মানুষ তার শিক্ষাজীবন প্রায় সমাপ্ত করে তবে প্রবেশ করছে তার সমাজ জীবনে ; এখানে তার শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ খানিকটা দেখা যাবে, এখানে তাকে আদর্শ নাগরিক হতে হবে। কিন্তু নাগরিকত্বের দীক্ষা তাকে অনেক আগেই নিতে হয়েছে, জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সময় সে বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করে ; সুতরাং আদর্শ মানুষ গড়া ও আদর্শ নাগরিক গড়া উভয় কর্তব্যই

---

* Q. 1. Write notes on : School Government & practical training in democratic ways of life. (CU. B. T. 1966)

2. Discuss fully the value of self Government in schools as an aid to Civic Training. (CU. B. T. 1969).

বিদ্যালয়কে সম্পন্ন করতে হচ্ছে। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ছাত্র-নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। এক কথায় বিদ্যালয়ই হবে···laboratory for training in the practical arts of citizenship ; এবং এই উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ত-শাসনের পরিকল্পনা দানা বাঁধে।

মানুষ গড়ার কাজে উৎসর্গীকৃত এই যে বিদ্যালয়, এর পরিচালনার ভার কাদের উপর থাকবে? এ প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কথা মনে হয়। তাঁরা যুগ যুগ ধরে বহু নিয়মকানুন তৈরি করেছেন যা বিদ্যার্থিগণ বিনা প্রতিবাদে পালন করে এসেছে। এখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সহযাত্রী সম্পর্ক গড়ে উঠত না, বরং গড়ে উঠত খানিকটা শাসক-শাসিতের মনোভাব। এর ফলে শিক্ষা তার স্বতঃস্ফূর্ততা হারাত। বিদ্যালয়ে একটা কৃত্রিম আবহাওয়া বইত।

বিদ্যালয় শাসনপদ্ধতির ইতিহাস।

বিদ্যালয় শাসনপদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই শাসন প্রায় রাষ্ট্র-শাসনের সাথে সমান্তরালগামী। বিদ্যালয় জীবন তো সমাজ-জীবনেরই প্রতিচ্ছবি তাই সমাজ-জীবন বিদ্যালয়-জীবনকে সর্বদা নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

রাষ্ট্রের একনায়কতন্ত্রের সাথে তুলনা করা চলে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের শাসনকে ; এটাই যেন বিদ্যালয়ের রাজতন্ত্রের যুগ। পরবর্তীকালে দেখা যায় সামন্ততন্ত্রের যুগ। বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য রাজা যেমন তাঁর সামন্তদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করতেন, তেমনি প্রধান শিক্ষকও তাঁর সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ খানিকটা করতেন। কিন্তু এতেও দেখা যাচ্ছিল, শাসনের ভার ঠিক জনগণের উপর অর্পিত হচ্ছে না। অর্থাৎ বিদ্যালয় শাসনের কাজে ছাত্রদের কোন সহযোগিতা অবাঞ্ছনীয় বলেই পরিগণিত হচ্ছে।

বিদ্যালয় শাসনের কাজে কিছু কিছু ছাত্রের সাহায্য নেওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যায় আরও পরবর্তীকালে, যখন Ardrew Bell 'সর্দার পোড়ো' প্রথার প্রচলন করেন। বেশ বড় ও পড়াশুনায় ভাল ছাত্রকে শিক্ষাকার্যে শিক্ষককে সাহায্য করার ভার দেওয়া হত, এতে একজন শিক্ষক একাধিক শ্রেণী সহজে পরিচালনা করতে পারতেন। এই 'সর্দার পোড়ো' প্রথা (Monitorial

System) Dr. Thomas Arnold তাঁর রাগবি স্কুলে প্রচলন করেও বেশ সুফল পেয়েছিলেন।

তবে এই 'সর্দার পোড়ো' প্রথাতেও কিন্তু স্বৈরতন্ত্রী মনোভাবই পরিস্ফুট হয়। সর্দার পোড়ো শিক্ষক কর্তৃক মনোনীত ফলে সর্দার পোড়ো সহপাঠীদের হিংসার পাত্র হত; তাকে নিজেদের প্রতিনিধি বলে ছাত্ররা মনে করত না। তাই সেখানে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিচয় মিলে না।

কিন্তু বর্তমান শিক্ষাবিদগণ গণতান্ত্রিক মতবাদের ভিত্তিতে বিদ্যালয় পরিচালনাকে সর্বাপেক্ষা উত্তম বলে বিবেচনা করেন। গণতন্ত্রের মূল কথাই হল দায়িত্ব বণ্টন, যাতে প্রত্যেকের মনে দায়িত্ববোধ জাগে। গণতন্ত্রের ভিত্তিতে বিদ্যালয় পরিশাসন করতে গেলে ছাত্রদের অনেকটাই দায়িত্ব নিতে হবে, ফলে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ এবং অধিকারবোধও জন্মাবে। আগামী কালের আদর্শ নাগরিক হতে গেলে তাদের যে গুণাবলী থাকা উচিত তা গড়ে উঠবে এই বিদ্যালয় শাসনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে। কোন ভাষা লিখতে পড়তে শিখতে হলে যেমন ব্যাপক অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, তেমনি গণতান্ত্রিক দেশের সুনাগরিক হতে হলে আগে থেকেই গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের শাসনকার্যে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ছাত্রই অংশগ্রহণ করবে না, যোগ্যতানুসারে প্রত্যেক ছাত্রই এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবে।

বিদ্যালয় শাসনকার্যে ছাত্রদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ, আমেরিকার 'জর্জ জুনিয়ার রিপাবলিক বিদ্যালয়' এ প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে বেশ ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও নেব্রাসকার, মিচিগানে ডেট্রয়েটে অবস্থিত ফোর্ড রিপাব্লিক প্রভৃতি স্কুলে এই প্রথা চালু করা হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডেও হোমার লেনের প্রচেষ্টায় 'লিট্ল কমনওয়েল্থ' নামে একটি স্কুলের অপরাধ প্রবণ ছেলেমেয়েদের সংস্কারের জন্য তাদের স্কুলের শাসনভার তাদেরই হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল; ফলে দেখা গিয়েছিল এই স্কুলের ছাত্ররা দায়িত্বশীল ও নির্ভরযোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে উঠেছিল।

স্বায়ত্ত-শাসনের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা।

উপরোক্ত উদাহরণগুলি থেকে এটি স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বিদ্যালয় শাসনকার্যে ছাত্রদের স্বায়ত্ত-শাসন আধুনিক যুগের একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এখন দেখা যাক স্বায়ত্ত-শাসন বলতে আমরা কি বুঝি। Good তাঁর

Dictionary of Education গ্রন্থে বলেছেন, "The maintenance of order and the regulation of matters of conduct in school by elected representatives chosen from the students body by the students themselves"।

সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যালয়-জীবন গড়ে উঠে না ; সমাজ ও বিদ্যালয় অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত। সমাজে গিয়ে ছাত্ররা যে সমস্ত কাজে অংশ গ্রহণ করবে, তার প্রস্তুতি বিদ্যালয়েই হবে।

স্বায়ত্ব-শাসনের প্রকারভেদ।

বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ব-শাসনের প্রকারভেদ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

(১) **অনির্দিষ্ট কর্মহেতুকপ্রথা** (Informal Type)—অনেক সময় দেখা যায় বিদ্যালয়ের কোন উৎসব অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য বর্তমান ছাত্রদের ও ex-student-দের সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব ইত্যাদিতে ছাত্রদের সহযোগিতা ; এর জন্য ছাত্রদের কোন স্থায়ী সংস্থার প্রয়োজন হয় না। এর মধ্যে দিয়ে ছাত্ররা অবশ্য স্থায়ীভাবে নেতৃত্ব করার সুযোগ পায় না, তবুও নাগরিকত্ব শিক্ষার প্রথম ধাপ হিসাবে এই প্রথার উপকারিতা অনস্বীকার্য।

(২) **নির্দিষ্ট কর্মহেতুক প্রথা** (Specific Service Type)—বিদ্যালয়ের কোন স্থায়ী কাজ পরিচালনায় ছাত্রদের সহযোগিতা—যেমন, বিদ্যালয়ের পত্রিকা, পাঠাগার পরিচালনা ইত্যাদিতে ছাত্র প্রতিনিধিদের সহযোগিতা গ্রহণ।

(৩) **সরল পরিষদ প্রথা** (Simple Council Type)—বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রিয় স্থায়ী পরিষদ গঠন করা যায়। এই পরিষদ আবার নানাপ্রকার সহপাঠ্যক্রমিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কতকগুলি উপসমিতি গঠন করবে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

(৪) **জটিল পরিষদ প্রথা** (Complex Council Type)—আধুনিক শিক্ষাবিদরা বলেন, বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টাকে আরও সফল করতে হলে কর্মক্ষেত্রকেও প্রসারিত করতে হবে।

ছাত্র পরিষদকে দু'টিভাগে ভাগ করা যায়—(ক) **বিচার পরিষদ** ও

(খ) কর্মপরিষদ—বিচার পরিষদের হাতে আইন ও বিচার থাকবে, কর্মপরিষদ কর্ম পরিচালনা করবে।.

(৫) **শিক্ষালয় নগর-পদ্ধতি প্রথা** (School City type)—এই পদ্ধতি অনুসারে ছাত্ররা ছোটখাট নগর পরিচালনার ভার নেবে। এই কাজে ছেলেদের কিছু ভুলভ্রান্তি হবে, তবুও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে।

ছাত্র সংসদ গঠনের মূলনীতি।

বিদ্যালয় পরিচালনায় কাজে যদি ছাত্রদের স্থায়ীভাবে অংশ গ্রহণ করতে হয়, তবে ছাত্রদের দ্বারা গঠিত একটি স্থায়ী সংসদ থাকা একান্ত দরকার। এই সংসদ সাফল্যের সাথে বিদ্যালয়ের বহু কাজ চালিয়ে যেতে পারবে কিন্তু এর জন্য কতকগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যেমন, প্রথমতঃ শিক্ষকগণকে ছাত্রদের ক্ষমতা সম্বন্ধে আস্থাবান হতে হবে। বিশ্বাস ও স্বাধীনতা ছাড়া ছাত্রদের মধ্যে দায়িত্ববোধ আসবে না। শিক্ষকদের কোন মতামত এই সভার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। H. G. Stead বলেছেন, "It is useless to institute self government in name only; i.e. to call self-government system where the head teacher impresses his or her views upon the prefects.... ।

তাছাড়া প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণ শিক্ষায় গণতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে উপলব্ধি করবেন এবং শ্রেণী-পাঠনার সময়ও এই নীতির দিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন। তা না হলে স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্র সাফল্যের সাথে পাশাপাশি চলতে পারবে না।[১]

ছাত্র সংসদ যে গড়ে উঠবে তার সুষ্ঠু কাজকর্ম পরিচালনার জন্য বিচক্ষণ পরিদর্শক হবেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। শিক্ষকগণ যেমন জোর করে কিছু সংসদের উপর চাপিয়ে দেবেন না তেমনি আবার নিরপেক্ষ ও উদাসীনও থাকবেন না। শিক্ষকদের সহযোগিতা সব সময় প্রয়োজন হবে। W. R. Smith এর ভাষায় আমরা বলতে পারি—"A school city state,

---

১। G. R. Dustin: A successful scheme requires a democratic organisation of the teaching staff of the school. The Principal must first realise the meaning of democratised education. Teachers must democratise their teaching and classroom management. Autocracy & democracy will never co-operate to make a democratic form of Government a success.

Student Council or any other form of student management, requires constant and intelligent supervision in which neither dictation nor aloofness is conspicuous"।

নির্বাচিত ছাত্র সংসদের কিছু ক্ষমতা থাকবে সেই সঙ্গে তারা নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধেও সচেতন থাকবে। সংসদের সদস্য সংখ্যা খুব বেশি না হওয়া বাঞ্ছনীয়। সংসদের কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের Veto power থাকবে এবং তার সাহায্যে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। সংসদ তাদের নিজেদের কাজেরও মূল্যায়ন করবে। সংসদের প্রত্যেক সদস্যের নির্দিষ্ট কর্তব্য থাকবে এবং তা সে যথাযথ-ভাবে পালন করতে চেষ্টিত হবে।

এইভাবে ছাত্র সংসদের বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত নানা প্রকার কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায়। ক্ষমতা সংসদের উপর দুইভাবে দেওয়া যায়। যথা, **পূর্ণ পরিশাসন দায়িত্ব ও আংশিক পরিশাসন দায়িত্ব।**

পূর্ণ পরিশাসন সংসদের উপর দিতে হলে বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজগুলিকে কতকগুলি দপ্তরে ভাগ করে নিতে হবে এবং প্রত্যেক দপ্তরের জন্য একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে যাকে মন্ত্রী নাম দেওয়াও যেতে পারে। দপ্তরগুলি হল, (১) স্বাস্থ্য বিভাগ, (২) খাদ্য বিভাগ, (৩) অর্থ বিভাগ, (৪) সাংস্কৃতিক বিভাগ, (৫) সমাজ সেবা বিভাগ, (৬) ক্রীড়া বিভাগ, (৭) যোগাযোগ বিভাগ ইত্যাদি। সবার উপরে থাকবে প্রধানমন্ত্রী।

প্রত্যেক বিভাগের অর্থাৎ **স্বাস্থ্য বিভাগের** বিশেষ বিশেষ কাজ থাকবে; স্বাস্থ্য বিভাগ শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে তা দেখবে ও চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করানোর দায়িত্ব নেবে।

খাদ্য বিভাগ—বিদ্যালয়ের মধ্যাহ্ন ভোজন সম্পর্কিত যাবতীয় কর্তব্য পালন করবে।

অর্থ বিভাগ—বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে মোটামুটি সচেতন হবে; আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী ব্যয়ের পরিকল্পনা করতে সচেষ্ট হবে। এই বিভাগ বিভিন্ন দপ্তরের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করবে।

সাংস্কৃতিক বিভাগ—নানা প্রকার উৎসব, অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, পত্রিকা ইত্যাদির ভার নেবে।

সমাজ সেবা বিভাগ—জনকল্যাণমূলক কাজের পরিকল্পনা করবে ও সমবেত প্রচেষ্টায় তা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবে।

ক্রীড়া বিভাগ—আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও আন্তঃবিদ্যালয় ক্রীড়ার ব্যবস্থা করবে।

যোগাযোগ বিভাগ—শিক্ষার্থীদের সাথে কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে চেষ্টা করবে।

প্রধানমন্ত্রী সব দপ্তরের দায়িত্ব নেবেন ও সবাইকে কাজে সাহায্য করবেন।

এছাড়াও বিচার বিভাগ থাকতে পারে, যার কাজ হবে শিক্ষার্থীদের অন্যায় ও অপরাধের বিচার করা। এতে অযথা শিক্ষকের উপর শিক্ষার্থী বিরূপ হয়ে উঠবে না। শিক্ষকরা অন্যায়ভাবে শাস্তি দিচ্ছেন একথা শিক্ষার্থী মনে করবে না।

বর্তমান শিক্ষাবিদদের অনেকেই আংশিক ক্ষমতা ছাত্র সংসদের হাতে তুলে দিতে বলেন। তবে তাতে ফল বেশি ভাল পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ, কিন্তু দায়িত্ব বণ্টনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই আংশিক ক্ষমতাদান বিশেষ কার্যকরী।

H. C. Mcknown বলেছেন, ছাত্রদের পূর্ণক্ষমতা দেওয়া যাবে না, প্রধানতঃ দুটো কারণে—

(১) ছাত্রদের বিচারবুদ্ধি তখনও অপরিণত, কাজেই সব দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে পারবে না।

(২) প্রধান শিক্ষক সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য ও ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য এবং তাদের শিক্ষার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। এক্ষেত্রে ছাত্ররা তাঁর অধিকারে সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

তবুও ছাত্র সংসদকে বিদ্যালয় পরিচালনার ভার দিলে ছাত্ররা যে আদর্শ নাগরিক তৈরি হতে উদ্বুদ্ধ হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ ব্যবস্থায় ছাত্রদের প্রক্ষোভ বিকাশের এটি একটি উপযুক্ত মাধ্যম হবে; শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ব্যবধান থাকবে না। শিশুরা ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হবে। ছাত্রদের নেতৃত্ব করার ক্ষমতা বাড়বে; অনেক অপ্রত্যাশিত প্রতিভার উন্মেষ হবে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হবে। তাদের কতকগুলি প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী*

(Co-curricular Activities)

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করতে গিয়ে যুগে যুগে বহু মতবাদ গড়ে উঠেছে। অতি প্রাচীনকালে দেখা গিয়েছিল কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে—এক পলায়ণী মনোবৃত্তি। প্লেটো, অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি গ্রীক চিন্তানায়কগণ ঘোষণা করেছেন, যা কিছু জাগতিক তাই অবাস্তব, একমাত্র idea বা ধারণাই সত্য। ভারতীয় দর্শনে, বিশেষতঃ বেদান্তে এই ধারণারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—মায়াময়ম্ ইদম্ বিশ্বম্, অর্থাৎ এ জগতের যা কিছু সবই মায়া, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষার স্বরূপ ও লক্ষ্য নির্ণয়কালে ভারতীয় ঋষিদের উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হল—'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে' অর্থাৎ যা আত্মার মুক্তি এনে দেবে তাই হবে শিক্ষা। আত্মার মুক্তি আসবে চিন্তার উৎকর্ষতার মাধ্যমে। দৈহিক চাহিদা হল নিম্নস্তরের বস্তু। তাই চিন্তন, মনন, বিচারকরণ প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত হল শিক্ষা।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের পর সেই লক্ষ্যে পৌছানোর পন্থাও নির্দিষ্ট হয়েছে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর মাধ্যমই হল পাঠ্যক্রম। এককালে কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য, কিন্তু বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক হয়েছে; শিক্ষার উদ্দেশ্য আজ শুধু জ্ঞানী মানুষ তৈরি করা নয়—একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রবান সামাজিক মানুষ তৈরি করা, যারা হবে দেশের দায়িত্বশীল, আদর্শ নাগরিক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে প্রত্যেক শিশুকে গড়ে তুলতে হলে যা যা তার জানা দরকার, বোঝা দরকার ও করা দরকার তা সবই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে নয়, পাঠাগারে, গবেষণাগারে, বিনোদনের স্থানে, ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে শিশু নিরন্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে,—এর সবগুলি পাঠ্যক্রমের আওতায় আসা উচিত। শিশু তার বিদ্যালয় জীবনে যা কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে, যা কিছু নৈপুণ্য

---

* Q. "Extra curricular activities are now regarded as an integral part of education"—Discuss. Describe at least five such activites that may effectivety be introduced in the secondary schools of West Bengal.

(B. E. D. 1966)

অর্জন করবে, তা সবই আসবে তার পাঠ্যক্রমের মধ্যে।[১] তাই আগে যে বিষয়গুলি পাঠ্যক্রম বহির্ভূত (Extra-curricular) ছিল, আজ আর তা পাঠ্যাতিরিক্ত কাজ নয়, আজ সেগুলি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী (Co-curricular Activities)। যেমন, খেলাধূলা, গানবাজনা, মৌলিক রচনা, চিত্রশিল্প, কারুশিল্প, দারুশিল্প, সীবনশিল্প, ইত্যাদি সবই শিশুর সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়।

পূর্বে ধারণা ছিল পড়াশুনা ছাড়া আর যা কিছু সবই বিদ্যালয়-জীবনে অপ্রাসঙ্গিক ও অতিরিক্ত। শুধু তাই নয় অনেক সময় এই সম্বন্ধকে পরিপন্থীও বলা হত। যে সব শিশু পড়াশুনা ছাড়া অন্য কিছু বেশী পছন্দ করত তাদের ধরেই নেওয়া হত লেখাপড়া হবে না। কিন্তু বর্তমানে মনে করা হয়, পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই—একে অন্যের পরিপূরক। "The curricular and the co-curricular works are the two sides of the same coin, they are complementary, each complementing what the other lacks"। সুতরাং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নতিকল্পে এই সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

সহপাঠ্যক্রমিক কাজের প্রয়োজনীয়তা।

এখন দেখা যাক, সহপাঠ্যক্রমিক কাজের কি কি প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রত্যেক শিশু তার ব্যক্তিগত বিভিন্নতা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে। শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি, সামর্থ্য ও প্রবণতার বিভিন্নতা অনুসারে ব্যক্তিগত বৈষম্য গড়ে উঠে ; এই সবের ভিত্তিতে তার চাহিদা গড়ে উঠে নিজস্ব ধারায়। শিক্ষাকে যদি সেই খাতে প্রবাহিত করা না যায়, তবে শিশুর জীবন-চাহিদা অপরিতৃপ্ত থেকে যাবে, তার বিকাশও ব্যাহত হবে। সাধারণ পাঠ্যক্রমের মধ্যে দিয়ে শিশুর সব চাহিদা মেটান যায় না। তাই সহপাঠ্যক্রমিক কর্মধারায় শিশু-

১। Mudaliar Commission : We do not visualise this school as merely a place of formal learning whose main concern is to communicate in certain prescribed quantum of knowledge but as a living and organic community which is primarily interested in training its pupils in, what we have called, the gracious art of living.

শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠে। এই পথেই শিশুর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে প্রত্যেক শিশু পরিপূর্ণ সমাজ-জীবন যাপনের যোগ্যতা অর্জন করে ; সমাজ-জীবনে প্রবেশ করার যাবতীয় অভিজ্ঞতা শিশু সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মধ্যে দিয়ে অর্জন করে।[১]

মানসিক বিকাশের জন্যও সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়গুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিশু তার শৈশব অতিক্রম করে যখন কৈশোরের দিকে এগিয়ে চলে তখন তার অসামাজিক প্রবৃত্তিগুলি কমে যায়। তার মধ্যে তখন সঙ্ঘবদ্ধতা, দলপ্রীতি, ইত্যাদি প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়। তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা দলীয় মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়। সহপাঠ্যক্রমিক কাজগুলির মাধ্যমে শিশুরা দল গড়তে পারে।

বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে, দলপতির নির্দেশ মেনে চলার প্রেরণা, সহকর্মীদের প্রতি সমবেদনা, নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

সহপাঠ্যমিক কাজের অনুশীলনে বিনোদন শিক্ষা হয়। প্রত্যেক মানুষ কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য খোঁজে। কেবলমাত্র লেখাপড়ার ব্যবস্থা শিশুর জীবনে যান্ত্রিকতা এনে দেবে, শিশু হারিয়ে ফেলবে তার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের উৎস। শিশুর শিক্ষার মধ্যে নানা প্রকার বৈচিত্র্য থাকলে তবেই শিশু সানন্দে শিক্ষা গ্রহণ করবে। তাছাড়া এই কাজগুলির মধ্যে দিয়ে শিশু ব্যক্তিগত সখ (hobby) চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়। ফলে বিদ্যালয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার এই সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়গুলি মূল্যবান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

বিমূর্ত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায় এই সহপাঠ্যক্রমিক কাজগুলিতে। জীবনে শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করলেই শিক্ষা সমাপ্ত হয় না, ঐ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ জীবনের ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য।

বিদ্যালয়, গৃহ ও সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধন হতে পারে সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে। বিদ্যালয়ে কোন উৎসব-অনুষ্ঠান হলে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব ক্রমশঃ কমে আসবে।

সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে প্রক্ষোভমূলক সমতা, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা,

১। Mudaliar Commission : They (extra-curricular activities) are as integral a part of the activities of a school as its curricular work and their proper organisation needs just as much care and forethought.

সৃজনমূলক পরিতৃপ্তি ইত্যাদি মূল্যবান বস্তু শিশু অনায়াসে লাভ করতে পারে।

সহপাঠ্যক্রমিক কাজের বিবরণ।

বিদ্যালয়ে কি কি সহপাঠ্যক্রমিক কাজের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে ?

সহপাঠ্যক্রমিক কাজগুলির বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। সাধারণতঃ দেখা যায় বিদ্যালয়ে সুযোগ ও সামর্থ্য অনুসারে এই কাজগুলির আয়োজন করতে হয়। "Such activities will naturally vary within limits from school to school depending upon its location, its resources and the interests and aptitudes of the staff and students"। তবে পরিমিত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে বিভিন্নস্তরের উপযোগী কতকগুলি সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা চলে। যেমন,

বিদ্যালয় সংলগ্ন খেলার মাঠটিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত খেলাধূলা, ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা, ইত্যাদির ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

সাহিত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠ্যগুলিকে জীবন্ত করে তোলা যায়।

বিতর্ক-সভার আয়োজন, আলোচনা-চক্র ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ সাধন করা যায়।

প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর সখ পূরণের জন্য Hobby Centres গড়ে তোলা যায়। বাগান করা, প্রকৃতিকোণ স্থাপন, ডাকটিকিট সংগ্রহ, ছবি তোলা, ছবি সংগ্রহ, বই পড়া, ছবি আঁকা ও অন্যান্য শিল্পকাজ করা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সৃজনশক্তির বিকাশ সাধন করা সম্ভব।

বিদ্যালয়ে N.C.C., ব্রতচারী, গার্ল-গাইড বুল-বার্ড, ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দৈহিক সামর্থ্যের অধিকারী করা যায়। তাছাড়াও নানা কাজের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

বিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণকর কাজে ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করা যায়। জনশিক্ষার প্রসারে, স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে, গ্রামোন্নয়ণের কাজে ছাত্রদের মাঝে মাঝে নিয়োগ করা সম্ভব। বিশেষ করে বড় বড় ছুটিতে শিবিরজীবনের মাধ্যমে ছাত্রদের জনকল্যাণমূলক কাজ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেওয়া যায়।

বিদ্যালয়ের পরিশাসন-জনিত ব্যাপারেও ছাত্রছাত্রীদের আত্মনিয়োগ করতে বলা হয়। ছাত্রসংসদ গঠন, সমবায় সমিতি পরিচালনা ইত্যাদিতে ছাত্রদের অনেক করণীয় কাজ থাকে। ভ্রমণসূচী তৈরি ও তৎসংশ্লিষ্ট কাজে ছাত্ররা সহযোগিতা করতে পারে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা সকলে একমত, কিন্তু যতদিন না এই কাজগুলির প্রকৃত মূল্যায়ন করতে শিখব, ততদিন এগুলি সার্থকভাবে কার্যকরী করা যাবে না। আমরা লেখাপড়ার প্রতিটি বিষয়ের মূল্যায়ন করি, পরীক্ষা নিই, কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করি, কিন্তু সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর সামগ্রিক মূল্যায়নের বিশেষ কোন ব্যবস্থা রাখি না। আমাদের দেশে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী আজও অবহেলিত। নামেমাত্র কোন কোন বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যমূলক কাজের ব্যবস্থা থাকলেও, সেগুলি সত্যি সত্যি সহপাঠ্যক্রমিক হয়েছে কি না সন্দেহ! সেগুলি আজও বোধ হয় বহুক্ষেত্রেই পাঠ্যক্রম বহির্ভূত হয়েই বিদ্যালয়ের অলিগলিতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু না—এগুলিকে দৃপ্ত আলোকে এনে এদের শিক্ষামূলক মূল্যের কথা স্মরণ করে আমরা যদি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর সুষ্ঠু পরিচালনা করতে পারি তবেই শিক্ষা জগতের সুদিন আসবে।

শারীরিক শিক্ষা (Physical education)।

রোগমুক্ত দেহকে আনন্দময় করে, উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে দেহকে সুন্দর, সুঠাম করে তুলতে হলে যে শিক্ষা ও আচরণের অভ্যাস ও অনুশীলন করতে হয় তাকেই আমরা মোটামুটি শারীরিক শিক্ষা বলতে পারি। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারি শরীরকে কিভাবে নীরোগ রাখতে হয়, কিভাবে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা যায় এবং শারীর-বিজ্ঞানের সাহায্যে কি করে সুন্দর দেহ গঠন করে ও কেমন করে সুন্দর মনের অধিষ্ঠান করাতে হয় তা জানতে পারি। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও শারীর-বিজ্ঞান উভয়কেই বিজ্ঞান ও কলা (art) দুই-ই বলা যায়। বিজ্ঞান হিসাবে উভয়ই আমাদের শরীর সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভে সাহায্য করে এবং কলা হিসাবে উভয়েরই বাস্তব প্রয়োগ আমাদের জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য—অর্থাৎ এই জ্ঞান শুধু পুঁথির পাতায় সীমাবদ্ধ থাকবে

না—জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, জীবনের মধ্য দিয়ে অভ্যাস করে তবেই এর সার্থকতা উপলব্ধি করতে হবে।

শিশুদের মনে যে চঞ্চলতা, কর্ম-প্রেরণা, ক্রীড়ানুরাগ, ইচ্ছা, ভাবাবেগ, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি থাকে সেগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে শারীরিক শিক্ষা। শিশুদের প্রবণতার উপর নির্ভর করে খেলাধূলার ব্যবস্থা হয়ে থাকে, তাই এটি তাদের প্রাণের জিনিষ; খেলার মাঠে শিশুরা মনের আগল খুলে দেয়। শিশুকে জানতে হলে শ্রেণীকক্ষের চেয়ে খেলার মাঠ কম উপযোগী নয়। সর্বাঙ্গীন বিকাশ যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তবে শারীর-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আজকাল শারীরিক শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হিসাবে ধরা হয়; বৌদ্ধিক শিক্ষার থেকে শারীরিক শিক্ষা বেশী উপযোগী বলে মনে করেন আধুনিক শিক্ষাবিদগণ। Hall বলেছেন, "A ton of knowledge bought at the expense of an ounce of health which is the most ancient and precious form of wealth and worth costs more than its value"। এইরূপ উক্তির সমর্থন বহু চিন্তানায়কের বাক্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।[১, ২] ভারতীয় বিদ্যালয়গুলিতে খেলাধূলার স্থান অত্যন্ত গৌণ হয়ে গেছে। যদিও ভারতের যৌগিক ব্যায়ামের প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল কিন্তু বিদ্যালয়গুলিতে সেই ঐতিহ্য লোপ পেতে বসেছে। শারীরিক শিক্ষার পুনরুজ্জীবনই হবে শিক্ষাসংস্কারের গোড়ার কথা। W. M. Ryburn-এর উক্তির সমর্থন করে আমরা বলতে পারি—"We need in Indian education a general philosophy of physical education—we need a conception of education in which physical education takes its rightful place and in which its vital importance is recognised"।

কাজেই সাধারণ শিক্ষার মধ্যে শারীরিক শিক্ষা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সে বিষয়ে সকলেই একমত। আধুনিক শিক্ষার ধারণা অনুসারে দেখা যায়, শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়

১। Swami Vivekananda: "Iron nerves with a well-intelligent brain and the whole world is at your feet."

২। Carlyle: "We manufacture clever devils by the thousand because health is not the object of party politics."

না। দৈহিক ও মানসিক বিকাশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, একটি অপরটি পরিপূরক, কাজেই এই দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হলেই তবেই শিক্ষা সার্থক হতে পারে ও সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে। বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি ও পুষ্টি হতে থাকে, তাই এই সময় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত শারীরিক শিক্ষার প্রচলন একান্তভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীকে শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করা প্রয়োজন।

এখন দেখা যাক শারীরিক শিক্ষা কি কি উদ্দেশ্য পূরণে তৎপর হয়।

(১) শারীরিক শিক্ষা স্বাস্থ্য রক্ষা করে; (২) সুন্দর, সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী করে; (৩) শক্তি, সাহস, সংযম, ধৈর্য প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন করে; (৪) কতকগুলি সামাজিক গুণের, যেমন নিয়মানুবর্তিতা, সহযোগিতা, নেতৃত্ব, বন্ধুত্ব ইত্যাদির উন্মেষ সাধন করে; (৫) নিয়মিত খেলাধূলা ও ব্যায়ামের অভ্যাস গঠন করে; (৬) স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গঠন করে; (৭) সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে বিকশিত হতে সাহায্য করে। Montaigne যথার্থই বলেছেন, "Physical education does neither train up the soul nor body, but the whole man"। ফ্রয়েবেল-এর কথাতেও এই কথার সমর্থন মেলে, যখন তিনি বলেন, "Early education must deal directly with the physical development and influence the spiritual development through the exercise of senses"।

কাজেই বহুবিধ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শ্রেণীকক্ষের বাইরেও নানাপ্রকার সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়কে ব্যবস্থা রাখতে বলা হয়। সহপাঠ্যক্রমিক পরিকল্পনা প্রধানতঃ খেলাধূলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করে শিশুরা রুটিনমাফিক শ্রেণীশিক্ষার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করতে সমর্থ হয়, নতুন নতুন কাজে তাদের আবার উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগে। খেলাধূলায় শিশু-মনের স্বাভাবিক প্রবণতার অভিব্যক্তি হয়, ফলে তাদের নানাপ্রকার কর্মস্পৃহা চরিতার্থ হয়। এই সব কারণে প্রতি বিদ্যালয়ে খেলাধূলার ব্যাপক কার্যক্রম প্রবর্তন ও প্রচলনের আয়োজন রাখা উচিত।

বিদ্যালয়ে শরীরচর্চার জন্য সময়-পত্রিকার মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান করে দিতে হবে। বিদ্যালয়ে স্কাউট, সাঁতার, বক্সিং, দৌড় ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়া ব্রতচারী, N. C. C., A. C. C., ড্রিল, নানাপ্রকার যৌগিক

ব্যায়ামের প্রচলন করাও খুব কঠিন কাজ নয়। সারা বৎসর নানাপ্রকার খেলাধূলা, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে পারা যায়। গৃহাভ্যন্তরস্থ খেলাধূলা (Indoor games) যেমন ক্যারাম, টেবিল টেনিস, দাবা, চাইনিজ চেকার, লেক্সিকোন ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা যায়। বিদ্যালয়ে খেলাধূলার ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে সংঘচেতনা জাগানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী খেলাধূলার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয়ে খেলাধূলার ব্যবস্থা সাধারণতঃ তিনভাবে করা যায়। যথা—(১) ব্যায়াম, (২) খেলাধূলা ও (৩) ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

(১) ব্যায়াম—সুন্দর শরীর গড়তে হলে শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষম গঠন হওয়া প্রয়োজন। তাই প্রত্যেক শিশুর জন্য ব্যায়াম নির্বাচনকালে শরীরের প্রতি অঙ্গের সঞ্চালন যাতে হয় সেদিকে নজর দিতে হবে; তাদের শারীরিক ক্ষমতা, যোগ্যতা, বয়স, দৈহিক ক্লান্তি, ইত্যাদির কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। ছাত্রাবস্থায় দেহ থাকে কোমল ও নমনীয়, সেই সময় নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরকে শক্তিশালী ও সুন্দর করা যায়। ব্যায়ামের আর একটি উপকারিতা হল ব্যায়ামকারীর প্রয়োজনীয়তা ও শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যায়ামগুলি নিয়ন্ত্রিত করা যায়, কিন্তু খেলাধূলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনেকক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়ে উঠে না। সেখানে অতি ব্যায়ামের কুফল এসে যেতে পারে। তাছাড়া সব ছাত্রই খেলাধূলা ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় হয়তো সমান পারদর্শিতা দেখাতে পারবে না; সেক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

বিদ্যালয়ে পড়াশুনার কাজে ছোট শিশুদের বেশিক্ষণ চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে শরীর ও মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। নিয়মিত কিছু কিছু ব্যায়ামের ব্যবস্থা রাখলে শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের কাজ ভালভাবে চলে, তাতে শরীর ও মন দুইই ভাল থাকে। তবে ব্যায়াম করলে সঙ্গে সঙ্গেই শরীর ভাল হবে না, তার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। কি ধরণের ব্যায়াম কখন করতে হবে তা শিক্ষক সময়মত নির্দেশ দেবেন।

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মস্তিষ্কের কাজ বেশি করতে হয়—মস্তিষ্কের কাজ তার রক্তসঞ্চালনের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। বিদ্যালয়ে ব্যায়াম

শিক্ষার প্রচলন করতে হলে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যেমন—

(ক) ব্যায়ামকাল (Duration)—ব্যায়াম করার ফলে সকলে খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সেইজন্য একটানা বেশিক্ষণ ব্যায়াম করতে হয় না। মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে ১৫-২০ মিঃ ব্যায়াম শিশুদের পক্ষে যথেষ্ট।

(খ) ব্যায়াম পদ্ধতি (Method)—ব্যায়ামের মধ্যে আনন্দময় বিশেষ কোন ব্যাপার থাকে না। তাই ব্যায়ামকে আনন্দময়, ছন্দময় করার জন্য ব্যায়ামকালে নানা প্রকার সাজসরঞ্জাম, যেমন ডাম্বেল, পতাকা, লাঠি, লেজিম ইত্যাদি দেওয়া হয়; ছন্দের জন্য ব্রতচারী, নানা প্রকার দেশীয় নাচ ইত্যাদি ব্যায়ামের সাথে যুক্ত করা হয়।

তাছাড়া ছোটদের ক্লাসে সাধারণতঃ অনিয়ন্ত্রিত (informal type) এবং বড়দের ক্লাসের জন্য নিয়ন্ত্রিত (formal type) ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা হয়। অনিয়ন্ত্রিত ব্যায়ামের মধ্যে আদেশ ও নিয়মকানুন শিথিল থাকে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত ব্যায়ামের বেলায় এ দু'টির প্রাধান্য দেখা যায়।

(গ) নিয়মিত চর্চা (Regularity)—ব্যায়াম-চর্চা নিয়মিতভাবে করা উচিত তাতে ফল ভাল হবে; তা না হলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হবে।

(ঘ) বয়সানুক্রমিক (Graded according to age)—বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের সামর্থ্য বাড়ে; তাই ব্যায়াম ছাত্রের বয়স অনুযায়ী ক্রমকঠিন হিসাবে নির্বাচিত হবে।

(ঙ) উপযুক্ত পোষাক (Suitable dress)—ব্যায়ামের জন্য পোষাক পরিচ্ছদ আলাদা হলে ভাল হয়। পোষাক সাধারণতঃ ঢিলেঢালা হবে যাতে সহজে চলাফেরা করা যায় অথচ বাড়তি কাপড়চোপড় থাকবে না।

(চ) প্রতিকারমূলক ব্যায়াম (Remedial Exercise)—অনেক সময় নানাকারণে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ত্রুটি ও নানাপ্রকার রোগ পরিলক্ষিত হয়। এই ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুমোদিত নানা প্রকার ব্যায়ামের দ্বারা রোগ প্রতিবিধান ও শারীরিক ত্রুটি দূর করা যায়।

(ছ) পরিবেশ (Environment)—ব্যায়ামের মধ্যে নানা প্রকার আঙ্গিক কলাকৌশল থাকে। তাই ব্যায়ামের জন্য উন্মুক্ত প্রান্তরের প্রয়োজন

হয়। কিন্তু তাই বলে গাছপালার কোন ছায়া থাকবে না, এমন মাঠ ব্যায়ামের জন্য উপযুক্ত নয়। মাঠটি তৃণাচ্ছাদিত, সবুজ কিন্তু ছায়াযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২) খেলাধূলা—আধুনিক শিক্ষা, শিক্ষায় স্বাধীনতার বিশ্বাসী। এই অবাধ স্বাধীনতার আস্বাদ শিশুকে দেওয়া যায় একমাত্র খেলাধূলার মাধ্যমে। খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে শিশু আনন্দ-মদিরা পান করে। তাছাড়া এই খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলিও তৃপ্ত হয়; মনোগত চাহিদাও মেটে। "Play is a biological and social necessity for children. It is the most fundamental thing about a child—play for the child is one of the most serious facts of life, it is a form of work for the young, and the basis for all natural education"—লিখেছেন Davie। শিশুর ধর্মই হল খেলা। "জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা"—। জন্মের পর থেকেই শিশুরা হাত-পা ছুঁড়ে খেলা আরম্ভ করে। Stern খেলাকে বলেছেন—'Voluntary self-constrained activity"।

খেলাধূলার দ্বারা যে শরীরচর্চা হয় তার বড় বৈশিষ্ট্য হল অজ্ঞাতসারে ও আনন্দের সঙ্গে সে কাজটি সম্পন্ন হয়, ফলে শরীর গঠন হয় কিন্তু কোন বিরক্তি আসে না। তাই খেলাকে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়। খেলাধূলায় যাতে প্রত্যেক শিশু অংশ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন দল গড়তে হবে; মাঠে স্থানাভাব থাকলে গৃহাভ্যন্তরস্থ ও বহির্বিভাগস্থ খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া টিফিনের পর ২।১ পিরিয়াড অথবা শেষ দু পিরিয়াড, সময়-পত্রিকায় খেলাধূলার জন্য নির্দিষ্ট থাকলে ভাল হয়। বিদ্যালয়ে খেলাধূলা পরিচালনার ভার একজন শিক্ষকের উপর থাকবে, তাছাড়া অন্যান্য শিক্ষকরাও তাঁকে সাহায্য করবেন। বহির্বিভাগস্থ খেলাধূলার জন্য সাধারণতঃ ফুটবল, ভলিবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস, হাডু-ডু, খো-খো, দারিয়াবাঁধা, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা যায়।

(৩) ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (Sports)—খেলাধূলার মত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে খেলাধূলার মত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিত্যদিন অনুষ্ঠিত হয় না। সাধারণতঃ বৎসরে একবার

Q. What are the educational value of games and sports? Mention the chief difficulties faced by our secondary schools in the matter of introduction of compulsory physical training. (B. Ed. 1968)

শীতকালে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পড়াশুনায় ভাল বলতে কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকেই বোঝায়, বাকি সবাই থাকে বঞ্চিতের দলে। তাদের কি উদ্যম জাগানোর কোন পথ নেই? আছে; যে ছেলে পড়াশুনায় ভাল নয়, তার পক্ষে খেলাধূলায় ভাল হওয়ার অসুবিধা কোথায়? কাজেই বেশীর ভাগ বিদ্যার্থীর মধ্যে যদি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাড়া জাগাতে হয় তবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে একটি মূল্যবান হাতিয়ার। "The battle of Waterloo was won on the play grounds of Eton"—কথাটি সার্থক রূপলাভ করতে পারে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। মানুষ জীবনে স্বীকৃতি চায়—এই স্বীকৃতি এনে দেবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে একটা বিরাট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে; বিশেষতঃ মুদালিয়ার কমিশন ও কোঠারী কমিশন ইত্যাদি শারীরিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সামগ্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে খেলাধূলা ও প্রতিযোগিতা অপরিহার্য; সে সম্পর্কে কমিশনগুলি একমত। কোঠারী কমিশন শারীরিক শিক্ষার শিক্ষাগত মূল্যের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশন বলেছেন শারীরিক শিক্ষা কেবলমাত্র শারীরিক, যোগ্যতা সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্যই নয়, মানসিক শক্তিবৃদ্ধির পক্ষেও একান্ত সহায়ক।

কাজেই শিক্ষার্থীদের বিকাশধর্মী শিক্ষাজীবনের স্তর-বিভিন্নতা অনুসারে একটি সুসংহত সামগ্রিক খেলাধূলার কার্যক্রম যথাযথভাবে প্রবর্তন ও অনুসরণ করা প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজনের যত গুরুত্বই থাক, প্রয়োজনকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে দেখা যায় কাজটি খুব সহজ নয়। পরিকল্পনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে দেখা যায় দুস্তর ব্যবধান—নানা বাধা ও সমস্যা এই ব্যবধান রচনা করে। এই বাধা বিপত্তি দূর করতে না পারলে কোন পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হয়ে উঠবে না। বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে শারীরিক শিক্ষার প্রবর্তন এই ধরনের একটি সমস্যা যা প্রবর্তন করা সহজ নয়, যদিও এই বিষয়টিকে বাদ দিয়ে শিক্ষা পরিকল্পনা অর্থহীন হয়ে পড়বে।

অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট নীতি চালু হয় নি। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার আশানুরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করতে

অপারগ। নানাপ্রকার মতবৈষম্য, সাংগঠনিক অসঙ্গতি আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নানাভাবে পঙ্গু করে দেয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থিক অনটনে জর্জরিত, কাজেই কোন ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা, বিদ্যালয়ের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে খুব সামান্য আর্থিক সাহায্য নিয়ে ক্রীড়া পরিচালনা করা যেতে পারে।

খেলাধূলা পরিচালনার জন্য আর্থিক সংকট ছাড়া আরও কতকগুলি সমস্যা জড়িয়ে আছে। বহু বিদ্যালয়ে সমস্ত ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার ব্যবস্থা করার মত উপযুক্ত স্থানাভাব আছে। তাই সেক্ষেত্রে সামান্য উন্মুক্ত প্রান্তর পেলে সেটুকুকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করার জন্যে যথাযথ পরিকল্পনা পূর্বাহ্ণেই প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে উপযুক্ত ক্রীড়া-শিক্ষকের অভাব দেখা যায়। খেলাধূলার কার্যক্রমকে সফল করতে হলে যোগ্যতাসম্পন্ন ক্রীড়া-শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত ক্রীড়া-শিক্ষক না থাকলে খেলাধূলা ঠিকভাবে পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই প্রতি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত ক্রীড়া-শিক্ষক নিয়োগ একান্তভাবে বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। ক্রীড়া বিভাগের শিক্ষকের বেতনের দায়িত্ব সরকারী শিক্ষা বিভাগের উপর থাকা উচিত।

যতদিন না শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা প্রতি বিদ্যালয়ে হয় ততদিন খেলাধূলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও আগ্রহী কোন শিক্ষকের উপর এই দায়িত্ব দেওয়া চলে, তবে তা নিতান্ত বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে। সব শিক্ষক অবশ্য এই নির্দিষ্ট শিক্ষককে খেলা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে সর্বদা সহযোগিতা করবেন।

এর পরের সমস্যা হল, খেলাধূলার উপর আধুনিক শিক্ষাবিদগণ যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলেও খেলাধূলার প্রতি সনাতন মনোভাবের তেমন কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে খেলাধূলাকে এখনও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বলেই বিবেচিত করা হয় ও সেইভাবে তা পরিচালিত হয়।

আমাদের দেশে ছয়টি ঋতু। ঋতু-বৈচিত্র্য অনুসারে খেলাধূলা পরিচালনা করতে বলা হয়, কিন্তু সব ঋতুতে খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে গেলে একটি জিমনাসিয়াম বা ব্যায়ামাগারের একান্ত প্রয়োজন। সেখানে indoor games এর ব্যবস্থা তো থাকবেই, উপরন্তু outdoor games-এর কিছু কিছু

প্রস্তুতিও চলতে পারে। সাঁতার আমরা জানি দৈহিক গঠনের পক্ষে খুব উপযুক্ত ও কার্যকরী ব্যায়াম। কিন্তু বিদ্যালয়গুলিতে সাঁতারের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যপার।

শিক্ষার সাথে শারীরিক শিক্ষার সমন্বয় সাধিত হয় নি। অথচ বলা হয় যে Play ground is the uncovered school। সত্যিকারের গণতন্ত্র যদি জীবনে অভ্যাস করতে হয় এবং আদর্শ সুনাগরিকের গুণাবলী অর্জন করতে হয় তবে খেলাধূলা ছাড়া তা সম্ভবই নয়। খেলার মাঠকে তাই Cradle of Democracy বলা হয়। তাই যতদিন না আমরা খেলাধূলাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব ততদিন শিক্ষা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে অক্ষম ও পঙ্গু থেকে যাবে। সেইজন্য যতশীঘ্র শারীরিক শিক্ষার প্রতি মনোযোগ পড়বে ততই মঙ্গল হবে।

পদ্ধতি, পরিচালনা ও স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে

তৃতীয় ভাগ

স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে

পদ্ধতি, পরিচালনা ও স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে

প্রথম অধ্যায়

স্বাস্থ্য শিক্ষা

(Health Education)

স্বাস্থ্য কি (What is health) ?

স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো কিছু জানার আগে আমাদের মন স্বভাবতঃই কৌতূহলী হয়ে উঠে স্বাস্থ্য কি, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করব কেন ইত্যাদি জানার জন্য।

স্বাস্থ্য কথাটিকে আমরা প্রচলিত অর্থে অনেক হাল্কাভাবে ব্যবহার করি। কাউকে একটু মোটাসোটা দেখলেই বলি, তার স্বাস্থ্য বেশ ভালো। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে কথাটা বোধ হয় ঠিক বলা হোল না। সাধারণতঃ দেখা যায় মোটা মানুষের শরীরে রোগের আধিপত্য বেশী। তাছাড়া মোটা মানুষের কর্মক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা (swiftness) শারীরিক উপযুক্ততা (physical fitness) ইত্যাদি কম হয়। কাজেই স্বাস্থ্য বলতে কেবলমাত্র মেদবহুলতা বোঝায় না। বরং মেদের স্বল্পতা, নীরোগ, ক্ষিপ্রতা, শারীরিক উপযুক্ততা যদি কারুর থাকে তবে তাকে স্বাস্থ্যবান বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্য কথাটি আরও ব্যাপক। স্বাস্থ্য বলতে সেই অবস্থা বোঝানো উচিত যে অবস্থায় মানুষ তার শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাজে জীবনের ক্ষেত্রে সার্থক প্রয়োগ করতে পারবে। এদিক থেকে বিচার করলে সুগঠিত দেহধারী, সুষমবিকশিত মনের অধিকারী মানুষ যদি সার্থকভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে সক্ষম হয় তবেই তাকে স্বাস্থ্যবান বলা চলবে।

কেমন করে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বাস করলে আমরা ব্যক্তিগতভাবে ও সমাজগতভাবে রোগ প্রতিরোধ করতে পারি, তা যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে তাকেই আমরা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান (Hygiene) বলি। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠ করলে আমরা এমন কতকগুলি সু-অভ্যাস গঠন করতে পারি যার সাহায্যে আমরা বাঁচার মত রসদ সংগ্রহ করতে পারব এবং জরা ব্যাধি, বার্ধক্যের সাথে সুষ্ঠু মোকাবিলা করতে পারব। দারিদ্র আমরা রাতারাতি উচ্ছেদ

করতে পারব না কিন্তু যদি আমরা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বাঁচার উপায় জানতে পারি তবে দারিদ্রের সাথে সংগ্রাম করেও আমরা বেঁচে থাকার অধিকার অর্জন করতে পারব। তাই ব্যবহারিক অর্থে স্বাস্থ্যশিক্ষাকে আমরা 'an art of living' বলতে পারিব।

স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Need for Health Education)।

প্রাচীনকালে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মানসিক উৎকর্ষসাধনই ছিল মানুষের কাম্য। শরীরকে মনে করা হ'ত আত্মার বন্ধনভূমি, তাই এই শরীরকে উৎপীড়ন করে আত্মার বন্ধন মুক্তি ছিল অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য। বৌদ্ধ দর্শন মোক্ষলাভের আশায় কৃচ্ছ্রসাধন করার কথা বলতেও দ্বিধা করেন নি।

কিন্তু তবুও দেখা গেছে যে সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। শ্রেষ্ঠদেহী, সুঠাম যোদ্ধা ইত্যাদির কদর সমাজে কম ছিল না। তখন বর্তমানের মত হয়তো উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি গড়ে উঠে নি তাই শরীরের কলকব্জার নিখুঁত বিবরণ তখনকার মানুষরা হয়তো জানতেন না, কিন্তু শরীরটা মাঝে মাঝে বিকল হলে যে তাকে নানাপ্রকার ভেষজ ওষুধ ব্যবহার করে আবার কর্মক্ষম করা যায় সে সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের নজীর যথেষ্ট পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব মানুষ উপলব্ধি করল বিংশ শতাব্দীতে, জড়বাদ দর্শন প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মনে করতে লাগল শারীরিক উন্নয়ন ও মানসিক উন্নয়ন সমান্তরালগামী, পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক।

সুন্দর দেহে সুন্দর মনের তত্ত্ব অবশ্য বহু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদগণ শারীরশিক্ষা ও স্বাস্থ্যশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন—'Education cannot be acquired without the proper frame of the mind'। প্রখ্যাত মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সার শিক্ষাকে (ক) জ্ঞানমূলক, (খ) নীতিমূলক ও (গ) শারীরমূলক এই তিন ভাগে বিভক্ত করে শারীরমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতের শিক্ষা কমিশনগুলিতে বিশেষ করে মুদালিয়ার কমিশন ও কোঠারী কমিশনে স্বাস্থ্যশিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা

হয়েছে। মুদালিয়ার কমিশন বলেছেন—"It will be seen that economising in health education and physical welfare is unsound economy because the state has to spend much more on medical services than it would under properly organised scheme of physical and health education.।"* কাজেই এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি আমাদের পাঠ্যসূচীতে স্থান পেয়েছে।

নানান দিক থেকে বিচার করলে স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারব।

আমাদের শরীর নানাপ্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সমষ্টি। যন্ত্রপাতিগুলি ঠিক রাখতে হলে এগুলির গঠন, কার্যপ্রণালী ইত্যাদি জানা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যশিক্ষার মাধ্যমে শরীরযন্ত্রের জটিল তত্ত্বগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা যায়।

শরীরকে ঠিক রাখতে হলে একদিকে যেমন ব্যায়াম, বিশ্রাম, খেলাধূলা ইত্যাদির প্রয়োজন, অন্যদিকে আবার সুষম খাদ্য পরিবেশন করে, শরীরকে পুষ্ট করে, নানাবিধ রোগের হাত থেকেও রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। আমরা যাতে সহজে রোগাক্রান্ত না হই সেজন্য আমাদের কতকগুলো স্বাস্থ্য সম্মত অভ্যাস গঠন করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যতীত এই অভ্যাস গঠন সম্ভব নয়।

আমাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য কেবল ভাল হলেই চলবে না; ব্যক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে সমাজ ও রাষ্ট্র। কাজেই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও গণস্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরা যায় একমাত্র স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে। অবশ্য স্বাস্থ্যশিক্ষা কেবলমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে, আমাদের আচার-আচরণের মধ্যে দিয়েই এই শিক্ষা সার্থকতা লাভ করবে।

বর্তমানে আমরা প্রত্যেকেই অবহিত আছি যে দৈহিক স্বাস্থ্যের সাথে মানসিক স্বাস্থ্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য, যদি

* কোঠারী কমিশন স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন—"Society has a special stake in the health and the physical well-being of University Students who are (or should be!) the elect of the rising generation and in whom it has to invest large resources and to whom it looks for the advancement of national interests."

কারুর দৈহিক পুষ্টির অভাব ঘটে বা শরীর রোগাক্রান্ত হয়। বিশেষ করে কৈশোরে যখন নানাপ্রকার মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে তখন শরীরকে যথেষ্ট পুষ্ট করা ও রোগমুক্ত রাখা উচিত। এজন্যেও স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মানুষের মন বলতে আমরা কি বুঝি? কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়া ও প্রক্ষোভের সমষ্টিকেই সাধারণভাবে মন বলি। এই প্রক্ষোভগুলির সমতা রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রক্ষোভগুলির সমতা রক্ষা না হলে ব্যক্তির জীবন যেমন নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তেমনি ঐ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরও দশজনের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে। তাই স্বাস্থ্যশিক্ষার মাধ্যমে এই প্রক্ষোভগুলির বিকাশ ও সমতা রক্ষায় আমাদের সচেষ্ট হওয়া একান্ত কর্তব্য।

তাছাড়াও আমরা আগেই জেনেছি যে জ্ঞানার্জনের জন্যে, জ্ঞানের অনুশীলনের জন্য দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য দুটোই অপরিহার্য। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যাহত হবে যদি আমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হই। এইভাবে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব যে স্বাস্থ্যশিক্ষা আমাদের জীবনে একান্ত প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যশিক্ষার উদ্দেশ্য (Aims of Health Education)।

এখন দেখা যাক একান্ত প্রয়োজনীয় এই স্বাস্থ্যশিক্ষার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকলে মাঝপথে পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকবে না।

স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে সুস্থ, সবল ও নীরোগ রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে শেখানো। নানাপ্রকার ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ব্যাধির লক্ষণ, প্রকৃতি, কারণ ইত্যাদি জানতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থী নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হলেই চলবে না; সমাজের ও রাষ্ট্রের অন্যান্য মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে সচেতন হবে এবং স্বাস্থ্যরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে। ব্যক্তিস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে আজ ভারতবাসী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নাগরিক। কাজেই সমস্ত মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেককে ভাগ করে

নিতে শেখাতে হবে। সেজন্য ব্যক্তিস্বাস্থ্যরক্ষা ও জনস্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে অবহিত করানোই হবে স্বাস্থ্যশিক্ষার উদ্দেশ্য। বর্তমানে সমস্ত মানুষের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), UNICEF ইত্যাদি, গড়ে উঠেছে, এই সমস্ত সংস্থার উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত করানও হবে স্বাস্থ্য শিক্ষার অন্যতম উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যক্তি তখনই সার্থক যখন সে সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে একজন মূল্যবান সদস্য। সমাজের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে মেশার ফলে তার আচার-ব্যবহার শোভন ও মার্জিত হয়। সমাজ অনুমোদিত বাঞ্ছিত আচরণ তার পক্ষে সম্ভব হবে না, যদি সে স্বাস্থ্যবান না হয়। তাই স্বাস্থ্য ঠিক রেখে আচরণবিধি শিক্ষা দেওয়াই হবে স্বাস্থ্যশিক্ষার আর একটি লক্ষ্য।

চতুর্থতঃ, আমরা জানি স্বাস্থ্যের সঙ্গে প্রাক্ষোভিক বিকাশগুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে প্রক্ষোভগুলিও বিকৃত রূপ ধারণ করবে ও শিক্ষার্থী মানসিক সমতা, স্থৈর্য হারিয়ে ফেলবে। সেইজন্য শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেওয়া এবং প্রাক্ষোভিক বিকাশের পথ সুগম করে দেওয়াই হবে স্বাস্থ্যশিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

পঞ্চমতঃ, মানুষের স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে শারীরিক সক্রিয়তা অনেক সময় কমে যায়। কিভাবে সুষম খাদ্য গ্রহণ করলে, কিভাবে ব্যায়াম করলে, কতটা বিশ্রাম নিলে শারীরিক সক্রিয়তা অক্ষুণ্ণ থাকে সে সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া স্বাস্থ্যশিক্ষার অপর একটি উদ্দেশ্য।

ষষ্ঠতঃ, শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যও বজায় রাখা স্বাস্থ্যশিক্ষার অন্যতম প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য। মানসিক শক্তিগুলির মধ্যে যাতে সমতা বজায় থাকে এবং তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়, শিক্ষার্থীকে সে সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করা হবে স্বাস্থ্যশিক্ষার অপর একটি উদ্দেশ্য।

সপ্তমতঃ, স্বাস্থ্যশিক্ষার যে ব্যবহারিক দিক আছে, এটা যে প্রতিদিনের আচরণের মধ্যে দিয়ে অভ্যাস করতে হয় সে সম্বন্ধে জানানো ও অভ্যাস গঠনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা হবে স্বাস্থ্যশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের স্বরূপ ও পরিধি (Concept of Health science and its sphere)

'স্বাস্থ্যবিজ্ঞান' এই নামটির সাহায্যে এটুকু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে স্বাস্থ্য

সম্বন্ধে বিশেষরূপে জ্ঞান দেওয়ার জন্যে এই শাস্ত্র রচিত হয়েছে। নামটি যদিও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, তবুও এটিকে বিজ্ঞান(Science) ও কলা(Art) দুইই বলা চলে। বিজ্ঞান রূপে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান আমাদের শরীরের যন্ত্রপাতির প্রকৃতি ও কাজকর্ম নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করে নানান জটিল তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করেছে। কিন্তু যখন এই মূল্যবান তত্ত্বগুলিকে আমরা প্রতিদিনের কাজে রূপান্তরিত করছি তখন এটিকে নিঃসন্দেহে কলা বলা চলে। প্রত্যেকটি কলার (art-এর) মত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটি ও বাস্তব মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এখন দেখা যাক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পরিধি কতটা অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিষয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু। আমরা জানি যে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বাঁচতে গেলে প্রত্যেক মানুষের শরীরের স্বাস্থ্য সম্মত বৃদ্ধি, মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশ, রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাবৃদ্ধি, শারীরিক বৈকল্য, অসম্পূর্ণতা সংশোধন ইত্যাদির প্রয়োজন। তাই এগুলি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মধ্যে স্থান পেয়েছে।

মানুষের শরীরের স্বাস্থ্যসম্মত বৃদ্ধির জন্য সুষম খাদ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন্ বয়সে কিরূপ খাদ্য উপযোগী, কোন্ খাদ্যের পুষ্টিমূল্য কিরূপ ইত্যাদি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

এছাড়াও আমাদের শরীর ঠিক রাখতে হলে জল, বাতাস, বিশ্রাম, ব্যায়াম, বিনোদন, নিদ্রা প্রভৃতির যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এগুলির প্রত্যেকটির স্বরূপ জানা প্রয়োজন এবং কোন বয়সে এগুলি কিরূপ মাত্রায় গ্রহণযোগ্য তাও জানা উচিত। সেইজন্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের এক বিরাট অংশ জল, বাতাস, বিশ্রাম ইত্যাদির আলোচনা অধিকার করে আছে। ব্যায়াম, খেলাধূলা শারীরবিজ্ঞানের অংশ হলেও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে এগুলির আলোচনা অবান্তর নয়।

আমাদের শরীরের কোন অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হলে আমাদের স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়। এই অস্বাভাবিক অবস্থা বদভ্যাসজনিতও হতে পারে। খারাপ অভ্যাস একবার গঠিত হলে তার কুপ্রভাব আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর তো পড়েই, মানসিক স্বাস্থ্যও এই কুপ্রভাবের হাত থেকে নিস্তার পায় না। কাজেই এই খারাপ অভ্যাস যাতে গঠিত না হয় তার দিকে নজর দিতে হবে। বদভ্যাসের কুপ্রভাবগুলি কতখানি ক্ষতিকর, তা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আলোচনার আওতায় পড়ে।

আমরা শুনে আসছি 'শরীরম ব্যাধিমন্দিরম্', শরীর থাকলেই ব্যাধির

প্রকোপ থাকবে। এই ব্যাধিগুলির দ্বারা আমাদের শরীর কিভাবে আক্রান্ত হয় তা জানা দরকার, ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে কিভাবে তা থেকে আরোগ্যলাভ করা যায় তাও জানা উচিত। শুধু তাই নয় ব্যাধিতে আক্রান্ত যাতে না হই সে সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ করার উপায়গুলিও জানতে হবে। তাই এগুলি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তাছাড়া আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা ঘটলে ডাক্তার এসে পৌছানোর আগে অনেক সময় প্রাথমিক প্রতিবিধান করার প্রয়োজন হয়। কাজেই প্রাথমিক চিকিৎসার নিয়মকানুন, বাণ্ডেজ ইত্যাদি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মধ্যে আলোচিত হয় বলে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, সমাজগত জীবন, বিদ্যালয় জীবন ইত্যাদি সুখকর হয়ে উঠে।

মানুষের নিজের শারীরিক ত্রুটি দূর করলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে না, তার পারিবেশিক অবস্থার উন্নতি করা প্রয়োজন। তাই পূর্তবিজ্ঞানের (Engineering-এর) কিছু কিছু বিষয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আওতায় এসে পড়ে। বিশেষতঃ যে কোন গৃহ নির্মাণের সময়—বাসগৃহ, বিদ্যালয়গৃহ, প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি, আলো-বাতাস-এর দিকে খেয়াল রেখে নির্মাণকার্য সম্পন্ন করতে হয়। প্রত্যেক গৃহের আসবাবপত্র কিরূপ হলে স্বাস্থ্য সম্মত হয় তাও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। প্রত্যেক গৃহের আবর্জনা দূরীকরণ, জল নিষ্কাশন ইত্যাদি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয়।

মনোবিজ্ঞানের বহু মূল্যবান তত্ত্ব আজ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করেছে। মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরবিভাগ ও প্রত্যেক স্তরের মানসিক প্রবণতা ও শারীরিক বৃদ্ধি অনুযায়ী খাদ্য, বিশ্রাম ও বিনোদন-এর মাত্রা নির্ণয় ইত্যাদির আলোচনা আজ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মধ্যে যথাযথ স্থান করে নিয়েছে।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পরিধি কেবল বেড়েই চলেছে। মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সৌন্দর্যতত্ত্বের একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। সুন্দর বস্তু আমাদের সব সময় আনন্দবর্ধন করে। কাজেই স্বল্পব্যয়ে স্বাস্থ্যকর সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা, গৃহসজ্জার সৌন্দর্যবর্ধন করা ইত্যাদি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু হয়ে উঠছে।

তাছাড়া নৈতিক অবনতি ঘটলেও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে। কাজেই নৈতিক মান ঠিক রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সচেষ্ট হবে।

বর্তমানে সমগ্র জগৎ জুড়ে প্রচেষ্টা চলছে শিশুর পুষ্টি যাতে কোনভাবে ব্যাহত না হয়। এজন্য বহু সংস্থা ইত্যাদি গড়ে উঠেছে ; প্রসঙ্গতঃ UNICEF-এর নাম আমরা করতে পারি। এদিক থেকে দেখলে গার্হস্থবিজ্ঞানের একটি অংশ শিশুর যত্ন (Child Care) স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মধ্যে স্থান পেয়েছে। এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পরিধি আধুনিককালে যথেষ্ট বিস্তারলাভ করেছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শারীর শিক্ষা* (Health education & Physical education)।

শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের উপর নির্ভর করে মানুষের সাধারণ শিক্ষা। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে শিক্ষাকার্য ব্যাহত হতে বাধ্য। কিন্তু এই শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে প্রধানতঃ শিশুর পুষ্টির উপর ; পুষ্টি একান্তভাবে নির্ভর করে শিশুর খাদ্যের উপর। কাজেই স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যতীত শারীরশিক্ষা মানুষকে বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন করতে পারে। কারণ শারীরশিক্ষা স্বাস্থ্যশিক্ষার উপরে একান্তভাবে নির্ভরশীল। শারীরশিক্ষা ও স্বাস্থ্যশিক্ষাকে একই মুদ্রার দুই পিঠ বলা চলে। তাই একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কল্পনা অর্থহীন। বর্তমানকালে শারীরশিক্ষা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

প্রাচীনকালে স্বাস্থ্য কথাটিকে অনেক সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হোত। স্বাস্থ্য বলতে কেবল শারীরিক সুস্থতাই বুঝাত। কিন্তু বর্তমানে স্বাস্থ্য বলতে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন কুশলতাকেই বুঝি। আধুনিককালে মনোবিজ্ঞানের কল্যাণে প্রত্যেক মানুষ অবহিত হয়েছে যে শরীরের সাথে মন নামক বস্তুটি একান্তভাবে জড়িত; তাই শারীরিক বৈকল্যের সাথে সাথে চিত্তবিকৃতিও ঘটতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মনের চাহিদা মানুষের শারীরিক চাহিদার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ; মনের চাহিদা দেহের চাহিদাকে অতিক্রম করতে পারে, মনের তাগিদ দৈহিক তাগিদের প্রভু বলা চলে। দেহ মনের আজ্ঞাবহ মাত্র।

বর্তমানে মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত। শিক্ষার গোড়ার কথাই হল শিশুর মনের দরজায় হানা দিয়ে তার মনের খবর জানা। তা না হলে শিশুর জ্ঞানমূলক, প্রক্ষোভমূলক ও সামাজিক বিকাশ

* Q. Distinguish between health education and physical education.

ব্যাহত হতে পারে। স্বাস্থ্যশিক্ষার সাথে মনোবিজ্ঞান একান্তভাবে জড়িতে। স্বাস্থ্যশিক্ষা আজ অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রত্যেক মানুষ কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই চলবে না, তার পারিপার্শ্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া একান্ত প্রয়োজন, তার বিশ্বমানবতা-বোধ জাগ্রত করতে হবে। এই বিশ্বমানবতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক মানুষকে সকলের স্বাস্থ্যরক্ষায় সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী ও জনস্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী প্রত্যেককে পালন করতে হবে।

এইসব দিক থেকে বিচার করলে শারীরিক শিক্ষার পরিধি স্বাস্থ্যশিক্ষার তুলনায় খানিকটা সঙ্কীর্ণ মনে হয়। শারীরশিক্ষাকে আমরা প্রচলিত অর্থে বলি দৈহিক ব্যায়াম অনুশীলন, খেলাধূলার মাধ্যমে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সুষম বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়গুলিকে সুস্থ ও সবল রাখা। আজকাল শারীরশিক্ষাকে কেবলমাত্র শারীরিক কুশলতার ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখা হয় না। কতকগুলি আঙ্গিক কৌশল আয়ত্ব করাই শারীরশিক্ষা নয়। শারীরশিক্ষা বলতে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, দেহের সুষ্ঠু গঠন, দৈহিক লাবণ্য ও কমনীয়তা, শারীরিক উপযুক্ততা, কর্মক্ষমতা, মানসিক সতর্কতা, বিনোদন শিক্ষা, সংস্কৃতিপূর্ণ মন ইত্যাদি বোঝায়।

শারীরশিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হলে মানবশরীরের কলকজাগুলির বিশদ বিবরণ জানা উচিত। শরীরের মধ্যেকার স্নায়ু, পেশী, অস্থি, মজ্জা, রক্ত, নানাপ্রকার গ্রন্থি প্রভৃতির অবস্থান, কার্যকলাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যেকের জ্ঞান থাকা উচিত। শারীরশিক্ষা দেওয়ার সময় প্রথমে শরীরকে শারীর শিক্ষাদানের উপযুক্ত করা উচিত, অর্থাৎ নিস্তেজ পেশীগুলি উত্তেজিত করে শরীরের তাপবৃদ্ধি করে নিতে হবে আবার শারীর শিক্ষাদানের শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উত্তেজিত পেশীসমূহকে শান্ত করে তবে শ্রেণীকক্ষে শিশুদিগকে ফিরিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। শরীরের নানাবিধ যন্ত্রপাতি জানতে হলে অনেক সময় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দুয়ারে ধর্ণা দিতে হয়। কিন্তু তাই বলে শারীরশিক্ষা মোটেই অনাবশ্যক ও অবান্তর নয়। স্বাস্থ্য-শিক্ষা অনেক সময় শারীরশিক্ষার উপর নির্ভরশীল।

উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে দেহের পুষ্টি হয় কিন্তু সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সমভাবে ও সুন্দরভাবে বৃদ্ধি নাও পেতে পারে। যেমন অনেক সময় আমরা দেখি স্নেহজাতীয় পদার্থ অতিরিক্ত গ্রহণের জন্য মেদ বৃদ্ধি হয় এবং তা

অধিকাংশই কটিদেশে ও উদরে সঞ্চিত হয়। ফলে দৈহিক সৌন্দর্য ব্যাহত হয় তখন আবার শারীরশিক্ষার স্মরণাপন্ন হ'তে হয়।

তাছাড়াও অনেক সময় বহু রোগ প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে, নানাপ্রকার শারীরিক ব্যায়াম, যোগ-ব্যায়াম, আসন ইত্যাদির সাহায্যে সহজে সেরে যায়। যেমন অজীর্ণ রোগ, বাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে শারীরিক ব্যায়াম বিশেষ ফলপ্রসূ বলে মনে হয়। ব্যায়ামের সাহায্যে শরীরটাকে কর্মঠ ও সুঠাম রাখতে পারলে এবং রোগমুক্ত হ'তে সাহায্য করলে অনেক সময় রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে। বর্তমানে গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা জানতে সক্ষম হয়েছি যে কায়িক পরিশ্রম যারা বেশী করে তাদের মধ্যে রোগ-প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কিঞ্চিৎ বেশী।

এই সব দিক থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব শারীরিক শিক্ষাও স্বাস্থ্যশিক্ষার মত সমান প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভরশীল। একটি ব্যতীত অপরটি অসম্পূর্ণ ও অর্থহীন মনে হয়। কাজেই একটিকে অপরটির পরিপূরক বলা চলে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়, পাঠ্যক্রমে এই দুই শাস্ত্রের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

জনস্বাস্থ্যরক্ষার মূলনীতি*

(Cardinal Principles of Community Hygiene)

মানুষ যখন থেকে যৌথ জীবনযাত্রা শুরু করেছে তখন থেকেই 'সকলের তরে সকলে আমরা' এই ব্রতে দীক্ষিত হয়েছে। তাই স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হলে প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে কেবল আত্মসচেতন হলে চলবে না, সেই সঙ্গে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে সচেতন হতে হবে তবেই জনস্বাস্থ্য-রক্ষা করা সম্ভব হবে। স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব যেমন প্রত্যেকটি ব্যক্তির রয়েছে তেমনই দায়িত্ব রয়েছে প্রত্যেকটি পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের। স্বাস্থ্যরক্ষায় এই যে সমবেত প্রচেষ্টা একেই জনস্বাস্থ্য বলা চলে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্বকে অবশ্য বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে।

(১) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি ঃ

প্রত্যেক ব্যক্তির দাঁত, চুল, নখ, গাত্রচর্ম ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, সুষম খাদ্য গ্রহণ, ব্যায়াম, উপযুক্ত পোষাক পরিধাণ, নিয়মমত মলমূত্র ত্যাগ, দেহমনের শুচিতা রক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির অন্তর্গত।

(২) পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষা ঃ

আলো বাতাসযুক্ত উঁচু জমিতে গৃহনির্মাণ করা প্রয়োজন। গৃহের আবর্জনা ও মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা, ভেজালহীন খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় ও স্নানের জলের ব্যবস্থা, পরিবারের সকলের সুখপ্রদ সাহচর্য ইত্যাদি পারিবারিক স্বাস্থ্যের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) সামাজিক স্বাস্থ্য ঃ

পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, পানাপুকুর পরিষ্কার, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা,

* Q. Discuss the role of community Hygiene in the building of of healthy citizens and show its relation to the personal, well-being of the child. (C.U. 1966).

সংক্রামক রোগীর ব্যবহার্য জিনিষের বিশুদ্ধিকরণ, ভেজাল খাদ্য সরবরাহে বাধাদান ইত্যাদি সামাজিক স্বাস্থ্যের মধ্যে পড়ে।

এছাড়াও আছে বিদ্যালয় গৃহের স্থান নির্বাচন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে রোগ-প্রতিষেধক টীকার ব্যবস্থা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত সময়-পত্রিকা রচনা ইত্যাদি যেগুলি সমাজের মানুষ উপেক্ষা করতে পারে না।

(৪) মিল কারখানা সম্বন্ধীয় স্বাস্থ্যবিধি :

মিল কারখানাগুলিতে কাজকর্মের জন্য বহু লোকের একত্র সমাবেশ হয়। মিল-কারখানাগুলিতে সাধারণতঃ প্রচুর আলো-বাতাসযুক্ত হয় না। তাছাড়া থাকে ধূলো, বালি, কয়লা গুঁড়া, তুলা ও পাটের আঁশ, কালো জমাট ধোঁয়া ইত্যাদি যেগুলি মিলের অপরিহার্য বস্তু। এসবের মধ্যে যাদের কাজ করতে হয়, সেই শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া একান্ত কর্তব্য। এছাড়াও মিলের যাবতীয় আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য জল নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ্ করাও প্রয়োজনীয়। তা না হলে কেবল মিলের শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি হবে না, মিল যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই অঞ্চলের বহু লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটার সম্ভাবনা থাকবে।

(৫) জনস্বাস্থ্য বা সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিধান :

সমগ্র দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কোন ব্যক্তিগত বা সমাজগত প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়, তার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিভাগকে দায়িত্ব নিতে হবে। বড় বড় শহরে ও শহরতলি এলাকায় কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি পৌর-প্রতিষ্ঠানের অধীনেও জনস্বাস্থ্য বিভাগ থাকে। বর্তমানে ব্লকের অধীনেও বহু বিভাগের মধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, যার কাজ হোল গ্রামের মানুষদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ হোল :—(ক) উত্তম খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা, (খ) খাদ্যে ভেজাল নিরোধ করা, (গ) বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, (ঘ) আবর্জনা ও মলমূত্র পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা, (ঙ) স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ও বিদ্যালয়গৃহের পরিকল্পনা করা ও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, (চ) রাস্তাঘাট, খালবিল পরিষ্কার করা, (ছ) স্বাস্থ্যকেন্দ্র

স্থাপন করা, (জ) মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠা করা, (ঝ) জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা, (ঞ) সংক্রামক রোগ-প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করা, (ট) স্বাস্থ্যবিধি প্রত্যেকে পালন করছে কিনা দেখা, (ঠ) স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি প্রচারের জন্য সিনেমা, বক্তৃতা, ম্যাজিকল্যাণ্টার্ণ ইত্যাদির সাহায্যে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা, (ড) সুসঙ্গত স্বাস্থ্যবিধিগুলি পালনের জন্য আইন প্রণয়ন করা ও (ঢ) আইন লঙ্ঘন করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা।

যে বিভাগের উপর কোটী কোটী লোকের স্বাস্থ্য নির্ভর করছে সেই বিভাগের কর্তব্যে অবহেলা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

(৬) আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধি ঃ

আমরা যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাই তখন আমাদের মাধ্যমে যাতে কোন ব্যাধি সংক্রামিত না হতে পারে তার জন্য আমাদের চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয়, মালপত্র জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে বিশোধিত করা হয় এবং নবাগতদের স্বাস্থ্য উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হয়। কোন দেশে কোন সংক্রামক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হলে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশসমূহে সংবাদ দেওয়া হয়।

এইভাবে দেখা যায় সে জনস্বাস্থ্যের পরিধি কেবল এক দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সমস্ত দেশের মানুষের উপরই জনস্বাস্থ্য নির্ভর করে। জনস্বাস্থ্যকে উন্নত করতে হলে দেশের ও সমাজের, এমন কি বিদেশেরও প্রত্যেক রোগীর, প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির, প্রত্যেক প্রসূতি ও শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

জনস্বাস্থ্য শিক্ষা প্রত্যেক মানুষের শৈশব থেকে সুরু হওয়া উচিত। তাই বর্তমানকালে জনস্বাস্থ্য শিক্ষার বিধিগুলিকে আধুনিক শিক্ষাবিদরা বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে স্থান দেওয়ার পক্ষপাতী। বিদ্যালয়ে আসার আগে শিশুর অভ্যাস গঠনের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে প্রত্যেকটি গৃহকে। গৃহ ও বিদ্যালয় উভয়ের পক্ষ থেকেই যৌথ প্রচেষ্টা চালিয়ে জনস্বাস্থ্য শিক্ষার কর্মসূচী গঠন করা কর্তব্য এবং কর্মসূচীটিকে রূপায়িত করার চেষ্টাও একান্ত অপরিহার্য। এর পরে অবশ্য প্রত্যেকটি মানুষের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত করার দায়িত্ব নিতে হবে তার কর্মক্ষেত্রকে। প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি তার স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব বহণ করতে সক্ষম হয় তবে জনস্বাস্থ্য বিভাগের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে

উঠবে। অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে না আরও দশজনের কথা তাকে ভাবতে হবে।

এইজন্য জনস্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সব মূলনীতি অনুসরণ করা হয় তার প্রথমেই আসে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা। প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হবে, তেমনি জনস্বাস্থ্য বিভাগও প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে উদাসীন থাকবেন না। জনস্বাস্থ্য বিভাগ তার নিয়মকানুনগুলির মধ্যে দিয়ে একটি মাত্র লক্ষ্যে পৌছাতে চেষ্টা করেন—তা হোল দায়িত্বশীল স্বাস্থ্যবান নাগরিক তৈরী করা।

এরজন্যে অবশ্য জনস্বাস্থ্য বিভাগ কতকগুলি সাধারণ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন—

জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা অভিপ্রদর্শনীর সাহায্যে বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দিতে চেষ্টা করতে পারেন। যতদূর সম্ভব তাঁরা কাজের মাধ্যমে স্বাস্থ্যশিক্ষা দিবেন। উদাহরণস্বরূপ কাঁচের গ্লাসে ময়লা জল ও বিশুদ্ধ জল নিয়ে দেখাতে পারেন দুটো জলে পার্থক্য কেন হোল। এরপর পুকুরের জল কিভাবে দূষিত হয় এবং দূষিত জল পরিষ্কার করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া এই প্রসঙ্গে শেখাতে পারেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধি বোঝাবার জন্য শিক্ষক ছবি ও গল্পের সাহায্য নিতে পারেন।

১। যে সময় যে নিয়ম পালন করা উচিত সেই সময়োপযোগী শিক্ষা দিলে শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। যেমন বিভিন্ন ঋতুতে যে সব রোগ হয়ে থাকে, ঋতু অনুযায়ী রোগের কারণ, তা নিবারণের উপায় ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া চলে।

২। স্বাস্থ্যকর অভ্যাস যাতে ছাত্রছাত্রীদের গড়ে উঠে তার জন্য বিদ্যালয় জীবনের প্রথম থেকে চেষ্টা করতে হবে।

৩। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে ও তার বিবরণী রাখতে হবে।

৪। শিক্ষক ছাত্র মিলিত হয়ে একটি স্বাস্থ্য পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য পরিষদের সভা পনের দিন অন্তর বসবে এবং সময়োপযোগী কর্মপন্থা স্থির করবে।

এইভাবে দেখা যায় জনস্বাস্থ্য বিভাগের এবং বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় প্রত্যেকটি শিশু ব্যক্তিগতভাবে এবং সমাজগত ভাবে উপকৃত হতে পারে। তাছাড়া শিশুর পরিবেশকে উন্নত করার মাধ্যমেও শিশুকেই পরোক্ষভাবে উন্নত করা হয়।

জনস্বাস্থ্য বিভাগ তার বহুবিধ কর্মের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যবান নাগরিক তৈরী করেন, অন্যদিকে তেমন এই নাগরিক তৈরীর কাজ আরম্ভ করেন প্রত্যেকটি নাগরিকের শৈশবকাল থেকেই। এইভাবে শিশুর ক্ষুদ্র চরণেই প্রত্যেকটি জাতি অগ্রসর হয়। কাজেই জনস্বাস্থ্য সংস্থা স্বাস্থ্যবান নাগরিক তৈরী করে সমগ্র জাতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখে।

এখন দেখা যাক জনস্বাস্থ্যরক্ষার মূলনীতিগুলি কি কি :—

(১) জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা :

নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিশুকে যখন অবহিত করানো হবে তখন সেই সঙ্গে তাকে সমাজের অন্যান্য অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে তার যথেষ্ট দায়িত্ব আছে তা বোঝাতে হবে। যেমন নিজের ঘর ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখার অর্থ এই নয় যে, নিজের যাবতীয় ময়লা অন্যের বাড়ীর সামনে রেখে আসতে হবে। সমগ্র পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক শিশুকে বোঝাতে হবে।

(২) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠন :

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠনকে—ব্যক্তিগত ও দলগত—এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা হোল নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখা, চুল, দাঁত, নখ ইত্যাদিতে ময়লা জমতে না দেওয়া, চোখ, কান, নাক পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। দলগত পরিচ্ছন্নতা হোল যেখানে আমরা আরও দশজনের সাথে বাস করি সেই জায়গাটা পরিষ্কার রাখা, পরিবেশের ময়লা দূর করা, শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে উভয়প্রকার পরিচ্ছন্নতাই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাফাই একটি নিত্যকর্ম। সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই গঠিত হয়।

(৩) ব্যাধিকালীন সতর্কতা ঃ

যে কোন ব্যাধির প্রকোপ যখন সুরু হয় সেটি যাতে বিস্তার লাভ করতে না পারে তার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কতকগুলি মারাত্মক ব্যাধি ছাড়া আমরা সাধারণতঃ সাবধান হই না। সাধারণ সর্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, খোস, পাঁচড়া ইত্যাদি হলেও সাবধান হওয়া, ছোঁয়াচ বাঁচানো একান্ত কর্তব্য। তাছাড়া কোন ব্যাধির নিরাময় কিভাবে হয় সে সম্বন্ধেও প্রত্যেককে শিক্ষা দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(৪) স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গঠন ঃ

জনস্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সমবেত প্রচেষ্টা একান্ত অপরিহার্য। কোন একটি পুকুরের জল দূষিত হলে, রাস্তার জলনিকাশের ব্যবস্থা না থাকলে, কোথাও আবর্জনা স্তূপীকৃত হলে, কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্যই কেবল নষ্ট হবে না, সমগ্র পরিবেশটি দূষিত হয়ে উঠবে। কাজেই সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা সমগ্র পরিবেশের উন্নতিসাধন হবে জনস্বাস্থ্য বিভাগের অবশ্য করণীয় কর্তব্য। সাধারণতঃ বস্তি ও গ্রামাঞ্চলে মলমূত্রত্যাগের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শৌচালয় ও প্রস্রাবাগার থাকে না। এজন্য সমস্ত পরিবেশটি বিষাক্ত হয়ে উঠে। আমাদের দেশের জনস্বাস্থ্য বিভাগ এদিকে যদি আরও নজর দেন তবে বোধ হয় পরিবেশের উন্নতিসাধন সার্থকরূপ পেতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা

(Personal Hygiene)*

আমরা জানি যে জনস্বাস্থ্য নির্ভর করে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উপর। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে কতকগুলি স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে ; এই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিকে কেন্দ্র করে যে শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তাকে আমরা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলি।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বলতে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাই কেবল বোঝায় না তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু বোঝায়, যদিও আমরা জানি ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ব্যক্তিগতস্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সোপান। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুস্বাস্থ্য অর্জন করতে গেলে যে সব কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হয় তার শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত আছে ব্যক্তিস্বাস্থ্যের তাৎপর্য।

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে তার শরীরের ভিতরের ও বাইরের স্বাস্থ্যকর অবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে। দেহের ভিতরের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে নিয়মিত আহার, ব্যায়াম, বিশ্রাম ইত্যাদির কথা জানা প্রয়োজন এবং এই সঙ্গে দেহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কথাও চিন্তা করা অপরিহার্য। দৈহিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বলতে দাঁত, নখ, চোখ, কান, নাক, চুল, গায়ের চামড়া, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি পরিষ্কার রাখা বোঝায়।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার গোড়াপত্তন হয় গৃহে। প্রত্যেক মাতাপিতার তাই উচিত শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা। শৈশব থেকে যাতে শিশুর স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গঠন হয় সেদিকে সকল অভিভাবককে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। গৃহে যদি শিশুর সদভ্যাস গঠিত হয় তবে বিদ্যালয়কে সদভ্যাস গঠনের জন্য বিশেষ বেগ পেতে হয় না। তবুও গৃহ পরিবেশে অভিভাবকের মত বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষকেরও স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মোটামুটি তিনটি মৌলিক নীতি মেনে চলতে হয়, যেমন পুষ্টিকর সুষম খাদ্য গ্রহণ, নিয়মিত পরিশ্রম করা ও পরিমিত বিশ্রাম লওয়া।

---

* Q. Write a note on personal hygiene.

কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য নিয়মিতভাবে আহার করতে হবে। আমাদের শরীর খাদ্যগুলিকে গ্রহণ করার একটা নির্দিষ্ট সময়ে পাচক রস ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং সেই সময় খাদ্য গ্রহণ করলে হজমের কোন ব্যাঘাত হয় না। কাজেই নিয়মিত আহার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার গোড়ার কথা।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমাদের শরীরের ক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ; কাজেই স্বাস্থ্যহানি ঘটে। আবার অত্যন্ত অল্প পরিশ্রম করলেও শরীরে অবসাদ আসে, ফলে শরীরের অভ্যন্তরের ক্রিয়াকলাপ ও বাইরের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। এতেও ব্যক্তিস্বাস্থ্য ব্যাহত হয়।

আমাদের শরীরযন্ত্রের বিশ্রামের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। বিশ্রামের স্বরূপ অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে আলাদা, তবুও পরিপূর্ণ বিশ্রাম বলতো আমরা সাধারণতঃ সুনিদ্রাকেই বুঝি। অবশ্য এই নিদ্রাও পরিমিত হওয় প্রয়োজন তা না হলে মেদবৃদ্ধি ইত্যাদির ভয় থাকে।

এছাড়াও আছে ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা। এর জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে কতকগুলি সুঅভ্যাস গঠন করতে হয়, যেমন ঘুম থেকে উঠার পর মুখ হাত ধোওয়া, দাঁত মাজা, চোখ পরিষ্কার করা, মলমূত্র ত্যাগ করা, সামান্য কিছু খাওয়া, স্নান করা, চুল পরিষ্কার রাখা, নখ পরিষ্কার করা ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যক্তির অভ্যাসের মধ্যে পড়ে। জামা কাপড় পরিষ্কার রাখা, সকাল বিকাল বেড়ান বা খেলাধুলা করা প্রত্যেক ব্যক্তির অভ্যাস করে নেওয়া প্রয়োজন।

প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য যাতে অক্ষুন্ন থাকে সেজন্য প্রত্যেকের সচেতন হওয়া দরকার। মানসিক প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, প্রবণতা ইত্যাদি ঠিক পথে পরিচালিত হয় মানুষের সাথে মানুষের আচার আচরণের মধ্যে দিয়ে। কাজেই এই আচার আচরণ যাতে সহজ, সরল ও সুন্দর হয় তার দিকে নজর রাখতে হবে।

আমাদের শরীর সুস্থ রাখতে হলে শরীরের মধ্যে যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা দরকার তেমনি শরীর রোগাক্রান্ত হলে নিরাময়ের ব্যবস্থা করা ও রোগাক্রমণ যাতে না হয়, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রোগ প্রতিষেধের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করবে জনস্বাস্থ্য। ব্যক্তিস্বাস্থ্য যেন

এক একখানি ইষ্টক যার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে জনস্বাস্থ্য অট্টালিকা। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক না হলে, কেবলমাত্র সরকারের চেষ্টাতে জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ সম্ভব নয়। সকলের মনে রাখতে হবে সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ জনসাধারণের প্রতিভূ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, যদিও অর্থসংকুলান হয় জনসাধারণের প্রদত্ত কর থেকে। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তির, সরকারী জনস্বাস্থ্যের কর্মীদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পোষাকে-আসাকে পরিচ্ছন্ন হবে; দেহ, মন পবিত্র রাখতে চেষ্টা করবে, লোভ সংবরণ করতে শিখবে, নিয়মশৃঙ্খলা পালন করবে, তাহলে ব্যক্তিস্বাস্থ্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। ব্যক্তিস্বাস্থ্য রক্ষার মূলমন্ত্র শৈশব থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবহিত করতে হবে।

স্বাস্থ্যরক্ষায় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব (School Health Service)

বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। দেশের ভাবি উত্তরাধিকারিগণ দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের দীক্ষা এই প্রতিষ্ঠান থেকেই নেবে। প্রাচীনকালে কেবলমাত্র মানসিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত; কিন্তু বর্তমানের গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা দেখছি শারীরিক উন্নয়ন ভিন্ন মানসিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। শরীর ও মন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে শিক্ষাকার্য ব্যাহত হতে বাধ্য। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যশিক্ষার উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। কাজেই বিদ্যালয়কে শারীরশিক্ষা পরিচালনা ও স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হয়।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের কর্মনীতিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়।—(১) বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যসম্মত করনীয় কাজ পরিচালনা, (২) স্বাস্থ্যসম্মত বিদ্যালয় জীবন যাপনের জন্য শিক্ষা দেওয়া।

এখন দেখা যাক বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যসম্মত করনীয় কাজ বলতে আমরা কি বুঝি।

প্রথমেই ধরা যেতে পারে বিদ্যালয়ের অবস্থান ও বিদ্যালয় গৃহ। বিদ্যালয়ের অবস্থান হবে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, উঁচু এবং খোলা জায়গায়। শ্রেণীকক্ষগুলি

Q. Describe the School Health Service in its essential features indicating its aims, the persons involved and their duties with special mention to the teacher's role in it. (C.U. 1969)

এমন প্রশস্ত হবে যাতে যথেষ্ট আলো বাতাস সহজে প্রবেশ করতে পারে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ও ব্যায়ামাগার থাকলে ভাল হয়।

শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্রগুলি শ্রেণীর উপযোগী হবে। ছোট শিশুদের জন্ত অপেক্ষাকৃত ছোট আসবাবপত্র থাকলে ভাল হয়। আবার বড় ছেলে-মেয়েদের যদি নীচু আসনে বসতে বাধ্য করা যায়, তবে তাদের মেরুদণ্ডের উপর আঘাত লাগবে। তাই শিশুদের উচ্চতা অনুসারে আসবাবপত্র তৈরী করা উচিত।

বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষগুলি, প্রাঙ্গণ ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। শুধু তাই নয় বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক পরিবেশটিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া একান্ত দরকার।

স্বাস্থ্যসম্মত সময় তালিকা রচনা করতে হবে। প্রতিদিনের কাজকে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যাতে শিশুরা সহজে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে।

পানীয় জল, টিফিন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা বিদ্যালয়ের অবশ্য করনীয় কর্তব্য।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন করে চিকিৎসক থাকবেন। নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্যপরীক্ষা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ হবে তাঁর প্রধান কাজ। বিদ্যালয়ের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীরা অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব যদি বিদ্যালয় গ্রহণ করে, তবে অনেক অভিভাবক নিশ্চিন্ত হতে পারেন। তাছাড়া নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিও প্রাথমিক স্তরে ধরা পড়ে এবং সময়মত চিকিৎসার দ্বারা জীবনহানির হাত থেকে রক্ষা পায়।

এজন্য অবশ্য Health Card বা স্বাস্থ্য-বিবরণী সংরক্ষণ করা উচিত। এইসব দায়িত্ববোধ থেকেই বিদ্যালয়ে আরোগ্যশালা গড়ে উঠেছে। ইউরোপ, আমেরিকার বিদ্যালয়গুলির মত আমাদের দেশেও যে বিদ্যালয়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে সেখানে এই আরোগ্যশালা বা school clinic গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষক ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের নিয়ে এই আরোগ্য-শালার একটি পরিচালনা সমিতি গঠন করা যেতে পারে। এইসব আরোগ্য-শালায় কিছু প্রাথমিক চিকিৎসার জন্ত আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও ওষুধপত্র থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে এর সাথে স্থানীয় হাসপাতালের সাথেও যোগাযোগ করা চলতে পারে। এইভাবে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী করতে হলে

বিদ্যালয়কে নানা প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-রক্ষার কাজ হাতে নিতে হলে :

(১) একটি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত পরিচালক মণ্ডলী গঠন করতে হবে, যাঁরা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সর্বতোভাবে দায়ী থাকবেন।

(২) একটি বিদ্যালয় চিকিৎসাগার (school clinic) থাকবে যেখানে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে।

(৩) আর একটি কার্যনির্বাহক সমিতি থাকবে, যাঁদের কাজ হবে অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন করে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ও তার বিবরণী সংরক্ষণ করা।

(৪) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে Junior Red Cross Society খোলা চলতে পারে। বিদ্যালয়গুলির এই Junior Red Cross Societyর মাধ্যমে ছাত্র, শিক্ষক এবং সমাজের বহু মানুষ একসাথে স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে ব্রতী হওয়া সম্ভব।

তাছাড়াও বিদ্যালয়ের মাধ্যমে নানারোগের প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, যার সাহায্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দও উপকৃত হতে পারে।

(৫) অপুষ্টিজনিত রোগ দূর করার জন্য বিদ্যালয়ের উচিত কিছু জল-যোগের ব্যবস্থা করা। প্রতি ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে কিছু অর্থ সাহায্য নিয়ে এই জলযোগের ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শিশুদের কিছু পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশনের দিকে নজর দিতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত বিদ্যালয় জীবন যাপন করতে হলে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। (১) স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ক অভ্যাসগঠন, (২) স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠ এবং (৩) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উপকার বোধ।

(১) স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ক অভ্যাসগঠন

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় জীবনে স্বাস্থ্যসম্মত আচার আচরণের মধ্যে দিয়ে এমন সুঅভ্যাস গঠন করে দিতে হবে যার ফলে পরবর্তী-জীবনে এর সুফল যেন তারা ভোগ করতে পারে।

(২) স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠ :

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল নীতিগুলি শুধু পাঠ্যতালিকা ভুক্ত হলেই চলবে না, ছাত্ররা পরিচ্ছন্ন

থাকছে কিনা, বিদ্যালয়ের বাইরে গিয়েও তাদের স্বাস্থ্যসম্মত সুঅভ্যাস গড়ে উঠছে কি না, স্বাস্থ্যশিক্ষার মূল নীতিগুলি জীবনে তারা কতখানি গ্রহণ করেছে, তা জানার জন্য ছাত্রদের সাথে মাঝে মাঝে আলোচনা করতে হবে ও জানতে হবে।

(৩) স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উপকার বোধঃ

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে অবহিত করতে হবে। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য বিশেষ কর্মসূচী পালিত হওয়া প্রয়োজন। যেমন ছাত্রদের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য দেওয়া, দাঁত, চোখ, কান, নাক, চুল পরিষ্কার আছে কি না দেখা, পোষাক পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখতে শেখান, সাধারণ ব্যাধির প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, সংক্রামকব্যাধির প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া ইত্যাদি।

স্বাস্থ্য দিবস

এছাড়া স্বাস্থ্য দিবস (৭ই এপ্রিল) পালন করা যায়। সেদিন বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিশেষভাবে পরীক্ষা করা যাবে। তাছাড়া ঐ দিন শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্ররা সামুদায়িক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী অবলম্বন করতে চেষ্টা করতে পারেন। ঐ সময়ে সমাজের মানুষের সাথে যোগাযোগ করে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য ও নানাপ্রকার সংক্রামকব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বহু মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করতে পারা যায়। স্বাস্থ্য সপ্তাহ অবশ্য বছরে একবারই পালন করা হয়। এই সময় প্রত্যেক শ্রেণী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে কি না তার উপর নির্ভর করে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে জীবনধারণ না করলে কি কুফল হয় তা ভাল করে তুলে ধরার জন্য যেখানে সম্ভব ছায়াচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা উচিত।

স্কুল ক্যান্টিন যদি থাকে তবে তা কিভাবে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে পরিচালনা করা যায়, সুষম খাদ্য কিভাবে দেওয়া যায়, সে সম্বন্ধেও ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করা যেতে পারে।

খাদ্য, পানীয়, ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ, সংক্রামক রোগ ইত্যাদির উপর বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যরক্ষায় শিক্ষকের দায়িত্বঃ (Responsibility of Teacher in respect of Health Service)।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে শিক্ষক যদি বিশেষভাবে উৎসাহিত না হন তবে সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যরক্ষায় সুশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যমশীল কর্মীদের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন।

বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষকগণ যদি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য কেমন তা জানার চেষ্টা করেন তবে স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্মসূচী সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষক তাঁর পর্যবেক্ষণের তথ্যগুলি নিয়ে ডাক্তার অথবা কোন নার্সের সাথে মাঝে মাঝে পরামর্শ করতে পারেন।

অবশ্য বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার আগে প্রত্যেক শিক্ষককে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। শিক্ষকের পরিশ্রমকে সমভাবে বণ্টন করা অবশ্য কর্তব্য। মাঝে মাঝে বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকাও বাঞ্ছনীয়।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। শিশু মনস্তত্ব, আচরণ মূলক সমস্যা, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষকদের ধারনা দিতে হবে। বিদ্যালয়-আরোগ্যশালা পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষকদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা চালাবেন শিক্ষক। তাছাড়া স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে শিক্ষকগণ শিশুদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করবেন কেমন করে? কেমন করে স্বাস্থ্য-বিবরণী রাখতে হয় তাও জানবেন শিক্ষক। ব্যক্তিস্বাস্থ্য ছাড়াও শিক্ষকের জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তিনি গড়ে তুলতে অপারগ হবেন। স্থানীয় পরিবেশের আবর্জনা দূরীকরণ, দূষিত জল নিষ্কাশন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব শিক্ষককেই নিতে হবে।

Q. Prepare a practical scheme of health service for your School. Discuss the responsibility of Teacher in this connection. (C.U. 1968)

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য আরোগ্যশালা ও শিশু পরিচালনাগার* (School Clinic & Child Guidance Clinic)।

স্বাস্থ্যশিক্ষাদানের জন্য কেবলমাত্র সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম রচনা করলেই চলবে না। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি শিশুর স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও পরিদর্শন করার ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে হলে বিদ্যালয়ে আরোগ্যশালা (School Clinic) ও শিশু পরিচালনাগার (Child guidance Clinic) স্থাপন করা দরকার। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশে স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থাগুলিকে আইন করে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমাদের দেশের মত গরীব দেশে অবশ্য প্রতি বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

মুদালিয়ার কমিশানে স্বাস্থ্যপরীক্ষা, পরিদর্শন ও স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই কমিশানে বলা হয় যে:—

বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিশুকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে হবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষাকে দায় সারা কাজ মনে না করে, অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে কর্তৃপক্ষকে মাঝে মাঝেই ডাক্তারের সাহায্যে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। বৎসরের প্রথমে একবার ও স্কুল পরিত্যাগের সময় আর একবার স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা একান্ত কর্তব্য।[১]

শিশুর রোগ নির্ণীত হলেও অনেক সময় অভিভাবকদের এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদাসীন দেখা যায়। রোগ অল্পই হোক বেশীই হোক তা সারিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা উচিত।

যে ত্রুটি বা অসুস্থতা সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ একমত, সেই ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

---

*Q. Describe the significance of School health Service and child Guidance Clinic in the educational programme of the School. In what ways do they contribute to the development of a balanced personality of child?

১। Health examination should be thorough and complete. If a choice is to be made between frequent and cursory examinations and more thorough examinations at longer intervals, the latter are greatly to be preferred. Every pupil in the school should undergo at least one complete examination every year while in School, and one just prior to leaving the School.

—Secondary Education Commission.

স্বাস্থ্যরক্ষার বিবরণীগুলি যথাযথভাবে রক্ষা করতে হবে। বিবরণীর তিনটি কপি থাকবে, একটি স্বাস্থ্যপরীক্ষকের কাছে, অপরটি অভিভাবকের কাছে, তৃতীয়টি থাকবে স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়কের কাছে।

বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রী এমন সব রোগে ভুগে থাকে যেগুলি সহজেই সারিয়ে তোলা যায়; যেমন দাঁতের অসুখ, সাধারণ দৃষ্টিহীনতা, বধিরতা, রক্তাল্পতা ইত্যাদি। স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক অভিভাবককে শিশুর উন্নত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করলে তবেই প্রত্যেক শিশু স্বাস্থ্যবান দায়িত্বশীল নাগরিক রূপে দেশের সম্পদ হয়ে গড়ে উঠতে পারবে।

স্বাস্থ্যরক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রও প্রসারিত হতে পারে। যেমন রোগ যদি অল্পেতে ধরা পড়ে ও সারান হয় তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। তাছাড়াও স্বাস্থ্যসম্পর্কিত ত্রুটিযুক্ত শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয় থেকে যদি তাদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে সেখানে শিক্ষাব্যবস্থা করা যায় তাহলেও শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় কম হবে।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, জনস্বাস্থ্য বিভাগকেও নানাভাবে নানাকাজে সাহায্য করতে পারে। স্বাস্থ্য পরীক্ষক হয়তো বিদ্যালয়গৃহ পরিবর্তন করতে পারবেন না, কিন্তু বিদ্যালয় গৃহটি কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আলো বাতাস যুক্ত রাখা যায় সে সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে পারেন। তাছাড়া কোন স্থানে যখন ছোঁয়াচে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে তখন স্বাস্থ্য পরীক্ষার সাহায্যে ঐ রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলি সহজেই ধরা পড়ে, ফলে সময়মত চিকিৎসাও আরম্ভ করা যায়।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার দ্বারা অভিভাবকশ্রেণী নানাভাবে উপকৃত হন। স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রভাব কেবল বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, একটি শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি যদি আমরা চাই তবে শিক্ষক ও অভিভাবকের সমবেত প্রচেষ্টায় তা সম্ভব; তাই স্বাস্থ্য পরীক্ষা, অভিভাবকশ্রেণীকেও শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। তাছাড়াও দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে সব সময় শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুর গৃহপরিবেশও উন্নত হতে পারে।

বিদ্যালয় যথা সময়ে সাহায্য না করলে ছাত্রছাত্রীদের বহু ত্রুটি বহু বছর ধরে থাকতে থাকতে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

যেমন ত্রুটিযুক্ত দাঁত ও দৃষ্টিশক্তি, মেরুদণ্ড বেঁকে যাওয়া ইত্যাদি থেকে নানা রোগের উৎপত্তি হয়। কাজেই এইসব ত্রুটিমুক্ত করার জন্য বিদ্যালয়কে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা (Medical Inspection)।*

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হলে কতকগুলি নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। যেমন :—

(১) স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পূর্ণ ও নিখুঁত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর বৎসরে অন্ততঃ একবার সম্পূর্ণভাবে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা উচিত এবং বিদ্যালয় ত্যাগের পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

(২) যে সব ছাত্রছাত্রীর বেশীমাত্রায় শারীরিক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় অথবা কঠিন রোগে দীর্ঘদিন ভুগছে তাদের ক্ষেত্রে খুব ঘন ঘন স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রয়োজন।

(৩) স্বাস্থ্য পরীক্ষার সব উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে যদি স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর ডাক্তারের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী কোন অনুসরণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা না হয়। বিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী টনসিল, দাঁতে পোকা, পাইওরিয়া, অপুষ্টি জনিত রোগ, সাধারণ দৃষ্টিহীনতা, চর্মরোগ ইত্যাদিতে ভুগে থাকে। বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষাগার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য পরীক্ষাগারটি পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা উপযুক্ত সরঞ্জাম সমন্বিত হয়ে যথোপযুক্তভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। তাছাড়া স্থানীয় হাসপাতালে বিদ্যালয়ের শিশুদের চিকিৎসার জন্য একটি পৃথক সময়সূচী নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের দেশে শিশুর স্বাস্থ্যের অবনতির কথা বলা হলেও দারিদ্র্যের জন্য বহু পিতমাতা চিকিৎসা করাতে পারেন না। সাধারণতঃ আমাদের দেশে শিশুদের দুভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থা হয়ে থাকে (১) ডাক্তারের ব্যক্তিগত চিকিৎসার মাধ্যমে (২) হাসপাতালের মাধ্যমে। দরিদ্র পিতামাতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ডাক্তারের ব্যক্তিগত চিকিৎসা নিতে অপারগ; তার প্রধান

* Q. "Medical Inspection of School Children is of little or no importance unless proper follow-up work is undertaken." How would you ensure this in a School where pupils are drawn mostly from middle class family, (C.U. 1961)

কারণ অর্থ সমস্যা। তাই বাধ্য হয়ে তাদের হাসপাতালের সাহায্য নিতে হয়। বিদ্যালয় থেকে এক একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এক একদল ছাত্রছাত্রী সপ্তাহে একদিন করে হাসপাতালে যেতে পারে। হাসপাতালগুলির বিকালের দিকে এই ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। চোখ, কান, নাক, গলা, বুক পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের বিশেষজ্ঞরা শিশুদের চিকিৎসার ভার নেবেন। অবশ্য হাসপাতালগুলিতে এত কাজের চাপ থাকে যে বিদ্যালয়ের শিশুদের চিকিৎসার ভার নেওয়া ডাক্তারদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষাগার যদি স্থাপন করা যায় তবে হয়তো সমস্যার খানিকটা সমাধান হতে পারে। আমাদের দেশের প্রতি বিদ্যালয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ আরোগ্যশালা গড়ে তোলা বোধ হয় সম্ভবপর নয়। পরস্পর সন্নিকটবর্তী কতকগুলি বিদ্যালয় মিলিত হয়ে একটি আরোগ্যশালা গড়ে তুলতে পারে। শহরাঞ্চলে আরোগ্যশালা স্থাপন খানিকটা সহজ হতে পারে; কিন্তু গ্রামাঞ্চলে আরোগ্যশালা স্থাপন করার জন্যে সরকারী অনুদান একান্তভাবে আবশ্যক।

আরোগ্যশালাগুলিতে নানা চার্ট, নক্সা, আদর্শ (model) বিবরণী পুস্তক, ইত্যাদি থাকবে; বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকতে হবে। এছাড়া আছে আরোগ্য-শালার জন্য প্রচুর খরচ। এত অর্থ পাওয়া যাবে কোথায়? মধ্যবিত্ত অভিভাবক শ্রেণীর পকেট প্রায় খালি। তবুও বিদ্যালয়ের আরোগ্যশালার মাধ্যমে চিকিৎসা করাতে হলে ডাক্তারের ব্যক্তিগত স্বাধীন চিকিৎসার চেয়ে অনেক কম অর্থ লাগবে একথা যদি অভিভাবকশ্রেণী উপলব্ধি করতে পারেন তবে হয়তো তারা বাৎসরিক ৪ অথবা ৫ টাকা চাঁদা দিয়ে বিদ্যালয়ের আরোগ্যশালাটি পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে পারেন।

(৪) স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টগুলি, একটি অভিভাবকের কাছে, অপরটি ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞের কাছে, তৃতীয়টি যে শিক্ষক স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধায়ক হবেন তাঁর কাছে থাকবে।

বিদ্যালয়ের আরোগ্যশালায় বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কর্মসূচীর মধ্যেই থাকবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার একটি রিপোর্টের নমুনা

বিদ্যালয়ের নাম..............................শ্রেণী............বৎসর................
ছাত্র/ছাত্রীর নাম......................পুরুষ/স্ত্রী.......জন্ম তারিখ............
ঠিকানা...
অভিভাবকের নাম..........................পেশা.......................................
পরিবারের লোকসংখ্যা...........বিদ্যালয়ে কয় বৎসর পড়েছে...............
টীকা নেওয়া হয়েছে কিনা...

পরীক্ষার ফলাফল

পরীক্ষার তারিখ.......

এর পূর্বে কোন তারিখে পরীক্ষা হয়েছিল......

১। উচ্চতা......
২। ওজন......
৩। পুষ্টি......
৪। সাধারণ স্বাস্থ্য........
৫। দৃষ্টি শক্তি : ডান......বাম.......
৬। শ্রবণ শক্তি : ডান......বাম.......
৭। দাঁত ও মাড়ি......
৮। টনসিল.......
৯। নাক........
১০। চর্ম........
১১। পা.......
১২। স্নায়ু.......
১৩। হৃদপিণ্ড......
১৪। ফুসফুস........
১৫। মেরুদণ্ড......
১৬। এডিনায়েড্‌স......
১৭। ঘাড়ের গ্রন্থি.......
১৮। গ্রন্থিসমূহ......
১৯। স্নায়ুতন্ত্র......
২০। সংক্রামক রোগাক্রমণ......
২১। অন্যান্য রোগ........
২২। চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়.......

(এটি অভিভাবকের নিকট জানা যাবে)

স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর শিক্ষকদের কাজ শেষ হয়ে যাবে না। তাঁরা শিশুর রোগের লক্ষণ দেখে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে অভিভাবক শ্রেণীকে রোগের গুরুত্বের কথা বলবেন। প্রতি শিশুর উচ্চতা ও ওজন এর বিবরণী রাখা একান্ত প্রয়োজন; এই কাজে শিক্ষকগণ, চিকিৎসককে সাহায্য করতে

পারেন। উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে Wood ও Boswell বলেছেন, "Weighing and measuring pupil in school is the easiest and most accurate method of following closely each pupil's health between health examinations ; it is a definite index of each child's progress from week to week"............এইভাবে শিক্ষকগণ স্বাস্থ্যরক্ষার নানা কাজে সাহায্য করতে পারেন। তাঁরা শিশুকে ভালভাবে জানেন এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীও খানিকটা বিজ্ঞানসম্মত হবে।

যেখানে বিদ্যালয়ের আরোগ্যশালা পরিচালনা করার মত আর্থিক সঙ্গতি থাকে সেখানে তাঁরা সেবিকা (Nurse) নিয়োগ করবেন। তা না হলে সেবাকার্য ব্যাহত হতে পারে। সেবিকার কাজেও শিক্ষকের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বিদ্যালয়ে খাদ্য সরবরাহ (School Meals)।*

মানবদেহ একটি যন্ত্রবিশেষ। নানাপ্রকার কাজকর্ম, পরিশ্রম ও খেলাধূলার দ্বারা আমাদের দেহযন্ত্রের ক্ষয় হতে থাকে। এই ক্ষয়, সঙ্গে সঙ্গে যদি পূরণ করা না হয় তবে অচিরে দেহযন্ত্র বিকল হয়ে পড়বে। খাদ্য ও পানীয়ের সাহায্যে সাধারণতঃ এই দেহযন্ত্রের ক্ষয়পূরণ করা হয়। শৈশবে শিশু অত্যন্ত চঞ্চল থাকে বলে তার শরীরের ক্ষয়ও বেশী হয়। তাই শিশুর খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা স্বল্প বিরতির পর পরই হওয়া উচিত।

স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করে তার মধ্যে অপুষ্টিকর খাদ্য অন্যতম। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশুই অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগে থাকে। বেশীর ভাগ শিশু বাড়ীতে ঠিকমত খাবার পায় না, কাজেই বিদ্যালয়ে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব বিদ্যালয়কেই নিতে হবে। সরকারী অনুদানপুষ্ট বিদ্যালয়গুলি যাতে অল্প খরচের মধ্যে কিছু পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সবাই একমত হলেও খাদ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে সকলে একমত নন। পিতামাতার দারিদ্রের জন্য অনেক শিশুকে অর্ধাহারে বা অনাহারে

---

* Q. Write a note on School-meal.

থাকতে হয়। অভুক্ত শিশুকে নিয়ে শিক্ষাকার্য ঠিকমত পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই শিশুদের বিশেষতঃ প্রাথমিক স্তরে একটু আগে আগে বিদ্যালয়ের কাজ সুরু করে যেমন বেলা ১০টা নাগাদ থেকে আরম্ভ করে বেলা ১২টার পর একটা দীর্ঘ বিরতির ব্যবস্থা করা যায়। এই সময় আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য ভাত, ডাল, তরকারি ইত্যাদি শিশুদের দেওয়া যায়। এই রকম একটা পরিকল্পনা রূপায়ণের ভার সরকার নিয়েও ছিলেন। আজকাল প্রায় প্রতি গ্রামেই বিদ্যালয় আছে। কয়েকটি গ্রামের মধ্যবর্তী কোনস্থানে বিদ্যালয়ের খাদ্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখান থেকে বড় বড় ছাত্ররা খাবার বয়ে নিয়ে যেত নিজ নিজ বিদ্যালয়ে। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। এই ব্যবস্থায় ছাত্ররা খুব উপকৃত হলেও দেখা গেল যে প্রচুর অর্থাভাব দেখা দিচ্ছে এবং খাদ্য সরবরাহেরও খুব অসুবিধা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে একরকম খাদ্য রোজ দিলে খাওয়ায় রুচি কমে যায়, তা যতই পুষ্টিকর খাদ্য হোক। রুচি না থাকলে দেহের পুষ্টি হবে না। অর্থের জন্য খাদ্যে বৈচিত্র্যের অভাব দেখা যায়।

বিদেশের অনুকরণে এই মধ্যাহ্নকালীন আহার সরবরাহের কথা চিন্তা করা হয়েছিল বোধহয়। যেখানে বিদ্যালয়গুলি আবাসিক সেখানে বিদ্যালয় সংলগ্ন canteen থাকে; সেখানে পুষ্টিকর খাদ্য মধ্যাহ্নে সরবরাহের কোন অসুবিধা থাকে না। কিন্তু গরীবদেশে ঐসব আকাশকুসুম কল্পনা করার সুযোগ আছে কি?

তাই অনেকে মনে করেন মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ে সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এর জন্যও সরকারী অনুদান লাগবে। আমাদের দেশের লোকের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম; তাই এই জলযোগ বাবদ তাঁদের কাছ থেকে খুব বেশী আশা করা যায় না। প্রতিমাসে ১·০০ বা ২·০০ নিয়ে এর সঙ্গে সরকারী সাহায্য যোগ দিয়ে তবে হয়তো জলযোগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেখানেও একান্ত গরীবদের জন্য বিনা পয়সায় কিছু খাদ্যের (Free Tiffin-এর) ব্যবস্থা রাখতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে সাধারণতঃ বিদ্যালয় সংলগ্ন কিছু জমি থাকে। বুনিয়াদী বিদ্যালয় সংলগ্ন কিছু জমিতে চাষবাস করার কথা বলা হয়ে থাকে। এই

চাষবাসের মধ্যে দিয়ে জলযোগে ব্যবস্থা করা যায়, এমন জিনিষ উৎপন্ন করা যায় কিনা দেখতে হবে। যেমন কলা, শশা, পেয়ারা, পেঁপে ইত্যাদি গাছ খুব সহজে হয়, তাছাড়াও আলু, মিষ্টি আলু, চীনাবাদাম, টমেটো প্রভৃতিও অতি অল্প পরিশ্রমে উৎপন্ন করা যায়। এইভাবে জলযোগের কাজে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই কায়িক পরিশ্রম দিয়ে কিছুটা সাহায্য করতে পারে।

UNICEF নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য নিয়ে বিদ্যালয়গুলিতে গুঁড়ো দুধ জলে গুলে সরবরাহ করারও ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তাও বেশী দিন কার্যকরী হয় নি। তবে এখনও সয়াবিন, মাইলো, বাজরা ইত্যাদি কোন কোন বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়।

টিফিন প্রস্তুত করার জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকা দরকার। কিছু বাসনপত্র একাজে অবশ্য প্রয়োজনীয়। বাসনপত্র পরিষ্কার রাখা, পরিষ্কার ভাবে খাদ্য প্রস্তুত করা ইত্যাদি কাজ দেখাশুনা করার জন্য ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকবেন।

টিফিন খাওয়ার আগে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ভাল করে হাতমুখ ধুয়ে নেবে; যদি পাত্রে করে টিফিন খায় তবে খাওয়ার পর পাত্রগুলি ধুয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখবে। যদি পাতায় বা কাগজের ঠোঙায় করে খাবার দেওয়া হয় তবে খাওয়ার পর পাতা বা কাগজগুলি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে জল খেয়ে ভাল করে হাতমুখ ধুয়ে তারপর ক্লাসে যাবে।

অল্প খরচের মধ্যে চাপাটি, ডাল, সুজি, শশা, কলা, পেয়ারা, পাঁউরুটি, ছোলা বা মটর সিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, বাদাম ইত্যাদি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ঋতু অনুযায়ী জিনিষের দামের তফাৎ হয়। যে সময় যে জিনিষ সস্তা হয় সেই জিনিষ তখন ছাত্রছাত্রীদের খাওয়ানোর চেষ্টা করা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন

(School Sanitation)

বিদ্যালয় ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে গেলে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদিগকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হবে। বিদ্যালয় আজ কেবলমাত্র শিশুর শিক্ষালয় নয়, শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশের আদর্শ সামনে রেখে, সমস্ত মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়ার জন্যই সমাজেরই প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আজকের শিক্ষা তাই কর্মকেন্দ্রিক, বহুমুখী ও জীবনকেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়ের পরিবেশটি শিশুর বিকাশের সম্পূর্ণ অনুকূল হওয়া দরকার। বিদ্যালয় পরিবেশের প্রতি এমনভাবে নজর রাখা উচিত যাতে শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। শিশুর শিক্ষাপরিবেশকে উন্নত করার প্রচেষ্টা তাই বর্তমান শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। আধুনিক শিক্ষাবিদরা মনে করেন যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ যদি স্বাস্থ্যকর না হয় তবে শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা করা সম্ভব হয় না, শিশু দেহে ও মনে পঙ্গু হয়ে যায়, ফলে শিক্ষা ব্যর্থ হয়।

বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় পরিবেশ উন্নত করার জন্য বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন একটি মূল্যবান বিষয়। বিদ্যালয় গৃহ অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমির উপর নির্মিত হলে ভাল হয়, যাতে কোন জলই জমে যেতে পারবে না। শহরের ঘন বসতি বা কোলাহলমুখর স্থান থেকে দূরে মুক্ত স্থানে বিদ্যালয়ের অবস্থান হওয়া উচিত। বিদ্যালয় গৃহের সংলগ্ন খেলাধূলার জন্য কিছুটা উন্মুক্ত প্রান্তর থাকা প্রয়োজন। আবাসিক বিদ্যালয় হতে হলে আরও পরিসর যুক্ত স্থানে বিদ্যালয় গৃহ ও ছাত্রাবাস নির্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয়ে সবরকমের জল সরবরাহ ও জল নিষ্কাশণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। পানীয় জল যেখানে থাকে সেখানে জল জমে যেতে না পারে এমনভাবে নর্দমা থাকা উচিত। নর্দমার ভিতর ও আশে পাশে ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, কেরোসিন ইত্যাদি ঢেলে দিলে মশা, মাছি জন্মাতে পারবে না।

তাছাড়া বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষে ও আসবাব পত্রে ধূলা ময়লা জমে যায়। সেগুলো প্রতিদিন নিয়ম করে ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় পরিষ্কার করে

নেওয়া উচিত। ছেঁড়া কাগজ বা যে কোন আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে এক একটি পাত্র রাখা উচিত এবং সেই পাত্রে যাতে সবাই ময়লা ফেলার অভ্যাস করে সেদিকে প্রত্যেকের নজর দেওয়া উচিত।

সবচেয়ে বড় অসুবিধা দেখা যায় শিশুদের পায়খানা, বাথরুম পরিষ্কার রাখা নিয়ে ; বেশীর ভাগ শিশু পায়খানা, বাথরুম ঠিকমত ব্যবহার করতে জানে না। আজকাল অনেক ভাল বিদ্যালয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক অথবা কুয়ো পায়খানা তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু এ পায়খানাগুলি ঠিকমত জল না ঢালা হলে ব্যবহারের উপযোগী থাকে না। তাই প্রত্যেক শিশুকে বাথরুম, পায়খানা ঠিকমত ব্যবহার করতে শেখান প্রয়োজন।

ছাত্রছাত্রীদের যেখানে সেখানে কফ, থুথু ফেলা উচিত নয়। কফ, থুথু যেখানে সেখানে ফেলে যে তার কি বিষময় পরিণতি হতে পারে সে সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা দেওয়া দরকার। কফ, থুথু নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবে, সেখানে প্রত্যহ ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি ছড়াতে হবে।

বিদ্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যসূচীকে ঠিকমত রূপ দিতে হলে কতকগুলি পরিকল্পনা ও পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন :—

(১) সমগ্র বিদ্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভার একটি সংসদ তৈরী করে সংসদ সদস্যদের উপর দেওয়া চলতে পারে।

(২) সমগ্র বিদ্যালয়ে জল নিকাষণ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যাবশ্যক।

(৩) শিক্ষকদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসগুলি গড়ে তুলতে হবে।

(৪) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠন ও স্বাস্থ্যপালন ইত্যাদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ; শিক্ষাগত মূল্যায়নে একে স্বীকৃতি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

বর্তমানে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের কাজ 'সাফাই' দিয়েই সুরু হয়। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীই এই সাফাই কাজে অংশ গ্রহণ করে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী পরিষদ থাকে ; এই পরিষদে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা নির্বাচিত প্রার্থী নিয়ে একটি মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়। মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে একজন থাকে সাফাই মন্ত্রী। সাফাই মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশগ্রহণ করে। সকলের অতি অল্প পরিশ্রমে সমস্ত বিদ্যালয় গৃহটি ও বিদ্যালয় পরিবেশটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা মোটেই দুঃসাধ্য কাজ নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

সাধারণ সংক্রামক ব্যাধি

(Common Infectious Disease)

"শরীরম্ ব্যাধি মন্দিরম্"—শরীর থাকলে নানরকম ব্যাধির হাত থেকে খুব সহজে রেহাই পাওয়া যায় না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রোগজীবাণু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকে সুস্থ দেহে প্রবেশ করে। নানাপ্রকার আচার অনুষ্ঠান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলেই মানুষ থেকেই মানুষের মধ্যে অতর্কিতে রোগ বিস্তৃতি ঘটে।

যে সকল ব্যাধি একজনের দেহ থেকে অপরের দেহে সংক্রামিত হয় তাকে সংক্রামক ব্যাধি বলে। সংক্রামক রোগ দুইভাবে সংক্রামিত হয়—(১) প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ রোগের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শে, (২) পরোক্ষভাবে—রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি, জল, খাদ্য বা ভূমির সংস্পর্শে। তাছাড়াও বাতাস, কীটপতঙ্গ ও জীবজন্তুর দ্বারা রোগ সংক্রামিত হয়।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যে ধরণের সংক্রামক রোগে ভুগে থাকে, জীবাণু-বাহকের বিভিন্নতা হিসাবে, রোগগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে :—

(১) প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ—বসন্ত, হাম, খোস পাঁচড়া, মাম্প্স, দাদ ইত্যাদি সরাসরি রোগীর কাছ থেকেই ছড়ায়।

(২) জল ও খাদ্যবাহিত—কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি।

(৩) বায়ুবাহিত—সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা, ডিপথিরিয়া ইত্যাদি।

(৪) কীটপতঙ্গবাহিত—কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি।

(৫) জীবজন্তুবাহিত—ধনুষ্টঙ্কার, কৃমি প্রভৃতি।

এখন দেখা যাক কোন পথে রোগ সংক্রামিত হয়। সংক্রামণের পথ হিসাবে আমরা দেখি (ক) নাসাপথ (প্রশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে), (খ) মুখবিবর (খাদ্য, পানীয়ের মাধ্যমে), (গ) চর্ম—(কোন ক্ষত বা ঘা থাকলে)।

রোগের জীবাণুগুলি উদ্ভিদ অথবা প্রাণীদেহ থেকে উৎপন্ন হয়, তারপর

Q. Enumerate the infectious diseases which are common in our country and summarise the methods you should adopt to protect your pupils against them.

বিভিন্ন বাহকের সাহায্যে সুস্থ মানবদেহে প্রবেশ করে। তারপর মানবদেহে রক্তের মধ্যে যে শ্বেতকণিকা থাকে তাদের সাথে এই বহিরাগত জীবাণুর লড়াই হয়। লড়াইএ যদি শ্বেতকণিকা জয়লাভ করে, তবে জীবাণুগুলি বিনষ্ট হয়ে যায় আর যদি জীবাণুগুলি জয়লাভ করে, তবে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। দুর্বল দেহ হলে জীবাণুগুলি প্রবেশ করেই বংশবৃদ্ধি সুরু করে, এদের দেহ থেকে একরকম বিষাক্ত রস নিঃসৃত হতে থাকে, তার ফলে রোগ দেখা দেয়। জীবাণু প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় না, এর জন্য কিছু সময় লাগে একে উপ্তিকাল (Incubation period) বলা হয়। উপ্তিকাল পার হলেই আক্রমণকাল (Invasion period) সুরু হয়, তারপর জীবাণুর রস শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে সুরু করলে আক্রমণের প্রকোপ কমে যায়, রোগী আরোগ্যের পথে অগ্রসর হয়।

রোগ সেরে গেলেও রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে হলে আরও কিছুদিন সময় লাগে। এই সময়টাকে রোগোত্তর কাল (Convalescence period) বলে। এই সময় শরীর খুব দুর্বল থাকে ; তাছাড়া নতুন রোগ আক্রমণের প্রতিরোধ ক্ষমতা তখনও গড়ে ওঠে না। এই সময় রোগীকে খুব সাবধানে রাখতে হয়।

আগেই আমরা দেখেছি রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের শরীরে থাকে, কিন্তু রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন কমে যায় তখন কৃত্রিম উপায়েও এই প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। তাহলে রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায় এবং দেহের মধ্যেই রোগ-অনাক্রম্য (immunity) অবস্থা ঘটে। টাইফয়েড, কলেরা, ডিপথিরিয়া, প্লেগ, টিটেনাস, বসন্ত ইত্যাদি রোগের প্রতিষেধক টিকার সাহায্যে মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যে ধরনের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় তাদের মধ্যে বসন্ত, হাম, মাম্পস্, যক্ষা, হুপিং কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিপথিরিয়া, আমাশয়, খোস পাঁচড়া, দাদ ইত্যাদি প্রধান।

জলবসন্ত (Chicken pox)।

উপ্তিকাল—১১-২১ দিন। **লক্ষণ**—প্রথমে শরীরে জর জর ভাব থাকে, মাথাধরা থাকে, গায়ে হাতে খুব ব্যথা থাকে। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়

লাল লাল জলভরা গুটি বার হয় এগুলি পরে পুঁজে ভরে যায়। ৭-৮ দিনের মধ্যে গুটিগুলো শুকিয়ে যায়।

যতদিন না একেবারে রোগী সুস্থ হয়ে উঠে প্রায় ৩ সপ্তাহ মত সময় ততদিন রোগীকে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতে দেওয়া চলবে না।

হাম (Measles)।

এই রোগ খুব মারাত্মক নয়। উপ্তিকাল—৭-১৪ দিন। লক্ষণ—প্রথম দু-চার দিন সর্দি, কাশি, জর ইত্যাদি দেখা যায়। তারপর মুখের মধ্যে লালচে ভাব দেখা যায়, চাকা চাকা উদ্ভেদ (rash) দেখা দেয়। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই উদ্ভেদ মিলিয়ে যায়। দিন পনেরোর মধ্যে রোগী একেবারে সেরে যায়।

রোগীকে কোনমতেই ঠাণ্ডা লাগাতে দিতে হয় না। হামের পর ঠাণ্ডা লাগলে অনেক জটিল রোগ দেখা দিতে পারে; ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ছোঁয়াছুঁইর ফলে এই রোগের খুব সহজে বিস্তার হয়, সেইজন্যে রোগীকে খুব সাবধানে আলাদা করে রাখতে হয়।

মাম্প্‌স্‌ (Mumps)।

উপ্তিকাল—১৪-২১ দিন। লক্ষণ—এই রোগের জীবাণু কণ্ঠ মধ্যস্থিত প্যারটিড (Parotid) নামক লালা গ্রন্থিকে আক্রমণ করে। ফলে কর্ণমূলের নীচে, মাড়ির শেষপ্রান্ত গরম হয়ে উঠে ও চোয়াল ও গলা ফুলে যায়। কোন খাবার খেতে-এমনকি ঢোক গিলতেও কষ্ট হয়। ৭-১৫ দিনের মধ্যেই রোগ সেরে যায়।

এই রোগ খুব ছোঁয়াচে, তাই রোগীর ছোঁয়াচ বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে।

হুপিং কাশি (Hooping-cough)।

উপ্তিকাল—৬-১৮ দিন। লক্ষণ—প্রথম প্রথম কয়েকদিন সর্দি কাশি থাকে, তারপর কাশতে কাশতে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম দেখা দেয়, একটানা কাশির চোটে চোখমুখের চেহারা বদলে যায়, অনেক সময় বমি উঠে আসে। একবার হুপিং কাশি হলে সহজে সারতে চায় না; প্রায় ২।৩ মাস থাকে।

এই রোগ খুব মারাত্মক নয় তবে পীড়াদায়ক। এক নাগাড়ে অনেকদিন ভুগলে ফুসফুস দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এই রোগ খুব ছোঁয়াচে তাই সবাই এই রোগী থেকে দূরে থাকলে ভাল হয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)।

উপ্তিকাল—কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিন। লক্ষণ—অত্যন্ত মাথাধরা থাকে জ্বরের সাথে, সর্দি কাশি, গায়ে হাতে ব্যথা বেদনা ইত্যাদি হয়।

রোগটি খুব সাধারণ তবে রোগীকে খুব দুর্বল করে ফেলে, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রকৃতি রোগের ক্ষেত্র রচনা করে। রোগটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে, রোগীর সংস্পর্শে কিছুক্ষণের জন্য এলেই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

ডিপথিরিয়া (Diphtheria)।

উপ্তিকাল—২-১০ দিন। লক্ষণ—জ্বর, কাশি এবং গলায় ব্যথা থাকে। কোন কিছু গিলে খেতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। কণ্ঠনালীর উপর কখনও কখনও সাদাটে ছাই রঙের একটা পর্দা পড়ে। এরপর শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়, পরে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয়।

এই রোগ ছাত্রছাত্রীর হলে তাকে আলাদা করে রাখা প্রয়োজন। রোগীর উচ্ছিষ্ট খাদ্য কেউ যেন না খায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। রোগীর বাড়ীর সকল শিশুকে ও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ডিপথিরিয়া প্রতিরোধক টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাশয় (Dysentery)।

উপ্তিকাল—২-১২ দিন। লক্ষণ—আমাশয় অসুখে পেট খুব কামড়ায়, মলের সাথে কখনও কখনও রক্ত পড়ে। কখনও সঙ্গে জ্বর থাকে, যদিও জ্বরের তাপ খুব বেশী থাকে না।

ঠিকমত চিকিৎসা হলে ৭।৮ দিনে সেরে যেতে পারে। তবে রোগীকে খুব দুর্বল করে দেয়। রোগীর মলমূত্রে যেন মাছি না বসে দেখতে হবে। রোগীর ব্যবহৃত জিনিষপত্র বিশোধক দ্রব্য দিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে।

যক্ষ্মা (Tuberculous)।

উপ্তিকাল—এই রোগের উপ্তিকাল ঠিকমত বলা যায় না। লক্ষণ—

যক্ষ্মারোগের লক্ষণ হোলো ক্ষুধার অভাব। রোগীর ঘন ঘন সর্দি লাগা, খুক-খুকে কাশি, ঘুসঘুসে জ্বর, শেষ রাত্রিতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাওয়া, ওজন কমে যাওয়া, ক্লান্তি বোধ করা ইত্যাদি। তারপর জ্বর বাড়ে, বুকে ব্যাথা, রোগী রোগা হয়ে যায়, কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে।

যক্ষ্মারোগ অত্যন্ত ব্যাপক ও সংক্রমণশীল এবং মারাত্মক। যৌবনকালে এই রোগের প্রকোপ খুব বেশী। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই রোগের আক্রমণ কম দেখা যায়। তবে দুর্বল দেহে এই রোগের জীবাণু খুব সহজে বাসা বাঁধতে পারে। রোগীর কফ, থুথু, হাঁচি, কাশির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়; তাছাড়া কফ, থুথু শুকিয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যেতে পারে অথবা কফ, থুথু ইত্যাদি মাছি, পিঁপড়ে প্রভৃতি কীটপতঙ্গও বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

যক্ষ্মারোগীর বাসস্থান আলোবাতাসমুক্ত হবে। রোগীর জন্য ভাল খাদ্য, পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা প্রয়োজন। যক্ষ্মারোগীর যে সেবা করবে তারও পৃথক থাকা বাঞ্ছনীয়। তার উপযুক্ত খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যথা সময়ে B. C. G. টিকা নেওয়া প্রয়োজন। জনসাধারণকে নানাবিধ প্রচার কাজের দ্বারা এই রোগের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে।

খোস-পাঁচড়া (Scabs)।

এই রোগ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে খুব দেখা যায়। চামড়ার উপর ঘা হয়, পুঁজ জমে, সুড়সুড় করে, চুলকালেই ঘা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

রোগগ্রস্ত ছেলেটিকে আলাদা করে বসার ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ রোগটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে। রোগীর ব্যবহৃত কোন জিনিষ যেমন, জামা-কাপড়, তেল, সাবান, চিরুণী, তোয়ালে, পেন্সিল, কলম ইত্যাদি অন্য কেউ ব্যবহার করবে না। ভাল করে ক্ষত স্থান ধুয়ে মলম লাগালে তাড়াতাড়ি সেরে যায়।

দাদ (Ring-worm)।

দাদও বিশ্রী রকমের ছোঁয়াচে অসুখ। শরীরের যে কোন জায়গায় এই রোগ হতে পারে। একরকম ছত্রক জাতীয় জীবাণু থেকে এই রোগের উৎপত্তি হয়। প্রথমে একটা পয়সার মত ছোট গোলাকার রেখা চামড়ার

উপর দেখা যায়। তারপর ক্রমশঃ এই বৃত্তটি বাড়তে থাকে। ক্ষতস্থান খুব চুলকায়, চুলকালে রক্ত পড়ে। রোদ লাগলে চুলকানি বাড়ে।

রোগীকে আলাদা করে রাখতে হবে এবং রোগীর ব্যবহার্য জিনিষ অন্য কেউ ব্যবহার করবে না। রোগীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। অনেক সময় আয়োডিন লাগালে বা দাদের মলম লাগালে দাদ সেরে যায়। সবাইকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে বলতে হবে তা না হলে দাদ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকবে।

সংক্রামক ব্যাধিতে বিদ্যালয়ের সাবধানতা।

বিদ্যালয়ে অনেক সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা সংক্রামক ব্যাধি দেখা যায়। শিক্ষক এদের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করবেন। যতদিন পর্যন্ত শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ সুস্থ না হয় ততদিন সে বিদ্যালয়ে আসবে না। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার্থীরা যাতে তার সংস্পর্শে এসে অসুস্থ না হয়ে পড়ে তার জন্যই এই সাবধানতা।

সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের উপায়।

সংক্রামক ব্যাধি যখন অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তখন তা মহামারীরূপে দেখা দেয়। এই সময় বহু প্রাণহানিও ঘটে। রোগের প্রকোপ এত ব্যাপক হয় যে অনেক সময় চিকিৎসার সময় পাওয়া যায় না। তাই এইসব রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আগে থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন :

(১) **সংক্রামক ব্যাধির সংবাদ জ্ঞাপন** (Notification)।

কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব হলে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় স্বাস্থ্যবিভাগকে জানাতে হবে। স্বাস্থ্যবিভাগ খবর পাওয়ার পরই রোগের ভয়াবহতা ও প্রতিরোধের উপায় জানিয়ে স্থানে স্থানে বিজ্ঞাপন দেবেন ; এতে রোগের বিস্তৃতি সহজে বন্ধ হবে।

(২) **রোগীকে স্বতন্ত্রীকরণ** (Isolation)।

রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে গৃহে রাখলে আলাদা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। সুযোগ থাকলে রোগীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হবে। রোগীর সাথে সাধারণ লোকের মেলামেশা বন্ধ করতে হবে। রোগীর শুশ্রূষাকারীকেও

যথেষ্ট সাবধান থাকতে হবে। রোগীর বিছানাপত্র, বাসন ইত্যাদি ব্যবহার্য জিনিষপত্র জীবাণুনাশক ঔষুধ দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।

(৩) রোগ-প্রতিষেধক টিকা (Immunization)।

সুস্থ ব্যক্তির দেহে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা করা যায়। রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলেই টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। টিকা দেওয়ার পর রোগ হলেও রোগের ভয়াবহতা অনেক কমে যাবে।

(৪) পৃথকীকরণ (Quarantine)।

রোগ সংক্রমণের স্থান থেকে যদি কেউ আসে অথবা রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছে এমন কেউ যদি থাকে তবে সেই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অন্য কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া উচিত নয়।

(৫) জীবাণুনাশ (Disinfection)।

রোগীর ব্যবহৃত যাবতীয় জিনিষ জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে বিশোধন করে নেওয়া দরকার।

(৬) জনস্বাস্থ্যরক্ষামূলক ব্যবস্থা (Sanitation)।

জনস্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খেয়াল রাখতে হবে যে রোগীর মলমূত্র আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে রেখে পরে তা পুড়িয়ে ফেলা; তাছাড়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করা; খাদ্য, পানীয়, বাসগৃহ ইত্যাদি যেন রোগজীবাণু দুষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করা। এইসব ব্যাপারে সতর্ক হলে রোগের ব্যাপকতা হ্রাস পাবে।

(৭) স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি শিক্ষাদান।

স্বাস্থ্যরক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সজাগ করতে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন। এই অজ্ঞতাই অনেক সময় রোগবিস্তৃতির সহায়ক হয়। তাই জনসাধারণকে স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা দেওয়ার জন্য নানারকম আলাপ-আলোচনা, রেডিও, বক্তৃতা, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ, চলচ্চিত্র ইত্যাদির সাহায্য নিতে হবে। জনসাধারণকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে রোগের কারণ ও রোগ কিভাবে সংক্রমিত হয়। তাছাড়াও বেশীর ভাগ লোক টিকা, ইন্‌জেক্‌সান প্রভৃতি নিতে ভয় পায়; তাদের ভয় ভাঙ্গাতে হবে এবং এগুলির বিশেষ উপকারিতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধ

(Protection Against Infection)

নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়-ঝঞ্ঝা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্দৈব যেমন মানুষের কাছে ভয়াবহ, তেমনি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোগজীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মানুষের দেহই 'ব্যাধি মন্দির' অর্থাৎ রোগজীবাণুর আশ্রয়স্থল। মানুষের শরীর থেকেই বেশীর ভাগ সংক্রামক ব্যাধি সমাজের আর দশজনের মধ্যে বিস্তারলাভ করে। যেমন কলেরা, টাইফয়েড, প্লেগ, ডিপথিরিয়া, বসন্ত, হাম, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয়, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, খোস-পাঁচড়া, দাদ, কালাজ্বর ইত্যাদি খুব সহজে একদেহ থেকে অন্যদেহে সঞ্চারিত হয় ও রোগবিস্তার ঘটায়।

সংক্রামক রোগের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকে অনবরত রোগ-জীবাণু নানাভাবে বার হয়ে খাদ্য, জল ও বাতাসকে দূষিত করে। খাদ্য, জল ও বাতাসের দ্বারা রোগজীবাণু বাহির হয় ও অপরদেহে এই রোগ-জীবাণু প্রবেশ করে তাকে রোগাক্রান্ত করার চেষ্টা করে। তবে সাধারণতঃ প্রত্যেকের শরীরে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে এবং এর দ্বারাই সে ঐ জীবাণু আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু মানুষের দেহে সাধারণ-ভাবে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে তার দ্বারা সব সময় সব রোগ-জীবাণুকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলেই মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

তাই প্রত্যেক মানুষের দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য জনস্বাস্থ্য বিভাগ কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। যেমন—

(১) প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌সান (Inoculation)।

কলেরা, টাইফয়েড, ধনুষ্টঙ্কার, পলিও রোগ, ডিপথিরিয়া, প্লেগ ইত্যাদি রোগের প্রকোপকে ব্যাহত করার জন্য এইসব রোগের ভ্যাকসিন তৈরী করে ইন্‌জেক্‌সান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

কৃত্রিম উপায়ে এইসব রোগের জীবাণুকে নির্বীর্য করে প্রথমে কোন

প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে, ঐ সব প্রাণীর দেহে রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা জন্মে। পরে ঐ ভ্যাকসিন নিয়ে ইন্‌জেক্‌সান দিলে মানুষের দেহেও রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ধনুষ্টঙ্কার, ডিপথিরিয়া ইত্যাদির জীবাণু প্রথমে ঘোড়ার দেহে ইন্‌জেক্‌সান দিয়ে তারপর সেই বিষ-প্রতিষেধক উপাদান (antitoxin) মানুষের দেহে ইন্‌জেক্‌সান দেওয়া হয়। সাধারণতঃ এইসব ইন্‌জেক্‌সানের ফলে ছমাস অন্ততঃ ঐসব রোগের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এইভাগে প্লেগের প্রতিষেধক হাফকিন-সিরাম, যক্ষ্মার প্রতিষেধক বি, সি, জি, ভ্যাক্‌সিন, পলিও'র প্রতিষেধক সল্‌ক ভ্যাকসিন প্রভৃতির ইন্‌জেক্‌সান নিলে সাময়িকভাবে ঐ সব রোগের আক্রমণ এড়ানো সম্ভব হতে পারে।

(২) টিকা-গ্রহণ (Vaccination)।

বসন্ত রোগের জন্য সাধারণতঃ টিকা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রথমে গরুর দেহে বসন্ত রোগের ভাইরাস জাতীয় জীবাণুকে ঢুকিয়ে দিয়ে ভ্যাক্‌সিন তৈরী করা হয়। পরে ঐ ভ্যাক্‌সিন মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিলে মানুষের বসন্ত রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়।

সাধারণতঃ বসন্তের টিকা দিলে বসন্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়; আর যদি টিকা নেওয়ার পর বসন্ত হয় তাহলেও খুব মারাত্মক হয় না। এই টিকার প্রতিরোধ ক্ষমতা ২।৩ বৎসর থাকলেও প্রতি বছর বসন্তের টিকা নেওয়া কর্তব্য।

শিশুর জন্মের পর ১ বছরের মধ্যে প্রথম-টিকা দেওয়া আবশ্যক। টিকা নেওয়ার ক্ষতস্থান যদি লাল হয়ে ফুলে উঠে পুঁজ জমে তবে বুঝতে হবে প্রাথমিক টিকা ঠিক হয়েছে।

(৩) স্বতন্ত্রীকরণ (Segregation or Isolation)।

যে কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখা একান্তভাবে কর্তব্য। নির্দিষ্ট রোগের জন্য বিশেষ বিশেষ হাসপাতাল থাকে; রোগীকে সেই সব হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। কিন্তু যেখানে হাসপাতালের সুবিধা নেই সেখানে রোগীকে স্বতন্ত্র তো রাখতেই হবে, উপরন্তু শুশ্রূষাকারীদেরও রোগীর রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বতন্ত্র থাকতে হবে। পরে ঐ গৃহের, বিশেষ রোগীর কক্ষের সমস্ত জিনিষ সম্পূর্ণভাবে বিশোধন করে তবে অন্যদের সংস্পর্শে যেতে দেওয়া উচিত।

নির্বীজন (Disinfection)।*

নির্বীজন কাকে বলে?

প্রত্যেক সংক্রামক রোগেরই জীবাণু থাকে। এই জীবাণুগুলি মানুষের দেহে অনুকূল পরিবেশ পেলে খুব সহজে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। প্রত্যেক রোগের জীবাণু আবার রোগীর দেহ থেকে কফ, থুথু, শ্বাসপ্রশ্বাস, মলমূত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বার হয়ে এসে নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ, বাতাস, জল ইত্যাদির সাহায্যে নানাজায়গায় ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। কাজেই রোগীর মলমূত্র, কফ, থুথু ইত্যাদি থেকে রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে ফেলতে না পারলে রোগের হাত থেকে নিস্তার নেই। রোগীর ব্যবহার্য সব জিনিষকে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া কর্তব্য। রোগ নিবারণের জন্য রোগ জীবাণু ধ্বংস করে ফেলার নামই হোল নির্বীজন।

সাধারণতঃ তিনটি উপায়ে নির্বীজন করা যায়।

(১) প্রাকৃতিক পদ্ধতি।

রোগজীবাণু ধ্বংস করবার পক্ষে সূর্যালোক অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট। প্রখর সূর্যকিরণে রোগজীবাণু খুব অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এমন কি ডিপথিরিয়া, প্লেগ প্রভৃতি রোগের জীবাণুও প্রখর সূর্যকিরণে বাঁচতে পারে না। এইজন্য সাধারণতঃ রোগীর ব্যবহৃত জিনিষপত্র রোদে শুকতে দিতে বলা হয়। নির্বীজক হিসাবে কড়া রোদ খুব সহজ ও উৎকৃষ্ট।

এছাড়া মুক্ত বাতাস, নাইট্রোজেন চক্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক পদ্ধতির মধ্যে পড়ে। মুক্ত বাতাস অনেক সময় জীবাণু ধ্বংসের কাজে খুব সাহায্য করে।

আবার বায়ুশূন্য স্থানে জীবাণু বেশীদিন বাঁচতে পারে না। সাধারণতঃ ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় রোগজীবাণুর প্রকোপ কম। এছাড়াও মাটির নীচে যে সমস্ত নাইট্রোজন চক্র থাকে তাদের সাহায্যেও রোগজীবাণু ধ্বংস হয়। এইজন্য অনেক সময় সংক্রামক রোগীর ব্যবহৃত জিনিষপত্র মাটির নীচে পুঁতে ফেলা হয় ফলে স্বাভাবিকভাবেই রোগজীবাণু মরে যায়।

(২) ভৌতিক পদ্ধতি।

আগুনের সাহায্যে সব রোগের জীবাণু ধ্বংস করে ফেলা যায়। যে সব রোগের জীবাণু খুব সহজে মরে না সেগুলি আগুনে পুড়িয়ে ফেলাই

---

*Q. Describe various methods of disinfection.

নিরাপদ। যেমন কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, বসন্ত ইত্যাদি রোগীর ব্যবহৃত জিনিষ আগুনে পুড়িয়ে ফেলাই ভাল।

অনেক সময় রোগীর জিনিষপত্র আগুনে না পুড়িয়ে গরম জলে ফুটিয়ে নেওয়া হয়। গরম জলে সোডা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফোটালে হয়তো রোগজীবাণু মরে যেতে পারে তবু আগুনে পুড়িয়ে ফেলা, সব চেয়ে নিরাপদ। যেসব জিনিষ গরম জলে ফোটান যাবে না, পোড়ান যাবে না যেমন রোগীর লেপ, তোষক, বালিশ, পশমী, রেশমী জিনিষ ইত্যাদি গরম বাক্সের মধ্যে রেখে নির্বীজন করা যেতে পারে। তবে এটি ব্যয়বহুল বলে আমাদের দেশে এই পদ্ধতির প্রচলন কম।

(৩) রাসায়নিক পদ্ধতি।

(ক) চুণ—সাধারণ লোকের কাছে চুণ অতি উত্তম নির্বীজক। কারণ চুণ-এর দাম খুব বেশী নয়, এটা ব্যবহারেরও কোন অসুবিধা নেই। টাটকা চুণ জলে গুলে দিলে জল বিশোধিত হয়। ঐ জল দিয়ে রোগীর মলমূত্র, জামা-কাপড়, ঘরের দেওয়াল, মেঝে সহজে পরিষ্কার করা যায়।

(খ) কয়লা জাত—আলকাতরা থেকে তৈরী কার্বলিক অ্যাসিড, ফিনল, আইজল, সিলিন, ক্রেয়োলিন, হাইকল, লাইসল ইত্যাদি জীবাণু নির্বীজনের কাজে ব্যবহৃত হয়। ফিনল, কার্বলিক অ্যাসিডের থেকে দামে সস্তা কিন্তু জীবাণুনাশের ক্ষমতা বেশী। পায়খানা, নর্দমা ইত্যাদিতে সিলিন দিলে ভাল কারণ এর জীবাণুনাশক ক্ষমতা খুব বেশী।

আইজল, লাইসল ইত্যাদি পাঁচশ ভাগ জলে এক ভাগ ওষুধ দিলেই রোগজীবাণু ধ্বংস করতে পারে। ২০ আউন্স জলে ১ আউন্স কার্বলিক অ্যাসিড ব্যবহার করতে হয়। এটা অ্যাসিড কাজেই অসাবধানে কোথাও লেগে গেলে সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যাবে। তাই এর ব্যবহারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

(গ) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট—পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট জলে গুললে অক্সিজেন সৃষ্টি হয়; এই অক্সিজেন রোগজীবাণু নাশ করে। কিন্তু রোগীর জামাকাপড় এই জলে ধুলে একটা রঙ ধরে যাবে। তাই দূষিত জল পরিশোধনের কাজে ও রোগীর ব্যবহৃত বাসনপত্র ধোওয়ার কাজে এই ওষুধ ব্যবহার করা যায়।

(ঘ) ক্লোরিন—ব্লিচিং পাউডার জলে গুলে এর সাথে হাউড্রোক্লোরিক

অ্যাসিড মেশালে ক্লোরিন গ্যাস তৈরী হবে। জীবাণুনাশের পক্ষে ক্লোরিন খুব কার্যকরী।

(ঙ) **ব্লিচিং পাউডার**—ক্লোরিনের চেয়ে ব্লিচিং পাউডারের ব্যবহার খুব সহজ। জনবহুল জায়গায় ব্লিচিং পাউডার চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে রোগজীবাণু সেখানকার পরিবেশটি নষ্ট করতে না পারে।

(চ) **সালফার ডাই অক্সাইড**—গন্ধক পোড়ালে সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাসের সৃষ্টি হয়। ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গার পক্ষে এটা খুব উপকারী। না হলে ঘরের দেওয়ালে ও মেঝেতে জল ছিটিয়ে দিয়ে তবে গন্ধক পোড়াতে হবে। আধসের পরিমাণ গন্ধক নিয়ে, মিথিলেটেড স্পিরিট মিশিয়ে একটি পাত্রে করে পোড়ান উচিত। তারপর ঘরের দরজা, জানালা অন্ততঃ ৬ ঘণ্টা বন্ধ করে রাখা দরকার। তবে এই গ্যাসের ফলে রঙিন জিনিষ ও ধাতব জিনিষের রঙ বদলে যায়। কাজেই এই গ্যাস প্রয়োগের সময় ঘরে ওগুলি না থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ছ) **ফর্মাল ডি হাইড**—এটি বাষ্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়; সাধারণতঃ রোগীর জামাকাপড়, রেশমী ও পশমী জিনিষ, ধাতুর জিনিষ ইত্যাদি নির্বীজন করার কাজে লাগে।

(জ) **হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড**—এই অ্যাসিড থেকে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তা অত্যন্ত বিষাক্ত। প্লেগের সময় পরিত্যক্ত বাড়ীর ইঁদুরের গর্তে এই অ্যাসিড দেওয়া হয়।

(ঝ) **ফিনাইল**—এটি আলকাতরা থেকে তৈরী। বীজাণুনাশক ওষুধ হিসাবে এটি ঘর ধোয়া-মোছার সময় ব্যবহার করা হয়।

(ঞ) **লাইসল**—ফিনাইলের মতই এটি তৈরী করা হয়। এটির দামও তেমন বেশী নয়। ১০০ ভাগ জলে ২ ভাগ লাইজল দিলে নির্বীজক হিসাবে ব্যবহার করা চলবে।

(ট) **ডেটল**—ক্ষতস্থান জীবাণুমুক্ত করার জন্য আজকাল ডেটলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী।

(ঠ) **টিংচার অফ আইওডিন**—শরীরের কোথাও কেটে ছিঁড়ে গেলে এটির ব্যবহার করা হয়। আজকাল অবশ্য এটি কম ব্যবহৃত হয়; এর বদলে মারকিউরোক্রোম ২% আজকাল বেশী প্রয়োগ করা হয়।

নির্বীজন সাধারণতঃ দুই প্রকারের হতে পারে (১) সদ্য সদ্য নির্বীজন, (২) পরিশেষ নির্বীজন।

(১) **সদ্য সদ্য নির্বীজন** (concurrent disinfection)।

কোন ব্যক্তি যখন সংক্রামক রোগাক্রান্ত হয় তখন রোগীর মলমূত্র, কফ, থুথু, ব্যবহৃত বস্ত্র ও বাসনপত্র ইত্যাদির সাথে রোগজীবাণু থাকে। এইসব জিনিষ নিয়মিতভাবে নির্বীজিত না করলে সহজে রোগটা ছড়িয়ে যেতে পারে। তাই এগুলির সদ্য সদ্য নির্বীজন প্রয়োজন।

(২) **পরিশেষ নির্বীজন** (Terminal disinfection)।

রোগী আরোগ্যলাভ করলে কিংবা রোগীর মৃত্যু হলে তার ব্যবহৃত জিনিষ নির্বীজন করা দরকার। রোগীর বিছানা, কাপড়-চোপড়, বই ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলা দরকার। রোগীর ঘর চুণকাম করে ফেলতে হবে। বসন্ত, যক্ষ্মারোগ ইত্যাদির বেলায় ঘরের দেওয়াল মেঝে সম্পূর্ণ খুঁড়ে নতুন করে প্লাষ্টার করলে ভাল হয়। তবে এটা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলে সাধারণতঃ চুণকাম করেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

অতি আধুনিককালে সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসাবে একটি জীবাণুনাশক ওষুধের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।

"Another discovery of great power against infectious diseases is that of insect-killing properties of a chemical substance called D. D. T. (Dichlora Diphenyl Trichloraethane)"—I. C. Joslin & P.M. Taylor. ডি, ডি, টি, ব্যবহারের মস্ত সুবিধা হোল এটি মানুষের পক্ষে তেমন ক্ষতিকর নয় অথচ এর প্রতিক্রিয়া বেশ কয়েক সপ্তাহ থাকে।

সপ্তম অধ্যায়

জল পরিশোধন

(Purification of drinking Water)

মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে জল, বাতাস ও খাদ্য একান্ত অপরিহার্য। প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করলে মানুষের জীবনে বাতাসের পরেই জলের স্থান। সেইজন্য জলের অপর নাম 'জীবন' বলা হয়। জল আমাদের সর্বদা প্রয়োজনে লাগে। তাছাড়া আমাদের খাদ্যের শতকরা ৮৫ ভাগই জল। আমাদের শরীর গঠনেও জল একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। আমাদের দেহের উপাদানগুলির তিন ভাগের মধ্যে একভাগ জল। রক্তের উপাদানে জলীয় অংশ আছে, এমন কি অস্থি-মজ্জার ভিতরেও জল থাকে।

দেহের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত যে কর্মপ্রবাহ চলছে তার জন্য জল একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। জল শরীরের সমস্ত দূষিত জিনিষ ধুয়ে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করে।

শরীরের এই দূষিত জল প্রত্যহ ঘাম ও প্রস্রাবের আকারে বার হয়ে যায়। জলের এই অভাব পূরণ করার জন্যই আমরা জল পানীয় হিসাবে গ্রহণ করি।

জল আমাদের রক্তের তারল্য রক্ষা করে, খাদ্য পরিপাকমূলক পাচক রস তৈরী করে হজমের সাহায্য করে এবং আমাদের দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

এছাড়াও মানুষের দৈনন্দিন প্রত্যেকটি কাজের জন্য জলের প্রয়োজন। তৃষ্ণা নিবারণ, স্নান, রান্না, বস্ত্রধৌতকরণ ইত্যাদির জন্য জলের প্রয়োজন তো আছেই, উপরন্তু গো-মহিষাদির পান ও স্নানের জন্য জল, মানুষের খাদ্যশস্য উৎপাদনে জল একান্ত অপরিহার্য। জীবনধারণের পক্ষে জল এত প্রয়োজনীয় বলেই বোধ হয় সৃষ্টির আদি থেকে পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ স্থান বিশাল জলরাশিতে আচ্ছাদিত।

প্রত্যেক মানুষ কতটা জল, ব্যবহার করবে তা নির্ভর করে তার ব্যক্তিগত অভ্যাসের উপর, আবহাওয়ার উপর। সাধারণতঃ মাথাপিছু অন্ততঃ ৩০ গ্যালন জল না হলে প্রতিদিনের কাজ চলে না।

এই যে এত প্রয়োজনীয় জল এটাকে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে কিন্তু আমাদের শরীরকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। আমাদের দেশে পরিস্রুত পানীয় জলের খুব অভাব আছে। পরিস্রুত পানীয় জল প্রয়োজনের তুলনায়

অত্যন্ত অল্প। কাজেই পরিস্রুত জলের একটুও অপচয় না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। তাছাড়া অপরিষ্কার জলকে কি করে পরিষ্কার করা যায় এবং জলকে কিভাবে মোটামুটি পরিষ্কার রাখা যায় তার কথাও চিন্তা করতে হবে।

জলের প্রধান উৎস হোল সমুদ্র। সূর্যকিরণে প্রতি বর্গমাইলে, মিনিটে প্রায় ৭০০ গ্যালন জল বাষ্প হিসাবে উপরে উঠে আবার বৃষ্টি, বরফ, শিশির-বিন্দু হিসাবে ঝরে পড়ে। এই জলই আবার নদী, নালা, পুকুর ইত্যাদিতে জমে ও ভূগর্ভে সঞ্চিত হয়। এইভাবে দেখা যাচ্ছে জলের উৎস হোল তিনটি (১) বৃষ্টির জল, (২) ভূভাগের উপরিস্থিত জল, (৩) ভূগর্ভস্থ জল।

(১) বৃষ্টির জল।

সমুদ্রের জল যখন বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায় তখন জলের লবণাংশ ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ ইত্যাদি নীচে পড়ে থাকে। তাই বৃষ্টির জল হোল স্বচ্ছ জল। কিন্তু এই জল যখন পৃথিবীর বুকে নেমে আসে তখন বাতাসের অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড, কার্বলিক অ্যাসিড ও ধূলিকণার সাথে মিশে খানিকটা দূষিত হয়ে উঠে। এই বৃষ্টির জলকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পান করতে হলে প্রথম পশলা ব্যবহার না করে পরের পশলার জল ব্যবহার করা উচিত। কোন পাত্রে বৃষ্টির জল ধরে রেখে তা অনায়াসে পান করা যায়।

(২) ভূভাগের উপরিস্থিত জল।

বৃষ্টিপাতের পর এই জল, সমুদ্র, নদী, হ্রদ, দীঘি, পুকুর, খানা, ডোবা ইত্যাদিতে জমা হয়। সমুদ্র ও নদীর জল, হ্রদের জল পরিস্রুত করে সাধারণতঃ পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বড় বড় শহরের জল সরবরাহ এইভাবেই হয়ে থাকে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে নদী ও পুকুরের জলই অপরিস্রুত অবস্থায় অধিকাংশ গ্রামবাসী পান করে ও অন্যান্য কাজে লাগায়।

(৩) ভূগর্ভস্থ জল।

বৃষ্টির জলের অনেকটা অংশ মাটি, বালি কাঁকর ইত্যাদির স্তর ভেদ করে ভূগর্ভে সঞ্চিত হয়। এই জল অবশ্য ঢাল বেয়ে গড়িয়ে যাওয়ার সময় কোন ফাটল পেলে প্রস্রবণ আকারে বার হয়ে আসে। প্রস্রবণের জলে অনেক আবর্জনা, ধাতব পদার্থ ইত্যাদি থাকে বলে এই জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার না করাই ভাল। তবে ধাতব প্রস্রবণে স্নান করলে বাত ইত্যাদি অনেক রোগ নিরাময় হয়।

আমাদের দেশে পল্লী অঞ্চলে কূপ খনন করে তার জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কূপ নানা প্রকারের হতে পারে,—

(ক) অগভীর কূপ—মাটির নীচে প্রথম অশোষক স্তরের সঞ্চিত জল সাধারণতঃ অগভীর কূপের সাহায্যে ব্যবহার করা হয়। তবে অগভীর কূপের জল জীবাণুশূণ্য নয়।

(খ) গভীর কূপ—প্রথম অশোষক স্তর ছাড়িয়ে অনেক গভীরে যে জল সঞ্চিত থাকে তা গভীর কূপের সাহায্যে মানুষের পানীয় হিসাবে কাজে লাগান যায়।

(গ) নর্টনের আবিসিনিয় কূপ—সাময়িকভাবে কোন প্রয়োজন মেটানোর জন্য ২০-২৫ ফুট গভীর করে এই ধরণের কূপ খনন করা হয়। এই জল পানীয় হিসাবে নিকৃষ্ট।

(ঘ) আর্টেজীয় কূপ—যখন দুটি অশোষক স্তরের মধ্যে সঞ্চিত জল কূপ খনন করে বার করা হয়, তাকে আর্টেজীয় কূপ বলা হয়।

বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে বিচার করলে জলকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

(১) পরিস্রুত জল (purified water),

(২) মলিন জল (polluted water),

(৩) দূষিত জল (contaminated water)।

স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিচারে মলিন জল ও দূষিত জলের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়। যখন জলে নানারকম ধাতব পদার্থ মিশে জলের স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ বদলে দেয় তখন জলকে মলিন জল বলা হয়। এই জল মানুষের ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য নাও হতে পারে। কিন্তু যখন জল রোগজীবাণুর সংস্পর্শে আসে তখন সেই জলকে দূষিত জল বলা হয়। এই জল ব্যবহারের উপযোগী থাকে না।

এই দূষিত জল ব্যবহার করলে আমরা নানাপ্রকার ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারি। আমরা জলকে কেবলমাত্র পানীয় হিসাবেই ব্যবহার করি না; রান্না করা, তরকারী ধোওয়া, মাছ ধোওয়া, স্নান করা, কাপড় কাচা ইত্যাদি জন্য জল ব্যবহৃত হয়। জলকে আগুনে ফুটিয়ে নিলে এই রোগজীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়।

অনেক সময় দেখা যায় যারা অনেকদিন ধরে দূষিত জল পান করে আসছে তাদের মধ্যে একটা রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। তবে সাধারণতঃ দূষিত

জল পান করলে পেটের অসুখ, কোষ্ঠকাঠিন্য, কলেরা, আমাশয়, রাউণ্ড ওয়ার্ম, হুকওয়ার্ম, থে্রডওয়ার্ম, গিনিওয়ার্ম ইত্যাদি রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এইজন্য জল যাতে দূষিত না হয় তার দিকে নজর রাখতে হবে। মানুষের শরীর থেকে অনেক রোগজীবাণু মলমূত্রের সাথে নির্গত হয়। তাই মানুষ যাতে কূপ, পুষ্করিণী ইত্যাদির জল দূষিত না করে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পাড়াগাঁয়ে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, স্নান করা, গবাদি পশু স্নান করান, রোগীর কাপড়-চোপড় কাচা, শৌচাদি কাজ সবই এক পুকুরে হয়ে থাকে। তা না করে পানীয় জলের জন্য রক্ষিত পুকুরে অন্য কিছু না করতে দিলে রোগের হাত থেকে হয়তো খানিকটা নিস্তার পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া জল সর্বদা ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে পান করা একান্তভাবে কর্তব্য।

জল পরিশোধণের উপায় (Purification of Water)।

দুইভাবে জলকে পরিস্রুত করা যায়। যথা—(১) প্রাকৃতিক ও (২) কৃত্রিম।

(১) প্রাকৃতিক পদ্ধতি।

নদীর জল সাধারণতঃ প্রাকৃতিক উপায়ে অনেকটা বিশুদ্ধ হয়ে যায়। নানা আবর্জনাবাহী নর্দমা দিয়ে দূষিত জল যখন নদীর স্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়ে তখন স্রোতের চাপে রোগজীবাণু দুর্বল হয়ে পড়ে ও শীঘ্র মরে যায়। অনেক সময় অজৈব পদার্থ যেগুলো জলে দ্রবীভূত হয় না তা স্রোত মৃদু হলে জলের তলায় ধীরে ধীরে জমে যায়, রোগজীবাণুগুলোও ঐ সঙ্গে থিতিয়ে যায়। অতিরিক্ত বেগুনী রশ্মির সাহায্যেও জীবাণু ধ্বংস হয়। তাছাড়া মাছ, পোকামাকড় ইত্যাদি অনেক জীবাণু খেয়ে ফেলে। এছাড়া শ্যাওলা জল পরিষ্কার রাখে।

(২) কৃত্রিম পদ্ধতি।

কৃত্রিম পদ্ধতিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। (ক) ভৌতিক, (খ) রাসায়নিক ও (গ) ছাঁকন।

(ক) ভৌতিক পদ্ধতি—এর মধ্যেও আবার দুটি ভাগ দেখা যায়। (১) স্ফুটন ও (২) চোলাইকরণ।

স্ফুটন—জলকে আগুনে খুব কষে ফুটিয়ে নিলে রোগজীবাণু নষ্ট হয়ে যায়। তবে জলের অঙ্গারাম্লজান গ্যাস থাকে না। তাই ফোটান জলকে একটা

পাত্রে ঢেলে পাত্রটির মুখ কিছুক্ষণ খোলা রাখলে বাতাসের সংস্পর্শে আবার অঙ্গারাম্লজান গ্যাস জলে মিশে যায় ও জলের স্বাদ ফিরে আসে।

চোলাইকরণ—জল ফুটিয়ে বাষ্পে পরিণত করে, ঐ বাষ্পকে আবার জলে পরিণত করলে তাকে জলের চোলাইকরণ বলা হয়। লাইবিগের হিমকার যন্ত্রের সাহায্যে জলকে এইভাবে খুব সহজে চোলাইকরণ করা যায়।

(খ) রাসায়নিক পদ্ধতি।

জলের সঙ্গে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে জলকে জীবাণুমুক্ত করা যায়। যেমন—ফটকিরি, পটাশ পারমাঙ্গানেট, ক্লোরিন, চুণ ইত্যাদি দ্বারা জলকে বিশুদ্ধ করা হয়।

(গ) ছাঁকন।

জলকে ছেঁকে নিলে রোগজীবাণুগুলি আলাদা হয়ে যায়। জলকে সাধারণতঃ তিনভাবে ছাঁকা যায়। (১) বালির বিলম্বিত ছাঁকন পদ্ধতি, (২) যান্ত্রিক দ্রুত ছাঁকন পদ্ধতি, (৩) ঘরোয়া তিন ঘড়ার সাহায্যে ছাঁকন পদ্ধতি।

(১) বালির বিলম্বিত ছাঁকন পদ্ধতি।

জলের সরবরাহ যখন অনেক বেশী করতে হয় তখন নদীর জল পাম্পের সাহায্যে তুলে নিয়ে প্রায় ৪৮ ঘণ্টার মত রেখে দিলে অনেকটা ময়লা থিতিয়ে যায়। জলে ফটকিরি মিশিয়ে দিলে আরও তাড়াতাড়ি থিতিয়ে যেতে পারে। এই থিতান জল দ্বিতীয় জলাধারে বা ফিল্টার বেডে আনা হয়। ফিল্টার বেডে পর পর ৪টি স্তর সাজান থাকে। প্রথম স্তরে প্রায় ৩ ফুট মত মিহি বালি থাকে। দ্বিতীয় স্তর আধ থেকে ১ ফুট পর্যন্ত মোটা বালি দিয়ে সাজান হয়। তৃতীয় স্তরে ২ ফুট নুড়ি থাকে ও চতুর্থ স্তরে থাকে ইট। সবকটা স্তর পার হয়ে জল যখন চুইয়ে একটি পাত্রে পড়ে তখন তাতে ক্লোরিন মিশিয়ে ঘরে ঘরে সরবরাহ করা হয়। প্রথম স্তরটি ফিল্টার বেডের প্রধান স্তর। এই স্তরে বেশীর ভাগ ময়লা ও রোগজীবাণু আটকে যায়। তবে কিছুদিন পর পর যেমন ৮ সপ্তাহ পরে এই ফিল্টার বেড পরিষ্কার করে আবার নতুন করে স্তর-বিন্যাস করতে হয়।

(২) যান্ত্রিক ছাঁকন পদ্ধতি।

বালির বিলম্বিত ছাঁকন পদ্ধতির মত এই পদ্ধতিতেও নদীর জল তুলে নিয়ে ফিল্টার বেডের চারটি স্তর পার হয়ে জল নীচে জমলে একটা ছুঁচলো

মুখওয়ালা ছাঁকনীর মত পাইপের মধ্যে দিয়ে ঐ জল বার করে নিয়ে একটি ট্যাঙ্কে রেখে তাতে ক্লোরিন মিশিয়ে সরবরাহ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ফিল্টার বেডের মধ্যে দিয়ে খুব দ্রুত জল চলে যায়। মাত্র ১৫ মিনিট ছাঁকার পর যন্ত্র পরিষ্কার হয়ে যায়। ফিল্টার বেডেও শ্যাওলা জমে না। এটি উত্তম প্রক্রিয়া কারণ জল দূষিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

(৩) ঘরোয়া জল ছাঁকাপদ্ধতি।

পল্লী অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের খুব অভাব বলে চারটি কলসীর সাহায্যে জল ছেঁকে খাওয়ার রীতি আছে। একটা কাঠের মঞ্চে পর পর চারটি কলসী সাজান থাকে। কলসীর তলায় ফুটো থাকে ও তাতে খড় লাগান থাকে। প্রথম কলসীতে অপরিশ্রুত জল থাকে, দ্বিতীয়টিতে থাকে কয়লা, তৃতীয়টিতে নুড়ি ও বালি, সব শেষেরটায় থাকে পরিশ্রুত জল।

ঘরে জল ফিল্টার করার জন্য আজকাল নানারকম যন্ত্রপাতির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

বার্কফেল্ড ফিল্টার—পোরসিলিনের তৈরী লম্বা ধরণের বোতল থাকে। তাতে দুটো ভাগ থাকে। উপরের ভাগে ছোট বড় অনেক ফুটো থাকে। এই ফুটোগুলোতে ময়লা ও রোগজীবাণু আটকে থাকে। তারপর পরিষ্কার জল নীচের তলায় পড়ে, তখন ব্যবহার করা যায়।

পাস্তুর চেম্বারলেন ফিল্টার—পাস্তুর ফিল্টারের জন্য বোতলটি চীনামাটি দিয়ে তৈরী থাকে।

কাতাদিন পদ্ধতি—এইভাবে ঘরে জল পরিশ্রুত করা যায়। বালুকণা কিংবা পোরসিলিন রূপার ভিতর পুরে পুঁতির মত তৈরী করে মালার মত গেঁথে কোন পাত্রে ডুবিয়ে রাখলে তাতে জল পরিশ্রুত হয়।

অষ্টম অধ্যায়

খাদ্য

(Food)*

"Half the struggle of life is a struggle for food"— কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। আমাদের জীবন সংগ্রামের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয় খাদ্য-সংগ্রহের চেষ্টায়। অনেক সময় আমাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়— আমরা কি খাওয়ার জন্য বাঁচি, না বাঁচার জন্য খাই? খাদ্যগ্রহণ বা ভোজন আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হলেও প্রকৃতপক্ষে আমরা বেঁচে থাকার জন্যই খাদ্যগ্রহণ করে থাকি।

খাদ্য মানুষের জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ। মানবদেহকে অনেকে রূপান্তরিত খাদ্য বলার পক্ষপাতী। আমরা যা খাই তা বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে আমাদের দেহকে গঠন করে, সুঠাম ও সুন্দর করে।

খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করতে গিয়ে I. C. Joslin ও P. M. Taylor বলেছেন যে, খাদ্য আমাদের যেভাবে উপকার করে তাকে মোটামুটি পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যেমন,

(১) দেহের ক্ষয় পূরণ করে, পেশীসমূহকে সুস্থ ও সবল রাখে।

(২) দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশে সাহায্য করে।

(৩) শরীরের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করে শক্তিবৃদ্ধি করে।

(৪) শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখে।

(৫) স্বাস্থ্যসম্মত কার্যাবলীর উন্নতি সাধন করে ও পরিপাক প্রণালীর সাহায্য করে।

একটি জীবকোষ হিসাবে প্রত্যেক জীবের জন্ম হয় মাতৃজঠরে। এই সময় থেকেই একের পর এক কোষসৃষ্টির দ্বারা জীবের বৃদ্ধি ও বিকাশ চলতে থাকে। প্রায় ২৪।২৫ বছর পর্যন্ত এই বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। এই বৃদ্ধির পিছনে কার অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে? নিঃসন্দেহে বলা যায় খাদ্যের। তাছাড়া আমরা দেখি মানবদেহ অসংখ্য কলকব্জার সমষ্টি আর তারা আমৃত্যু একটানা কাজ করেই চলেছে। দেহের অভ্যন্তরে থেকে হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সর্বদাই কাজ করছে। এই

---

* Q. What is the need of food for human body?

অবিরাম কাজের ফলে দেহকোষগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পেশীগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই ক্ষয়পূরণের জন্য চাই খাদ্য।

আমাদের দেহযন্ত্রের ইঞ্জিনকে টেনে নিয়ে যেতে হলে শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তির উৎস কোথায়? খাদ্যের মধ্যে উৎস নিহিত আছে। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তা পরিপাক হয়ে শরীরে তাপ সৃষ্টি করে; এই তাপই আমাদের শক্তি জোগায়।

তাছাড়া আছে নানাপ্রকার ব্যাধির প্রকোপ। আমরা সামান্যতম অসাবধান হলেই নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। এই রোগ থেকে আমাদের আরোগ্যের পথে নিয়ে যাবে কে? খাদ্য। অনেকে হয়তো বলবেন, বিংশ শতাব্দিতে রোগ সারাবার ভাবনা কি? ডাক্তার আছে, নানারকম ওষুধ আছে তাতেই রোগ সারবে। কথাটির মধ্যে হয়তো আংশিক সত্য আছে কিন্তু পূর্ণ সত্য নেই। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে 'Food cures more than doctors'—ডাক্তারদের চেয়ে পথ্য অনেক বেশী উপকারী। তবে আমাদের জানতে হবে কখন কি পথ্য গ্রহণ করব। এক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রবচনটিও প্রনিধানযোগ্য—

"বিনপি ভেষজৈ ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
ন তু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥

অর্থাৎ ওষুধ ব্যতীত কেবল পথ্যের দ্বারাই রোগ আরোগ্য হতে পারে। কিন্তু পথ্য ব্যতীত শত ওষুধেও রোগ আরোগ্য হয় না। কাজেই অতি আধুনিক যুগেও খাদ্যকে আমরা কোন ভাবেই উপেক্ষা করতে পারছি না।

কিন্তু আমাদের জীবনের পক্ষে এই যে অতি প্রয়োজনীয় বস্তু খাদ্য, তার সম্বন্ধে আমরা অনেকে উদাসীন। কেবল মাত্র উদাসীন নই, আমরা অনেকে আবার খাদ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাও পোষণ করি।

বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ ও দেহের উপর তাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা থাকে না বলেই এই বিভ্রান্তি। এদেশে সাধারণতঃ চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ ছাড়া খাদ্য সম্বন্ধে কারুর মাথাব্যাথা নেই। সাধারণ লোকের মধ্যে খাদ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই নেই। অথচ আমরা জানি খাদ্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিতকরণের কতখানি প্রয়োজন।

আমরা সাধারণতঃ খাদ্য পেলেই গ্রহণ করি। খাদ্য হিসাবে আমাদের যা জোগাড় হয় সেটা কিভাবে গ্রহণ করব তা আমরা চিন্তা করি না।

কিন্তু খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকলে খাদ্যটা অন্ততঃ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা করব।

অনেক মায়েদের বিশ্বাস যে শিশু যতবেশী খাদ্য গ্রহণ করবে সে তত হৃষ্টপুষ্ট হবে। কিন্তু কেবল গুরুভোজন করলেই শরীরের পুষ্টি হবে না, সেটি ভালভাবে হজম হওয়া ও শরীরের কাজে লাগা চাই। অনেকে আবার বলেন, কেবল মাছ-মাংস বেশী করে খেলেই শরীর ভাল হয়; এ ধারণাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। মাছ, মাংস শরীরের পক্ষে ভালো কিন্তু তাই বলে বাঙালীর সাধারণ খাদ্যে কোন পুষ্টিকর উপাদান নেই এ ধারণা ভুল। আজকালকার ছেলেমেয়ের মধ্যে শাকসব্জি ও তরকারীর প্রতি যতই বীতরাগ দেখা যাক না কেন, 'ও সব বাজে জিনিষ' বলে যতই উড়িয়ে দিক না কেন, এগুলির খাদ্যমূল্য নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু নয়। স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে সবরকম খাদ্যই একান্ত আবশ্যক।

খাদ্যের উপাদান (Ingridients of Food)।*

এখন দেখা যাক খাদ্যের মধ্যে কি কি উপাদান আছে। খাদ্যদ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণের পর দেখা যায় যে শরীর গঠনোপযোগী ছয়টি উপাদান এতে আছে।

১। প্রোটিন—(Protein)। ২। শ্বেতসার ও শর্করা—(Carbohydrates)। ৩। স্নেহজাতীয় পদার্থ—(Fat)। ৪। বিভিন্ন ধাতব লবণ—(Mineral Substance)। ৫। ভিটামিন—(Vitamin)। ৬। জল—(Water) ও বাতাসের অক্সিজেন যা জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য।

খাদ্যের প্রত্যেকটি উপাদানের গুণাগুণ বিভিন্ন। এখন এক এক করে এগুলি আলোচনা করা যাক।

প্রোটিন (Protein)।

খাদ্যের উপাদানগুলির মধ্যে প্রোটিনকে শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধনের জন্য উপযুক্ত মনে করা হয়। তাই প্রোটিন সম্বলিত খাদ্যকে দেহসংগঠক ও দেহসংরক্ষক খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। আমাদের দেহ অসংখ্য কোষের

Q. What are the ingridients of food ?

সমষ্টি। খাদ্যের প্রোটিন উপাদানই জীবকোষের প্রধান উপাদান। এইজন্য প্রোটিনকে দেহনির্মাণের ইষ্টকস্বরূপ মনে হয়। আমাদের দেহের মধ্যে যে ক্রমাগত ক্ষয়কার্য চলে তা প্রোটিনের সাহায্যে পূরণ হয় এবং মানুষ অকালে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

প্রোটিনকে সাধারণতঃ আমিষ জাতীয় খাদ্য বলা হয়। প্রোটিন জাতীয় খাদ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণও যথেষ্ট আছে। তাই একে nitrogenous foodও কেউ কেউ বলেন। প্রোটিন জাতীয় খাদ্য থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরী হয়। এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিই দেহের মেটাবলিজম তৈরী করে অর্থাৎ দেহের ভিতরকার পুষ্টিকর উপাদানগুলির পরিবর্তন ঘটিয়ে দেহের তাপ-সংরক্ষণ করে। প্রোটিনের সাহায্যে দেহের তাপ-সংরক্ষণ, ক্ষয়পূরণ, পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন হয়; যুগপৎ চারটি কাজ চলে বলেই বোধহয় 'প্রোটিন' অর্থাৎ খাদ্যের মধ্যে প্রধান এই নামকরণ হয়েছে।

প্রোটিন জাতীয় খাদ্য আবার দুরকমের হতে পারে। (১) প্রাণীজ প্রোটিন ও (২) উদ্ভিজ্জ প্রোটিন।

(১) প্রাণীজ প্রোটিন।

এই জাতীয় প্রোটিন সাধারণতঃ মাছ, মাংস, ডিম, লিভার, যকৃত, দুধ, ছানা, পনির ইত্যাদিতে থাকে অর্থাৎ যে প্রোটিন আমরা প্রাণীদেহ থেকে পাই তাকেই প্রাণীজ প্রোটিন বলে।

(২) উদ্ভিজ্জ প্রোটিন।

সিম, মটরশুঁটি, বাদাম, ডাল, গম, যব, সয়াবিন ইত্যাদির মধ্যে প্রচুর প্রোটিন আছে। এর সবগুলিই আমরা উদ্ভিদ জগতের কাছ থেকে পাই। তবে এই প্রোটিন প্রাণীজ প্রোটিনের থেকে নিম্নশ্রেণীর প্রোটিন।

শরীরে প্রোটিনের অভাব হলে যেমন অপুষ্ট ও রুগ্ন হয়, ওজন কমে যায়, খিটখিটে মেজাজ হয়ে যায় আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রোটিনজনিত খাদ্য খাওয়াও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য শরীরের মধ্যে দূষিত পদার্থ সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় মাথাধরা, বাত ইত্যাদি রোগও দেখা যায়।

শ্বেতসার বা কার্বোহাইড্রেট।

বাতাসের হাইড্রোজেন, কার্বলিক অ্যাসিড গ্যাস, সূর্যের কিরণ, উদ্ভিদের

পাতার ক্লোরোফিল—এই চারটি পদার্থের সংমিশ্রণে, উদ্ভিদের ভিতরে এক রকম দানাদার পদার্থের সৃষ্টি হয়, একেই শ্বেতসার বলা হয়। প্রত্যেক দানাদার পদার্থের একটি করে পাতলা আবরণ থাকে যাকে সেলুলোজ বলে। গরম জলে উদ্ভিদের সেলুলোজটি সহজে ফেটে যায় ও ভিতরকার শ্বেতসার সহজে সিদ্ধ হয়ে যায়।

শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের কর্মশক্তি বাড়ে ও মানব-দেহের তাপ সংরক্ষিত হয়। দৈহিক পরিশ্রম করে যারা তাদের পক্ষে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য খুব প্রয়োজনীয়। অনেক সময় দেখা যায় যারা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য অধিক পরিমাণে গ্রহণ করে তাদের অম্লরোগ দেখা যায়। শ্বেতসার খাদ্য গ্রহণ করলে খাদ্যের সমতা বজায় থাকে ও অম্লাধিক্য নষ্ট হয়। সেইজন্য শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে প্রোটিন বাঁচোয়া খাদ্য বলা হয়।

ভারতের মত গরীব দেশের মানুষ সাধারণতঃ প্রোটিন বেশী খেতে পারে না, কারণ প্রোটিন খাদ্য ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু প্রোটিন অল্প খেয়ে ও শ্বেতসার বেশী খেয়ে একজন মানুষ সুস্থ শরীরে অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে। কার্বোহাইড্রেট খাদ্য পরিপাক হয়ে শর্করায় রূপান্তরিত হয় এবং রক্তের সাথে মিশে রক্তের ক্ষারত্ব বজায় রাখে। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের চাহিদা হল ৫০০ গ্রাম।

কার্বোহাইড্রেট হল উদ্ভিজ্জ খাদ্য উপাদান। কার্বোহাইড্রেটকে দুই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। (১) শর্করা জাতীয়, (২) শ্বেতসার জাতীয়।

শর্করা জাতীয় হোল নানাপ্রকার ফল, ইক্ষু, বীট, মধু, দুগ্ধ ইত্যাদি। আর ভাত, রুটি, চিড়ে, আলু. আটা, বাজরা, ভুট্টা ইত্যাদি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের মধ্যে পড়ে।

স্নেহজাতীয় খাদ্য।

শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের মত স্নেহজাতীয় খাদ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আছে। কিন্তু এই খাদ্যে কার্বনের তুলনায় অক্সিজেন কম থাকে। স্নেহজাতীয় খাদ্যের স্নেহকণা, গ্লিসারিণ, ষ্টিয়ারিক অ্যাসিড ও ওলিক অ্যাসিড-এর সংমিশ্রণে তৈরী হয়। সমস্ত রকম স্নেহজাতীয় খাদ্যে স্নেহ উপাদান সমান-ভাবে থাকে না। যেমন শূকরের গলা চর্বিতে শতকরা ১০০ ভাগ স্নেহপদার্থ থাকে কিন্তু মাখনে শতকরা ৮৫ ভাগ স্নেহপদার্থ থাকে বাকিটা থাকে জল।

সাধারণতঃ স্নেহজাতীয় খাদ্যকে তৈলজাতীয় খাদ্যও বলা হয়। এই তৈলজাতীয় খাদ্য আমাদের কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে ও শরীরের তাপ সংরক্ষণ করে। সেইজন্য শীতপ্রধান দেশের মানুষ তৈলজাতীয় খাদ্য অধিক পরিমাণে গ্রহণ করে। বিশেষ করে শীতপ্রধান দেশে যারা শারীরিক পরিশ্রম বেশী করে, তাদের পক্ষে স্নেহজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন আরও বেশী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রত্যেক মানুষের ৩।৪ আউন্স মত স্নেহপদার্থ হলেই চলে।

স্নেহজাতীয় পদার্থ একদিকে যেমন খাদ্যগুলিকে পরিপাক করতে সাহায্য করে তেমনই মানবদেহের কলকব্জাগুলিকে সচল রেখে স্নায়ু গঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করে। স্নেহপদার্থ খাদ্যের এ, ডি, ই, ও, কে জাতীয় উপাদানকে দ্রবিভুত করতে সাহায্য করে। স্নেহপদার্থের অভাব হলে গায়ের চামড়া শুকনো ও খসখসে হয়ে যায়; নানাপ্রকার চর্মরোগ দেখা দেয়।

স্নেহজাতীয় পদার্থকেও মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা কঠিন ও তরল। স্নেহপদার্থ আবার উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ হতে পারে। নানাপ্রকার তৈলবীজ থেকে উৎপন্ন স্নেহপদার্থ দেখা যায় উদ্ভিজ্জ ও তরল। যেমন সরিষার তেল, তিল তেল, নারিকেল তেল, বাদাম তেল। আবার ঘৃত, মাখন, চর্বি, মাছের তেল ইত্যাদি প্রাণীজ ও কঠিন স্নেহপদার্থ।

বিভিন্ন ধাতব লবণ।

এগুলি ছাড়া খাদ্যের মধ্যে আছে অসংখ্য ধাতব লবণ। দেহ গঠনের পক্ষে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, আইওডিন, সোডিয়াম একান্ত অপরিহার্য। দন্ত ও অস্থি গঠনে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস খুব উপযোগী। দুধ, ছানা, পনির, চাল, গম, টাট্কা সব্জি ও তরকারী, ছোট মাছ, ডিমের কুসুম ইত্যাদির মধ্যে লবণ জাতীয় উপাদান থাকে। ফসফরাস ও ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস হচ্ছে দুধ; ডিমের কুসুমেও এই দুটি উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। সোডিয়াম বললে সাধারণতঃ দৈনন্দিন ব্যবহারের লবণকেই বোঝায়। উদ্ভিজ্জ খাদ্যে সোডিয়াম বেশী থাকে না, বরং প্রাণীজ খাদ্যে বেশী থাকে। সোডিয়াম শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজে সাহায্য করে ও পেশীগুলিকে সতেজ সবল রাখে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধে সোডিয়াম আছে।

সবরকম শাকসবজি, আলু ইত্যাদির মধ্যে পটাসিয়াম থাকে।

পটাসিয়ামের অভাবে শ্বাসকার্য বাধা পায়, স্নায়ু দুর্বল হয় ও চর্মরোগের আশঙ্কা দেখা দেয়।

আইওডিন সাধারণতঃ বীট, ফুলকপি, শালগম, কডলিভার অয়েল, সমুদ্রের মাছ, বেগুন, রসুন প্রভৃতির মধ্যে থাকে। আইওডিনের অভাবে গলগণ্ড হয়। আইওডিনের অভাবে মানুষ নিস্তেজ হয়ে পড়ে, দেহ, মনের অবসাদ আসে।

কোকো, পীচফল, ডুমুর, ডাল, চকোলেট, মটরশুঁটি, নারকেল, টম্যাটো, ওটমিল, আলুবোখরা ইত্যাদির মধ্যে লৌহ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। লৌহের অভাবে শরীরে রক্তাল্পতা রোগ দেখা দেয়। শরীরের দেহকোষ গঠনেও লৌহ সাহায্য করে। লৌহের অভাব ঘটলে রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা কমে যায় এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে আসে; শরীরের পুষ্টি ব্যাহত হয়।

ভিটামিন।*

খাদ্যের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে অদৃশ্য ভাবে। ঐ পদার্থগুলি আকারে অত্যন্ত ছোট হলেও মানবজীবনের উপর এদের প্রভাব অসামান্য। আমাদের জীবনধারণের পক্ষে এগুলি একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সূক্ষ্ম পদার্থগুলিই ভিটামিন নামে পরিচিত। দেহে প্রাণ না থাকলে যেমন আমাদের কাজ করার কোন ক্ষমতা থাকে না, তেমনি খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন না থাকলে এই খাদ্য মানুষের তেমন উপকারে আসে না। খাদ্যের মধ্যে ভিটামিনগুলি প্রধান প্রযোজনীয় বস্তু, সেইজন্য ভিটামিনের অপর নাম খাদ্যপ্রাণ।

সুস্থ শরীরে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে হলে যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি এই খাদ্য ভিটামিনযুক্ত হওয়া একান্ত অপরিহার্য। মানুষের অস্থি, দাঁত, স্নায়ু, তন্তু, চামড়া ইত্যাদির যথাযথ পুষ্টির জন্য ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া ভিটামিন রক্তের মধ্যে উপাদানগুলির সমতা রক্ষা করে ও ভিটামিনগুলি বিভিন্ন ধাতব লবণের সহযোগিতায় খাদ্যকে পরিপাক করে। খাদ্যের মধ্যে ভিটামিনের অভাব হলে মানুষ কোন না কোন পীড়ায় আক্রান্ত হয়। এ পীড়াগুলিকে ভিটামিনের অভাব-জনিত পীড়া বলা হয়।

* Q. Why is vitamin element so very important in our food ?

যেমন—রিকেট, স্কার্ভি, বেরিবেরি প্রভৃতি রোগকে অভাবজনিত রোগ (deficiency disease) বলা হয়।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণগুলি উদ্ভিদ থেকেই আসে ও প্রাণীদেহে সঞ্চারিত হয়। একটি ভিটামিন কেবল সূর্যের অতিরিক্ত বেগুনী রশ্মির (ultra-violet ray) সাহায্যে মানুষের শরীরের মধ্যে সৃষ্টি হয়। জীবদেহে ভিটামিন সাধারণতঃ তৈরী হয় না, কিন্তু ভিটামিন সঞ্চয় করে রাখার ক্ষমতা জীবদেহের আছে। এই সঞ্চিত ভিটামিন খরচ না হওয়া পর্যন্ত অভাব-জনিত রোগ হয় না।

সাধারণতঃ শহরের মানুষের খাদ্যে ভিটামিন কম থাকে। গ্রামের মানুষের খাদ্যের মধ্যে থাকে ঢেঁকিছাঁটা চাল, ক্ষেতের সতেজ তরকারী, পুকুরের টাট্‌কা মাছ, গরুর খাঁটি দুধ। আজকাল অবশ্য সবগুলিই রূপকথায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। তবুও আলোবাতাসযুক্ত খোলা জায়গায় অধিকাংশ সময় খালি গায়ে গ্রামের মানুষ বেশীরভাগ সময় কাজ করে, ফলে সূর্যকিরণের সাহায্যে বেগুনি রশ্মি গ্রামের মানুষের দেহে বেশী তৈরী হয়। তাই দেখা যায় গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য শহরের মানুষের স্বাস্থ্যের চেয়ে অনেক ভাল ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশী।

বিভিন্ন খাদ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভিটামিন আছে। আবার কোন কোন খাদ্যে একাধিক ভিটামিনও থাকতে পারে। ভিটামিনকে প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়। (১) ভিটামিন 'এ', (২) ভিটামিন 'বি', (৩) ভিটামিন 'সি', (৪) ভিটামিন 'ডি'। এছাড়া ভিটামিন 'ই', 'কে', 'জি', 'এইচ', 'পি' ইত্যাদি আরও কয়েকটি ভিটামিন আছে।

ভিটামিন 'এ'—ভিটামিন 'এ' র আর এক নাম হোল ক্যারোটিন। এই ভিটামিন আমাদের শরীরের বৃদ্ধির জন্য দায়ী থাকে। এর অভাবে অস্থি ও দাঁতের পুষ্টি ভালভাবে হয় না। এই ভিটামিন রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। এটির অভাবে চামড়ার রোগ, রাত্রান্ধতা, চোখের মধ্যে ফুস্কুড়ি ওঠা ও চোখের দৃষ্টি শক্তি কমে যাওয়া, নাক, গলা ও ফুস্‌ফুসের রোগ দেখা দিতে পারে। 'এ' ভিটামিন—গাজর, পালংশাক, অন্যান্য শাকসব্জি, টাটকা সবুজ তরকারি, আঙ্গুর, টম্যাটো, ঘি, দুধ, মাখন, যকৃৎ, ডিমের কুসুম, কডলিভার তেল ইত্যাদির মধ্যে আছে।

ভিটামিন 'বি'—ভিটামিন "বি" আবার বি$_১$, বি$_২$, বি$_৩$ ইত্যাদিতে

বিভক্ত। এই ভিটামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগ দেখা দেয়। দক্ষিণ ভারতে ও জাপানে এই রোগের প্রকোপ বেশী; এখানকার অধিবাসীরা অতিরিক্ত মার্জিত চাল খায়। ঢেঁকিছাঁটা চালে এই ভিটামিন খুব বেশী পরিমাণে থাকে। ভিটামিন 'বি' শরীর পুষ্ট করে, স্নায়ুর শক্তি বাড়ায়, হজমে সাহায্য করে। চালের খোসা, যাঁতাভাঙ্গা আটা, সয়াবিন, সিম, পালং শাক, ওটমিল, ডাল, বাদাম, মেটলে, বাঁধাকপি, ডিমের শ্বেতাংশ, দুধ, অঙ্কুরিত ছোলা ইত্যাদির মধ্যে ভিটামিন 'বি' থাকে।

ভিটামিন 'সি'—ভিটামিন 'সি' স্কার্ভি নামক একপ্রকার চর্মরোগ-নিরোধক। এই রোগে শরীরের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, দাঁতের মাড়িতে ঘা হয়, গাঁটগুলো ফুলে উঠে ও হাড়ের মধ্যে যন্ত্রণা হয়। টাট্‌কা ফলমূল ও সব্জির অভাব হলে এই রোগ হয়। লেবু, কমলালেবু, টম্যাটো, আঙুর, জাম, পালং শাক, আমলকী, আনারস ইত্যাদির মধ্যে 'সি' ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে।

ভিটামিন 'ডি'—ভিটামিন 'ডি'র অভাবে রিকেট রোগ হয়। এই রোগে হাড়গুলির যথেষ্ট পুষ্টি হয় না। কাজেই হাড়গুলি ক্রমশঃ নরম হয়ে বেঁকে যায়; হাঁটার সহজ ভঙ্গী নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া মানুষের দাঁতের পুষ্টি ও স্থায়িত্ব ভিটামিন 'ডি'র উপর নির্ভর করে। কডলিভার, হ্যালিকট-লিভার, শার্কলিভারের তেল-এ সবচেয়ে বেশী ভিটামিন 'ডি' থাকে। এছাড়া ইলিশ মাছ, ডিমের কুসুম, আচার, বড়ি, দুধ ও রৌদ্রপক্ক ফলে এই ভিটামিন বেশী থাকে।

এছাড়াও অন্যান্য ভিটামিন যেমন 'ই', 'কে', 'জি', 'এইচ', 'পি', ইত্যাদিও আমাদের কাছে নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। এইসব ভিটামিনের অভাবে প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়, কেটে গেলে রক্ত সহজে বন্ধ হতে চায় না। ভিটামিন 'ই' যুক্ত খাদ্য খেলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, ডায়াবেটিস্ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়; দেহের রক্তের চাপ কমায় ও অকালবার্ধক্যের হাত থেকে রক্ষা করে।

ভিটামিন 'কে' শরীরের পিত্তনাশ করে। চাল, আটা, বাজরা ও সবুজ তরকারীতে ভিটামিন 'কে' থাকে। ভিটামিন 'পি'র অভাবে শরীরের রক্ত জমাট বেঁধে যায় ও হৃদপিণ্ডের কাজ ব্যাহত হয়। ভিটামিন 'ই' ও 'পি' এক সঙ্গে খেলে প্রাথমিক স্তরের থ্রম্বোসিস রোগ খানিকটা কমে। আজকাল

তাই ভিটামিনকে আলাদা করে নিয়ে মনুষ্যদেহে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ভিটামিন 'এ' 'ডি' 'ই' 'কে' তৈল জাতীয় জিনিসে গলে যায় আবার ভিটামিন 'বি' 'সি' 'পি' ইত্যাদি জলে গলে যায়।

জল বা জলীয় খাদ্য।

আমরা সাধারণতঃ যে খাদ্য গ্রহণ করি তাতে অনেকটা জলও থাকে। জলীয় খাদ্য বা জল ছাড়া কোন প্রাণীই বাঁচতে পারে না। পানীয় জল ছাড়া দুধ, ফলমূল, তরকারীতেও জলের পরিমাণ কম নয়।

আমাদের দেহের ওজনের তিনভাগের দুভাগই জল। দেহে জল আছে বলেই দেহকোষগুলি সজীব থাকে। রক্তে জল আছে বলে রক্তের তারল্য বজায় থাকে। কাজেই জলের অভাবে মাংসপেশী ও স্নায়ুগুলি দুর্বল হয়ে পড়বে, রক্ত ঘন হয়ে চাপ বৃদ্ধি করবে, হজম শক্তির ব্যাঘাত ঘটবে, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি রোগ দেখা দেবে।

কাজেই পিপাসা না থাকলেও শরীরের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে প্রচুর জল পানীয় হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

প্রত্যেক মানুষের প্রতিদিন ২½ কেজি জল পান করা কর্তব্য।

শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় জল আমরা পানীয় জল ছাড়াও অন্যান্য খাদ্যবস্তু থেকে পাই। টাটকা ফলে জলের পরিমাণ অনেক থাকে। ভাপে সিদ্ধ মাছ, তরকারীতেও শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জল বর্তমান। পনীর, আপেল, ডিম, আলু, কমলা, কলা, গাজর, লেটুস শাক, টম্যাটো, সিম ইত্যাদিতেও প্রচুর জল আছে। এইসব খাদ্য নিয়মিতভাবে গ্রহণ করলে আমাদের শরীরের জলের অভাব অনেকটা দূর হবে।

সুষম খাদ্য (Balanced Diet)।*

মানবদেহকে সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম রাখতে হলে আমাদের খাদ্য গ্রহণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। খাদ্যের সাহায্যেই দেহের বৃদ্ধি, পুষ্টি, তাপসৃষ্টি, ক্ষয়পূরণ, জীবনীশক্তি সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজগুলি সম্পন্ন হয়। কাজেই স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের পূর্বাহ্নেই

---

* Q. What do you understand by the term balanced diet ? Describe the composition of balanced diet for a normal healthy person ? How does it compare with the ordinary diet of the ordinary school child in Bengal ?

খাদ্য পরিকল্পনা রচনা করা দরকার এবং এই পরিকল্পনাটি নিখুঁত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। খাদ্যের অনেকগুলি উপাদান আছে আমরা জানি এবং এগুলি প্রত্যেকটিই আমাদের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। কাজেই খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করার সময় এই উপাদানগুলির সুষম বণ্টন প্রয়োজন। খাদ্যের উপাদানগুলিকে যদি পরিমিতভাবে আমরা খাদ্যের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করি ও সেই খাদ্য যদি আমাদের দেহযন্ত্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তবেই তাকে আমরা সুষম খাদ্য বলব।

সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করার আগে অবশ্য আমাদের জানা উচিত একজন ব্যক্তির দৈহিক পুষ্টি, তাপশক্তি ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য কি পরিমাণ তাপমূল্যের খাদ্য প্রয়োজন। তাপমূল্য অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, দেহের গঠন ও ওজন, শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

বেশী পরিশ্রম যারা করে তাদের বেশী তাপমূল্যের খাদ্যের প্রয়োজন। একজন স্বাভাবিক পরিশ্রমী লোকের প্রায় দৈনিক ৩০০০ ক্যালোরী তাপমূল্যের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এই ৩০০০ ক্যালোরী তাপমূল্য পাওয়ার জন্য আমাদের খাদ্যের মধ্যে দিয়ে যে উপাদানগুলি পাওয়া উচিত তা হোল—

প্রোটিন—১০০ গ্রাম,
কার্বোহাইড্রেট—৪০০-৫০০ গ্রাম,
স্নেহপদার্থ—১০০ গ্রাম,
বিভিন্ন ধাতব লবণ—৩০ গ্রাম,
জল—৪-৪$\frac{১}{২}$ পাইন্ট,
এবং ভিটামিন—পরিমাণ মত।

আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ঘরের খাদ্যের মধ্যে দেখা যায় অধিকাংশই কার্বোহাইড্রেট জাতীয়। প্রোটিন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলে প্রোটিনের মাত্রা কম। ডালের মধ্যে দিয়ে কিছু উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পাওয়া যায় বটে তবে তা প্রাণীজ প্রোটিনের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আমরা জানি দেহধারণের উপযোগী নানা খাদ্যোপাদান বহুবিধ খাদ্যের মধ্যে ছড়ান আছে। কাজেই একটি আদর্শ খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করতে গেলে নানা প্রকার খাদ্য তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত।

তাছাড়া প্রতিদিন যদি আমরা একই খাদ্য খাই তাহলে দু'দিন পরে আহারে অরুচি দেখা দেবে। কাজেই খাদ্য-পরিকল্পনার মাধ্যমে ভোজ্য-বস্তুর অদল-বদল করে বৈচিত্র্য আনা যেতে পারে। প্রত্যেক খাদ্যের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে খাদ্যগুলিকে মিলিয়ে মিশিয়ে খেলে তবেই খাদ্যের উপাদানগুলির ক্ষমতা রক্ষা করা যাবে।

কোন খাদ্যই একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য নয়, কারণ সবগুলি খাদ্যোপাদান সাধারণতঃ একটি খাদ্যের মধ্যে দেখা যায় না। কাজেই প্রত্যেকটি খাদ্যের পরিপূরক হিসাবে অপর খাদ্য গ্রহণ করতে হয়।

আমাদের দেশের একজন সাধারণ পরিশ্রমী মানুষের সুষম খাদ্য-তালিকার মধ্যে কোন কোন খাদ্য কি পরিমাণে থাকা উচিত তার একটি ছক করা যেতে পারে।

খাদ্য উপাদান	খাদ্যদ্রব্য	দৈনিক পরিমাণ	তাপমূল্য
উৎকৃষ্ট প্রাণীজ প্রোটিন	মাছ	৪ আউন্স	১০০
	দুধ	১২ "	২১০
নিকৃষ্ট উদ্ভিজ্জ প্রোটিন	ডাল	৪ "	৪০০
শ্বেতসার	চাল	৮ "	৮৭৩
	আটা	৬ "	৫৯৪
স্নেহপদার্থ	তেল, ঘি	৩ "	৭৮৩
ভিটামিন ও খনিজ লবণ	ফল ও শাক সবজি	৬ "	১৬৯
জল	—	৩ পাইণ্ট	—

মোট ক্যালোরী ৩১২৯

তবে ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন অনুসারে এই তালিকার কিছু অদল-বদল হতে পারে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে প্রত্যেক্যের খাদ্যের পরিমাণ যতটা হওয়া উচিত এবং গুণ হিসাবেও দেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ, উৎপাদন ইত্যাদির জন্য সব রকম খাদ্য সুষম খাদ্যের তালিকায় স্থান পাওয়া উচিত।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কেবল মাত্র সুষম খাদ্য গ্রহণ করলেই চলবে না, খাদ্যদ্রব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। যাতে মুখগহ্বরে

নাসারন্ধ্র ও চর্মপথে কোন রোগজীবাণু আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। খাদ্য গ্রহণ ঠিকমত করতে হলে কতকগুলি বিধি আমাদের মেনে চলা কর্তব্য। যেমন—

(১) **নিয়মিত সময়ে পরিমিত আহার**—প্রতিদিন একই সময়ে খাবার খেলে নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের শরীরের মধ্যে পাচক রস নির্গত হয় ও হজমের কোনো ব্যাঘাত হয় না। খেতে ভাল লাগছে বলে খুব বেশী খেলেও হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে।

(২) **বাসি, ঠাণ্ডা ও আ-ঢাকা খাবার খাওয়া**—বাসি, ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত নয়, খেতেও খুব রুচি হয় না। আ-ঢাকা খাবারের মধ্যে দিয়ে রোগ জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

(৩) **অপরিষ্কার স্থানে অপরিষ্কার বাসনে খাওয়া**—হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদিতে খাবার অনেক সময় উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন থাকে না। খেতে সুস্বাদু হবে বলে নানারকম মশলা, তেল ইত্যাদি দিয়ে মুখরোচক করে তোলা হয়। তাছাড়া বাসনপত্র ঠিকভাবে মাজা বা ধোওয়াও হয় না। কাজেই এইসব স্থানে খাওয়া অধিক পরিমাণে বর্জন করা উচিত।

(৪) **কোন উচ্ছিষ্ট খাবার না খাওয়া**—উচ্ছিষ্ট খাবারের মধ্য দিয়ে একজনের অসুখ অপরের শরীরে খুব সহজে সংক্রমিত হতে পারে।

(৫) **কোনো নোংরা পাচকের** অথবা ঝি **চাকরের হাতে** খেতে নেই। তারা সাধারণতঃ অজ্ঞতাবশতঃ খাদ্য প্রস্তুতে ও খাদ্য পরিবেশনে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে না।

(৬) **বাজারের খোলা জিনিষ** মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

(৭) **ভাল করে না ধোওয়া**, পোকা ধরা; পচা কোনো খাদ্য একেবারেই গ্রহণ করা উচিত নয়। এরূপখাদ্য উপকারের পরিবর্তে অপকারই করে থাকে।

তাছাড়া ও খাদ্য গ্রহণের সময় মনে রাখতে হবে যে কেবলমাত্র মুখোরোচক করার জন্য খাদ্যের উপাদানগুলো নষ্ট না হয়ে যায়। অনেকে ভাজা খাবার বেশী পছন্দ করেন, কিন্তু এতে দেখা যায় ভাজতে গিয়ে খাদ্যের

বহু মূল্যবান উপাদান অনেক কমে গেছে। সেইজন্য খাদ্য (যেগুলি সম্ভব) কাঁচা ও সিদ্ধ খেলে ভালো হয়।

বিদ্যালয়ের সাধারণ ঘরের শিশু।

বিদ্যালয়ের সাধারণ গৃহের শিক্ষার্থীর সংখ্যাই খুব বেশি। তাছাড়া আছে অতি গরীব ঘরের শিশু। তারা যথোপযুক্ত তাপবিশিষ্ট ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। সুষম খাদ্যও তারা গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না, ফলে তাদের মধ্যে নানাধরণের রোগ দেখা যায়। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কিছু সুষম খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থাই এই অসুবিধা দূরীকরণের একমাত্র উপায়।

———

নবম অধ্যায়
প্রাথমিক সাহায্য
(First Aid)

প্রাথমিক সাহায্য বা প্রাথমিক শুশ্রূষা বলতে সাধারণতঃ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় বা আকস্মিক পীড়ায় আক্রান্ত কোনও ব্যক্তির, চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত যতখানি শুশ্রূষা ও সাহায্য করা যায় তাকেই বোঝায়। হাতের কাছে খুব সহজে যা পাওয়া যায় তাই নিয়েই প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসতে হয়। চিকিৎসক এসে উপস্থিত হলে, ইতিমধ্যে যা যা করা হয়েছে তার বিবরণ দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ শেষ করতে হয়। এরপর শুশ্রূষাকারীকে চিকিৎসকের নির্দেশানুযায়ী রোগীর শুশ্রূষা করতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য শুশ্রূষাকারীর যেমন পর্যবেক্ষণ শক্তি, উপস্থিত বুদ্ধি, বিচারক্ষমতা, ধৈর্যশীলতা ও সহানুভূতিশীলতা থাকা প্রয়োজন, তেমনি শারীরবিজ্ঞান ও শুশ্রূষাবিজ্ঞান সম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। শরীরের কোথায় শুশ্রূষার বেশী প্রয়োজন তা তাকে সর্বপ্রথমে জানতে হবে তারপর সেইমত শুশ্রূষা করতে হবে। এইভাবে স্থির সংকল্প নিয়ে, সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে, ধীর চিত্তে, খুব তাড়াতাড়ি প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ আরম্ভ করা উচিত। কোনো রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে, কৃত্রিম উপায়ে তার শ্বাসকার্য চালাবার চেষ্টা করতে হবে; রক্তক্ষরণ হতে থাকলে প্রথমেই রক্ত বন্ধ করা প্রয়োজন।

রোগীকে কোন দুর্ঘটনার পর যথাসম্ভব কম নাড়াচাড়া করতে হবে। রোগীকে এমনভাবে শোয়াতে হবে যাতে রোগী সবচেয়ে বেশী আরাম বোধ করে। রোগীর চারপাশ থেকে ভীড় সরিয়ে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া প্রয়োজন। যে কোন প্রকারের দুর্ঘটনা হোক না কেন রোগীর দেহের তাপ যাতে খুব কমে না যায় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগীর মনে সাহস দিতে হবে। আঘাত বা বিপদের কারণ দূর করা সম্ভব হলে তা তৎক্ষণাৎ তা দূর করা উচিত।

রোগী জীবিত না মৃত বলে সন্দেহ হলেও ডাক্তার না আসা পর্যন্ত

প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। রোগীকে সরানো গেলে তার বাড়ীতে অথবা হাসপাতালে বা নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়াই মঙ্গল।

এখন এক এক করে দেখা যাক কোন রোগীকে কি ভাবে প্রাথমিক বিধান দেওয়া উচিত।

কাটা, থেতলানো ও ক্ষত (Cuts, Bruises & Wounds)।

কোনো ধারাল জিনিষে লেগে চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি হলে সেখান থেকে রক্তপাত হতে থাকে, সামান্য কেটে ছিঁড়ে গেলে ক্ষতস্থান রেক্টিফায়েড স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করে টিংচার আইওডিন ছোঁয়ালে কিংবা বেঞ্জিন দিয়ে বেঁধে দিলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু একটু বড় রকমের কাটা হলে, খুব সহজে রক্ত বন্ধ করা যায় না। তাছাড়া ক্ষতস্থানটি রোগ জীবাণুদুষ্ট হয়ে পেকে উঠতে পারে, সেজন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

বড় রকমের কাটাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—(১) কর্তন জনিত, (২) ছিন্নভিন্ন ক্ষত, (৩) পিষ্ট হওয়ার ফলে ক্ষত।

(১) **কর্তনজনিত ক্ষত**—কোনো ধারাল জিনিষে লেগে যদি শিরা, উপশিরা কেটে যায় তবে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে থাকে। তখন হয়তো চিকিৎসক এসে ক্ষতস্থানটি সেলাই করে দেবেন। তার আগে প্রাথমিক চিকিৎসাকারীর উচিৎ ক্ষতস্থানের কাছে উপরের দিকে খুব জোরে চেপে ধরা। হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে রক্ত পাম্প করে শরীরের বিভিন্ন অংশে পাঠায়, কাজেই যেদিক থেকে রক্ত আসে সেদিকে চাপ দিলে রক্তের প্রবাহ কমে যাবে। কাঁচে কেটে গেলে, কাটা জায়গায় নুন চেপে দিলে ক্ষতস্থান বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, রক্তও সহজে বন্ধ হয়। তারপর মারকিউরোক্রোম ২% দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করতে হবে।

(২) **ছিন্নভিন্ন ক্ষত**—ছিন্নভিন্ন ক্ষত হতে বেশী রক্তপাত সাধারণতঃ হয় না। কাজেই ক্ষতস্থান ভাল করে ডেটল দিয়ে মুছে মারকিউরোক্রোম দিয়ে বেঁধে দিলে ভাল হয়।

(৩) **পিষ্ট হওয়ার ফলে ক্ষত**—কোন ভারী জিনিষ পড়লে অনেক সময় দেহের কোন অংশ থেতলে যায়। রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে যায়ও খুব যন্ত্রনা হয়। এইরকম আঘাতে তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডাজল অথবা বরফ দেওয়া উচিত। ঠাণ্ডাজলের পটি দিয়ে মাঝে মাঝে ক্ষত স্থানটিকে ভিজিয়ে দিতে হবে।

অস্থিভঙ্গ ও সন্ধিচ্যুতি (Fractures & Dislocation)।

আমাদের শরীরের অস্থি নানাকারণে ভেঙ্গে যেতে পারে।

(ক) আঘাতজনিত অস্থিভঙ্গ—প্রত্যক্ষ বল প্রয়োগের ফলে অস্থি ভেঙ্গে যায়। খুব জোরে আঘাত লাগলে, বন্দুকের গুলি লাগলে, চাকায় পিষ্ট হলে যেখানে আঘাত লাগে সেই জায়গার অস্থি ভেঙ্গে যায়।

(খ) পরোক্ষ অস্থিভঙ্গ—কিন্তু কখনও কখনও যেখানে আঘাত লাগে তার থেকে অনেক দূরের অস্থি ভেঙ্গে যায়। যেমন গাছ থেকে পড়লে পায়ে আঘাত, লাগে কিন্তু উরুর অস্থি ভেঙ্গে যায়। সেইজন্য এটিকে পরোক্ষ অস্থিভঙ্গ বলা হয়।

(গ) পৈশিক ক্রিয়াজনিত অস্থিভঙ্গ—জানুর অস্থির সংলগ্ন মাংসপেশীর আকস্মিক প্রবল সঙ্কোচনের ফলে এই প্রকার অস্থিভঙ্গ হয়।

অস্থিভঙ্গের প্রকারভেদ (Different types of Fractures)।

অস্থিভঙ্গ নানাপ্রকারের হতে পারে যেমন—

(১) সরল অথবা ক্লোজ্‌ড্‌ (Simple or Closed)—যখন বাইরে কোন ক্ষত দেখা যায় না কিন্তু ভিতরে অস্থিভঙ্গ হয় তখন হয় সরল অস্থিভঙ্গ।

(২) মিশ্র বা ওপ্‌ন্‌ (Compound or Open)—এরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায় বাইরে তন্তু, চামড়ায় ক্ষত ও ভিতরে অস্থিভঙ্গ। ক্ষতস্থান থাকায় রোগজীবাণু সহজে প্রকাশ করতে পারে।

(৩) জটিল (Complicated)—এতে কেবল অস্থিভঙ্গ হয় না উপরন্তু ভিতরের কোন শারীরযন্ত্র অথবা কোন শিরা, ধমনী আহত হয়। ফলে অস্থিভঙ্গ হবার পর স্থানচ্যুত হয়; সেজন্য একে জটিল অস্থিভঙ্গ বলা হয়।

অস্থিভঙ্গের সাধারণ চিহ্ন কি কি (General signs of Fractures)?

(১) অস্থিভঙ্গের স্থানে খুব বেদনা ও যন্ত্রণা হয়।

(২) আহত স্থানের উপর সামান্য চাপেও খুব ব্যথা লাগে।

(৩) ভগ্নাস্থির চারিদিকে ফুলে ওঠে।

(৪) আহত স্থান খুব সহজে নাড়াচাড়া করা যায় না।

(৫) অস্থিভঙ্গ হওয়ার পর অস্থি অন্যত্র সরে গেলে সেই অঙ্গে অস্বাভাবিক অবস্থা হয়।

(৬) অস্থি যদি চামড়ার ঠিক নীচেই হয় তাহলে হাত দিলেও অনেক সময় টের পাওয়া যায়।

(৭) অনেক সময় অস্থিভঙ্গের স্থানে খট্ খট্ আওয়াজ হয়।

অস্থিভঙ্গ চিকিৎসার সাধারণ নিয়মাবলী (General rules of Fracture Treatement)।

রোগীকে বেশী নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। সাময়িক ভাবে ভগ্ন অস্থি সংবদ্ধ করে দিতে হবে। কেটে বা ছিঁড়ে গেলে প্রথমে তার প্রতিবিধান করা উচিত। এক্ষেত্রে ব্যাণ্ডেজ ও Splint-এর ব্যবহার করার দরকারও হতে পারে।

ব্যাণ্ডেজ—যেখানে অস্থিভঙ্গ হয়েছে ঠিক তার উপরেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা উচিত নয়। অঙ্গ সঞ্চালন যাতে কম হয় সেজন্য ব্যণ্ডেজ একটু শক্ত করে বাঁধার নিয়ম কিন্তু তাই এত জোরে বাঁধবে না যাতে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হয়।

স্প্লিণ্ট—আহত অঙ্গকে ঠিকভাবে শক্ত করে রাখার জন্য যে কোন শক্ত জিনিষ যেমন লাঠি, কাটের টুকরো, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। স্প্লিণ্টের দৈর্ঘ এমন হবে যাতে ওটা ভগ্নাস্থির উপরের ও নীচের সন্ধি অবিচলিত রাখতে পারে। স্প্লিণ্ট যথেষ্ট চওড়া হবে এবং সম্ভব হলে আহত অঙ্গ ও স্প্লিণ্টের মাঝখানে প্যাড ব্যবহার করা যেতে পারে।

সন্ধিচ্যুতি (Dislocation)।

কোন অস্থিসন্ধি থেকে এক বা একাধিক অস্থি যদি স্থানভ্রষ্ট হয় তবে তাকে সন্ধিচ্যুতি বলে। সাধারণতঃ স্কন্ধ, কনুই, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, অঙ্গুলি, চোয়াল প্রভৃতি স্থানে সন্ধিচ্যুতি ঘটে।

লক্ষণ—সন্ধির উপর খুব ব্যথা হয়, অঙ্গ-বিকৃতি দেখা যায়; সন্ধি স্থল ফুলে উঠে। মৃগী রোগীর সন্ধিচ্যুতি প্রায়ই দেখা যায়।

প্রতিবিধান—প্রাথমিক শুশ্রূষাকারীর পক্ষে স্থানভ্রষ্ট অস্থিকে স্বস্থানে বসবার চেষ্টা না করা ভাল। চিকিৎসকের সাহায্য একান্তভাবে প্রয়োজন। সন্ধিস্থান মচ্‌কে গেলে (Sprains), আরামদায়ক অবস্থায় রোগীকে রেখে,

সন্ধিস্থল উন্মুক্ত রেখে ব্যাণ্ডেজ করতে হবে। তারপর ব্যাণ্ডেজকে বার বার ঔষধে বা জলে ভিজিয়ে দিতে হবে।

শুষ্কদাহ (Burns) এবং আর্দ্রদাহ (Scald)।

কোনো দাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে এসে আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কখনও কখনও পুড়ে যায়, একেই দাহ বলা হয়। দু'রকমের এই দাহ হতে পারে—শুষ্ক দাহ ও আর্দ্রদাহ।

শুষ্কদাহ—আগুন, কোন উত্তপ্ত ধাতব পদার্থ, বিদ্যুৎপ্রবাহ, বজ্র, চলমান দড়ি বা তার, ঘূর্ণমান চাকা, নানা প্রকার অ্যাসিড যেমন সালফিউরিক, নাইট্রিক, হাইড্রোক্লোরিক ইত্যাদি, ক্ষার পদার্থ যেমন কষ্টিক সোডা, পটাশ, অ্যামোনিয়া, চুণ ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুড়ে যায়।

আর্দ্রদাহ—ফুটন্ত জল, জলীয় বাষ্প, গরম তেল, গরম দুধ, গুড়, ডাল, তরকারী ইত্যাদিতে যখন পুড়ে যায় তাকে আর্দ্রদাহ বলা হয়।

লক্ষণ—পুড়ে গেলে চামড়া প্রথমে লাল হয়ে উঠে পরে ফোস্কা পড়ে আর খুব জ্বালা করে। পুড়ে যাওয়ার পর স্নায়বিক আঘাত তীব্র হতে পারে। দগ্ধস্থানে রক্ত দূষিত হয়ে পেকে যায় অনেক সময়।

প্রতিবিধান—স্নায়বিক আঘাত হলে রোগীকে হালকা উত্তেজক চা, কফি, গরম দুধ ইত্যাদি পান করতে দেওয়া দরকার। অ্যাসিড বা ক্ষার পদার্থে পুড়ে গেলে জল দিয়ে আহত স্থান ধুয়ে দিতে হবে বাকি সময়ে জল লাগান উচিত নয়। ফোস্কা গেলে দিতে নেই এবং কোন লোশান লাগাতে নেই। সম্ভব হলে বীজাণুশূণ্য ড্রেসিং দিয়ে আহত স্থান ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া উচিত। গুরুতর আঘাত হলে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

দংশন ও হুল ফুটানো (Bites & Stings)।

বোলতা বা অন্য কীট পতঙ্গে হুল ফুটানোও সঙ্গে সঙ্গে আইওডিন লাগান উচিত। ক্ষতস্থান ফুলে উঠে ও যন্ত্রণা হয়। গরম জলে সেঁক দিলে ও সোডার সলিউসান লাগালে যন্ত্রণা কমে।

কাঁকড়া বিছার হুল অনেক সময় চামড়ার সঙ্গে লেগে থাকে। প্রথমে হুলটা বার করে দেওয়া দরকার। একটা বড় চাবির ফুটো দিয়ে ক্ষতস্থানটি

চেপে ধরলে হুল বার হয়ে আসবে। অ্যামোনিয়া, রেকটিফায়েড স্পিরিট দিয়ে ঐ স্থানটি ধুয়ে দিলে, অথবা গরম নুনজলের সেঁক দিলেও যন্ত্রণার উপশম হয়।

সাপে কামড়ান—কোন বিষধর সাপে কামড়ালে ক্ষত স্থানের উপরের দিকে নিকটবর্তী অস্থিসন্ধির উপরে হৃৎপিণ্ডের দিকে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধন দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দেওয়া উচিত। চেপে বেঁধে দেওয়ার পর ক্ষত স্থান পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট এর জলে ধুয়ে ফেলা আবশ্যক। আহত ব্যক্তির দেহে গরম রাখা ও সম্পূর্ণ বিশ্রাম করতে দেওয়া কর্তব্য। গরম পানীয়, চা, কফি, দুধ ইত্যাদি রোগীকে খাওয়াতে হবে। রোগী যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আহত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা বাক্যদ্বারা নির্ভয় করা কর্তব্য। যদি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তবে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চালু করতে হবে।

এরপর অ্যান্টি-ভেনিন, লেকসিন প্রভৃতি কতকগুলি ওষুধ প্রয়োগ করে সর্পঘাত জনিত রোগীর উপশম করা যেতে পারে।

সমাপ্ত

প
পরি
স্বাস্থ

গায়

সুলো
সে